প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৬২

মুদ্রাকর—শ্রীরণজিৎকুমার সামুই
ভাস্কর প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

পরম আরাধ্যতমা

স্বর্গতা মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

॥ নিবেদন ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 'চর্যাগীতি' পড়াইতে পড়াইতে এই গানগুলি সম্পর্কে আমার মনে নূতন কৌতূহল জাগ্রত হয়। আমি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি, চর্যাগানগুলি গৌড়বঙ্গের নিজস্ব সম্পদ। গানগুলির ভাষা, স্থানিক পট, নিসর্গ-প্রকৃতি, আভ্যন্তর সাধন-প্রণালী ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ইহাদের উত্তরাধিকার—এই দেশেরই মর্মমূলকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছে। সাহিত্যিক মূল্য বাদেও গানগুলি প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। শুধু ধর্মসঙ্গীত বা তত্ত্ববাহিত সাহিত্য বলিয়া নহে, সংস্কারমুক্ত পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের ভিত্তি গঠনে 'শূন্যতা-করুণাভিন্ন' বোধিচিত্তের আদর্শ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, জ্ঞানমিশ্রা করুণাই পরহিতব্রতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—সেখানে জাতিভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই, স্ব-পর ভেদ নাই। সমগ্র চর্যার অন্তরালে মুক্ত মনের জীবননিষ্ঠা ও পরোপচিকীর্ষার কথা যেন গানের ধ্রুবপদের মত নানারূপকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি আমার এই অনুভবের কথা আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছি, লক্ষ্য করিয়াছি তাহাদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ। দেশীয় সংস্কৃতির এই মর্মসত্য নীরস তত্ত্বের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে। 'চর্যাগীতির ভূমিকা' রচনায় ইহাই মূল প্রেরণা।

এ বিষয়ে পূর্বসূরীদের অমূল্য আলোচনা আমাকে পথ দেখাইয়াছে। বারবার মনে পড়িয়াছে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের কথা। বঙ্গের লুপ্তপ্রায় বিচিত্র ধর্ম সাধনার ধারাগুলিকে তিনিই অকৃত্রিম নিষ্ঠা সহকারে নূতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তথ্যনিষ্ঠার দিক হইতে শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের আলোচনাও অত্যন্ত মূল্যবান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনুলাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে চর্যাগীতি পড়াইবার ভার দিয়া আমার চিন্তা ও আলোচনার দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্য ভারতীয় ভাষাবিভাগের বর্তমান প্রধান অধ্যাপক বন্ধুবর ডঃ অসিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নম্রস্নিগ্ধ উৎসাহ গ্রন্থপ্রকাশে আমাকে

অনুপ্রেরিত করিয়াছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবিভাগের প্রধান, সুহৃদ্বর ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের 'হিতমনোহারী' উপদেশের কথাও আমি স্মরণ করি।

পরিচিত সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও প্রাচীন বাংলাপুথির অনুরাগী সংগ্রাহক শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়ালের নাম উল্লেখযোগ্য। আমার স্নেহভাজন অধ্যাপক শ্রীমান্ সুশান্ত বসু আদ্যোপান্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সংশোধনের কাজ করিয়া দিয়াছে, শ্রীমান্ বিনোদ কিশোর গোস্বামী ও অধ্যাপক দিলীপ নন্দী প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। শ্রীমান সুখেন্দু পুরকায়স্থ গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করিয়াছে এবং গোবিন্দপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অরুণ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই আমার শুভ কামনা জানাই।

ডি. এম লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী বর্ষপ্রবীণ শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদারের স্নেহের কথা আমি ভুলিব না। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহার আগ্রহ আমাকে দৃঢ় স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়াছে। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন। গ্রন্থ মুদ্রণে 'ভাস্কর প্রিণ্টার্সে'র তরুণ মুদ্রক শ্রীরণজিৎ কুমার সামুইএর প্রযত্ন ও ধৈর্য ধন্যবাদার্হ।

চর্যাপদাবলী এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয়। বইখানি সম্পর্কে অধ্যাপকদের কোন বক্তব্য বা নির্দেশ সাদরে গ্রহণ করিব। ভবিষ্যতে চর্যাগীতাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ সহ একটি সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু তৎপূর্বে পুনর্বার দেখা প্রয়োজন নেপাল রাজদরবারের আদর্শ পুথি। এই গ্রন্থ শুধু ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করিয়া নহে, বাংলার তথ্যান্বেষী অনুরাগী পাঠকদের উদ্দেশ্যেও রচিত। এই পুস্তক পাঠে ছাত্রসমাজ ও সাধারণ পাঠক উদ্বুদ্ধ ও উপকৃত হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আচার্য অদ্বয়বজ্রের উক্তি দিয়া নিবেদন শেষ করিতেছি—

স্বার্থং বাপি পরার্থং বা সাধিতং মে শুভং যতঃ।
তেন পুণ্যেন লোকোঽস্তু জ্ঞানভূমিঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥

নিবেদক—
শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

সূচীপত্র

[পার্শ্বস্থিত সংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্কের সূচক]

॥ সূচনা ॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবার-গ্রন্থাগার হইতে 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন। নব্যভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার বাঙ্গালীর গৌরবময় অবদান। গ্রন্থখানিতে আছে সংস্কৃত ভাষ্য সহ কতকগুলি 'বৌদ্ধ গান': গানগুলির ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষায় রচিত গানের সংস্কৃত টীকা, যেন এক অপার বিস্ময়। শুধু তাহাই নহে, গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলার একটি বিস্মৃত যুগের দর্পণ। ইহারই ভিতর নিহিত রহিয়াছে গৌড়বঙ্গের প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজের ঐতিহাসিক উপকরণ। সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা এক নব সংযোজন। 'আমাদের সৌভাগ্য যে, একজন বাঙালীই বঙ্গের এই লুপ্তরত্নের আবিষ্কর্তা।'

বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে নব্য বাঙালীর সোৎসুক দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছেন পাশ্চাত্য বিবুধ বর্গ। তাঁহারাই দক্ষিণে দ্বীপময় ভারতে হীনযান এবং উত্তরে নেপাল-তিব্বতে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের তথ্য প্রকাশ করেন। পণ্ডিতপ্রবর B. H. Hodgson ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নেপালে হইতে উত্তরাপথে প্রচলিত বৌদ্ধ পুথি সংগ্রহ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। ইংরাজ পণ্ডিত Wright সাহেবও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নেপাল হইতে পুথি সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের চোখে সটীক চর্যাগীতির সঙ্কলন গ্রন্থখানি পড়িতে পারিত। তাহা পড়ে নাই। বাঙালীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতেই বাংলার প্রাচীন ঐশ্বর্য ধরা পড়িয়াছে।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। বাঙালীর রক্তে তান্ত্রিকতার স্রোত প্রবাহিত। হিন্দুতন্ত্রের একটি ধারার বাহক গৌড়বঙ্গ। তন্ত্রস্পৃষ্ট বৌদ্ধধর্মের বিকাশও গৌড়বঙ্গে। এই দেশ হইতেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মচক্র তিব্বতে-চীনে প্রসারিত হইয়াছিল। বাঙালী সে ইতিহাস প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যস্থতায় যখন সেই লুপ্ত প্রায় ইতিহাসের দ্বার উন্মোচিত হইল, তখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার বিচিত্র তথ্য আবিষ্কারে বাঙালী পশ্চাৎপদ রহিলেন না। এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন বঙ্গগৌরব শরৎচন্দ্র দাস। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তুষার-মণ্ডিত হিমালয়-পথ অতিক্রম করিয়া পিকিং-এর নিষিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির ('The

Forbidden Temple') হইতে তিনিই প্রথম সংগ্রহ করিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের চিত্র-প্রতীক। তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইল, 'Buddhist Text Society' (১৮৯২)। এই ব্যাপারে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের প্রচেষ্টাও স্মরণযোগ্য। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'Sanskrit Buddhist Texts of Nepal' নাম দিয়া Hodgson-সংগৃহীত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় প্রকাশ করেন। গবেষক বাঙালীর দৃষ্টি বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয় নেপাল-তিব্বতে রক্ষিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতি। তাঁহারা বুঝিতে পারেন, প্রাচীন বাংলার অনেক বিস্মৃত কীর্তি ওই সকল দেশের ধর্মচর্চার কেন্দ্রেই সংরক্ষিত রহিয়াছে।

ইতিহাস-অনুসন্ধানের এই ধারা ধরিয়াই পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চার বার নেপাল যান। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় যাত্রাই বিশেষভাবে সিদ্ধিপ্রদ। এই বারেই তিনি 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' গ্রন্থখানির সন্ধান পান এবং নেপালের দরবার গ্রন্থাগার হইতে উহা নকল করাইয়া লইয়া আসেন। গ্রন্থখানি অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থের সহিত অর্থাৎ ১. সরোজ বজ্রের সটীক দোহা-কোষ, ২. মেখলা টীকাসহ কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ৩. বৌদ্ধ তন্ত্রের পুথি ডাকার্ণব-এর সঙ্গে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩২৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাদের ভিতর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত 'চর্য্যাচর্য চিনিশ্চয়' গ্রন্থখানিতেই প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধগানের সঙ্কলন পাওয়া যায়।

॥ পুথি-পরিচয়ঃ পুথির অপূর্ণতা ॥

'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' পুথিখানি তালপাতায় লেখা। প্রাচীন অন্যান্য পুথির মত একটি পাতার উভয় পৃষ্ঠাতে পংক্তিগুলি একটানা সাজানো। এক একটি পৃষ্ঠায় পাঁচটি করিয়া পংক্তি। প্রতি পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাতার সংখ্যাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। শেষের পাতার অঙ্ক-সংখ্যা ৬৯, কিন্তু উহাতে পুথি অসমাপ্ত। মাঝখানের ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ এবং ৬৬ সংখ্যক পাতাগুলিও নাই। কাজেই আবিষ্কৃত পুথিখানির মধ্য ও অন্ত খণ্ডিত। লুপ্ত পত্রগুলি বাদে মোট ৬৪টি পাতা পাওয়া যাইতেছে। প্রথম পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে গ্রন্থের শুরু।

প্রথমে 'নমঃ শ্রীবজ্রযোগিন্যৈ।' তৎপরে একটানা প্রায় দেড় পংক্তিতে শ্রীমৎ-সদ্‌গুরুবক্ত্রপঙ্কজ' নামক বন্দনা ও বস্তুনির্দেশক-শ্লোক। তৎপরে দ্বিতীয় পংক্তির মাঝামাঝি হইতে 'কাআ তরুবর' দ্বারা আরম্ভ ১ম চর্যাগীত। গীতের প্রতি চরণের পরে এক দাঁড়ি (।), দ্বিতীয় চরণের পরে দুই দাঁড়ি (।।)। অতঃপর রাগ 'পটমঞ্জরী'র উল্লেখ। অনন্তর 'কায়া-তরুবরেত্যাদি' বলিয়া সংস্কৃত টীকার শুরু। টীকার শেষে গানের ক্রমিক সংখ্যা।

দ্বিতীয় গানটির আরম্ভ-ক্রম স্বতন্ত্র। উহা আরম্ভ হইয়াছে চতুর্থ পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। তাহাতে প্রথমেই 'রাগ'-এর নাম, তৎপরে চর্যাকারের নাম (যথা, 'রাগ গবড়া কুক্কুরীপাদানাং')। অতঃপর মূল গান, টীকা এবং টীকার শেষে গানটীর ক্রমিক সংখ্যা। পরবর্তী অংশগুলি এই ক্রমেই সাজানো। তবে কোথায়ও কোথায়ও যে ব্যতিক্রম না আছে, তাহা নহে। মনে হয়, ব্যতিক্রমগুলি লিপিকর প্রমাদজাত। যথা ১০ সংখ্যক গানের পূর্বে শুধু 'রাগ'-এর ('রাগ দেশাখ') নাম আছে, চর্যাকারের নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু গান ও টীকা হইতে জানা যায়, গানটি 'কাহ্ন' বা 'কৃষ্ণপাদ' বা 'কৃষ্ণাচার্য'-এর রচনা। ১২ সংখ্যক গানের পূর্বে 'রাগ' পদটি ব্যবহার করা হয় নাই, সোজা-সুজি আছে, 'ভৈরবী কৃষ্ণপাদানাং'। বোঝা যায়, রাগ ভৈরবী, কবি কৃষ্ণাচার্য। শেষ গানটির টীকাংশ খণ্ডিত। তবে উহার পূর্ব গানের টীকা-শেষে ।। ৪৯।। সংখ্যা থাকায় বোঝা যায়, শেষ গানটির সংখ্যা ছিল ৫০। অর্থাৎ আবিষ্কৃত পুথিতে সংখ্যাত গানের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ।

প্রথম আবিষ্কার সচরাচর নিখুঁত হয় না। আকর হইতে যে স্বর্ণ সংগৃহীত হয়, তাহাতে নানারূপ অপূর্ণতা থাকে। শাস্ত্রী-সংগৃহীত পুথিখানিও নানাদিক হইতে অপূর্ণাঙ্গ। ফলে কতকগুলি সংশয় ও সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথমতঃ শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন, 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'। এই নাম পুথিতে পাওয়া যায় না। প্রশ্ন জাগে, এ নাম তিনি কোথায় পাইলেন? এই গ্রন্থনাম সঙ্গত কি না?

দ্বিতীয়তঃ, এই পুথিতে সংখ্যাত গীতের সংখ্যা পঞ্চাশটি হইলেও মাঝখানের শেষের কয়েকটি পাতা না পাওয়ায় ২৩ সংখ্যক গানের ছয়টি চরণ ব্যতীত ২৪, ২৫ এবং ৪৮ সংখ্যক গান সম্পূর্ণ লুপ্ত। অতএব প্রাপ্ত পুথিতে মিলিতেছে একটি অপূর্ণাঙ্গ গীতসহ ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ গান। টীকার ব্যাপারেও ২৩ ও

২৪ সংখ্যক গানের সম্পূর্ণ টীকা ও ২৫ সংখ্যক গানের প্রথমাংশের .. লুপ্ত। ৪৭ সংখ্যক গানের টীকা সামান্যের জন্য অসমাপ্ত এবং ৪৮ সংখ্যক গানে শেষ পদটির ব্যাখ্যা ব্যতীত গোটা টীকাই লুপ্ত। তবে ২৫ সংখ্যক গান যে তন্ত্রীপাদের এবং ৪৮ সংখ্যক যে কুক্কুরীপাদের রচনা, তাহা গীতদ্বয়ের টীকা শেষাংশ হইতে জানা যায়। কিন্তু ওই গানগুলি কোন্ রাগে গীত এবং উহাদে বিষয় বস্তুই বা কি ছিল, আবিষ্কৃত পুথি হইতে সে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না উপরন্তু ৫০ সংখ্যক গানের টীকার শেষাংশ খণ্ডিত থাকায়, টীকাকারের নাম ' তাঁহার শেষ বক্তব্যও অজ্ঞাত। তবে টীকাটির নাম যে 'নির্মলগিরা টীকা তাহা সূচনা-শ্লোক হইতে জানা যায়।

তৃতীয়তঃ প্রাপ্ত পুথিতে ১০ সংখ্যক চর্যাটীকার পরে, টীকাকারই হউন ব লিপিকরই হউন, লিখিয়াছেন, "লাড়ীডোম্বীপাদানাম্ সূনেত্যাদি। চর্য্যা ব্যাখ্যা নাস্তি।" এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় পাদটীকায় বলিতেছেন, "এখানে চর্য্যাপদটিও নাই, তাহার ব্যাখ্যাও নাই। সেইজন্য তাহার নম্বরটি টীকাকার ধরেন নাই। চর্য্যাসংগ্রহে কিন্তু গানটি ছিল বোধ হয়। 'চর্য্যাসংগ্রহে গানটি ছিল বোধ হয়'—মন্তব্যটি নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে।

চতুর্থতঃ, প্রকাশিত গ্রন্থে যে চর্যাগীতি ও টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে উদ্ধৃত গানের সঙ্গে কোন-কোন স্থলে টীকা-ধৃত পাঠের অমিল লক্ষিত হয় প্রশ্ন জাগে, কোন্ পাঠটি খাঁটি—উদ্ধৃত গানের, না টীকাধৃত পাঠের?

পঞ্চমতঃ, শাস্ত্রী মহাশয় দোহা ও চর্যা উভয়ের ভাষাকেই 'বাঙ্গালা' বলিয় ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু দোহা ও চর্যার ভাষায় যে পার্থক্য বিদ্যমান ভাষাবিদের চোখে তাহা স্পষ্ট। চর্যার ভাষা নব্য ভারতীয় ভাষাবর্গের কো ভাষা, সে সম্পর্কেও বিতর্ক অল্প নহে।

প্রকাশিত গ্রন্থ এইভাবে নানা সমস্যা ও বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে পরবর্তীকালের অনুসন্ধিৎসায় ও আলোচনায় এই সমস্যার অনেকগুলিই নিরাকৃ হইয়াছে। ভালবাসার ধনকে মানুষ পূর্ণাঙ্গরূপেই দেখিতে চায়। বাঙালী বিবুধবর্গ এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকেন নাই। চর্যার ভাষা লইয়া মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া নৈয়ায়িকের মত তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, চর্যাগীতির ভাষা নিঃসংশয়ে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় আচা ডঃ সুকুমার সেনের কৃতিও অসামান্য। চর্যার বিষয়বস্তু ও পাঠান্তর

ার করিয়াছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী আবিষ্কার রিয়াছেন এই গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। লুপ্ত চর্যাগীতি এবং নির্মলগিরা কার ভাবোদ্ধারে এই অনুবাদ বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে ; উপরন্তু জানা য়াছে, 'নির্মলগিরা টীকা'র রচনাকার আচার্য মুনিদত্ত। চর্যাগীতির শুদ্ধ পাঠ রূপণে ও গ্রন্থ-নাম বিচারেও এই অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। ডঃ বাগচী গীতির সন্ধ্যাভাষা এবং রূপকার্থ লইয়াও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন ষ্টব্য 'Studies in the Tantras—Part I')। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী বিধুশেখর চার্যের দানও স্মরণীয় ; 'সন্ধা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ বিচারে তাঁহার মন্তব্যের ত্ব আছে। চর্যাগীতির দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ গুপ্তের 'Obscure Religious cults' এবং 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি' গ্রন্থদ্বয় ূত আলোকসম্পাত করিয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল আলোচনাই চর্যাগীতি-ঠের মূল্যবান্ ভূমিকা। আর এই আলোচনার পুরোভাগে রহিয়াছেন স্ত্রী হরপ্রসাদ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নে চর্যাগীতির সংযোজন প্রসাদেরই প্রসাদ

॥ গ্রন্থনাম বিচার : চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ॥

আবিষ্কারক শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত গ্রন্থখানির নাম দিয়াছেন য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। মুখবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "১৯০৭ সালে আবার নেপালে া আমি কতকগুলি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার ৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, গানের নাম 'চর্য্যাপদ'।" বস্তুতঃ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার পর গ্রন্থনাম বিচারের গতি দুই মুখে হইয়াছে : একটির বিষয় সঙ্কলিত গীত ; অপরটির বিষয় সংস্কৃত গীত-সঙ্কলনের দিক হইতেই নামকরণের ঝোঁকটা বেশী। গ্রন্থখানির লোচনা প্রসঙ্গে বিধুশেখর ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) [Indian Historical arterly. Vol IV] মন্তব্য করিয়াছিলেন, গ্রন্থের শুদ্ধ নাম হইবে 'আশ্চর্য-কারণ নির্মলগিরা টীকার বস্তু-নির্দেশক শ্লোকে ওই নামটি রহিয়াছে। বর্তীকালে যাঁহারা সটীক গানগুলির সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও

গীতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাম নিরূপণ করিয়াছেন। এইরূপে 'চর্যাপদ' (শাস্ত্রী), 'আশ্চর্য চর্যাচয়' (ভট্টাচার্য), 'চর্যাগীতিকোষ' (ডঃ বাগচী) এবং 'চর্যাগীতিপদাবলী' (ডঃ সেন) প্রভৃতি নামের নির্দেশ পাওয়া যায়।

কিন্তু গ্রন্থনাম বিচারে প্রথম বিচার্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যে গ্রন্থখানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চর্যাগীতি সঙ্কলন মাত্র নহে, গীতিগুলির অর্থ বা টীকা। গ্রন্থখানির আরম্ভ টীকাকারের বন্দনা ও বস্তুনির্দেশক শ্লোক লইয়া। তৎপরে মূল গান, তৎপরে টীকা। গ্রন্থের সমাপ্তি অংশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুথিতে নাই। কিন্তু ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতী অনুবাদের যে সংস্কৃত ছায়া দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, তাহা টীকাকার মুনিদত্তের উক্তি লইয়াই পরিসমাপ্ত। অতএব আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত গ্রন্থখানিতে টীকাংশই প্রধান।

কেহ কেহ মনে করেন, মূল গ্রন্থে গানগুলি ছিল না। সম্ভবতঃ অর্থাববোধের জন্য লিপিকর পরে গানগুলি যোগ করিয়া দিয়াছেন। টীকায় প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পদের প্রথম শব্দটি উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা শুরু হইয়াছে। গানগুলি থাকিলে পদে পদে এইরূপ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হইত না। মূল না দিয়া, শুধু মূলের প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দটির উল্লেখ করিয়া টীকা রচনা— এই রীতি যে বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচলিত ছিল, হেবজ্রতন্ত্রের কাহ্নপাদকৃত 'যোগরত্নমালা' টীকা, অদ্বয়বজ্রকৃত সরোরুহবজ্রের 'দোহাকোষপঞ্জিকা' এবং নারোপা-কৃত 'সেকোদ্দেশটীকা' গ্রন্থগুলিই তাহার সাক্ষ্য। আলোচ্য গ্রন্থে হয়তো সেই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত গান ও টীকার পাঠভেদও এই উক্তি সমর্থন করে। কাজেই অনেকেই মনে করেন আবিষ্কৃত গ্রন্থখানি আদৌ ছিল টীকা-সর্বস্ব। টীকাকারের সূচনা শ্লোকের 'নির্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটম্' এবং সমাপ্তি শ্লোকের 'কোষস্য চার্থঃ প্রকটিকৃতোঽত্র'—প্রভৃতি উক্তিও এই মত সমর্থন করে।

গ্রন্থখানি যদি টীকা গ্রন্থই হয়, তবে ইহার 'চর্য্যাপদ', 'চর্যাগীতিকোষ', 'চর্যাগীতিপদাবলী' নামকরণ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। তখন 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটির প্রতিই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু মূল পুথিতে এই নাম নাই। শাস্ত্রী মহাশয় কোথা হইতে এই নাম পাইলেন, তাহাও অজ্ঞাত। এ নামের তাৎপর্যই বা কি? কেহ কেহ মনে করেন, 'চর্য্য' অর্থ আচরণীয় এবং 'অচর্য্য' অর্থ অনাচরণীয়। অতএব যে গ্রন্থে সিদ্ধাচার্যদের 'চর্য' ও 'অ

নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা 'চর্য্যাচর্য-বিনিশ্চয়' ; এই দিক হইতে টীকার নামকরণ সঙ্গতই হইয়াছে। বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রীও বলেন,

"I see no justification to invent a new name when the old one conveys the better meaning, that is, Viniscaya 'determination' of carya 'that to be practised' and acarya 'that not to be practised'" (Preface Caryagitikosa : Visva Bharati) কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গানগুলি চর্যা। কৃদন্ত বিশেষ্যরূপে চর্য ও অচর্য শব্দ দুইটি কোথায়ও ব্যবহার করা হয় নাই ; না গানে, না টীকায়। তাই কেহ কেহ টীকোক্ত সূচনা শ্লোকের 'আশ্চর্যচর্যা' উক্তিটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'It Therefore seems that the name chosen by Dr. Shastri was based on a wrong reading of the title—*Caryascarya Viniscaya*." (Studies in the Tantras Pt. I : P. C. Bagchi) ; শ্রদ্ধেয় আচার্য সুকুমার সেনও মনে করেন, "চর্য্যাচর্য-বিনিশ্চয়' নামটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ নাম হইবে 'চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড)।

এ সবই পরিকল্পনা মাত্র : মহাযান সম্প্রদায়ের বহু পুথি কালক্রমে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল : অনূদিত হইয়াছিল মূল শাস্ত্র ও তাহাদের টীকাজাতীয় গ্রন্থাবলী। শাস্ত্র ও ভাষ্য অনুসারে তাহাদিগকে তিব্বতী ভাষায় যথাক্রমে কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর—এই দুই তালিকায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। কর্দিয়ে সাহেব এই তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঞ্জুর তালিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তালিকায় আচার্য মুনিদত্তের নামে 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি নাম' গ্রন্থখানির উল্লেখ আছে। এই একই নামে আর একখানি পুথির উল্লেখ রহিয়াছে। তাহার রচয়িতা কীর্তিচন্দ্র (মহাপণ্ডিত)। কর্দিয়ে প্রকাশিত তালিকার নির্দেশ অনুসারে জানা যায়, সংস্কৃত টীকার রচয়িতা মুনিদত্ত এবং উহার তিব্বতী অনুবাদক কীর্তিচন্দ্র। অতএব বোঝা যায়, মুনিদত্তকৃত টীকার নাম 'চর্য্যাগীতি কোষ বৃত্তি'। কিন্তু টীকাকারের নিজের উক্তি-বিচারে মনে হয়, 'বৃত্তি'র পরিবর্তে তিনি 'টীকা' শব্দটিই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কারণ, গ্রন্থের সূচনায় তিনি বলিয়াছেন, 'টীকাং বিধাস্যে স্ফুটম্'। অতএব শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায়, গ্রন্থটির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ

টীকা'। তিব্বতী রূপান্তরে তাহা হইয়াছে 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। এই নামটিই প্রকাশিত গ্রন্থের নাম হওয়া সঙ্গত।

॥ গ্রন্থনাম : চর্যাগীতিকোষ ॥

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রীর গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার পরে গ্রন্থনামবিচারের দ্বিমুখী ধারা দেখা গিয়াছে। অনেকেই গীত-সঞ্চয়নের দিক হইতে গ্রন্থনাম বিচার করিয়াছেন। আচার্য শাস্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন, 'গানের নাম চর্য্যাপদ।' বিধুশেখর ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) সূচনাশ্লোকের একটি অংশ 'শ্রীলুয়ীচরণাদিসিদ্ধ রচিতে হত্যাশ্চর্য চর্য্যাচয়ে' অবলম্বনে মন্তব্য করিয়াছেন, গ্রন্থখানির নাম হইবে 'আশ্চর্য চর্য্যাচয়'। মুনিদত্তের টীকার শেষাংশে তিব্বতী অনুবাদের সংস্কৃত ছায়ায় দেখা যায়, পণ্ডিতগণের বিচারের নিমিত্ত একশত চর্যাগীতিকার একটি 'কোষ' সংরচিত হইয়াছিল। মুনিদত্ত সেই সমাহৃত শত চর্যাগীতিকার একটি চয়নিকা হইতে অর্ধেক গীতির ('অর্ধস্য তস্মাৎ') অর্থ প্রকটীকৃত করিয়াছেন। কাজেই পরবর্তীকালে যাঁহারা সটীক গানগুলির সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও গীতের দিক হইতেই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। তিব্বতী অনুবাদের আবিষ্কারক ডঃ বাগচী তাই মনে করেন, 'Caryagitikosa might have been another name under which the collection of the caryas was known.' (Studies in the Tantras. Pt. I) ; বিশ্বভারতী হইতে শান্তিভিক্ষুর সঙ্গে যুক্ত সম্পাদনায় তাঁহার যে সটীক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'চর্যাগীতিকোষ'। ডঃ সুকুমার সেন মূল ফটো প্রতিলিপির সহিত পুনরায় পাঠ মিলাইয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন 'চর্যাগীতিপদাবলী'। বস্তুতঃ মুনিদত্তের টীকাও যে গান-সংযুক্ত ছিল, তাহার ইঙ্গিত মুনিদত্ত স্বয়ং দিয়াছেন একেবারে গ্রন্থশেষে— 'সিদ্ধবজ্রগীতয়ঃ সটীকাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ'।[১] অতএব গীত-সঞ্চয়নের দিক হইতে গ্রন্থের চর্যাগীতি এই নামকরণকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া যায় না।

তবে গ্রন্থনাম 'চর্য্যাপদ' (শাস্ত্রী ও মণীন্দ্র মোহন বসু) হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যদিও "পরবর্তীকালে 'পদ' শব্দটির অর্থ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তবু আদৌ 'পদ'

১। 'চর্যাগীতিকোষ-সিদ্ধ বজ্রগীতি-তত্ত্বাবভাসিত কল্যাণমিত্রাণাং কৃতে আচার্য মুনিদত্তেন বিবৃতাঃ সিদ্ধ বজ্র গীতয়ঃ সটীকাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ' (চর্যাগীতিকোষ, বিশ্বভারতী)।

[লি]লিতে বুঝাইত—দুই পংক্তির একটি শ্লোক বা 'couplet' অর্থাৎ গানের মাত্র [দু]ইটি ছত্র" (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ)। চর্যাটীকায় প্রতিটি গানের ব্যাখ্যায় এই [অ]র্থেই 'পদ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। পদসমষ্টি সঙ্কলনের দিক হইতে গীত-[স]ঙ্কলনের নাম 'চর্যাপদাবলী' হইতে পারে। কিন্তু ডঃ সেন নির্বাচিত 'চর্যাগীতি-[প]দাবলী' পুনরুক্ত দোষদুষ্ট। পণ্ডিতপ্রবর বিধুশেখরের 'আশ্চর্য চর্যাচয়' নামটি [অ]নুপ্রাস-সুবলিত ও টীকা-সমর্থিত হইলেও 'আশ্চর্য' শব্দটি চর্যার বিশেষণ [রূ]পেই প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার সহিত টীকায় আর একটি বিশেষণের বিশেষণ [যো]গ করা হইয়াছে 'অত্যাশ্চর্য'। তাহা হইলে নাম 'অত্যাশ্চর্য চর্যাচয়' হইতে [পা]রে। সম্পূর্ণ বিশেষণটি বর্জন করিয়া অংশকে গ্রহণ করার পক্ষে প্রবল যুক্তি [না]ই। তাহা ছাড়া, 'আশ্চর্য্য' বা 'অত্যাশ্চর্য' শব্দটি একবারই মাত্র চর্যাটীকার [প্রা]রম্ভে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই নামে গ্রন্থ হইলে অন্ততঃ দ্বিতীয়বার ইহার [উ]ল্লেখ থাকিত। বরং সংগ্রহগ্রন্থের দিক হইতে গ্রন্থনাম 'চর্যাচয়', বা শুধু ['চ]র্যাগীতি' বা 'চর্যাগীতিকোষ' হইতে বাধা নাই। তন্মধ্যে বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-[রী]তির দিক হইতে 'চর্যাগীতিকোষ' নামটিই তাৎপর্যবোধক এবং তাঞ্জুর [তা]লিকা-সমর্থিত।

'চর্যাগীতিকোষ' নামটি তিনটি পদের সমস্তপদ—চর্যা, গীতি ও কোষ। [না]মবিচারে এককভাবে প্রতিটি পদের গুরুত্ব বিচার্য।

(১) চর্যা—চর্যা শব্দটি চর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। শব্দকল্পদ্রুম মতে চর্যার [অ]র্থ 'ঈর্য্যাপথস্থিতিঃ'। 'ঈর্য্যা' মানে ভিক্ষুব্রত।[১] সেই ভিক্ষুব্রতে অবস্থানই চর্যা। [কো]থায়ও 'চর্যা' আচার শব্দটির সহিত এক হইয়া গিয়াছে; অসঙ্গের 'যোগাচার-[ভূ]মি' তিব্বতে 'যোগচর্যাভূমি' নামে প্রচলিত। চর্যাগানে 'চার' শব্দটি আচার [বা] চর্যাঅর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (তুঃ 'কাহ্ন কপালী যোগী পইঠঅ চারে' ১১)। [চ]র্যাটীকায় বলা হইয়াছে -যোগীর অবস্থান ও বিহারাদির নিয়মই চর্যা—'চর্যা [যো]গীন্দ্রস্য স্থিতির্বিহরণাদিকং' (টীকা ২)। বস্তুতঃ সাধনার ক্ষেত্রেই ঈর্যা-[চ]র্যার প্রয়োগ। চর্যা শব্দটি অপ্রাচীনও নহে। প্রাচীন পালি গ্রন্থে [বো]ধিসত্ত্বের আচরণীয় চর্যাকে বলা হইয়াছে 'চরিয়া'। পালি 'চরিয়া পিটকে' [দা]ন, শীল, সত্য, মৈত্রী, উপেক্ষা প্রভৃতি পারমিতার উল্লেখ দেখা যায়।

১। মহাযান বিংশিকার মতে—'ঈর্য্যাচ কায়িকং কর্ম বাচিকং ধর্মদেশনা।
সমাদানং মনঃকর্ম নির্বিকল্পস্য ধীমতঃ ॥ (অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ)

বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব অর্জনের নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব জন্মে এই পারমিতাগুলির অনুশীলন করিতেন। ইহাই 'চরিয়া' বা চর্যা।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে—মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়েরও প্রধান আচরণীয় ছিল পারমিতা। এইজন্য এই সকল শাখার সাধন-পদ্ধতি 'পারমিতা নয়' নামেও খ্যাত। উহাতে দশ পারমিতা, (দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান) এবং বিশেষতঃ ষট্‌পারমিতার (দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা) অনুশীলন 'বোধিচর্যা' বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। ইহাদের ভিতর 'প্রজ্ঞা' ছিল পারমিতাগুলির প্রধান, অন্যান্য পারমিতা ইহার পরিকর—'ইয়ং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগৌ— বোধিচর্যাবতার ৯।

বজ্রযানে 'চর্যা' শব্দটি ক্রমশঃ বিশিষ্ট এক আচরণ-বিধিতে পরিণত হয়। মহাযানে যে আচরণ ছিল আদিকর্মের অন্তর্ভুক্ত, বজ্রযানে তাহা বিশেষার্থবোধক হইয়া উঠে। সে আচরণ গুহ্য এবং বিসদৃশ। প্রজ্ঞোপায় যোগ, বোধিচিত্ত উৎপাদন ও যুগনদ্ধ অবস্থায় সহজসুখে স্থিতিই উহার লক্ষ্য। সেখানে সাধক এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক চর্যা-পথে অগ্রসর হন,

উৎপাদয়ামি বরবোধি চিত্তং
নিমন্ত্রয়াম্যহং সর্বসত্ত্বান্।
ইষ্টাং চরিষ্যে বরবোধিচারিকাং
বুদ্ধো ভবেয়ং জগতো হিতায়॥ (অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ)

হে বজ্রতন্ত্রের 'চর্যাপটলে' (প্রথমকল্প, ষষ্ঠ পটল) হেবজ্রসিদ্ধির হেতু 'চর্যা' কি, তাহার বর্ণনা আছে। তাহা সাধন-মার্গের সাধারণ আচরণ-বিধি হইতে স্বতন্ত্র। উহা বোধিচিত্ত উৎপাদনের সঙ্কেতময় আচরণ। উহা স্পষ্টতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ১. নিরংশু চর্যা (অস্থি-আভরণাদি ধারণ) ২. মুদ্রা গ্রহণ ৩. বজ্রপদ নৃত্য-গীত ৪. উন্মত্ত ব্রতাচরণ ৫. সপ্রপঞ্চ চর্যা ('বিহারঃ পঞ্চবর্ণেষু') এবং ৬. নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা।

চর্যার এই গুহ্য রহস্যময়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত চর্যাপটলের টীকায় কাহ্নুপাদ বলিয়াছেন, চর্যা মানে দুষ্কর ব্রতচরণ। চর্যা ব্যতীত আশু বোধি লাভের সম্ভাবনা নাই। অবিচ্ছিন্ন যোগ-প্রধান এই চর্যা বিজনে এক-বিবৃক্ষমূলে অভ্যাস করিতে হয়। প্রজ্ঞা-সেবাই যোগ। মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র ও

অধিমাত্রতর সত্ত্ব ভেদে প্রজ্ঞারূপ মুদ্রা চারি প্রকার—কর্ম, সময়, ধর্ম ও মহামুদ্রা। চর্যাও তিন প্রকার—সপ্রপঞ্চ, নিষ্প্রপঞ্চ ও অতিনিঃপ্রপঞ্চ।[১]

আমাদের আলোচ্য পদাবলীরও প্রধান বর্ণনীয় বিষয় অনুত্তর যোগীদের চর্যা। টীকাকার বিভিন্ন প্রসঙ্গে টীকা মধ্যে কোন্‌টি কি ধরনের চর্যা, তাহার নির্দেশ দিয়াছেন। যথা—অতীব নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা (২), নিরংশু চর্যা (১০), সপ্রপঞ্চ চর্যা (১০), কপাল চর্যা (১১), যোগিনী প্রসাদাদ্ যোগীন্দ্রস্য চর্যা (১৯), স্বচ্ছন্দ চর্যা (৩৯) প্রভৃতি। একটি চর্যাটীকায় কাপালিককে 'চর্যাধর' বলা হইয়াছে ('হউ কাপালিকঃ চর্যাধরশ্চ'—১০)। কুক্কুরীপাদ তো স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন,—'অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ' (চর্যা. ২)।

বস্তুতঃ গানগুলির মূল বিষয় যে চর্যা, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

(২) **গীতি** : চর্যাগুলির প্রকাশ-বাহন গীতি। মিস্টিক সাধকদের ভাব সঙ্গীতেই প্রকাশিত হয়। 'mystic message'-এর মাধ্যম 'mystic melody' —বলেন Underhill.

প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে আমোদ-প্রমোদের কোন স্থান ছিল না। ব্রহ্মজাল সুত্তে (দীঘনিকায়) গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন, নৃত্য-গীত-বাদ্য, কবি গান, দামামা বাদ্য, রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্য প্রভৃতিতে তিনি বিরক্ত। কিন্তু বজ্রযানে জীবনের ভোগকে পরিহার করা হয় নাই। বরং পঞ্চ কামভোগ বা পঞ্চবর্ণ বিহার তাঁহাদের সাধনার অন্তর্গত। বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিতে দেখা যায়, মণ্ডলে নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ নহে।

অভিষেকে ও মণ্ডল-উদ্বোধনে বজ্র-গীতের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। হেবজ্রতন্ত্রের চর্যাপটলে বলা হইয়াছে, বজ্রকন্যাসহ চর্যাকালে সমাহিত যোগী আনন্দহেতু নৃত্য-গীত করিতে পারেন।[২] এই নৃত্য-গীতকে বলা হয় 'বজ্রনৃত্য'

১। 'দুষ্কর ব্রতচরণম্ চর্যা। চর্যয়া বিনা নাস্তি শীঘ্রতরা' বোধি। অবিচ্ছিন্ন যোগপ্রধানেয়ং চর্যা একবৃক্ষাদিষেব বিজনে যুজ্যতা ইতি ভাবঃ। প্রজ্ঞাসেবনঞ্চ যোগঃ। সত্ত্বভেদেন মৃদু মধ্য অধিমাত্র অধিমাত্রতর ভেদেন চতস্রো মুদ্রাঃ। চর্যাপি ত্রিধা সপ্রপঞ্চতা নিঃপ্রঞ্চতা অতিনিঃ-প্রপঞ্চতা।" (যোগরত্ন মালা)।

২। যদি গীয়তে আনন্দাৎ তর্হি বজ্রাম্বিতং পরম্।
যত্নানন্দে সমুৎপন্নে নৃত্যতে মোক্ষহেতুনা।
তর্হি বজ্রপদে নাট্যং কুর্যাদ্ যোগী সমাহিতঃ॥ হে বজ্র ১ম কল্প, ৬ষ্ঠ পটল।

ও 'বজ্রগীত'। সহজমার্গের সাধনাতেও নৃত্য-গীত-বাদ্যের স্থান আছে। চর্যাতেই দেখা যায়, চৌষট্‌টি দল পদ্মে চড়িয়া ডোমরমণী নৃত্য করেন,

এক সো পদুমা চৌষট্‌টি পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥—১০

এখানেও হেরুক-চর্যা সাধন কালে বীণা বাজে, সারী গান শোনা যায় এবং বজ্রধর ও যোগিনী নাচ-গানের নাটকে বিহ্বল হন

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥—১৭

তবে বজ্রগীতির প্রেরণা ও চর্যাগীতির প্রেরণা এক নহে। বজ্রগীতির স্থান সাধন-মণ্ডলে যোগিনী-চক্রে। উহা দ্বারা রক্ষা বিধান করা হয়, উহা দ্বারা মন্ত্র-জাপ সাধিত হয়। মণ্ডলস্থ যোগী ও যোগিনীরাই এই গীতে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু চর্যাগীতির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরিত করা। চর্যাগীতি রচনা করিয়াছেন 'শান্ত সন্তর্পিতানন্দস্তিমিতহৃদয়' সিদ্ধাচার্য্যগণ। তাঁহাদের লক্ষ্য, যাহারা সংবৃত-বিবৃত সত্যদ্বয়ের ভ্রান্ত মোহজলধিতে মগ্ন, তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া মহাসুখের পথ নির্দেশ করা। বক্তব্য যাহাতে সুরে ও রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে সহজে হৃদয়কে স্পর্শ করে, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের গান। চর্যার গীতি-লক্ষণ আরও স্পষ্ট রাগ-রাগিণী ও ধ্রুবপদের উল্লেখে। তবে গানগুলির প্রকারভেদ ছিল। কোন গান 'কামচণ্ডালী' ('কাহ্নে গাইউ কাম-চণ্ডালী'—১৮); কোন গান আবার সন্ধ্যাভাষার আবরণে মূঢ়জনের অবোধ্য—'ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝই'। ফলতঃ চর্যা যে গান, কুক্কুরীপাদের স্পষ্ট ঘোষণাই তাহার প্রমাণ—'অইসনী চর্য্যা কুক্কুরীপাএ গাইউ'—২।

(৩) কোষ—চর্যাগুলি গীতি। মুনিদত্তের লুপ্ত অংশের তিব্বতী তর্জমা হইতে জানা যাইতেছে, এইরূপ একশত চর্যা গীতির একটি কোষ গ্রন্থ ছিল। মুনিদত্ত সেগুলির অর্ধেক আহরণ করিয়া অর্থ প্রকট করিয়াছেন। অতএব মুনিদত্তের সংগৃহীত চর্যাগীতির চয়নিকাও কোষ। কর্দিয়ে-প্রকাশিত তিব্বতী গ্রন্থের তাঞ্জুর তালিকায় উহাকে 'চর্যাগীতিকোষ'ই বলা হইয়াছে।

অলঙ্কার শাস্ত্র মতে অন্যোন্য নিরপেক্ষ শ্লোক সমূহকে কোষ বলা হয়। ব্রজ্যাক্রমে বিন্যস্ত হইলে সেই কোষ হয় মনোরম।[১] 'ব্রজ্যা, বলিতে

১। কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ।
ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতি মনোরমঃ ॥ সাহিত্য দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বোঝায় একজাতীয় শ্লোকসমূহের একত্র সন্নিবেশ। গৌড়বঙ্গে সঙ্কলিত বিদ্যাকরের 'সুভাষিত রত্নকোশ' (F. W. Thomas-প্রদত্ত নাম 'কবীন্দ্র বচন-সমুচ্চয়') এবং শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত' ব্রজ্যাক্রমে সজ্জিত মূল্যবান কোষ গ্রন্থ। উহারা সংস্কৃত শ্লোকের কোষ।

'চর্যাগীতিকোষ' নামটি সার্থক। ইহা বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনচর্যা বিষয়ক সঙ্গীতের সঞ্চয়িতা। সঙ্গীতগুলিতে ভাবের দিক হইতে সজাতিয়ত্ব রহিয়াছে। ইহাতে ২৩ জন ভিন্ন ভিন্ন কবি-রচিত ৫০টি গান সঙ্কলিত হইয়াছে (পুথির পাতা লুপ্ত হওয়ায় সাড়ে তিন খানি গান পাওয়া যায় নাই)। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কোষগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতা বা শ্লোকের সমষ্টি মাত্র। চর্যাগীতি কোষের অভিনবত্ব এইখানে যে, ইহা অনেকগুলি পূর্ণাঙ্গ গানের চয়নিকা। সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বই শ্রেণীর গীতি-সঙ্কলন এই প্রথম। চর্যাগীতি-কোষ বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব। গীতি চয়নিকার এই ধারাই প্রবাহিত হইয়াছে পরবর্তী বৈষ্ণব গীতির সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে।

॥ চর্যাগীতি ও নির্মলগিরা টীকা ॥

চর্যাগীতি আস্বাদনের প্রধান সহায় উহার সংস্কৃত ভাষ্য 'নির্মলগিরা টীকা'। টীকাই চর্যা-বোধিনী। উহার অন্যান্য উপযোগিতাও আছে।

(১) গানগুলির শুদ্ধ পাঠ নিরূপণে টীকায় উদ্ধৃত পাঠান্তরগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। চর্যার্থ ব্যাখ্যায় টীকাকার মূলগানের প্রতিটি পদের প্রথম শব্দটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন, 'কাআতরুবর' গানটি (চর্যা ১)। এই গানে মোট পাঁচটি পদ (দুই চরণে এক পদ)। টীকাকার ব্যাখ্যা শুরু করিয়াছেন প্রথম পদের 'কাআতরুবরেত্যাদি' উল্লেখ করিয়া। অতএব গানের 'কাআতরুবর' টীকাতেও অপরিবর্তিত অবস্থায় উল্লিখিত। এই ভাবেই এই গানের অন্যান্য পদের প্রথম শব্দ 'দিঢ় করি', 'সঅল সমাহি', 'এড়িএড়', 'ভণ্ডই' টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার কতকগুলি গানের ব্যাখ্যায় প্রতিপদের প্রথম শব্দ বাদেও পদমধ্যস্থ অপরাপর কতিপয় শব্দও বিধৃত হইয়াছে। যেমন ২ সংখ্যক চর্যার 'কুম্ভীর', 'বিআতী', 'কানেট', 'কাড়ই', 'কামরু' কিংবা ৮ সংখ্যক গানের 'করুণা', 'নাবী', 'রূপা' প্রভৃতি। এইরূপে চর্যাটীকায়

মূল গানের প্রচুর শব্দের সমাবেশ দেখা যায় ; অবশ্য পাঠান্তরও সংখ্যায় অনেক। টীকা-ধৃত এই শব্দগুলির সাহায্যে গানের শুদ্ধপাঠ নিরূপণ করা সম্ভব।

(২) গীতের ভাষা বাংলা, টীকার ভাষা সংস্কৃত। ফলে টীকায় পাওয়া যায় সংস্কৃত প্রতিশব্দ। টীকা যেন চর্যাগীতির বাংলা-সংস্কৃত অভিধান। সংকলন করিলে সত্যই তৎকাল-প্রচলিত শব্দাবলীর একটি বাংলা-সংস্কৃত অভিধান রচিত হইতে পারে। যেমন,

মূল—		সংস্কৃত	মূল—		সংস্কৃত	মূল—		সংস্কৃত
এড়িএড়	(১)	বিহায়	উপাড়ী	(৮)	উৎপাট্য	খন্ত	(১৬)	স্তম্ভ
পিটা	(২)	পীঠক	কাচ্ছি	(৮)	কচ্ছিকা	কসণ	(১৬)	ভয়ানক
সাস্থ	(৪)	শ্বাস	মাগা	(৮)	মার্গ	লাউ	(১৭)	তুম্বি
কোঞ্চা	(৪)	কুঞ্চিকা	বাখোড়	(৯)	স্তম্ভদ্বয়	চ্ছিণালী	(১৮)	ছিন্ননাসিকা
তুআন্ত	(৫)	অন্তর্দ্বয়	পাখুড়ী	(১০)	দল	ভতার	(২০)	স্বামী
টাঙ্গী	(৫)	পরশু	পইসই	(১৪)	বিশতি	তুটঅ	(২১)	ক্রুট্যতি
ঘিনি	(৬)	গৃহীত্বা	কবডী	(১৪)	কপর্দিকা	ধুণি ধুণি	(২৬)	ধৃত্বা ধৃত্বা
মেলি	(৬)	মুক্ত্বা	বাট	(১৫)	মার্গ	চেবই	(৩৬)	চেতয়তি

সংস্কৃত এই প্রতিশব্দগুলি কেবল অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, বাংলা শব্দের সংস্কৃতমূল নিরূপণে এবং ক্রিয়াপদের ভাব ও কাল নির্ণয়েও সহায়তা করে। যেমন, প্রথম গানের, 'পাণ্ডি বইঠা' অংশে 'বইঠা' যে সমাপিকা ক্রিয়া নহে, অসমাপিকা ক্রিয়া, তাহা বোঝা যায় টীকার 'উপবিষ্টঃ সন্' ব্যাখ্যা হইতে। ওই পদের সমাপিকা ক্রিয়া 'দিঠা' (='সাক্ষাৎ কৃতং')

(৩) (অনেক ক্ষেত্রে টীকা নিরুক্ত স্থানীয়। নিরুক্ত যেমন একটি শব্দের নিরূঢ়মূল ধাতুকে আবিষ্কার করিয়া শব্দার্থ ব্যাখ্যা করে, টীকাও বহুক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে গূঢ় শব্দার্থের ইঙ্গিত দিয়াছে। যেমন, ৬ সংখ্যক গানের "হরিণী" ; উহার অর্থ 'বিষপান ভবগ্রহান্ হরতি গুণ্ডয়তি হরিণী'। হরণ করে বলিয়া হরিণী, এ অর্থ অভিনব। তেমনই ২১সংখ্যক গানের'মুসা' শব্দ ; 'মুষ্ণাতীতি মূষক'— এ অর্থও তাৎপর্যবোধক। তেমনই কপালী—কং সুগং পালিতুং সমর্থঃ (১০)।

(৪) চর্যাগান দার্শক শব্দাবলীর ভাণ্ডার। একটি বাহ্য অর্থ, অপরটি 'সম্প্রদায়ার্থ' (গুরু-পরম্পরা-প্রদত্ত অর্থ)। এই সম্প্রদায়ার্থের অধিকাংশ

আভিপ্রায়িক। অনেক শব্দ আবার সন্ধ্যাশব্দ (=সময়-সঙ্কেত সূচক শব্দ); সেগুলি সঙ্কেতময়, জটিল ও 'ডাকিনীগুহ্য'। এই গুহ্য বচনের উদ্ঘোতনে চর্যাটীকা 'অন্ধকারে প্রদীপবৎ'।

(৫) তাহা ছাড়া, চর্যাগীতির তত্ত্বও দুরূহ। চর্যাকারেরা নিজেরাই বলেন, সে তত্ত্ব 'বাক্‌পথাতীত', টীকাকারের ভাষায় 'অতি দৌর্লভ্য'। সে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যে উপায়, তাহা গুহ্য হেরুকতন্ত্র-জলধি হইতে উত্থিত। সে সাধনোপায়ও গুরুগম্য ('গুরু পুচ্ছিঅ জাণ')। আচার্য মুনিদত্ত শিষ্যাববোধের নিমিত্ত ('শিষ্যাববোধপ্রতিপাদনায়') যে টীকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গুরুবচনের মতই পথপ্রদর্শক। মুনিদত্ত নিজে এই সাধক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত, অতএব তাঁহার ব্যাখ্যাও সাধক সম্প্রদায়ের অনুগত। টীকা না থাকিলে চর্যাগীতি সাধারণের নিকট নিরুত্তর জিজ্ঞাসা হইয়া থাকিত। লাড়ীডোম্বীপাদের চর্যার ব্যাখ্যা নাই বলিয়া লিপিকর সেটিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমনই 'নির্মলগিরা' টীকা না থাকিলে চর্যাগীতির অনেকগুলিই দুর্বোধ্য হইয়া থাকিত।

(৬) আর একটি দিক হইতে চর্যা টীকার গুরুত্ব বিচার্য। উহাতে বক্তব্যের সমর্থনে ভাবানুষঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সিদ্ধাচার্যদের রচনাংশের উদ্ধৃতি সঙ্কলিত হইয়াছে। এই উদ্ধৃতির কতকগুলি সংস্কৃত, কতকগুলি অপভ্রংশ, কতকগুলি বা চর্যা-ভাষার অনুরূপ। এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে সহজ মতের পরিপোষক গ্রন্থাবলীর নির্দেশ পাওয়া যায়। সংস্কৃত উদ্ধৃতি সংগৃহীত হইয়াছে শ্রীসমাজ, শ্রীহেরুকতন্ত্র, শ্রীহেবজ্রতন্ত্র, সম্পুটোদ্ভব তন্ত্ররাজ, দ্বিকল্প, গুহ্য সমাজ, নামসংগীতি, আগম, একশ্লোকা ভগবতী, শ্রীকালচক্র, চতুর্দেবী পরিপৃচ্ছা, পঞ্চক্রম, মধ্যমক শাস্ত্র, অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশ, জ্ঞান সংবোধি, অনুত্তর সন্ধি, অদ্বয় সিদ্ধি, বোধিচর্যাবতার, যোগরত্নমালা, রতিবজ্র, সেকোদ্দেশ, সহজসংবর, সূতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে; নামোল্লেখ সহ সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যাইতেছে নাগার্জুনপাদ, আচার্যনিদত্তক, দউড়ীপাদ, সরহপাদ, বজ্রপাণি, বোধিপাদ, ধোকড়িপাদ প্রভৃতির নামে। অপভ্রংশ ভাষায় রচিত শ্লোক পাওয়া যাইতেছে সরহপাদ, কৃষ্ণাচার্যপাদ ও তিল্লোপাদের নামে। চর্যা- ভাষার অনুরূপ ভাষারও রচনার অংশ মিলিতেছে। যেমন,

এক। খালত পড়িলেঁ কাপুর নাশই (টীকা. ৮, ১৮)

[উহা 'চর্য্যাপাদ'-এর নামে উদ্ধৃত। ডঃ বাগচী মনে করেন, উহা

কৃষ্ণাচার্যপাদের রচনা। বাহ্য অর্থ, থালে পড়িলে কর্পূর বিনষ্ট হয়; গুহ্যার্থ—ললনা-রসনা নাড়ীতে পড়িলে বোধিচিত্তরূপ শুক্র বিনষ্ট হয়]

দুই। আতেঁ তিসেঁ নব তিসিএঁ।
এঁ-তিঅ মণ্ডল নাহি বিসেষে॥ (টীকা, ৭)

[টীকায় ইহাও 'চর্যাপাদ'-এর নামে সঙ্কলিত। ডঃ বাগচী 'আতেঁ তিসেঁ' প্রভৃতি স্থলে পাঠ ধরিয়াছেন, 'সাতেঁ তিসেঁ নব তিসেঁ'। কাহ্নপাদের 'তে তিনি তে তিনি তিনি অভিন্না' পংক্তির সমর্থনে চর্যাপদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব উহার গূঢ়ার্থ এই যে, উৎপত্তিক্রমে যে মণ্ডলগুলি অবিভূর্ত হয়, উৎপন্নক্রমে অর্থাৎ সহজসিদ্ধিতে সে মণ্ডলগুলির ভিতর কোন প্রভেদ থাকে না। সহজে কায়মণ্ডল, বাক্‌মণ্ডল ও চিত্তমণ্ডল একস্বভাব]

তিন। ভব ভুঞ্জই ন বান্ধই রে অপূব বিণাণা।
জেন বি লোঅর বান্ধন (তেন) বি জোইর মেলাণা॥

[১৭ চর্যা-টীকায় 'চর্যান্তর' বলিয়া উদ্ধৃত। পদটি কাহার রচনা, জানা যায় না। মূলে 'বান্ধই' স্থলে 'বাস্‌সই', 'জেন' স্থলে 'জেব' পাঠ আছে; বন্ধনী-স্থিত 'তেন' শব্দটি নাই। ডঃ বাগচী 'জেব' স্থলে 'জিম' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ডঃ সেন পাঠ ধরিয়াছেন 'বাজঝই'; 'জেব' অবিকৃত রাখিয়াছেন। উহার অর্থ, ওরে বিজ্ঞান অপূর্ব। উহা ভব ভোগ করে, (অথচ) বদ্ধ হয় না। যাহাতে লোকের বন্ধন, তাহাতে যোগীর মুক্তি]

চার। কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম কুরঙ্গ সমাধি কপাট॥
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা।
কমলমধু পিবি ধোকে ন ভমরা॥

[২১ চর্যাটীকায় পরদর্শনে মীননাথের বচনরূপে উদ্ধৃত। উহার অর্থ, গুরু পরমার্থ পথের কথা বলিতেছেন। কর্ম—(চঞ্চল) হরিণ, সমাধি—কপাট অর্থাৎ চাঞ্চল্য রুদ্ধ করার উপায়। কমল প্রস্ফুটিত হইল, জমরাকে (জমরা একপ্রকার কমল-ভোজী শামুক) কহিও না। কমলমধু পান করিয়া ভ্রমর চঞ্চল হয় না, অর্থাৎ নিশ্চল হয়।

পাঁচ। ঘটমন গুম্ম থড়দতি বোহঅ।
অক্ষি বুজিঅ মাগ চালী॥

[৩২ চর্যাটীকায় 'চর্যান্তর' বলিয়া উদ্ধৃত। প্রায় এইরূপ পংক্তি পাওয়া যাইতেছে ২৫ সংখ্যক গানের শেষে শান্তিপাদের ভনিতায়। সেখানকার পাঠ 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥' উহার অর্থ— (পরিশুদ্ধাবধূতী মার্গে) ঘাট নাই, গুল্ম নাই, খাড়ি নাই ; চোখ বুজিয়া সে পথে যাও। এই ধরনের উক্তি পাওয়া যায় সেকোদ্দেশ টীকায়,

বামে দাহিণে গুমা ঘাট।
ভণই কাহ্নু অন্তরালে বাট ॥

এই সকল উদ্ধৃতি হইতে অনুমান করা যায়, সহজমত ও পথ লইয়া সংস্কৃতে ও অপভ্রংশে এবং নবজাত বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ ও গান রচিত হইয়াছিল। বহিঃশাস্ত্রেও অনুরূপ মত প্রচলিত ছিল। নাথ সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধ সহজ দর্শনের মিল ছিল। চর্যাকারদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন, যাঁহারা শুধু গান রচনা করেন নাই, অপভ্রংশে দোহা ও সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল উদ্ধৃতি হইতে ইহাও প্রমাণিত হয়—মধ্যমক শাস্ত্র, বিজ্ঞানবাদ ও তন্ত্রমন্ত্র-নয়ের পথ বাহিয়াই সিদ্ধাচার্যদের সাধনধারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। নদী-জলধারা যেমন পাহাড়-পর্বত-সমতলভূমির চিহ্ন বহন করিয়া বহিয়া চলে, সহজমতও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব এক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল। মহাযানে সহজমার্গ অপ্রাচীন নহে।

॥ চর্যাগীতিপাঠে তিব্বতী অনুবাদের ভূমিকা ॥

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী-আবিষ্কৃত তিব্বতী অনুবাদের বিষয়টিও বিবেচ্য। তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কৃত হওয়ায় হরপ্রসাদ-শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত গ্রন্থের অপূর্ণতা বহুল পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে। চর্যা-গানের খাঁটি পাঠ উদ্ধারে এবং চর্যাটীকার খাঁটি পাঠ নিরূপণেও এই অনুবাদ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কোন কোন স্থলে চর্যাগানের খাঁটি অর্থ নিরূপণেও তিব্বতী অনুবাদের মূল্য স্বীকার্য। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, শাস্ত্রীর গ্রন্থের লুপ্ত অংশের ভাবোদ্ধারে এই আবিষ্কার আমাদের কিছুটা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিয়াছে। চর্যাটীকার রচয়িতা কে, শাস্ত্রীর গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায় না। তিব্বতী অনুবাদ হইতে জানা যায়, 'নির্মলগিরা' টীকার প্রণেতা হইতেছেন আচার্য মুনিদত্ত। ২৪ সংখ্যক লুপ্ত গানের রচয়িতা কে, তাহাও ছিল জিজ্ঞাস্য। তিব্বতী অনুবাদ হইতে জানা যাইতেছে, ওই গানের

রচয়িতা কৃষ্ণাচার্য পাদ। ২৩ সংখ্যাক গানের কিয়দংশ এবং গোটা ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক গান শাস্ত্রীর গ্রন্থে লুপ্ত। কায়ার রূপ ছায়া দ্বারা মিটানো হইলেও তিব্বতী অনুবাদ ও তস্য ছায়া সংস্কৃতানুবাদ হইতে ওই লুপ্ত গানগুলির ভাব-বস্তু সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য বাগচী-কৃত সংস্কৃত অনুবাদগুলি এখানে উদ্ধৃত হইতেছে[১]।

॥ ২৩ সংখ্যক গানের অপূর্ণাংশ ॥

কায়ে আত্মনঃ বর্জনং নাস্তি মালাং চ খাদতি।
কাল-অকাল-দ্বয়ং গৃহীত্বা
জালং শৃঙ্খলং চ নাস্তি হরিণঃ জালমেকম্ ইচ্ছতি।
চঞ্চলং চঞ্চলং চলিত্বা শূন্যমধ্যে অস্তংগতঃ ॥

[(পূর্বানুবৃত্তিঃ—মায়জাল প্রসারিত করিয়া মায়াহরিণীকে আবদ্ধ করা হইল) কায়ে আত্মজ্ঞান বর্জিত হইল না। খায় মালা (?), কাল-অকাল উভয়কে গ্রহণ করিলে জাল-শৃঙ্খল রহিল না। হরিণ অন্য জাল ইচ্ছা করিল। দ্রুত পদে চলিতে চলিতে সে শূন্য মধ্যে বিলীন হইল।]

॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রতাল ইতি রাগঃ কৃষ্ণাচার্য পাদানাং
যদা চন্দ্র উদিতঃ ভবতি।
তদা চিত্তরাজঃ নির্মলঃ ভবতি ॥
মোহমলং ছিন্নং গুরূপদেশেন।
আয়তনেন্দ্রিয়াণি গগনং প্রাপ্তানি ॥
খসম বীজং যৎ খসমং যাতি।
আত্মনঃ বৃক্ষাৎ ভুবনত্রয়ং ছায়াং বিস্তৃণোতি ॥
যথা সূর্যঃ উদিত্বা রাত্রিমপসারয়তি।
ভবসমুদ্রস্য মোহতিমিরং প্রকৃষ্টং দূরীকরোতি

১. দ্রষ্টব্য Materials for a critical Edition of the old Bengali Carya padas by Dr. P. C. Bagchi (J. D. L. C. U. Vol. XXX)

ডঃ বাগচীর অনুমোদিত শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রীর সংশোধিত সংস্কৃতানুবাদ আরও সুশৃঙ্খল ও সুন্দর (দ্রষ্টব্য চর্যাগীতি কোষ, বিশ্বভারতী)

যথা হংসরাজঃ জলং গৃহ্লাতি।

ভবং খাদয়তি কাহ্নুনা কথ্যতে ॥[১]

[যখন চন্দ্র উদিত হয়, তখন চিত্তরাজ নির্মল হয়। গুরুর উপদেশে মোহমল ছিন্ন হইল; আয়তন ও ইন্দ্রিয় শূন্যে লীন হইল। শূন্যতা বীজ শূন্যে প্রবেশ করিলে আত্মবৃক্ষ হইতে ত্রিভুবনে ছায়া বিস্তৃত হয়। যেমন সূর্য উদিত হইয়া রাত্রিকে বিনষ্ট করে, তেমনই ভব-সাগরের মোহতিমির নিঃশেষে দূরীভূত হয়। যেমন হংসরাজ জল গ্রহণ করে, কাহ্ন বলেন, (সেইরূপ) ভবভক্ষ হয়]

॥ ২৫ ॥

এতদ্ তন্ত্রীপাদস্য গীতম্

ধর্মোদ্ভবং পদাধিষ্ঠানং বজ্রপদমিতি কথ্যতে।

কাল পঞ্চকতন্ত্রং নির্মলং বস্ত্রং বয়নং করোতি ॥

অহং তন্ত্রী আত্মনঃ শ্রুতম্।

আত্মনঃ সূত্রস্য লক্ষণং ন জ্ঞাতম্ ॥

সার্ধত্রিহস্তং বয়নগতিঃ প্রসরতি ত্রিধা।

গগনং পূরণং ভবতি অনেন বস্ত্রবয়নঞ্চ ॥

অনাহতং বয়নশব্দং গুরুবাক্যেন স্থিরীকৃতং।

স্থানদ্বয়ং গৃহীত্বা সূত্রেণ আচ্ছাদিতং দৃঢ়ং বিস্তৃতং ॥

মাণ মূলে গতং শূন্যতত্ত্বস্য লক্ষণং শূন্যতত্ত্বস্য সারং।

বয়নরসঃ প্রাপ্তঃ মোহমল-মুক্তঃ ॥

[ধর্মের উদয়স্থানকে বজ্রপদ বলা হয়। (তথায়) কাল পঞ্চক (পঞ্চতথাগত) নির্মল বস্ত্র বয়ন করেন (অর্থাৎ তথায় বোধিচিত্ত শুদ্ধ শূন্যতা-করুণাস্বভাব)। আমি তন্ত্রীপাদ এইরূপ শ্রুত হইয়াছি। গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত সেই চিত্ত বা বজ্রপদের বা আত্ম-সূত্রের কোন লক্ষণ নাই। সাড়ে তিন হাত দেহে সেই বয়ন-সূত্র ত্রিধা (তিন প্রকার আনন্দে) প্রসারিত। উহা দ্বারা শূন্যতা পূর্ণ হয়, বস্ত্রবয়নও সিদ্ধ হয়। গুরুবাক্যে অনাহত বয়ন-নাদ স্থির করা হইল এবং প্রজ্ঞোপায়কে গ্রহণ পূর্বক সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে আচ্ছাদন করা হইল। মণিমূলের

---

১. এই কবিতার প্রথম দুই পংক্তির মূল পাওয়া যায় সেকোদ্দেশ টীকায় (G. O. S. Xc):

পুন্নিম চন্দা উইঅউ জবেঁ।

চিঅরাঅ নিমিলিঅ তবেঁ ॥

নৈরাত্ম্যা যোগিনী শূন্যতার সার, শূন্যতত্ত্বের লক্ষণ-যুক্ত। তাহার প্রসাদে আমি মোহাভবঙ্গ স্বত্র বিযুক্ত হইয়া (জাতিধর্ম পরিত্যাগ করিয়া) মুক্ত হইয়াছি][১]

॥ ৪৮ ॥

পটহ ইতি নাম রাগঃ কুক্কুরীপাদানাং

কুলিশজাত নিদ্রা ব্যাপৃতা।

সমতা যোগ সেনা গণাঃ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়স্য পুরসমূহান জীতবন্তঃ।

শূন্যতাবাজঃ মহাসুখম (ইতি) নাম ॥

তূর্যশঙ্খধ্বাননাম অনাহতগীতং করোতি।

মোহভববলানি দূরম অতিক্রান্তানি।

সুখনগর্যাম্ অগ্রস্থানসমূহং গৃহীতম।

অঙ্গুলিম উর্ধ্বমুৎক্ষিপ্য কুক্কুরীপাদঃ ভণতি।

এতৎ ত্রিলোকং মহাসুখেন জিতম।

তত্ত্বার্থঃ নিনত্য কুক্কুরীপাদেন কথ্যতে ॥

[সমতা যোগের সেনাসমূহ কুলিশাজ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল। বিষয়েন্দ্রিয়ের পুরসমূহ জয় করিয়া, শূন্যতাবাজ মহাসুখ নামক পুর জয় করিল। তূর্যশঙ্খ-ধ্বনিতে অনাহত গীত গান করা হইল। মোহোদ্ভব সেনাগণ দূরে অপসারিত হইল। সুখনগরীর প্রধান প্রধান স্থান (অচ্যুতমহাসুখরূপ বোধিচিত্ত) অধিকৃত হইল। কুক্কুরীপাদ অঙ্গুলি উর্ধ্বে তুলিয়া (জয়সূচক সঙ্কেতে) বলিলেন, ত্রিভুবন (কায়বাক্‌চিত্তের আভাস দোষ) মহাসুখ দ্বারা জিত হইল। এই তত্ত্বার্থ কুক্কুরীপাদ ব্যক্ত করিলেন]

চর্যাগীতি রচনার কাল : খ্রীঃ অষ্টম—একাদশ শতাব্দী ॥

চর্যাগীতিগুলি কোন সময়ে রচিত হইয়াছে ? এক একথায় উত্তর দেওয়া অসম্ভব। চর্যাকারদের আবির্ভাবকাল বিচার করিলে একটা উত্তর পাওয়া যাইতে

[১] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বোধি [illegible] তূর্য [illegible]

[illegible] পাঠ। কুলিশ [illegible] শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রী)

পারে এবং অধিকাংশ গবেষক পণ্ডিত এই সূত্রেই গীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। একথা ঠিক যে, সিদ্ধসাধকেরা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহাদের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু অস্তিত্বকাল অনিশ্চিত। এ সম্পর্কে যাবতীয় প্রমাণ অনুমান-নির্ভর; নেপালে ও তিব্বতে গুরুপরম্পরায় সিদ্ধাচার্যদের তালিকা ও জীবন-কাহিনী প্রচলিত আছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও বঙ্গদেশেও যোগসিদ্ধ কাহিনীর অপ্রতুলতা নাই। তাঁহাদের অনেকের রচনাও পাওয়া গিয়াছে সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীনতম নব্য প্রাদেশিক ভাষায়। কিন্তু একদা জীবন্ত এই ব্যক্তি সমূহের জীবনী ও জীবৎকাল সম্পর্কে এত জনশ্রুতি মূলক অলৌকিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে যে, তৎসম্পর্কে খাঁটি ইতিহাস-নির্ভর উত্তর সাধকদের 'নিরুত্তর' তত্ত্বের মতই বাক্‌পথাতীত। চর্যাকারদের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে সত্যকারের কোন 'পাথুরে প্রমাণ' নাই।

তবু অনুসন্ধিৎসা নিরস্ত হয় নাই। কেহ বা এই রচনাবলীর ভাষার নিরীক্ষায়, কেহ বা পরবর্তীকালের কোন গ্রন্থের অনুলিপির তারিখ ধরিয়া, কেহ বা নেপাল-তিব্বতের কিংবদন্তীকে অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতেই চর্যাগীতির রচনাকাল বিচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে স্পষ্টতঃ তিনটি মত পাওয়া যাইতেছে।

শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ভিতর চর্যাগানগুলি রচিত হইয়াছিল। এই কাল নির্ণয়ে তিনি প্রধানতঃ দুইজন চর্যাসাধকের জীবৎকাল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। একজন আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, অপরজন জালন্ধরীপাদের শিষ্য পণ্ডিতাচার্য কাহ্নপাদ। লুইপাদের সময়-নিরূপণে তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি উক্তিকেই ভিত্তি করিয়াছেন। সে উক্তিটি এই—"লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানির নাম অভিসময়বিভঙ্গ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীলা বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।" (বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধ)। এই সূত্র ধরিয়া ডঃ চ্যাটার্জী লুইকে অতিশ দীপঙ্করের 'elder contemporary' বলিয়া চর্যাগীতির রচনাকালের উর্ধ্বতন সীমা ('The upper limit for the Caryas') ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ নির্দেশ করিয়াছেন। আর নিম্নতম সীমায় রহিয়াছেন কাহ্নপাদ। এই

কাহ্নপাদ সিদ্ধাচার্য জালন্ধরীপাদের শিষ্য (দ্রষ্টব্য চর্যা. ৩৬)। কাহ্নপাদের লেখা 'হেবজ্র-পঞ্জিকা যোগরত্নমালা' নামে হেবজ্রতন্ত্রের একটি টীকা পাওয়া যায়। এই টীকার একটি অনুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছিল রাজা গোবিন্দ পালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব পণ্ডিতাচার্য কাহ্নপাদের জীবৎকালের 'lower limit' দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। কাহ্নপাদের কালবিচারে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কাহ্নপাদের সমসাময়িক গোরক্ষনাথের সময় বিচার করিয়াছেন। জ্ঞানদেব-বিরচিত মারাঠী জ্ঞানেশ্বরী গীতাভাষ্যের (C. 1290 A. C) সাক্ষ্য বিচার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, নাথআচার্য নিবৃত্তিনাথের গুরু গণিনাথ এবং গণিনাথের গুরু গোরক্ষনাথ। নিবৃত্তিনাথের জন্ম হয় ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব নিবৃত্তিনাথের পরম গুরু হিসাবে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। অতএব কাহ্নপাদও এই সময়ের। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত—'The period 950—1200 A.C would thus seem to be reasonable date to give to these poems' (O.D.B.L)

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কালনির্ণয়ে দ্বিতীয় মত পোষণ করেন পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন (দ্রষ্টব্য দোহাকোশ-ভূমিকা)। তিনি মনে করেন, লুইপাদ আদি সিদ্ধাচার্য নহেন। রাহুল ভদ্র সরহপাদ আদি সিদ্ধ। ইনি বৌদ্ধ আচার্য শান্তরক্ষিতের সমসাময়িক। শান্তরক্ষিত ভোটসম্রাট 'খি-স্রোঙ-দে চন্' এর রাজত্বকালে (৭৫৫—৭৮০) আহূত হইয়া তিব্বত গমন করেন। অতএব সরহ-পাদ অষ্টম শতাব্দীর লোক। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি তথ্য বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শান্তরক্ষিতের শিষ্য নালন্দার অধ্যাপক ধর্মকীর্তি ছিলেন গৌড়সম্রাট ধর্মপালের বৃদ্ধ সমসাময়িক এবং সরহপাদের অধ্যাপক। ধর্মপাল ৭৭০—৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সরহপাদের মৃত্যু হয় আনুমানিক ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। রাহুলজী প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধাচার্য লুইপাদেরও সময় বিচার করিয়াছেন। তিব্বতী ইতিহাস মতে, রাহুলভদ্র সরহের প্রশিষ্য সিদ্ধশবরী বা শবরপাদ। এই শবরপাদের শিষ্য লুইপাদ। লুইপাদ ধর্মপালের রাজত্বের অন্তকাল অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে (৮০০ খৃষ্টাব্দ) বর্তমান ছিলেন। কাজেই রাহুলজীর মতে সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে।[১]

১. 'আঠবী সে গ্যারহবী সদী ইসবী তক কৌন-কৌন-সী আধ্যাত্মিক বিভূতিয়াঁ পৈদা হুই থী।' (দোহাকোশ ভূমিকা : রাহুলজী)

চর্যাগানের রচনাকাল বিষয়ে তৃতীয় মত পোষণ করেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনিও তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে মনে করেন, লুইপাদ আদি সিদ্ধাচার্য নহেন। তাঁহার গুরু শবরপাদ। শবরপাদ কমলশীলের জন্য সংস্কৃতে দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। কমলশীলও তিব্বতরাজ খি-স্রোং-দে-চনের আহ্বানে ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত গমন করেন। অতএব শবরপাদ অষ্টম শতাব্দের মধ্যবর্তী হইবেন। তাহা ছাড়া, চর্যাগানের অপর কবি কম্বলাম্বরপাদ। ইনি রাজা ইন্দ্রভূতির দীক্ষাগুরু। ইন্দ্রভূতি পদ্মসম্ভবের পালক পিতা। পদ্ম সম্ভবের জন্মকাল ৭২১/২২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং ইন্দ্রভূতির জন্ম ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইতে পারে না। তাঁহার গুরু কম্বলাম্বরপাদ অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর লোক হইবেন। উপরন্তু চর্যাচয়ের টীকায় মীননাথের একটি চর্যার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে ('কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট। কর্মকুরঙ্গ সমাধিকপাট॥'—টীকা ২১)। ডঃ শহীদুল্লাহ্ উহাকে আদিস্তরের বাংলাভাষা বলিয়াই মনে করেন। মীননাথের নামান্তর মৎস্যেন্দ্রনাথ। তিনি দক্ষিণবঙ্গের লোক। ফরাসী পণ্ডিত Sylvau Levi-এর মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে গমন করেন। ইহাতে সাক্ষ্য-প্রমাণে ৬৫০ খ্রীঃ অব্দকে বাংলা ভাষার আরম্ভকাল বলিয়া ধরা যায়।

চর্যাগীতির রচনাকাল সম্পর্কে তিনজন বিশেষজ্ঞের তিন মত। ডঃ শহীদুল্লাহের মতে সপ্তম শতাব্দীতে ইহার সূচনা, রাহুলজীর মতে অষ্টম শতাব্দী এবং আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ। এই মতগুলির ভিতর কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, তাহা ধীরভাবে বিচার্য।

শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও প্রমাণ ও যুক্তি অনুমান-নির্ভর। আর এই অনুমানের মূলে রহিয়াছে পূর্বসূরী শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি। 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান লুইয়ের অভিসময়বিভঙ্গ রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন,'—শাস্ত্রীমহাশয়ের এই উক্তির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কর্দিয়ের তাঞ্জুর তালিকায় লুইপাদ ও দীপঙ্কর উভয়ের নামেই 'শ্রীভগবদভিসময়' ও 'অভিসময়বিভঙ্গ' গ্রন্থদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়। এবং স্পষ্টতঃ ইহাও দেখা যায় যে, 'অভিসময়-বিভঙ্গে'র রচয়িতা মহাযোগীশ্বর লুইপাদ এবং এই গ্রন্থের তর্জমা করিয়াছেন পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (Catalogue. 2. P. 45)। বস্তুতঃ লুইপাদ-বিরচিত

'ভগবদভিসময়'—সময়-চর্যা বিষয়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি নিজেই ইহার একটি বৃত্তি বা বিভঙ্গ ('অভিসময়বিভঙ্গ') রচনা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে, বিভিন্ন আচার্য এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন, সংশোধন করেন, এবং ইহার উপর বৃত্তি, ক্রম, মঞ্জরী, টীকা ও পঞ্জিকা রচনা করেন। কেহ কেহ এই গ্রন্থ ও তাহার বৃত্তিরও অনুবাদ করেন তিব্বতী ভাষায়। তাঞ্জুর গ্রন্থের তালিকা হইতেই জানা যায়, কম্বলাম্বরপাদ রচনা করেন 'অভিসময় নাম পঞ্জিকা'। এই নামানুসরণে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায় কম্বলাম্বর পাদের শিষ্য প্রজ্ঞারক্ষিতের নামে। 'অভিসময়পঞ্জিকা' তর্জমা করেন নারপাদের সম্প্রদায় ভুক্ত সুমতিকীর্তি। রত্নবজ্র তর্জমা করেন 'অভিসময়ক্রম'। শুভাকর গুপ্ত রচনা করেন "অভিসময় মঞ্জরী'। কাশ্মীরবাসী উপাধ্যায় তর্জমা করেন 'শ্রীভগবদভিসময় নাম'। জগদ্দল বিহারের পণ্ডিত দানশীল তর্জমা করেন 'ভগবদভিসময়' ও 'অভিসময় মঞ্জরী'। স্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করিয়া লুইপাদের গ্রন্থ ও বৃত্তির তর্জমা করেন জগদ্দল বিহারস্থ মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র; তাঁহার অনূদিত গ্রন্থদ্বয়ের নাম 'লুহিপাদাভিসময়বৃত্তি সম্বরোদয় নাম' এবং 'লুহিপাদা ভিসময়বৃত্তিটীকা বিশেষদ্যোতনাম্নী'। ঠিক এই নামেই গ্রন্থ পাওয়া যায় উড়িষ্যাবাসী মহাপণ্ডিত তথাগতবজ্রের নামে—'লুহিপাদাভিসময়বৃত্তি সম্বরোদয়' ও 'লুহিপাদা-ভিসময়বৃত্তিটীকা বিশেষদ্যোতনাম্নী'। শাশ্বতবজ্রের নামে পাওয়া যায় 'সম্বর লুহিপাদাভিসময়বৃত্তি'। স্বয়ং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে শাল্‌বিহার নামে যে বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানেও অনেক গ্রন্থ তর্জমা করা হয়। এই সূত্রেই স্বয়ং শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর 'শ্রীভগদভিসময়বিভঙ্গ' তর্জমা করেন। (দ্রষ্টব্য শাস্ত্রী-প্রদত্ত কর্দিয়ে তালিকার বঙ্গপ্রতিলিপি)। তর্জমাকার দীপঙ্করকে গ্রন্থকার লুইপাদের সমসাময়িক, এমন কি 'elder Contemporary'ও বলা সঙ্গত নহে। অভিসময়ের বৃত্তি, টীকা বা পঞ্জিকা যিনি রচনা করিবেন, তিনিই লুইপাদের সমসাময়িক হইবেন, এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। সুতরাং দীপঙ্করের কালসীমা ধরিয়া চর্যাগীতি রচনার সূচনা দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। গ্রহণযোগ্য নহে, তাহার আর এক কারণ, কর্দিয়ের তালিকাতেই মহাচার্য অতিশ দীপঙ্করের নামে 'চর্যাগীতি' ও 'চর্যাগীতিবৃত্তি' নামক দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অতএব সহজেই অনুমান করা যায়, দীপঙ্করের সময়েও চর্যাগীতির প্রচলন ছিল এবং দীপঙ্কর স্বয়ং তাহার একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মুনিদত্ত-কৃত

বৃত্তির তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করিয়া যে সংস্কৃত ছায়া দিয়াছেন, তাহাতেও একশত চর্যাগীতির একটি সঙ্কলন গ্রন্থ যে প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ দেখা যায়।[১]) এইদিক হইতে চর্যাগীতি সঙ্কলন ও তাহার বৃত্তি রচনারই সময় দাঁড়ায় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী।) চর্যাগীতির রচনাকাল নিশ্চয়ই উহার বহু পূর্ববর্তী।

চর্যাগীতি রচনার নিম্নতম সীমা নির্ণয়ের যুক্তি প্রমাদজনক। কৃষ্ণাচার্য কাহ্নপাদ 'যোগরত্নমালা' নামে হেবজ্রতন্ত্রের যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি অনুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছিল রাজা গোবিন্দ পালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব কাহ্নপাদের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। কোন গ্রন্থকারের অন্য লিপিকর কর্তৃক একটি গ্রন্থের অনুলিপির তারিখ ধরিয়া, মূল গ্রন্থকারকে সেই সময়কার বলিয়া ঘোষণা করা কি যুক্তিসঙ্গত? কৃত্তিবাসের পুথির অষ্টাদশ শতকের অনুলিপি পাইয়া কি সিদ্ধান্ত করা চলে যে, কৃত্তিবাসের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা অষ্টাদশ শতাব্দী? কাজেই, চর্যাগীতিগুলি ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর রচিত হইয়াছিল, আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না।

পণ্ডিত রাহুলজী এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, উভয়েই চর্যাগীতিকারদের কালনিরূপণে সুম্পাখন্‌পো-এর Pag Sam Jon Jang, লামা তারনাথকৃত Khabad Dun Dan প্রভৃতি তিব্বতী বিবরণ এবং Sylvan Levi-কৃত Le Nepal vol I এবং Waddel-প্রণীত Lamaism প্রভৃতি গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়াছেন। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সাধনমালা গ্রন্থের ভূমিকায় সিদ্ধ তন্ত্রাচার্যদের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারও ভিত্তি তিব্বতী ও নেপালী ঐতিহ্য। এই ভিত্তিতে কেহ (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) গীতিরচনার আরম্ভ কালকে সপ্তম শতাব্দী, কেহ বা অষ্টম শতাব্দী (রাহুলজী ও ডঃ ভট্টাচার্য) বলিয়া ধরিয়াছেন। তিব্বতী ও নেপালী ইতিহাস নানাপ্রকার কিংবদন্তী ও অসঙ্গতিতে পূর্ণ; তাই অনেকেই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। কিন্তু এই সকল ঐতিহ্যে গাল-গল্প যাহাই থাকুক, তাহাদের ভিত্তিমূল যে অমূলক, এমন কথা বলা চলে না। ঐতিহ্যে উল্লিখিত

১। তত্রাহৃতানাং চ বিচারিতানাং চর্যাশতেনাহৃত গীতিকানাং।
সত্তৈস্তু সংবোধিবিচারণার্থং কোষং বুধাঃ সংগ্রচয়াংবভূবুঃ ॥ চর্যাগীতিকোষ : বিশ্বভারতী

ব্যক্তিরা জীবন্ত সত্য এবং তাঁহারা যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমাদের দেশেও এই ধরনের ইতিহাস প্রচলিত আছে। হিন্দু পুরাণ, জৈনদের ত্রিষষ্টি শালাকাপুরুষ, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী, হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলী চরিত, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ গল্পাশ্রিত ইতিহাস। এগুলিতে কাল্পনিক কাহিনীর দ্বারপথে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'পাথুরে' ও ধাতব প্রমাণ বহুস্থলে এই ঐতিহ্যের সত্যতা সমর্থন করিয়াছে। 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' গ্রন্থের সম্পাদক ও ইংরাজী অনুবাদক C. H. Tawney পণ্ডিতপ্রবর Buhler-এর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন; মন্তব্যটি বিচার যোগ্য—

"In particular, must it be admitted that the person introduced in the older, as well as in the more recent narratives, are really historical characters. Although it is frequently the case that an individual is introduced at a period earlier or later than to which he really belonged, or that the most absurd stories are told in regard to him, yet there is no case forthcoming in which we could affirm with certainty that a man named by these chroniclers is a pure figment of imagimation. On the contrary, nearly every freshly discovered inscription, every collection of old manuscripts, and every really historical work, that is brought to light, furnishes confirmation of the actual existence of one or other of the characters described by them. In the same way all exact dates given by them deserve the most careful attention. When they are found to agree in two works of this class, that are independent of one another, they may, without hesitation, be accepted as historically correct"

বস্তুতঃ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে, নেপালী ও তিব্বতী ঐতিহ্যের অলৌকিক কিংবদন্তীর অন্তরালে যে সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ১. তিব্বতী ইতিহাস বলিল, লুইয়ের শিষ্য দারিক এবং এই দারিক ছিলেন রাজা। ৩৪ সংখ্যক চর্যাগানে দারিকের ভনিতায় এই সত্যের পরিচয় মিলে—

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহে রে বাধা।
লুই পাঅ পসাএ দারিক দ্বাদশভুঅণেঁ লধা॥

[রাজা, রাজা, ওরে (আমিই সত্যকারের) রাজা। অপর রাজা মোহে। লুইপাদের প্রসাদে দারিক দ্বাদশভুবনে প্রতিষ্ঠিত]

২. তিব্বতী ঐতিহ্যে বলা হইল, 'পণ্ডিতাচার্য' কাহ্নপাদ ছিলেন জালন্ধরী দের শিষ্য। ৩৬ সংখ্যক গানে কাহ্নপাদও সেই সাক্ষ্য দিয়াছেন,

শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।
পাখি ন চাহই মোরি পণ্ডিতাচাএ॥

[(এই ধর্মে) জালন্ধরি পাদকে সাক্ষ্য মানিব। (পুথিপণ্ডিত) পণ্ডিতাচার্য মার পাশে থাকিয়াও ইহা দেখেন না]

৩. বিরূপ সম্পর্কে তিব্বতী ইতিহাস হইতে পাওয়া গেল, তিনি মদ্যপান রতেন। একদা এক শুণ্ডিনীর নিকট তিনি মদ্য প্রার্থনা করেন। শুণ্ডিনী হাকে মদ না দেওয়ায় বিপত্তি বাধে। বিরূপ-রচিত চর্যায় (৩) সত্যই মিলিল গুনীর মদ-চোলাই প্রসঙ্গ :-

এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ॥

[এক শুঁড়িনী দুইকে (দুই প্রকার বলকারক মাদক দ্রব্যকে) ঘটে ঢোকায়। ণ বাকলে মদ বাঁধে]

ঐতিহ্যে ও রচিত গীতে যেখানে মিল রহিয়াছে, সেখানে ঐতিহ্যকে অস্বীকার া যায় না এবং ইতিহাসগত সন-তারিখকেও মূল্য দিতে হয়। (ডঃ মুহম্মদ হুল্লাহ্‌, পণ্ডিত রাহুলজী এবং বৌদ্ধতন্ত্রের সম্পাদক ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাস্কর্যের ক ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যও নেপালী ও তিব্বতী ইতিহাসের সত্যকে রপথেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের তিনজনের মত একত্র করিয়া বলা ়, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী না হউক, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী চর্যাগীতি রচনার কাল। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই টীকা-ধৃত চর্যাগানগুলি ত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে এই গীতিগুলির একটি বৃত্তি ('চর্যাগীতি-ত্তি') রচনা করিয়াছিলেন স্বয়ং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিশ, যিনি ৫৮ বৎসর স তিব্বতে গিয়াছিলেন ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে।)

॥ চর্যার কাল : রাষ্ট্রীয় পট, ধর্ম ও ভাষার বিচার ॥

অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের রাষ্ট্রীয় পট, চর্যাগীতির সহজধর্ম ও তৎকালীন ীতে সহজমতের প্রতিফলন এবং বহির্ভারতে এই ধর্মের প্রচার-ইতিহাসও সিদ্ধান্ত সমর্থন করে যে, চর্যাগীতিগুলি ৮ম-১১শ শতকের মধ্যে রচিত।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত গৌড়বঙ্গে রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও ভাষার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সংক্রান্তিকাল। 'গৌড়ভুজঙ্গ' শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে 'গৌড়তন্ত্র' নৈরাজ্যের নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হয়। কনৌজ, গুর্জর, কামরূপ ও রাষ্ট্রকূট বংশের আক্রমণে বিপর্যস্ত পঞ্চগৌড়ে তখন 'মাৎস্য ন্যায়ের'[১] প্রাদুর্ভাব। শক্তিমানের সহিত শক্তিমানের সংঘর্ষ, অন্তর্ঘাত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ, শক্তির পরীক্ষায় শক্তের কবলে দুর্বলের পরাভব ও রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলা তখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। দণ্ডশক্তি দুর্বল, রাজতন্ত্র অস্থির, পর্যুদস্ত প্রকৃতিপুঞ্জ। চতুর্দিকে অনিশ্চয়তার সঙ্কেত।

ধর্মজগতেও তখন বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল। গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম তখনও অব্যাহত। ইহার সঙ্গে প্রচলিত ছিল ষট্‌কর্ম-বিহিত শাক্তাচার ও শৈব হঠযোগ। জৈনধর্মে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনার সঙ্গে সামাচারী সাধন—অলৌকিক সিদ্ধি এবং ভাবনা-বিমুক্তির নামে রতিকল্প ও বিচিত্র চর্যা—যোগভ্রষ্ট সাধুদের ('পতৎপ্রকর্ষ সাধূনাং) ক্রিয়া-কলাপে পরিণত হইয়াছিল। জৈন সাধুদের একটি শাখা ক্রমশঃ শৈব হঠযোগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় উদ্ভূত হইয়াছিল শৈব নাথপন্থ। সর্বভারতে ইহাদের প্রভাবও তখন অল্প ছিলনা। বন্ধকরণ-কপাটাদি অবলম্বনে নাথ যোগিগণ আশ্চর্য বিভূতি দেখাইতে পারিতেন। বৌদ্ধধর্মে মহাযান শাখায় মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদে নানা সূত্র ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রচলন ছিল এবং লৌকিক সিদ্ধির লক্ষ্যে ('অমুকীং বশমানয়, অমুকমুচ্চাটয়') ছিল বিচিত্র তন্ত্র-মন্ত্র-ক্রিয়া-চর্যার সাধন। সিদ্ধ নাগার্জুন-প্রবর্তিত রসরসায়নের প্রতিও আকর্ষণ ছিল। সর্বত্রই লৌকিক সিদ্ধি লাভের তাগিদ।

বৌদ্ধ তন্ত্রযান বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। অনেকেই মনে করেন, ঐতিহাসিক কালক্রমে সহজযান বয়ঃকনিষ্ঠ। এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। একই তন্ত্রের বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি অনুসারে নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। হিন্দু তন্ত্রের ভাবত্রয় (পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব) কালানুক্রমে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নহে। অধিকারী ভেদেই ভাবসাধনের পার্থক্য। তেমনই বৌদ্ধ তন্ত্রের কোন শাখা অগ্রে, কোন শাখা পরবর্তীকালে উদ্ভূত হইয়াছে—এরূপ বলা চলে না। অধিকারিভেদে (মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর) বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। সাধনের ক্রিয়া-চর্যা-যোগ সত্ত্বভেদে পৃথক: কাহারও পক্ষে (মৃদু অধিকারীর) বাহ্য

১। 'প্রবল-নির্বল-বিরোধে নির্বলবাধ বিবক্ষায়াং তু মাৎস্য ন্যায়াবতারঃ।'—লৌকিক ন্যায়সংগ্রহ

মন্ত্র ও ক্রিয়া, কাহারও (মধ্যইন্দ্রিয় সত্ত্বের) যোগ, কাহারও (অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর সত্ত্বের) অনুত্তর যোগ। সহজসাধন 'অনুত্তর' যোগের অন্তর্গত —উহা উচ্চস্তরের যোগীর সাধন। ইহা হিন্দুতন্ত্রের দিব্য ভাবের মতই 'সর্বভাবোত্তমোত্তম'। ইহার তত্ত্ব 'মহাসুখ', ইহার চর্যা 'মহারাগ নয়'। ইহার সাধন ও প্রাপ্তি উভয়ই 'অনুত্তর' (যাহার পর নাই)। এই সহজ মত বৌদ্ধতন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।[১] বৌদ্ধতন্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্র-মণ্ডলাদি দ্বারা উহা আচ্ছন্ন ছিল মাত্র।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ভিতর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিল। রাজতন্ত্র যখন অব্যবস্থিত, যখন দণ্ডশক্তির দুর্বলতায় 'মাৎস্যন্যায়' অবারিত, তখন প্রজাপুঞ্জ অগ্রসর হইয়া গোপালদেবকে রাজা নির্বাচন করিলেন—'মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাকরং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপালঃ'। পণ্ডিতপ্রবর কীলহর্ণ প্রমুখ ইতিহাসবিদ্গণ ইহাকে গণ-অভ্যুত্থান বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন, জনগণের দাবীতেই সামন্ত রাজগণ গোপালকে নির্বাচন করেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, ইহা একটি যুগান্তকারী ঘটনা ('epoch making event.' —ইহার ফলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভিতর নিশ্চয়তা আসিল, শত্রুদীর্ণ রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং জনগণের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকার লাভ করিল।

এই সময়ে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাপুঞ্জের প্রত্যক্ষ যোগের ফলে লোকাশ্রিত ধর্মও প্রাধান্য লাভ করিল। পালরাজগণ নিজেরা ছিলেন 'সৌগত'। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিলেও তাঁহারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের ধারক। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট রূপ সহজমত, শূন্যতা ও করুণার-মিলন যোগ প্রাধান্য লাভ করিল। পাল রাজাদের সিংহাসন বজ্রাসন, আর সে বজ্রাসন প্রজ্ঞা-উপায় বা শূন্যতা-করুণার যুক্ত প্রতীক। এই সময়ে প্রদত্ত তাম্রপট্টলিপিগুলির বন্দনা-শ্লোকে বজ্রাসনের এইরূপ প্রশস্তি পাওয়া যায়ঃ

সর্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাস্থিতস্য
বজ্রাসনস্য বহুমার কুলোপলম্ভাঃ।
দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতানি
রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশো জয়ন্তি।। (খালিমপুর তাম্রশাসন)

১। শ্রীমদ্ হেরুক তন্ত্ররাজজলধে গুহ্যাৎ সমাকৃষ্টিকাৎ।
শ্রীৎ সদ্গুরু নাথবাক্য মথনাদ্ যা সাধনা উত্থিতা।। চর্যাগীতিকোষ

—যিনি বজ্রাসনে আস্থিত হইয়া শ্রীরূপিণী সর্বজ্ঞতাকে স্থির করিয়াছেন, দশবলে মার-গৃহীত দশদিক জয় করিয়া মহাকরুণায় দিক্ সমূহ প্রতিপালন করিতেছেন, সেই দশবল তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

এখানে দেখা যাইতেছে, বজ্রাসনে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি সর্বজ্ঞতা (প্রজ্ঞা) এবং করুণার মিলিত মূর্তি, তিনি দশবলের অধিকারী, তিনি মারকে পরাভূত করেন। সহজযানের মূলতত্ত্ব—প্রজ্ঞা ও করুণার যুগনদ্ধ তত্ত্ব। এই তত্ত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সত্যকারের দশভূমীশ্বর ('দ্বাদশভুঅণেঁ লধা'—চর্যা ৩৪), তিনি কাম-প্রভব অজ্ঞানতা নাশ করিয়া শাশ্বত শান্তি লাভ করিতে পারেন। এই ভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে পাল রাজাদের অপরাপর তাম্রশাসনের প্রশস্তি-শ্লোকে (নিম্নে দ্রষ্টব্য ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণ পালদেবের তাম্রপট)।[১] সম্বোধির (প্রজ্ঞা) সঙ্গে করুণার যোগ এবং সেই যোগফলজাত লৌকিক ও অলৌকিক সিদ্ধি অর্থাৎ ধর্মমেঘরূপ বোধিসত্ত্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠা -ইহা চর্যাগীতিরও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এই মতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাল রাজাদের বজ্রাসনকে কেন্দ্র করিয়া।

গণতান্ত্রিক শাসনের অপর ফল—গণজীবনের অধিকার ও মূল্যবোধের স্বীকৃতি। চর্যাগানেও এই স্বীকৃতির স্বাক্ষর আছে। নিম্নবর্ণের ডোম্বী, মাতঙ্গী, শবর এখানে ব্রাহ্মণেরও অধিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। উপরন্তু জনগণের ভাষারও মূল্যবোধ স্বীকৃত হইয়াছে। যে লোকাশ্রিত ভাষা অভিজাত সংস্কৃত ভাষার চাপে অপাংক্তেয় হইয়া ছিল, যাহা ছিল অপভ্রংশের নির্মোকে কঞ্চুকিত, পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যুগে সেই ভাষা, অপভ্রংশের ভাষাবৃন্ত বিদীর্ণ করিয়া স্ফুটনোম্মুখ হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, সে ভাষা দেশজ 'গবড়া' (গউড়া=গৌড়া) ও বঙ্গাল রাগকে আশ্রয় করিয়া সুরেলা হইয়া উঠিল।

ভাষার দিক হইতে চর্যার ভাষা সংক্রান্তিকালের লক্ষণ বহন করে। এ যেন সদ্য অপভ্রংশ-কোষ মুক্ত ভাষা। পণ্ডিতগণ ৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দকে অপভ্রংশ ভাষার সীমা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নব্যভারতীয় আর্যভাষা তাহার পরবর্তী।

১। মৈত্রীং কারুণ্য রত্ন প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ।
সম্যক্ সম্বোধি বিদ্যা সরিদমল জল ক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ॥
জিত্বা যঃ কামকারি প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং।
স শ্রীমান্ লোকনাথ জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥

[তাম্রপট্ট-ধৃত শ্লোক দুইটি রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাস, প্রথমভাগ হইতে সংগৃহীত]

কিন্তু এই সময়-সীমা নিঃসংশয়ে অসন্দিগ্ধ নহে। 'ভাষা', 'প্রাকৃত', 'বিভাষা' এবং 'অপভ্রংশ' ও 'অপভ্রষ্ট' প্রভৃতি ভাষানাম বহুকালাতত। এগুলি প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত ভাষার নামান্তর। বিষ্ণুধর্মোত্তরে 'অপভ্রষ্ট' ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] পতঞ্জলি শাস্ত্রহীনের চলিত ভাষারূপে 'অপভ্রংশে'র উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কের কতকগুলি গান অপভ্রংশে রচিত। আচার্য দণ্ডী (৭ম শতাব্দী) যে চারি প্রকার ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর অপভ্রংশ একটি (কাব্যাদর্শ ১.৩২)। লক্ষণসহ অপভ্রংশ ভাষার বিচার পাওয়া যাইতেছে মার্কণ্ডেয়, পুরুষোত্তম ও রামশর্মাকৃত গ্রন্থাবলীতে। সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জানপদ ভাষা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায়, অপভ্রংশ ভাষা সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং সে ভাষার প্রসার দ্বাদশ-ত্রয়োদশ, এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্তও ছিল। কারণ, সূরী হেমচন্দ্র অপভ্রংশ ভাষার বিচার করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর কবি গোবর্ধন আচার্যের আর্যা সপ্তশতীর দুইটি শ্লোকে অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ ও অপভ্রংশ গীতের উল্লেখ দেখা যাইতেছে (আর্যা ৩৪২, ২১৫)।

'বঙ্গাল বাণী'র স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যাইতেছে সদুক্তি কর্ণামৃতের সঙ্কলিত একটি শ্লোকে। মনে হয়, গৌড়াঞ্চলের ভাষা পূর্বে 'প্রাকৃত,' 'অপভ্রংশ' বা 'ভাষা' নামেই অভিহিত হইত। আচার্য মুনিদত্ত লুইপাদাদি রচিত চর্যাচয়ের ভাষাকে 'প্রাকৃত ভাষা' বলিয়াছেন ('শ্রীলুইপাদঃ···প্রাকৃতভাসয়া রচয়িতুমাহ' টীকা ১)। লঙ্কেশ্বর-কৃত 'প্রাকৃত কামধেনু'তে বলা হইয়াছে, 'লকৃথণ বিহুলা কথা' (বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর কাহিনী) গৌড়ী প্রাকৃতে রচিত ('সো পাউঅ গৌড়ী')। পরবর্তী বাংলা কাব্যে বাংলা ভাষাকে 'ভাষা' বলা হইয়াছে। প্রাকৃত, অপভ্রংশ বা ভাষা নামে বঙ্গালবাণী গৌড় অঞ্চলের প্রাকৃত-অপভ্রংশের ভিতর প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই ভাষা প্রথম প্রকাশোন্মুখ হইয়াছে পালযুগেই। ইতিহাসবিদ বলেন, 'The Vernacular of Bengal developed a Proto Bengali form during the reign of Dharmapala.' (Prof. P. Maiti)

চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল যে অষ্টম-একাদশ শতাব্দী, সে সম্পর্কে আর একটি

১। দেশেষু দেশেষু পৃথগ্ বিভিন্নং ন শক্যতে লক্ষণতস্তু বক্তুম্।
লোকেষু যৎ স্যাদপভ্রষ্ট সংজ্ঞং জ্ঞেয়ং হি তদ্দেশবিদোঽধিকারম্॥
(বিষ্ণুধর্মোত্তর ৭ অধ্যায়)

সাক্ষ্য—চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাস। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনদেশের যোগ খ্রীষ্টপূব প্রথম শতকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কুমারজীবের (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) সময় হইতেই চীনদেশের মানসে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা। কুমারজীব নাগার্জুনের মতবাদ প্রচার করেন। চৈনিক প্রতিভা এই মতকে কন্‌ফুসিয় ও তাও ধর্মের সঙ্গে মিলাইয়া লয়। ক্রমে চীন দেশে 'ধ্যান'-শাখা বিস্তার লাভ করে। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে আচার্য বোধিধর্ম এই শাখাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে হিউয়েন-সাঙ্‌ ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া চীনদেশে যোগাচার-বিজ্ঞানবাদ প্রচার করেন। কোষ-শাখারও প্রবর্তক হিউয়েন সাঙ্‌। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ এই শাখার ভিত্তি। এইভাবে চৈনিক মানসে বৌদ্ধ-ধর্মের অপর শাখা—তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে পণ্ডিত বজ্রবোধি চীনদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার সহায়ক হন শিষ্য অমোঘবজ্র (দ্রষ্টব্য Hist. of Philosophy Eastern and Western. Vol I. Part IV. Chaps. XXI-XXV); তাঁহারা কতকগুলি বৌদ্ধ তন্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। মনে হয়, বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত সহজমতবাদও এই সঙ্গে প্রসার লাভ করে। কারণ কর্দিয়ের তালিকায় দেখা যাইতেছে, বজ্রবোধির 'সহজতত্ত্বালোক' তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে চীন দেশে পুনরায় তাঁহাদের স্বকীয় ধর্ম Neo-Confucianism প্রসার লাভ করে। অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে চীন দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও সহজ মতবাদ প্রচারিত হইল, তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইল জাপানে—আর সেই মতবাদের উৎসস্থল গৌড়বঙ্গে তাহার সূচনা হইল দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে এ সিদ্ধান্ত ইতিহাস-বিরোধী।

যেদিক হইতেই বিচার করি না কেন, সহজমতের বাহক চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতেই ধরিতে হইবে।

॥ চর্যাগীতির পরমতত্ত্ব : মহাসুখ বা সহজতত্ত্ব ॥

প্রত্যেক ধর্মেরই একটি চরম লক্ষ্য থাকে। তাহাই চরম প্রাপ্তি, পরম তত্ত্ব বা পরমার্থ। বৌদ্ধ সহজসাধকদের পরমার্থ সহজ মহাসুখ।

৮ সংখ্যক চর্যাগানে দেখা যায়, সিদ্ধাচার্য কম্বলাম্বরপাদ শূন্যতায় ভরা করুণার নৌকা গগনের উদ্দেশ্যে বাহিয়া চলিয়াছেন। উদ্দেশ্য 'মহাসুখসঙ্গ'।

কৃষ্ণাচার্যও শূন্য মার্গে নৌকা বাহিয়া চলেন (১৩)।
লক্ষ্যও 'মহাসুহসঙ্গ'। চর্যাকারের শেষ সম্পত্তি এই
চরমান্তরে শবরপাদ শবরীর সহিত মিলিত হইয়া এই
মহাসুখে রাত্রি প্রভাত করেন (২৮)। তাই প্রথম গানেই :
সিদ্ধাচার্য লুইপাদ একরূপ জীবজ্ঞানের উদ্যোগ্য কর্ণধার
হইয়া বলিলেন, 'মহাসুহ পরিমাণ'।

বৌদ্ধদের পরম সাধনার বস্তু নির্বাণ — 'নি
পরমং বদন্তি বুদ্ধা' (ধম্মপদ ১৮৪)। কিন্তু নির্বাণ বলিতে
বুদ্ধদেব বা প্রাচীন বৌদ্ধেরা যাহা বুঝিতেন, তাহা কি
মহাসুখ? নির্বাণ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটি অস্পষ্ট
ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, ভাবাত্মক মহাসুখ কি
হইতে ভিন্ন নহে?

এই সংশয়-প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মের
বিচিত্র বিবর্তনের ইতিহাস নিহিত। স্বয়ং বুদ্ধ যে
'ধর্মচক্র' প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা একটি নিয়ত
ঘূর্ণমান শীল চক্র। তাহা যেমন বারবার নিজ
কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে, তেমনই আবার
দুরন্ত গতিশক্তিবলে দূর-দূরান্তরে যাত্রা করিয়াছে।
বৌদ্ধধর্ম সিংহল-শ্যাম-কম্বোজ, তিব্বত-চীন-জাপান

হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কোনদিন একমাত্র বা এক ধর্মে বদ্ধ হইয়া থাকে নাই। তাহা ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই শাখাগুলির ভিতর দুটি প্রধান শাখা — দক্ষিণাপথের হীনযান এবং উত্তরাপথের মহাযান। হীনযানও নানা শাখায় বিভক্ত। মহাযানেরও যানভেদ অল্প নহে — সার্বাস্তিবাদ, যোগাচার, বজ্রযান, সহজযান। বাংলা ভাষায় রচিত সিদ্ধ আচার্যদের সাধন সঙ্গীতগুলি সহজযানের অন্তর্ভুক্ত। সহজসুখ তাঁহাদেরই সাধ্যসিদ্ধি। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের নির্বাণ-ধারণায় 'সহজসুখ' এর সংযোজন।

এই সহজসুখ কি? হেবজ্র, গুহ্যসমাজাদি তন্ত্রে ইহার বিশদ আলোচনা আছে। চর্যাগীতিতেও তত্ত্ব-স্বভাব সঙ্গীতগুলিতে সহজসুখের তত্ত্ব আভাসিত হইয়াছে। চর্যাটীকায় 'তত্ত্বস্বরূপ' (২৯,৪০), 'পরমার্থতত্ত্ব' (৪১), 'অনুত্তরপদ' (২৬) এবং 'চতুরানন্দ' (৫) প্রভৃতি নামে সহজসুখের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে মোটামুটি সহজসুখ সম্পর্কে এই ধারণা জন্মে যে, সহজসুখ নির্বাণসংশ্লিষ্ট একটি সহজ আনন্দঘন অবস্থা; ইহা সর্বশূন্য, ইহা নিরালম্ব বিশুদ্ধ বিজ্ঞান; সহজসুখের সহিত অবিনাভাবে যুক্ত অদ্বয়,

সত্তা ও সমরস বোধ; মহাসুখতত্ত্বের ফলে মহাকরুণা এবং সার্বোপরি অলক্ষ্য ও নামহীন মহাসুখ একটি স্বসংবেদ্য 'বাক্‌পথাতীত' তত্ত্ব। নিম্নে এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হইতেছে।

৩৪

(১) মহাসুখ ও সহজানন্দ

মহাসুখের অপর নাম সহজ বা সহজানন্দ। চর্যার সাধকগণ 'সহজ-উন্মত্ত', গানে সহজ সুখের চরম কেন্দ্রকে বলা হইয়াছে জিনপুর (জিনউর — ৭, ১২, ১৪), কামরূপ (কামরু— 'গঅণাণ্ডই' (১৬), 'সহজ নলিনীবন (৯), অনুত্তর ধাম (অনুত্তু ধাম — ১৭), অমন ধাম পারিমকুল (৩৪) বা পরম নির্বাণ (পরম নিবাণ কিংবা 'জোহ্নাবাড়ী' (৫০)। সহজ সাধক মাত্রই এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ধাবমান। কাহ্নপাদের প্র চিত্তগমনের দন্দ ভাঙিয়া, নিবল তাঁটিয়া সহজে

স্বরূপে প্রবেশ করিয়া নিবৃত্ত হয় — 'সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা' — ৯। সরহপাদ উজান বাহিয়া সহজের দিকে যাত্রা করেন — ৩৮। গগনে সহজস্বরূপের উদয় দেখিয়া 'সহজানন্দে মত্ত' উল্লসিত ভুসুকু বলেন,

উইআ গগন মাঝেঁ অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ॥ — ৩০

শাব্দিক অর্থে 'সহজ' হইতেছে সহজাত স্বভাব. 'সহ জায়তে ইতি সহজঃ'।[১] হেবজ্রতন্ত্র বলেন, জন্মের সঙ্গেই যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই সহজ ('সহোৎপন্নং যদুৎপন্নং সহজং তৎ প্রকীর্তিতম্' ১.১০.৪১)। আবার কেহ কেহ বলেন, সহজ মানে সরল (Easy)। আসলে মহাসুখ বা সহজানন্দ একটি অদ্বিতীয় মহাসুখের অনুভব। পার্থিব জগতে নরনারীর মিলনে যে আনন্দ, তাহারই একটি কোটিগুণিত আনন্দ ই সহজানন্দ। মহাসুখ বা সহজানন্দ যুগনদ্ধ-ফল। সুনিশ্চিত বলেন, পরিপক্কবুদ্ধি যোগীরা 'যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দ ফল' অন্বেষণ করেন। যুগনদ্ধ বলিতে বোঝায় দুইটি তত্ত্বের একীভূত মিলিত অবস্থা — 'একীভূতো ভবেৎ যত্র যুগনদ্ধং তদুচ্যতে' (পঞ্চক্রম)। সে দুইটি তত্ত্ব প্রজ্ঞা-উপায় বা শূন্যতা-করুণা। উপায় বা করুণা পুরুষতত্ত্ব এবং প্রজ্ঞা বা শূন্যতা স্ত্রীতত্ত্ব। একটি 'ভগবান' (প্রেমিক), অপরটি 'দারী' (প্রেমিক পত্নী) — 'যোষিৎ তত্ত্ব ভবেৎ প্রজ্ঞা উপায়ঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ' (হেবজ্র)। ইহাদেরই অদ্বয়-মিলনের (সমরসের) ফল সহজানন্দ মহাসুখ। এই দিক হইতে 'সহজ' শব্দটি তাৎপর্যবোধক। 'সহজ' শব্দ 'সহ-জ' নহে, 'স-হ-জ'

১. 'The word 'sahaja' literally means that which is inborn or which originates with the birth' — S.B.

অর্থাৎ 'স' এবং 'হ'-এর মিলনজাত যান। সরহপাদের 'কা-
দোহা' মতে 'স' বর্ণটির অর্থ সমতাজ্ঞান বা প্রজ্ঞা; আর চর্যা
টীকা মতে (৫০) 'হ' হইতেছেন 'পারিবীর' বা বজ্রবীর অর্থাৎ উ
বা করুণা। সহজানন্দ হইতেছে রাগানন্দে মিলিত এই দুইটে
যোগফল। চর্যাতে ভুসুকুপাদ বলেন, আমি মিলন-লীলায়
সহজানন্দ মহাসুখকে বুঝিয়াছি —

ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ ॥ ২৭

২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানেও দেখা যায়, বজ্রবীর শবর নৈরাত্মা
শবরীর সহিত মিলিত হইয়া মহাসুখে রাত্রি প্রভাত করিতেছেন
অতএব মহাসুখ হইতেছে নরনারীর রূপান্বয় দুইটি তত্ত্বের
রাগমিলনজাত এমন একটি সহজ ('Spontaneous'—Snell
'Inborn'— Dasgupta) আনন্দ, যাহা সকল কল্প, সকল বিকল্পের
স্বরূপ। ইহাই 'পরমতত্ত্ব'। ইহা হইতেই দৃশ্য সংসারের উৎপত্তি
ইহার অনুভবেই স্বরূপজ্ঞান বা নির্বাণ, তত্ত্ব বলেন, এই সহ
স্বরূপ, এই সহজই সর্বগত, বিশুদ্ধ চিত্তের পক্ষে এই সহ
নির্বাণ। সহজ সাধকদের মতেও যোগজ (স-হ-জ) আনন্দ
মিথিল সংসার। এই আনন্দের বিশুদ্ধ রূপই নির্বাণ।

আনন্দের স্তরভাগ : বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা এই আন
'ক্ষণ' (বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ) ভেদে চারিটি ভা
ভাগ করিয়াছেন: আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজা
আনন্দের এই ভাগগুলি ক্রমবিন্যস্ত এবং উত্তরোত্তর উত্তম
নরনারীর দর্শন, আলিঙ্গন, মিলনাদিতে যেমন আনন্দটি
ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়, এখানেও ঠিক তেমনি প্রজ্ঞোপায়
যোগে বা শূন্যতা করুণার যোগে দেহস্থ নাড়ীগুলিতে প্র
দেহস্থ চক্রে চক্রে উত্তম আনন্দ সাধনে জাগে। দেহের দক্ষি
দিকের নাড়ীতে (রসনা) পুরুষতত্ত্ব, বাম নাড়ী (ললনা). এ
মধ্যম নাড়ী (অবধূতী) পুং-স্ত্রী-লক্ষণ বর্জিত (নপুংসক)
স্ত্রীতত্ত্ব। প্রজ্ঞোপায় যোগে প্রথম আনন্দের দ্বারা দক্ষিণা

স্ফুট হয়, উহাই 'বিচিত্র' প্রথমানন্দ। দ্বিতীয় আনন্দের স্পন্দন
দেশ বাসনা নাড়ীতে, উহা 'বিপাকজ' দ্বিতীয় আনন্দ ও
পরমানন্দ। তৃতীয় আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয় সর্ব্যাস নাড়ী।
উহা 'বিমর্দজাতের' বিরমানন্দ।

---

১. তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকারচেতসা॥ হেবজ্র ২.২.৪৪

২. বিচিত্রে প্রথমানন্দঃ পরমানন্দো বিপাককে।
বিরমানন্দো বিমর্দে চ সহজানন্দো বিলক্ষণে॥
হেবজ্র ২

৯।

আনন্দই চতুর্থ স্তরে (বিলক্ষণ স্তর) শূন্যস্বরূপ সহজানন্দের
প পরিগ্রহ করে। এই যেমন আনন্দ-স্পন্দনের একটি গতি,
সেই ইহার আর এক গতি ঊর্ধ্বক্রমে। সে আনন্দের
স্থানগুলি সর্ব্যাস নাড়ীতে স্থিত নির্মাণ চক্র (নাভি),
সম্ভোগ চক্র (কণ্ঠ), ধর্মচক্র (হৃদয়) এবং মহাসুখচক্র
(উষ্ণীষ কমল, মস্তক) অনুভূত হয়। ঊর্ধ্ব যাত্রায়
নাভিচক্রে (নির্মাণকায়ে) যে আনন্দ, তাহা প্রথমানন্দ,
ণ্ঠে (সম্ভোগকায়ে) পরমানন্দ, হৃদয়ে (ধর্মকায়ে)
বিরমানন্দ এবং উষ্ণীষে (সহজকায়ে) সহজানন্দ।
নির্মাণ-সম্ভোগে যে দুইটি আনন্দ, তাহা যেন লৌকিক
রূপভেদ, ভোগাদীনের মধ্যেই থাকে। সর্ব্যাসের
আনন্দ বিরমানন্দ ('Joy of creation')
থমে প্রথম আনন্দদ্বয়ের বিকাশ — উহা

রাগ-বিরাগ বর্জিত। এই বিরমানন্দের পরেই সহজানন্দ — রাগ-বিরাগের অতিরিক্ত শূন্যস্বভাব এক নিস্তরঙ্গ আনন্দ। (From the joy of ceasation comes a passionless State' — Snellgrove): তন্ত্র বলেন, প্রথমানন্দ 'ভব', পরমানন্দ 'নির্বাণ', বিরমানন্দ কেবল — 'সর্বাস্মানন্দ মাত্র' এবং সহজানন্দ ত্রিস্বভাব-বর্জিত এক অতীন্দ্রিয় সহজানু সেখানে রাগ নাই, বিরাগ নাই, সর্বাস্মানন্দও নাই, আছে সর্ববিবর্জিত সহজাখ্য নিস্তরঙ্গ আনন্দ।[2]

চর্যাগীতিতে রূপক-সংকেতে এই আনন্দের কথা নানাভ ব্যক্ত হইয়াছে। টীকায় নির্মাণের আনন্দমাত্রাগুলিকে বলা হইয়াছে, 'ক'-জাতীয় সুখ। এই 'ক' সুখকে যিনি বীর্য বা পালন করেন, তিনি 'কপালী' (কাপালিকঃ চর্যাবিরুঢ়। সুখং পালিতুং সমর্থঃ' — টীকা ১০)। এই 'ক' সুখই ক্রমে 'খ'-সুখ (খ = আকাশ = শূন্য) অর্থাৎ শূন্যতাসুখ বা মহা পরিণত হয়। ৫০ সংখ্যক চর্যাগীতিতে দেখা যায়, শবরা-শবরী যখন তিনতলা অতিক্রম করিয়া চতুর্থ 'খ-সম' বা

---

১. আনন্দং প্রথমং বীরং পরমানন্দং যোগিনী।
সুরতানন্দং সমস্তং জ্ঞানমুখোপায়ঃ সর্ববিৎ॥
আনন্দেন সুখং কিঞ্চিৎ পরমানন্দং ততোঽধিকম্।
বিরামেণ বিরাগঃ স্যাৎ সহজানন্দং শেষতঃ॥ তত্রৈব ১.৮.৩১-

২. প্রথমানন্দং ভবং প্রোক্তং নির্বাণঞ্চ বিরাগতঃ।
সর্বাস্মানন্দ মাত্রন্তু সহজানন্দ বিবর্জিতম্॥
ন রাগো ন বিরাগশ্চ সর্বাস্মং নোপলভ্যতে।
ত্রয়ানাং বর্জনাৎ এব সহজং বোধিরুচ্যতে॥
অথবা সমস্তকঃ সৈবাস্থবা সর্ববিবর্জিতঃ। —
তত্রৈব ১.১০.১৭

...লেন, তখন 'ছোহ্নবাড়ি' উদ্ভাসিত হইল, এই ছোহ্নবাড়ি-ই পরম জ্ঞানেন্দুমণ্ডল বা মহাসুখচক্র। মন একে একে প্রস্ফুটিত হইল খ-পুষ্প অর্থাৎ আকাশ-ফুল ('আকাশ-ফুলিলা') এবং 'কপাস অর্থাৎ -এর পার্শ্ববর্তী 'খ' (ক-কারস্য পার্শ্ববর্তী খ-কারঃ শূন্যং — টীকা); সেই সঙ্গে 'কন্টিকা পারেকা' ..., ক-সুখরূপ অর্থাৎ যাহার এমন যে সংবৃতি বোধিচিত্ত কং সুখং সংবৃতিবোধিচিত্তং তেন যস্যাঃ সা নির্মিতি'— তাহা পরিপক্ক হইল অর্থাৎ সংবৃতি সুখ সুখে পরিণত হইল। ইহাই মহাসুখের হয়।

মহাসুখ পার্থিব চেতনার অতিরিক্ত একটি নির্বচনীয় মহাবিপুল তুরীয় অবস্থা। এ অবস্থা নারীর মিলনজাত লৌকিক আনন্দ নহে, ইহা প্রজ্ঞা উপায় কিংবা শূন্যতা ও করুণার একীভূত (যুগনদ্ধ) পের অপার্থিব অবস্থা। এ অবস্থা সহজ (Unborn) নিত্য (Eternal), ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, এ পরিবর্তন নাই। এ অবস্থা কোন কার্য-কারণের ause and effect) অধীন নহে, কোন হেতু-প্রত্যয়ের use and condition) ফল নহে, তাহা প্রকৃতিপ্রভাস্বর of effulgent) এবং স্বয়ম্ভু। তাই যেমন সব বস্তু ও যেমন নিঃস্বভাব (Essenceless), তেমন একমাত্র 'স্বভাব' সুখ। এ অবস্থা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; সে অবস্থার ভাবে ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় — 'জানু নিজে তুই ইন্দিআরণ' — ৩০ (যথা সহজাবস্থায় সে ইন্দ্রিয়ানলানিতি ইন্দ্রিয়াণ্যেবং সংত্যজতি' — ৩০)। এ-অবস্থায় মনে হয়, ইন্দ্রিয়গুলি যেন

স্থগিত হইয়াছে, মন যেন সবেই অন্তর্লীন হইয়াছে, তা বা দেহ যেন সহসুখে সম্প্রসন্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছে।[1]

(২) মহাসুখ ও সর্বশূন্যতা

এই সহজ মহাসুখের অপর নাম শূন্যতা। সহজ সর্বশূন্যতার অবস্থা। শূন্যতার পরিকল্পনা সুপ্রাচীন, প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে 'শূন্য' (সুঞ্ঞ) শব্দটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হইলেও নানা প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ দেখা যায়, পটিসম্ভিদা পালিতে 'সুঞ্ঞকথা' প্রসঙ্গে শূন্যের কথা আলোচিত। ধম্মপদে নির্বাণকে বলা হইয়াছে শূন্যাগার (সুঞ্ঞাগারং — ধম্মপদ ৩৭৩)। বিশেষজ্ঞগণ

---

১. ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীহ মনো যত্র বিলীয়তে।
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সহসুখ স্থিতেঃ॥
(১নং চর্যাগীতিকায় উদ্ধৃত অবতরণ

বৌদ্ধধর্মের মূল বীজ শূন্যতা বা নৈরাত্ম্য।[৭] এই
...ম চরমে পৌঁছিয়াছে মাধ্যমিক শাস্ত্রে। তাঁহাদের
সবই শূন্য, সবই অতর্ক্য; সৎ নাই; অসৎ নাই;
সত্ত নাই; উভয়ের উভয়াত্মক বা অনুভয়াত্মক
তত্ত্ব নাই। শূন্য হইল চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত।[২] মঃ
মুক্ত ইহাকে বলিয়াছেন, 'uncompromising spirit
negation' — অর্থাৎ সর্বাত্মক নাস্তিবাদ।

চর্যার সাধক কবিরাও সহজানন্দকে বলিয়াছেন,
প্রান্তর ('সুন পান্তর' — ১৫)। সেখানে পড়শী নাই
... পড়বেশী'), সেখানে ইন্দ্রিয়তে ভাতও থাকে না
...তো ভাত নাহি — ৩৩)। তাহার বর্ণ-চিহ্ন-রূপও
(চাহের বর্ণ-চিহ্ন-রূব ণ জাণী' — ২৭)। ভাষেসায়
...ছেন, কিন্তু যখনে উলিয়ার শূন্য সমুদ্রে প্রবেশ করিল
...ন দশদিকে সর্বশূন্য দেখিলাম ('সোহরিম দহদিহ
... সূণ' — ৩৫)। 'সহজনিবাণ' কাহ্নপাদ
...লিয়াছেন: ধ্যান নাই, চেতনা নাই, অক্ষরাতোগ
... সহজানন্দে নিয়মাত অনিম একেবারে নয় —

ধ্যানই ণ চেবই সণের বিভাগে,
সহজনিবাণ কাহ্নিলা জাণী॥ — ৩.

তিনি আরও বলেন, সহজ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ শূন্য
- 'চিত্ত সহজে শূন সংপুন্না' — ৪২। সহজের
অনুভব যে চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত (চৌকোডি বিমুক্ক
৩৭), ভাড়ুকপাদ তাঁহার চর্যায় তাহা স্পষ্ট
...বলিয়াছেন। তাহা অস্তি, নাস্তি, অস্তি-নাস্তি

এবং নাস্তি-নাস্তি — এই চতুর্বিধ বিচারের অতীত।

সহজসুখ শূন্য-স্বভাব; শুধু শূন্য স্বভাব নহে, সর্বশূন্য। ইহা যে সর্বরিক্ততা, একটি রূপকের আবরণে ভুসুকুপাদ (৪৯ চর্যা) অবশ্য সুন্দর করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন: বজ্রা নৌকা পদ্মখালে বাহিয়া চলিয়াছিল। (এমন সময়) নির্দয় বঙ্গাল দেশ লুণ্ঠন করিল। ভুসুকুকে বঙ্গাল করিয়া ভুলিল। তাহার গৃহিণীকে চণ্ডালে গ্রহণ করিল। পঞ্চপাটন, ইন্দ্রের মত বিষয়-আশয় বিনষ্ট হইল। সোনারুপার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তিনি বলিতেছেন, সহজসুখে আমি, আমার চতুঃকোটি ভাণ্ডার নিঃশেষে লইয়া গেল। (এখন) মরণে-জীবনে সমান। — এখানে সর্বশূন্যতাই যে সহজসুখ, তাহার ইঙ্গিত অতি...

১. Nairatmya (Substancelessness) is the generic idea of Buddhism. T. R. V. Murti: The Metaphysical Schools Buddhism (Hist. of Phil. Eastern & Western Vol I)

২. ন সন্ন নাসন্ন সদসন্ন চাপি অনুভয়াত্মকম্
চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ ॥
— জ্ঞানসারাবলী

শূন্যের স্তরভেদ : এই যে শূন্য, ইহারও আবার প্রকারভেদ আছে। পূর্বোক্ত চতুরানন্দের (আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ) ক্রম অনুসারে শূন্যেরও চারিটি ভেদ। ৫০ সংখ্যক গানে দেখা যায়, শূন্য হইতে শূন্যে (গঅণত গঅণত)—তাহার সহিত সংলগ্ন তৃতীয় শূন্য (তইলা বাড্হী)। তাহার উপরে চতুর্থ শূন্য (জোহ্না বাড়ি)। সেইখানে নৈরামণি শবরীর সহিত শবর মহাসুখে বিলাস করিতেছেন ('মহাসুখে বিলসন্তি')। গানে এই শূন্যগুলির ইতর-বিশেষের কথা বলা হইলেও বিশিষ্ট নাম নাই। চর্যাটীকায় কিন্তু ইহাদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে : শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য এবং প্রভাস্বর চতুর্থ শূন্য (টীকা ৫০)। এই শূন্যতার অনুভবস্থান যথাক্রমে নাভি, কণ্ঠ, হৃদয় ও উষ্ণীষ (নির্মাণ, সম্ভোগ, ধর্ম ও সহজকায়)।

শূন্যের এই স্তর বিভাগের ভিতর বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের প্রায় সমগ্র ইতিহাস বিধৃত। চর্যাধরদের শূন্যানুভবের তত্ত্বগুলিও ইহারই ভিতর বিন্যস্ত। নির্মাণকায়ে যে শূন্যতার অনুভব, তাহা পুদ্গল-শূন্যতা বা দেহ-শূন্যতা বা গ্রাহ্যবস্তুর শূন্যতার অনুভব। পঞ্চস্কন্ধাত্মক নামরূপ শূন্য, শূন্য ভব, শূন্য বর্ণভেদ ও জাতিভেদ। উহা হীনযানের নির্বাণরূপ শূন্যতার বোধ। তাঁহারা মনে করিতেন, কতকগুলি শাশ্বত ধর্মের সমবায়ে গঠিত যে পুদ্গল, তাহা শূন্য।[১] দ্বিতীয় স্তরে সম্ভোগকায়ে পরমানন্দের সঙ্গে যে শূন্যতাবোধ, তাহা ধর্মশূন্যতা বোধ। এখানে শুধু গ্রাহ্য বস্তু নহে, গ্রাহকও যে শূন্য, এই বোধ হয়—ইহা অতিশূন্য। প্রকৃতপক্ষে ইহা মহাযান বৌদ্ধদের ধর্মশূন্যতার অনুভব।[২] ধর্মকায়ে বিরমানন্দে যে শূন্যতার ধারণা, তাহা গ্রাহ্য ও গ্রাহক এতদুভয়ের যুক্ত শূন্যতাবোধ। ইহা মহাশূন্য। চতুর্থশূন্য বা সহজশূন্য ইহারও উপরে। সেখানে গ্রাহ্য-গ্রাহকের অনুভয়াত্মক শূন্যতাবোধ এবং তাহা সর্বশূন্যের স্তর। সে শূন্য চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত। সেখানে রূপ নাই, দ্রষ্টা নাই—শব্দ নাই, শ্রোতা নাই—গন্ধ নাই, ঘ্রাতা নাই—রস নাই, রাসক নাই—স্পর্শ নাই, স্প্রষ্টা নাই—চিত্ত নাই, চৈত্তিক নাই।[৩] এই 'সর্বাকার

১. All phenomena are unstable compounds of a certain fixed member of stable elements—W. M. Mc Govern : Intro. to Mahayana Buddhism.

২। Everything, even the component parts of being, are in a perpetual flux—Mc. Govern : Intro. to Mahayana Buddhism.

৩। নাস্তি রূপং ন দ্রষ্টা চ ন শব্দো নাপি শ্রোতা চ।
ন গন্ধো নাপি ঘ্রাতা চ ন রসো নাপি রাসকঃ॥
ন স্পর্শো নাপি স্প্রষ্টা চ ন চিত্তং নাপি চৈত্তিকম্॥ হে বজ্র ; প্রথমকল্প পঞ্চম পটল

বরোপেত শূন্যতা', যাহা 'স্বভাবাভাবতঃ শূন্যং', যাহা গম্ভীরা ও উদারা, তাহাই সর্বশূন্য। এই শূন্যই 'অক্ষরং মহাসুখং'।

বস্তুতঃ কায়, বাক্, চিত্ত—এই তিনের সমবায়ে মানুষের সত্তাবোধ। সংসারের সঙ্গে যোগও এই তিনের মধ্যস্থতায়। যদি কেহ এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন যে, কায়শূন্য, বাক্শূন্য এবং চিত্তও শূন্য—তখনই সর্বশূন্যতায় প্রতিষ্ঠা। দেহস্থ নির্মাণ, সম্ভোগ, ধর্মকায়গুলি যথাক্রমে কায়-বাক্-চিত্তেরই প্রতীক। এগুলি পার হইয়া চতুর্থ শূন্য বা সর্বশূন্যতার স্তর। চর্যাসাধকেরা প্রথম তিন শূন্যকে নিম্নমানের বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'সুন বাহ'—৩৬—শূন্যতা বাধা। তথতা-জ্ঞান দ্বারা এই শূন্যতার বাধা অতিক্রম করিতে পারিলে সহজনিদ্রায় প্রতিষ্ঠা হয়। অথবা চতুর্থ শূন্যের সঙ্গে প্রথম তিন শূন্যের মিলন ঘটিলে, সহজ উদ্ভাসিত হয়। কোঙ্কণপাদ বলেন,

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সকলধাম উইআ তবেঁ॥—৪৪

শূন্যতার এই ক্রমিক স্তরগুলিকে কোন-কোন তন্ত্রে (কালচক্রতন্ত্র) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে। জাগ্রদবস্থার বিনষ্টিতে প্রথম শূন্যতায় প্রতিষ্ঠা, স্বপ্নাবস্থা ক্ষয়ে মন্ত্রাত্মক সম্ভোগকায়ে প্রতিষ্ঠা; উহা অতি-শূন্যতার স্তর। সুষুপ্ত অবস্থার বিমোক্ষে ধর্মকায়ে মহাশূন্যের অবস্থা। সে অবস্থায় নিত্যানিত্য বোধ থাকে না, সকল বিকল্পভাব বিনষ্ট হয় এবং তর্কাভাব দেখা দেয়। এই তর্কাভাব হইতে তুর্যাবস্থার ক্ষয়ে—'ইনি বুদ্ধ, ইহা বোধি'—এই প্রণিধান পর্যন্ত লুপ্ত হয়। ইহাই 'সর্বাকার বরোপেত শূন্যতা'—উহা এক নির্বিকল্প সর্বধর্ম-অনুপলম্ভের অবস্থা। তন্ত্রে ইহাকে বলা হইয়াছে 'বিশুদ্ধং তুর্যাবস্থাক্ষয়াদক্ষরং মহাসুখম্' (সেকোদ্দেশ টীকা)। ইহার অপর নাম 'সর্বধর্মাপ্রতিষ্ঠান মহাসুখ' (অপইঠান মহাসুহ—৩৪)

চর্যাটীকায় এই শূন্যতার বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা থাকিলেও, চর্যাকারেরা কবির মত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নানা রূপকের অন্তরালে এই শূন্যের আভাস দিয়াছেন। প্রথম দুই শূন্যকে তাঁহারা বলিয়াছেন—'চন্দ-সুজ্জ' (১৪), 'শূন-করুণা'—৩৪, 'বিন্দুনাদ' (বিন্দুনাদ)—৪৫ প্রভৃতি। চর্যাটীকা অনুসারে এগুলি প্রকৃতপক্ষে ভাব-অভাব, ভব-নির্বাণ ও গ্রাহ্য-গ্রাহক প্রভৃতির প্রতীক। চন্দ্র হইতেছে আলোকজ্ঞান বা গ্রাহক, আর সূর্য আলোকাভাস বা গ্রাহ্য। এই

দুয়ের শূন্যতাবোধে, তৃতীয় শূন্যতার উপলব্ধি। তৃতীয় শূন্যকে চর্যায় বলা হইয়াছে 'পুলিংদা' (১৪) বা 'নপুংসক'। চতুর্থ শূন্য জিনপুর (৭) বা মহাসুখপুর। চর্যাকারেরা কবিত্ব করিয়া উহাকে বলিয়াছেন 'গঅণন্ত' (শূন্যের শেষ সীমা —১৬) বা গগন সমুদ্র (৩৫), পারিমকুল—৩৪ এবং জোহ্নাবাড়ি (৫০)। চতুর্থ শূন্যের দ্যোতনাই চর্যাগানে অধিক। সাধকেরা এই শূন্যের জন্যই পাগল। এই শূন্যে পৌছিয়া সিদ্ধ সাধক দশদিক শূন্য দেখেন (৩৫), 'ত্রিভুবন যেন স্বপ্নের মত শূন্য (স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ—৩৬); কখনও বলেন, 'ণ জানমি অপা কঁহি গই পইঠা'—৩১, ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা—৪৯। এই অবস্থায় জ্যান্তে মরাতেও পার্থক্য নাই—'জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ' —২২,৪৯।

শূন্যবাদীদের দৃষ্টিতে পরমতত্ত্বই শুধু শূন্য নহে, এই যে পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ, তাহাও শূন্য। পরমতত্ত্ব সত্য, জগতও এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সে সত্য সংবৃত্তি সত্য বা ভ্রান্তি। মিথ্যা প্রতীতিবশে উহার উৎপত্তি বোধ হইতেছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাকে বলা হইয়াছে 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। প্রতীত্য-সমুৎপাদের ব্যাখ্যা হীনযানে ও মহাযানে ভিন্ন হইলেও, উহার মূলতত্ত্ব এক। অর্থাৎ বস্তু বা ধর্মমাত্রই অনিত্য (ক্ষণিক) এবং অনাত্ম (নিঃস্বভাব)। সবই পরমার্থতঃ অনুৎপন্ন। উৎপন্ন ভাব একটি প্রতীতি বা হেতু-প্রত্যয় বা ভ্রান্তির ফল। বৌদ্ধেরা 'নীরেন্দ্বাদি' দ্বাদশ দৃষ্টান্তদ্বারে এই সংবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৪১ সংখ্যক গানে ভুসুকুপাদ সর্বশূন্যতার প্রমাণ স্বরূপ সুন্দর ভাবে এই সংবৃত্তি-দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'আই এ অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই'—আদৌ অনুৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তিবশে প্রতিভাসিত হয়। জগৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তিবৎ। সে সর্প দংশন করে না। ওরে যোগি, হাত ময়লা করিও না, জগৎকে এই স্বভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর:—

মরু-মরীচি গন্ধব-নইরী দাপণ পড়িবিম্বু জইসা।
বাতাবত্তে সো দিঢ় ভইআ অপে পাথর জইসা।
বাংঝি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআ তেলে সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা॥

—যেমন মৃগতৃষ্ণা, গন্ধর্বনগরী, ও দর্পণে প্রতিবিম্ব; যেমন বায়ুর আবর্তে ঘনীভূত বৃষ্টি-শিলা (করকা)—তেমনই এই জগৎ। বন্ধ্যাসুত যেমন

বালুকাতেল মাখিয়া, আকাশকুসুমে সজ্জিত হইয়া, শশশৃঙ্গরূপ ধনুক লইয়া নানাবিধ খেলা খেলে, জগতের খেলাও সেইরূপ।[১]

চর্যাগীতিতে সর্বধর্ম-অপ্রতিষ্ঠান-শূন্যতার ('Want of substratam of knowledge'—Shastri) সঙ্গে এই মায়োপম শূন্যতাকেও স্বীকার করা হইয়াছে। এই দুই শূন্যতা যখন এক হয়, তখনই সর্বশূন্য মহাসুখে প্রতিষ্ঠা।

(৩) মহাসুখ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান

তাই বলিয়া চর্যাগীতির মহাসুখ সর্বাত্মক নাস্তিবাদ (Nihilism) নহে। সর্বাভাবের ভিতরেও এখানে একটি ভাবাত্মক অবস্থার স্বীকৃতি আছে। চর্যাকারেরা একথা বার বার বলিয়াছেন যে, মহাসুখের অবস্থায় মরণে-বাঁচনে কোন পার্থক্য থাকে না—'জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেষো'—২২, ৪৯। অর্থাৎ মহাসুখ বা সহজানন্দ জ্যান্তেমরার অবস্থা। জীবন আছে, কিন্তু তাহা মৃতবৎ—চিত্ত আছে, কিন্তু সে চিত্ত অচিত্ত, মন অ-মন। এইখানেই অ-ভাবের ভিতর ভাবের স্বীকৃতি। শ্রদ্ধেয় আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, বৌদ্ধ ধর্মের সর্বাত্মক নাস্তিবাদ ক্রমে ক্রমে ভাবের দিকে ঝুঁকিয়া ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া 'হিন্দু ব্রহ্মবাদে বা আত্মবাদে' গিয়া পৌঁছিয়াছিল ('বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি')। কথাটিকে ঘুরাইয়া অন্যরকম ভাবেও বলা যায় যে, ভাবে অভাব এবং অভাবে ভাব কল্পনা ভারতীয় দর্শনের একটি সাধারণ লক্ষণ। পরমতত্ত্বকে একদিকে অভাবও বলা যায়, আবার ভাবও বলা যায়। উহা যেন ভাবাভাবের একটি বিচিত্র অচিন্ত্য অবস্থা। বৌদ্ধধর্মের পরমার্থতত্ত্বও আগাগোড়া এই ভাবাভাবের দোলায় দোদুল্যমান। সহজ মহাসুখতত্ত্ব অভাব-পারিনিষ্ঠিত হইলেও ভাব-বিরহিত নহে। এমন কি মাধ্যমিক শূন্য-বাদও যে সম্পূর্ণ অভাবাত্মক নহে, ভাষ্যকার চন্দ্রকীর্তি তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন (মাধ্যমিক বৃত্তি ২৪.৭)।[২] তবে, ভাববাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা

১। বন্ধ্যা নারীর পুত্র-কল্পনা অলীক। এই পুত্রের বালুকাতেল, শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম লইয়া খেলাও অলীক। জগতের উৎপত্তি কল্পনাও তেমনই অলীক। প্রচলিত একটি শ্লোকেও মিথ্যা-ভ্রান্তিকে লইয়া এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়—

মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খ-পুষ্প কৃত শেখরঃ।
এষো বন্ধ্যাসুত যাতি শশশৃঙ্গ ধনুর্ধরঃ॥

২। 'ন পুনরভাব শব্দস্য যোঽর্থঃ স শূন্যতা শব্দস্যার্থঃ। অভাব শব্দার্থঞ্চ শূন্যতার্থম্ ইত্যধ্যারোপ্য ভবানস্মানুপালভতে।·· নিরবশেষ প্রপঞ্চোপশমার্থং শূন্যতোপদিশ্যতে।···অতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি স্বভাবায়াং শূন্যতায়াং কুতো নাস্তিত্বম্।—অভাব শব্দের যে অর্থ, শূন্যতার অর্থ সেরূপ নহে। অভাবের অর্থ শূন্যতায় আরোপ করিয়া আপনারা বৃথা আমাদিগকে দোষ দেন। শূন্যতা প্রপঞ্চোপশম; যাহা প্রপঞ্চ নাশ করে, তাহাতে নাস্তিত্ব কোথায়?

মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধু-প্রবর্তিত বিজ্ঞানবাদে। ডঃ প্রবোধ বাগচী সুন্দর কবিত্বময় ভাষায় বিজ্ঞানবাদের এই ভূমিকা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, "নাগার্জুনের শূন্যবাদ তার অধ্যাত্ম দৃষ্টির পটভূমিকা হতে যে আনন্দময় কল্পলোক অপসারিত করেছিল, সে এক মুহূর্তেই তা ফিরিয়ে পেল।' ('বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য')। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, ষড়ংশ সাধনে অবয়ব ও অবয়বীয় পরমাণুগুলির উপপত্তি হয় না সত্য, কিন্তু গ্রাহ্য-গ্রাহক বিনির্মুক্ত চিত্ত তখন থাকে। এই চিত্তই 'বিজ্ঞান'—ইহাই জগতের মাপক বা মাত্রা ('চিত্রমাত্রং জগৎসর্বং')। এই বিজ্ঞানকে বলা হয় আলয়বিজ্ঞান বা নিখিল বিজ্ঞানের ভাণ্ডার (Repository of Consciousness); পরিনিষ্পন্ন (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা), পরতন্ত্র বিজ্ঞান (অন্তরাভব বা মনোবিজ্ঞান) এবং পরিকল্পিত বা বিকল্প বিজ্ঞান (ইন্দ্রিয়ার্থ জগতের জ্ঞান)—এই আলয়বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়। এক বিজ্ঞানই অন্তর্মুখ (পরিনিষ্পন্ন) এবং বহির্মুখ (পরতন্ত্র ও পরিকল্পিত) বিজ্ঞানের আলয়। বিশুদ্ধ চিত্ত বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা। তাহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পারমার্থিক স্তরে এই সর্বব্যাপী চিত্ত শূন্য, নিরালম্ব, লক্ষণহীন ও অনির্দেশ্য ('চিত্তমেব ইদমনাকার স্বসংবেদনরূপং')। অতএব ভাবাত্মক বিজ্ঞানও শেষ পর্যন্ত যেন অভাবাত্মক শূন্যতার সহিত এক হইয়া যাইতেছে।[১] পার্থক্য এই যে, নিরালম্ব অনির্দেশ্য শূন্যতারূপ বিজ্ঞানের অস্তিত্ব আছে, তাহা গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত হইলেও সর্বব্যাপী। এই বিজ্ঞানের ভিতরেই মিথ্যাজ্ঞান (false ideation) সঞ্চিত রহিয়াছে—বহির্মুখ বিজ্ঞানে তাহার প্রকাশ। বস্তুতঃ কোন কিছুই 'ন চিত্তেষু বহির্ভূতাঃ'।

চর্যাগীতিতে আমরা যে শূন্যবাদের সাক্ষাৎ পাই, তাহা এই ভাবাত্মক শূন্যতা বা আলম্বনহীন অদ্বয় বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা। চর্যার কোন কোন স্থলে এমন উক্তি আছে, যাহাতে মনে হয়, চর্যাধরেরা যেন বিজ্ঞানবাদকে নস্যাৎ করিয়া দিতেছেন। যেমন ৩৯ সংখ্যক গানে সরহপাদ বলিতেছেন,

বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণানা ॥

—অদ্বয় জ্ঞান রূপিণী প্রজ্ঞাকে গৃহিণীরূপে গ্রহণ করায় তোমার 'বিজ্ঞান' বিনষ্ট হইল।

১. The highest truth (পরিনিষ্পন্ন), however of the yogacharins is Sunyata equated with Vijnaptimatrata, which is indiscribable, as it is deviod of all characteristics (Lakshana)—Dr. N. Datta (Cultural Heritage of India Vol I)

২৬ সংখ্যক গানে শান্তিপাদ তুলা ধুননের রূপকে বিজ্ঞানবাদীদের মতই ষড়ঙ্গ সাধনে পরমাণুর অনুপপত্তি তো প্রতিপন্ন করিয়াছেনই, উপরন্তু বিজ্ঞান-বাদীরা যে চিত্তের (অপণা) শাশ্বতত্বকে স্বীকার করেন, তাহাকেও বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, তুলা (কায়-বাক্-চিত্ত) ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ করিলাম, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া তাহা নিরবয়ব করিলাম। শেষ পর্যন্ত কোন রূপই তো পাওয়া গেল না। ('তথাচ অহেতুকত্বাৎ তস্য চিত্তস্য হেত্বন্তরং ন প্রাপ্যতে'—টীকা)। তাহা হইলে ভাবের অপ্রাপ্তিহেতু কি ভাবনা করা হইবে? অবয়ব শূন্যে বিলীন হইল, অবশেষে 'অপণা' অর্থাৎ চিত্ত অর্থাৎ বিজ্ঞানকেও ধ্বংস করিলাম।[১]

আচার্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতা পরিচ্ছেদেও ঠিক এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, অংশগুলি অণুভেদে এবং অণুগুলি আরও সূক্ষ্ম অংশভেদে ভাগ করিয়া দেখা গেল, তাহা শূন্যের মত নিরংশ; অতএব অণু নাই ('নাস্তি অণু'—৯.৮৭)। যাহা নিরংশ তাহার সংসর্গ (সৃষ্টি) কি ভাবে হয়? সংসর্গে নিরংশ আছে—এমন দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি? অতএব অমূর্ত বিজ্ঞানের সংসর্গ বা সৃষ্টিতে পরিণমন হয়, এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।[২]

অবশ্য শান্তিপাদ শান্তিদেবের মত শূন্যবাদের সমর্থক বলিয়াই বিজ্ঞানবাদের চিত্তাস্তিবাদকে 'তুলা ধুনিয়া' ছাড়িয়াছেন। তবু শূন্যতা-উপলব্ধির (স্ব-সংবেদনের) যে স্বরূপ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন—'সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলকৃখ লকৃখণ ন জাই' (১৫), তাহার সহিত বিজ্ঞানবাদী বসুবন্ধুর 'অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ' (ত্রিংশিকা ২৯)—এই উক্তির কোন পার্থক্য দেখা যায় না। শূন্যবাদীরা ভাবকে অভাবোদ্ভব বলেন, অভাব (শূন্যতা) তাঁহাদের মূলতত্ত্ব—আর বিজ্ঞানবাদীরা অভাবকে ভাবোদ্ভব (আলয় বিজ্ঞানোদ্ভব) বলিয়া মনে করেন ('উদধের্যথা তরঙ্গং'); ভাব (অস্তিবাদ) তাঁহাদের মূলতত্ত্ব।

---

১. বিজ্ঞানবাদে চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান একার্থক : 'চিত্তং মনোঽথ বিজ্ঞানমেকার্থম্'—বসুবন্ধু

২. অংশাপ্যণুভেদেন সোঽপ্যণুর্দিগ্বিভাগতঃ।
দিগ্বিভাগো নিরংশত্বাদাকাশং তেন নাস্ত্যণুঃ ॥...
নিরংশস্য চ সংসর্গং কথং নামোপপদ্যতে।
সংসর্গে চ নিরংশত্বং যদি দৃষ্টং নিদর্শয়।
বিজ্ঞানস্য ত্বমূর্তস্য সংসর্গো নৈব যুজ্যতে। বোধিচর্যাবতার ৯।৮৭,৯৬

একটিতে অস্তি নাস্তিতে লয় পাইতেছে, অপরটিতে নাস্তি অস্তিতে বিলীন হইতেছে। শেষ স্তরে দুইয়েরই লক্ষণ এক।

বস্তুতঃ সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনকেই অচিন্ত্য ভাবাভাববাদে সমীকৃত করা যায়। চর্যাগীতিরও মূল দর্শন—তাহা শূন্যবাদই হউক বা বিজ্ঞানবাদই হউক—এই অচিন্ত্য ভাবাভাববাদ। বিজ্ঞানের যে তিনটি স্তর বিকল্পিত, পরতন্ত্র (অন্তরাভব বিজ্ঞান) এবং পরিনিষ্পন্ন (নিরালম্ব বিজ্ঞান)—সবগুলিরই পরিচয় চর্যাগীতিতে আছে। বিশেষ এই যে, সহজিয়া বৌদ্ধগণ যেমন আনন্দ ও শূন্যতার চারিটি স্তর কল্পনা করেন, তেমনই বিজ্ঞানেরও চারিটি স্তর কল্পনা করিয়াছেন: তাঁহাদের মতে—দক্ষিণা ও বামা নাড়ীতে কিংবা নির্মাণচক্রে ও সম্ভোগচক্রে যে বিজ্ঞান, তাহা পরিকল্পিত; অবধূতিকা বা ধর্মকায়ে যে বিজ্ঞান, তাহা অন্তরাভব বিজ্ঞান এবং সহজকায়ের বিজ্ঞান বিশুদ্ধ নিরালম্ব বা পরিনিষ্পন্ন।

৪৬ সংখ্যক গানে 'অভিজ্ঞালাভী' জয়নন্দীপাদ চারি প্রকার বিজ্ঞানেরই আভাস দিয়াছেন। 'বেণিপাখে' অর্থাৎ দুই পক্ষে'—ললনা-রসনায় যে বিজ্ঞান, তাহা ছায়া-মায়া অর্থাৎ বিকল্পিত, তাহাতে ভবচক্রে আনাগোনা। বিষয়-প্রবেশের পূর্বে ('বিজ্ঞান-সংক্রমণ-কালে') যে বিজ্ঞান, তাহা 'অন্তরাভব বিজ্ঞান'। তাহা বিজ্ঞানের তৃতীয় অবস্থা। তাহা কায়-বিজ্ঞান বা আলয় বিজ্ঞানের স্বাপ্নিক স্তর। তখনও সংসারের সহিত চিত্তের প্রকৃত যোগ ঘটে না, অথচ আমি জন্মিতেছি, আমি মরিতেছি—আমি জন্মিব না, মরিব না—এইরূপ একটি 'আত্মস্নেহ' (মোহ) জন্মে। সে মোহ সত্য নহে, যেন স্বপ্নের প্রতিভাস, যেন দর্পণের প্রতিবিম্ব। জয়নন্দীপাদও বলেন, অন্তরাভব বিজ্ঞানের মোহ স্বপ্নে বা আদর্শে প্রতিভাসের মত,

> পেখই সুঅণে অদশ জইসা।
> অন্তরালে মোহ তইসা॥

মন যখন এই মোহ-বিমুক্ত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে 'অবনাগমণা' রুদ্ধ হয়। সে অবস্থায় চিত্ত অক্ষর, অক্ষয়, অবিনাশী—তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে প্লাবিত হয় না, শস্ত্রে ছিন্ন হয় না—'নৌ দাটই নৌ তিমই ন ছিজ্জই' ('অগ্নিনা ন দগ্ধো ভবতি জলে ন প্লাবনীয়ং ভবতি শস্ত্রেণ ছেত্তুং ন পার্যতে'—টীকা)। এই বিজ্ঞানই পরিনিষ্পন্ন সহজ বিজ্ঞান—সংক্রমণ বা পরিণমন বিহীন। সে বিজ্ঞানের উপলব্ধি সহজকায়ে।

৪২ সংখ্যক গানে 'জ্ঞানামৃত পরিতুষ্ট' কাহ্নপাদ এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপী সহজ চিত্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং তাহা যে অমর ও সর্বব্যাপী, তাহা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না'—সহজচিত্ত শূণ (void) এবং সংপুন্না (All perfect); সে চিত্ত সর্বব্যাপী—'ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই'। দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানবাদীর। সে চিত্তের বিনষ্টি নাই, তাহা হ্রাস-বৃদ্ধি হীন, অবিনাশী; সাগর হইতে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহা ভগ্ন হয়, কিন্তু তাহাতে সাগরের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই—'ভাগতরঙ্গ কি সোসঈ সাঅর'। তেমনই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পরিণামগুলি উদিত হয়, ধ্বংস হয়—তাহাতেও বিজ্ঞানের ক্ষতি হয় না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপী অক্ষর-চিত্ত যে আছে, তাহা মূঢ়জনের চোখে পড়ে না। কবির মত দৃষ্টান্ত দিয়া কাহ্নপাদ বলেন,

মূঢ় অচ্ছন্তে ণ পেখই।
দুধ মাঝে লড় ণচ্ছন্তে দেখই॥

চর্যাগীতির শূন্যবাদ এই অস্তিত্বময় বিজ্ঞানবাদ। উহা গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত ও নিরালম্ব হইলেও সৎ অর্থাৎ আস্তত্ব সম্পন্ন ('অথবা সর্বাত্মকঃ সৈবাথবা সর্ববিবর্জিতঃ'—হেবজ্র ১।১০।১৭)। আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, পরমার্থ সহজ বিজ্ঞান যে অচিন্ত্য, ভাবাভাবের এক বিচিত্র সন্ধি, সর্বব্যাপী ও দুর্লক্ষ্য, তাহা আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন,

লুই ভণই বট দুলকৃখ বিণাণা।
তিএ ধাএ বিলসই উহ ণ জানা॥—২৯

তিনি বলেন, উহাতে ভাব হয় না, অভাবও যায় না: উহা আছে, এমনও বলা যায় না—নাই, তাহাও বলা চলে না; এ এক অদ্ভুত সত্য-মিথ্যার প্রতীতি—'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' সহজ মহাসুখ এই ধরনের এক অচিন্ত্য নিরালম্ব বিজ্ঞান—স্থূল অনুভবের অতীত। কবি বিহারীলাল যেমন বলেন, 'বিশ্ব গেছে কান্তি আছে অনুভবে আসে না'— বিজ্ঞান-ঘন নিরালম্ব শূন্য সহজানন্দও সেইরূপ—মূঢ়জনের প্রত্যয়ের অতীত। সহজ মহাসুখ সর্বশূন্যতা ও অস্তিত্বময় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের একটি মিলিত রূপ।

(৪) মহাসুখঃ অদ্বয়, তথতা, সমরস

অদ্বয়ঃ—সহজ মহাসুখের সহিত 'অদ্বয়', 'তথতা' এবং 'সমরস' প্রভৃতি তত্ত্ব অবিনাভাবে যুক্ত। চর্যাধরগণ সহজ মহাসুখ অর্জনের ব্যাপারে অদ্বয়

বোধ এবং তথতাকে বলিয়াছেন মোহ নাশের খড়্গস্বরূপ। চাটিলপাদ বলেন, মোহতরু ফাড়িবার টাঙ্গী অদ্বয় (আদঅ টাঙ্গী—৫)। কাহ্নপাদ বলেন, 'তথতা' হইতেছে কুঠার ('তথতা পহারী'—৩৬), উহা দ্বারা মোহভাণ্ডার নিঃশেষে বিনষ্ট করিলাম। ভুসুকুপাদ 'অদ্বয়' বোধকে বঙ্গালের সঙ্গে উপমিত করিয়া বলিয়াছেন—'অদয় বঙ্গালে দেশ লুড়িউ'—৪৯ (দেশ = দ্বেষ = ক্লেশ)।

বস্তুতঃ অদ্বয় বা তথতা মোহকে বিনষ্ট করে, আবার সহজ মহাসুখের স্তরে চিত্ত এই অদ্বয় বা তথতা বোধে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। সহজ মহাসুখ এক বা অদ্বয় অনুভবেরই অবস্থা। সেখানে গ্রাহ্য থাকে না, গ্রাহক থাকে না—জ্ঞেয় থাকে না, জ্ঞাতা থাকে না—থাকে শুধু এক অচিন্ত্য অদ্বৈত বোধ। শান্তিপাদ বলেন, আপনা (আত্মবোধ) যখন চূর্ণ হয়, তখন বহুত্ব ও দ্বয়াকার বোধ আর থাকে না—'বহল বাট দুই আর ন দিশঅ'—২৬। যতক্ষণ মোহ, ততক্ষণ বহুত্বের বোধ, দ্বৈতের বোধ। অদ্বয় জ্ঞানে এগুলির বিনষ্টি।

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে 'নির্বাণ'-এর সঠিক অবস্থা যে কি, তাহা অনাখ্যাত। সেখানে অদ্বৈতবাদ স্বীকৃতও হয় নাই, অস্বীকৃতও হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে অদ্বৈতবাদের স্বীকৃতি আছে। অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাবেই এই ধরনের বিবর্তন সম্ভব হইয়াছে—ইহাই পণ্ডিতগণের মত। শূন্যবাদীরা বলেন, শূন্যতায় দুইয়ের স্থান নাই, উহা 'অদ্বৈধীকার'—বিজ্ঞানবাদীরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন, 'দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে'। বজ্রযানের শূন্যতা-বিজ্ঞানরূপী বজ্রও এক এবং অদ্বৈত। সহজমতে সহজ 'নানাত্ববর্জিত,' 'একাকার' এবং সর্বব্যাপী। ২২ নং চর্যাটীকায় 'অদ্বয়সিদ্ধির' একটি বচন উদাহৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, যাহার স্বভাবে উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, যাহা সর্ব সঙ্কল্প বর্জিত—'তদ্‌জ্ঞানমদ্বয়ন্নাম।'[1] অদ্বয়ে যাবতীয় দ্বৈত বোধ—ভাব-অভাব, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, ভব-নির্বাণ—সব একাকার। অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা যেমন বলেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', সহজ-তন্ত্রও তেমনই বলে—

'এক স্বভাবোঽসৌ মহাসুখং শশ্বৎপরম্' (হেবজ্র)

চর্যাগানেও এই অদ্বয় জ্ঞানের জয়ঘোষ। পূর্বেই বলা হইয়াছে। চর্যায় অদ্বয় জ্ঞান হইতেছে মোহ বিনাশের অস্ত্র, যেন সদা উদ্যত খড়্গ (আদঅ টাঙ্গী)। বিরমানন্দের মার্গই অদ্বয় জ্ঞানের মার্গ (চর্যাটীকা ২৬)। শুধু তাহাই

১. যস্য স্বভাবো নোৎপত্তিবিনাশো নৈব দৃশ্যতে।
তদ্‌জ্ঞানমদ্বয়ন্নাম সর্বসঙ্কল্প বর্জিতম্।।—২২ নং চর্যাটীকায় উদ্ধৃত

নহে, মোহ ধ্বংসেও অদ্বয় বোধেই চিত্তের বিশ্রাম। উপায় ও উপেয় দুইই অদ্বয়। কাহ্নপাদ যখন 'বিমন' হইলেন, তখন দেখিলেন,

'তে তিনি তে তিনি তিনি অভিন্না'

অর্থাৎ বাহ্যে স্বর্গমর্ত্যরসাতল, অধ্যাত্মে কায়বাক্‌চিত্ত, দিবারাত্রিসন্ধ্যা—সবই অভিন্ন (দ্রষ্টব্য চর্যা টীকা ৭)। ভুসুকুপাদ বলেন, যেমন, জলে জল প্রবেশ করিলে আর ভেদ থাকে না, সহজ মহাতরু যখন প্রস্ফুরিত হয়, তখন মনরত্নও তেমনই খ-সম স্বভাবে বিলীন হইয়া যায় (৪৩)। এই কথাটিই আরও সুন্দর করিয়া কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন আর্যদেবপাদ,

চান্দের চন্দ কান্তি জিম পড়িভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসঅ ॥—৩১

চন্দ্র অস্তগত হইলে চন্দ্রিকা (চাঁদের আলো) যেমন চন্দ্রেই প্রবিষ্ট হয়, চিত্ত যখন অচিত্ত হয় অর্থাৎ প্রভাস্বরে প্রবেশ করে, তখন তাহার বিকল্পাবলীও তাহাতে বিলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ সহজে সর্বপ্রকার বিকল্প একাকার হইয়া যায়। দ্বৈতের এই আত্যন্তিক অবরোধই অদ্বয় মহাসুখ।

তথতাঃ—অদ্বয় জ্ঞানের সঙ্গে 'তথতা' শব্দটিও বিচার্য। চর্যায় 'তথতা'ও মোহভাণ্ডারের প্রহারক। সমস্ত বিশুদ্ধির মূল 'তথতা'—'সর্বেষাং খলু বস্তূনাং বিশুদ্ধিস্তথতা মতা' (হেবজ্র)।

'তথতা' বলিতে বুঝায় সমস্বভাব বা তৎস্বভাব ('Sameness or That-ness)। প্রাচীন পালি সাহিত্যে 'তথা, অবিতথ, অনঞ্ঞথা (অনঞ্‌ঞথা) শব্দগুলি এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (পটিসম্ভিদা পালি)। অর্থাৎ 'তথা' মানে এমন একটি সত্য, যাহার অন্যথা হয় না। এই অর্থেই 'তথাগত' হইতেছেন সত্যস্বভাব বা অবিতথ জ্ঞানসম্পন্ন। তথতা শব্দটি তথা-শব্দ সম্ভব। উহারও অর্থ বস্তুর একটি নিত্য স্বভাব, যাহা অবিতথ। মহাযান বৌদ্ধধর্মে 'তথতা'র এই মূল অর্থ আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে। 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপার-মিতা'য় শূন্যতার লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, 'নির্বাণমিতি ধর্মধাতুরিতি তথতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে', অর্থাৎ শূন্যতারই অপর নাম নির্বাণ, ধর্মধাতু ও তথতা। 'তথতা' হইতেছে এমন একটি নিত্য অবস্থা, যাহা অকৃত (uncreated), অপরিবর্তিত এবং যাহা সর্বদা ও সর্বত্র সমান।[১]

১. "Suchness is without any trace of positivity and negativity, as being one, not different, inextinguishable, unaffected, non-dual, without cause for duality." Translation. Astasaharika.E. Conz.

আচার্য অশ্বঘোষ এই তথতাবাদকে একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র'। গ্রন্থটির মূল পাওয়া যায় নাই। Dr. Suzuki চৈনিক অনুবাদ হইতে 'Awakening of Faith' নাম দিয়া ইহার ইংরাজী করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, 'তথতা' চিরন্তন ও নির্বিকার—ইহা সকল ভূতের আশ্রয়, তাই নাম 'ভূত-তথতা'। সৃষ্টির সমস্ত বস্তু, সকল ধর্ম এই তথতা-স্বভাব অর্থাৎ সমস্বভাব।[১]

অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যেও তথতার কথা আছে। রূপাসক্ত নন্দের মোহভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ তথতার স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ধর্মধাতু বা তথতা হইতে কিছু বাদ দেওয়া যায় না, তাহাতে কিছু প্রক্ষেপও করা যায় না। এই ভাবেই বস্তুর যথার্থ রূপ বুঝিতে হইবে।[২]

সকল বস্তুই যে তথতা স্বভাব—এই সমজ্ঞানকেই তন্ত্রে বস্তুশুদ্ধি, নাড়িশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির হেতুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'সর্বং বুদ্ধময়ং জগৎ'—এই জ্ঞানই তথতা জ্ঞান বা সমতাজ্ঞান ('সমতথতা'—চর্যাটীকা)। এইজ্ঞানে ষাড়িন্দ্রিয়, পঞ্চস্কন্ধ, ষড়ায়তন, পঞ্চভূত—সবই 'স্বভাবেন শুদ্ধ'। চর্যাসাধকেরাও সমতাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বলিয়াছেন, ষড়্‌গতি স্বভাবে শুদ্ধ, ভাবাভাব বিন্দুমাত্র অশুদ্ধ নহে :—

ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন অছুধ ॥—৯

চর্যাসাধকেরা আরও বলিয়াছেন, সংসারের ভেদবুদ্ধি ও সাকার-নিরাকারের তর্ক, বালযোগীদের কোলাহল। কঙ্কণপাদ বলেন, তথতানাদে সকল বিকল্পজ্ঞান ও কোলাহল ধ্বংস করিলাম—'সর্ব বিচুরিল তথতানাদেঁ'—৩৪

বিষয়-বিশুদ্ধিরূপ তথতাই স্বসংবেদ্য পরম সুখ। জয়নন্দীপাদ তথতাকে ('ভাবাভাবয়োরৈক্যং') 'প্রজ্ঞাপারমিতার্থ মহারস' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই তথতাস্বভাবে শোধিত হইলে, চিত্ত আর অন্যরূপ হয় না—

চিঅ তথতা স্বভাবে ষোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ন হোই ॥—৪৬

---

১. 'All Things in their fundamental aspect possesses absolute Sameness They are nothing but one soul'—Dr. Suzuki.

২. নাপনেয়ং যতঃ কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ্যং নাপি কিঞ্চন।
দ্রষ্টব্যং ভূততোভূতং যাদৃশঞ্চ যথা চ যৎ ॥ সৌন্দরনন্দ, ১৩।৪৪.

(কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এই উক্তিটির প্রতিধ্বনি মাধ্যমিক শাস্ত্রে ও তন্ত্রেও পাওয়া যায়)

ভুসুকুপাদ আরও কবিত্বময় ভাষায় বলেন, চন্দ্র দ্বারা যেমন গগন উদ্ভাসিত হয়, বিষয়বিশুদ্ধি দ্বারা (তথতা) আমি তেমনই সহজানন্দের উদ্ভাস বুঝিয়াছি :

বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ:জিম উজোলি চান্দে ।।—৩০

তথতা শুধু উপায় নহে, উপেয়। যে সমতাজ্ঞান মহাসুখ বা সহজে প্রতিষ্ঠার উপায়—সহজানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধক সেই সমতাকেই প্রকাশ করেন। কাহ্নপাদের চিত্তগজেন্দ্র 'সহজনলিনীবনে' প্রবিষ্ট হইয়া নিবৃত্ত হইল, তখন তিনি তথতা-মদজল বর্ষণ করিতে লাগিলেন : 'তথতা মঅগল বরিসঅ'। মুনিদত্তও বলেন, 'তথতা বিশুদ্ধো হি যঃ স তথাপরং ভবতি।' (টীকা ৪৬)

সমরস : মহাসুখবাদে অদ্বয়বোধ এবং তথতা জ্ঞানের সঙ্গে 'সমরস'-তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ডাকার্ণব তন্ত্রে সমরসকে বলা হইয়াছে 'একো ভাবরসাস্বাদঃ'। ডঃ দাশগুপ্ত ইহাকে বলিয়াছেন, 'The sameness or oneness of emotion.'[১] হেবজ্রতন্ত্র বলিতেছেন, 'সম' শব্দের অর্থ তুল্য, তাহার চক্র (মণ্ডল) 'রস' নামে অভিহিত ; অতএব সমরস বলিতে বোঝায় 'একভাব' —'সমরসং ত্বেকভাবং'।[২] সেখানে আরও বলা হইয়াছে, তত্ত্বভাবনায় হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট—এগুলিকে সমান ভাবনা করা হয় ('সর্বান্যেতানি সমানীতি')। অতএব সমরসের মূলতত্ত্বটি হইল একতাজ্ঞান। অদ্বয় বা তথতাজ্ঞানের সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। সহজ মহাসুখের স্তরে ভাব-অভাব, ভব-নির্বাণ পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ভোজ্য-অভোজ্য সমান—সমান স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা—সমান ঘৃণা-লজ্জা-ভয়। ভাল-মন্দ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ—সমরসে এক হইয়া যায়। সামাজিক প্রচলিত মূল্যবোধও সেখানে নিশ্চিহ্ন।

অবশ্য এই সমতাজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যান-ভেদে স্বতন্ত্র। প্রাচীন বৌদ্ধগণ নির্বাণ-ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া একপ্রকার সমতাজ্ঞান লাভ করিতেন। শূন্যবাদীরা সবই শূন্যময় দেখিয়া রাগ-বিরাগ, ভাবাভাবকে এক মনে করিতেন। তাঁহাদের

---

১. In a deeper sense Samarasa is the realisation of the oneness of the universe amidst all its diversities,—it is the realisation of one truth as the one emotion or the all prevading bliss.—Introduction to Tantric Buddhism. Dr. S. B. Dasgupta.

২. সমং তুল্যমিতি প্রোক্তং তস্য চক্রো রসঃ স্মৃতঃ ।
সমরসং ত্বেকভাবং এতেনার্থেন ভণ্যতে ।।—হেবজ্র. ১ম কল্প. ৮ম পটল, ৪০.

ষ্টিতে ভব শূন্য, নির্বাণ শূন্য—অতএব ভবই নির্বাণ ('The world of existence and Nirvana are identical')। বিজ্ঞানবাদীরা মনে করেন, পরিনিষ্পন্ন জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও বিষয়বিজ্ঞান এক বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন অবস্থা ; সংসারও বিজ্ঞানের পরিণাম—'উদধের্যথা তরঙ্গাঃ'—অতএব সংসার ও বিজ্ঞান এক। পার্থক্য এই যে, সংসার কার্যকারণের অধীন ও গ্রাহ্য-গ্রাহক আলম্বন যুক্ত—আর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিরালম্ব, গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত। বজ্রযানে বা সহজযানে শূন্য-দৃষ্টি ও বিজ্ঞানদৃষ্টির সমন্বয়। তাঁহারা বলেন, 'অনুৎপন্নেষু ধর্মেষু ন ভাবো ন চ ভাবনা' (গুহ্যসমাজতন্ত্র); তত্ত্বদৃষ্টিতে সকল বস্তুই প্রকৃতিপ্রভাস্বর—প্রকৃতিপ্রভাস্বরা ধর্মাঃ সুবিশুদ্ধা নভঃসমাঃ' (গুহ্যসমাজতন্ত্র)। অতএব ভব-নির্বাণ, সুখ-দুঃখ সবই সমরস, সবই এক।

চর্যাগীতিতে সমরসের এই তাৎপর্যই গৃহীত হইয়াছে। ১৭ সংখ্যক গানে বীণাপাদ বলিতেছেন, গজবরকে (চিত্তকে) যখন আলি-কালি সারি শুনানো হইল, তখন সমরসে তাহার সন্ধি-দোষ দূরীভূত হইল। অর্থাৎ যখন অ-কার সর্ববর্ণের সার অর্থাৎ শূন্য—এই গান শুনানো হইল, তখনই সমরসে চিত্ত ভরপুর হইল এবং বত্রিশতন্ত্রী শূন্যতা ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। ৪৩ সংখ্যক গানে ভুসুকুপাদ এই সমরসের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করিয়াছেন: সমরস যেন জলে জলের মিলন। বাহিরের জল যেমন অন্তর-নীরে প্রবেশ করিলে আর ভেদ থাকে না, তেমনই চিত্ত 'গগনে' (শূন্যে) প্রবিষ্ট হইলে সমরসীভূত হয়—

জিম জলে পানিআ টলিআ ভেড ন জায়।
তিম মণরঅণা সমরসে গঅণ সমাঅ ॥—৪৩

কাজেই দেখা যাইতেছে, সহজ মহাসুখে আসিয়া মিলিত হইয়াছে সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনের মূল তত্ত্ব। প্রাচীন বৌদ্ধের নির্বাণ-ধারণা, অশ্বঘোষের তথতাবাদ, মাধ্যমিক দর্শনের শূন্যতা এবং বিজ্ঞানবাদের বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা এবং অদ্বয়, তথতা ও সমরস—সবকিছু দ্বারা সহজ মহাসুখ অধিবাসিত। আর অচিন্ত্য ভাবাভাব-বাদে সমগ্র বৌদ্ধ দর্শন সমীকৃত। চর্যার মহাসুখবাদ অচিন্ত্য ভাবাভাব বাদ।

(৫) মহাসুখ 'বাক্‌পথাতীত'

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, গভীর অনুভব মাত্রই অনির্বচনীয়। গভীর শোক নীরব, অতিশয় আনন্দ বাক্যহীন। মৌনই গভীর অনুভূতির শ্রেষ্ঠ-ভাষা, কখনও বা সঙ্কেত। সঙ্কেতে-ইঙ্গিতে, একটু হাসির ঝলকে বা একবিন্দু চোখের জলে ভিতরের অনুভব বাহিরে প্রকাশিত হয়।

অধ্যাত্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে অনুভব সত্যই অনির্বচনীয়। যে অনুভবের বিষয়বস্তু 'অবাঙ্‌মনসোগোচর', সে অনুভবের গভীরতা ও বিস্তৃতির ধারণা স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত। যে দেহ, বাক্য ও মন লইয়া মানুষের ভাব বিনিময়, অধ্যাত্ম অনুভবের স্তরে সেগুলি সৎসুখে মূর্চ্ছিত। তখন কে কাহাকে প্রকাশ করে? করে না জন্যই, সে অনুভবের ক্ষেত্রে দেহ নিস্পন্দ, মন আপনহারা, বাক্য নিস্তব্ধ। তখন দেহ-বাক্য-মন নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত শান্ত।

কথিত আছে, চিকিৎসক জীবক রাজা অজাতশত্রুকে এক রমণীয় জ্যোৎস্না রাত্রিতে শান্তির প্রকৃত রূপ দেখাইবার নিমিত্ত সার্ধ দ্বাদশশত শ্রমণবেষ্টিত বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া যাইতেছিলেন। আম্রকাননের সন্নিহিত হইয়া অজাতশত্রু চিৎকার করিয়া উঠিলেন, জীবক তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? যেখানে সাড়ে বার শত ভিক্ষু, সেখানে কোন শব্দ নাই—না হাঁচির, না কাশির শব্দ! তুমি তো আমাকে প্রতারণা করিতেছ না? জীবক মহারাজকে অভয় দিয়া সেই আম্রকাননে লইয়া গেলেন। রাজা বুদ্ধদেবের ভিতর দেখিলেন শান্তির এক উদার মহনীয় রূপ (দীঘনিকায় : শ্রামণ্য ফলসূত্র)। অধ্যাত্ম-অনুভবে সত্তার এমনই প্রশান্তি, সেখানে ভাষা ভাষাহীন। গভীর অনুভূতির স্থান 'ভাষার অতীত তীরে'।

চর্যাগীতির সিদ্ধ সাধকেরা বার বার করিয়া বলিয়াছেন, সহজ মহাসুখ 'বাক্‌পথাতীত'। তাড়কপাদ বলেন, 'অনুভব সহজ মা বোল রে জোই'—ওরে যোগি, সহজের অনুভবের কথা বলিও না (৩৭)। (কাহ্নপাদ বলেন, 'ভণ কইসে সহজ বোলবা জায়'—বল, কেমন করিয়া সহজকে বলা যায় (৪০)?—অর্থাৎ সহজানন্দ 'অনুত্তর' (যার-পর-নাই) বলিয়াই নিরুত্তর বা অনির্বচনীয়।

স্বরূপতঃ সহজানন্দের কোন রূপ নাই। যেখানে ভাব নাই, অভাব নাই—তাহার অস্তিত্বে কে প্রত্যয় করিবে? মানুষ ভাবকে বোঝে, ভাবের সম্পর্কে অ-ভাবকেও বুঝিতে পারে। চন্দ্র, সূর্য, আলোক মানুষের বোধগম্য, কারণ এগুলি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য। আবার ইহাদের অ-ভাব যে অন্ধকার, তাহাও আমাদের ধারণার বস্তু। কিন্তু আলো-অন্ধকারের অতীত যে তত্ত্ব, তাহাকে কিরূপে ধারণা করা যায়? তীর্থিক বা বালযোগী বা বহিরঙ্গ জন তাহার থাই পায় না। বহিরঙ্গ জনের দেহ, বাক্য ও মনের কারবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে লইয়া। সে দেহ, সে বাক্য ও সে মন 'সহজে'

প্রবেশাধিকার পায় না—'পৃথগ্‌জনানাং কাঅবাকৃচিত্তং যস্মিন্‌ সহজে নাস্তর্ভবতি' —টীকা ৪০। তাই কাহ্নপাদ বলেন, 'ভণ কইসে সহজ বোলবা জাঅ।'

তাহা ছাড়া মনোগোচর গ্রন্থাদি স্থূল মনোগোচর বস্তুকেই প্রকাশ করিতে পারে। আগম-পুথি মনোগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অতএব বেদাগম সঙ্কল্প-বিকল্পজালাত্মক (আলাজালা—৪০) বস্তুকে প্রকাশ করে। কিন্তু সহজানন্দ সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পের অতীত—তাহা একাধারে সর্বশূন্য ও গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত। কাজেই বেদাগম তাহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে ?) লুইপাদ বলেন,

জাহের বানচিহ্নরূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥—২৯

সাধক কবি কাহ্ন বলেন, 'বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস' (৪০); তাড়ক-পাদ বলেন, 'বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখাণী' (৩৭)।

সহজানন্দকে প্রকাশ করা যায় না কেন ? এইখানেই আসে অনুভবের প্রশ্ন। অনুভবার্থকে প্রকাশ করা যায় না। বহিরঙ্গ জন তাহার মর্ম বুঝিতে পারে না। অন্তরঙ্গ জন সহানুভূতি বশে খানিকটা বুঝিতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণটা নহে। সাধক কবিরা বার বার বলিয়াছেন, সহজানন্দ 'স্বসংবেদ্য'। নিজেই নিজেকে অনুভব করার নাম স্বসংবেদন (সঅসংবেঅণ)। তাঁহারা বলেন, 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅ মণ'—৩২

স্ব-সংবেদন লক্ষণহীন বলিয়াই 'বাহ্যভীত'—বাহিরে প্রকাশিত হইতে ভীত —'বাহ্যভীতং স্বসংবেদ্য লক্ষণযুক্তং ধর্মং কথং লোকে বচনদ্বারে প্রকাশয়িতব্যং'— —টীকা ৩৭। সত্যই তাহা বচনদ্বারে লোকজগতে অপ্রকাশ্য। সে অবস্থায় চৈতন্য নিরালম্ব, মূর্ছিত। (তাই কাহ্নপাদ বলেন, জিনরত্নের (যাহা নিরন্তর রতিসুখ অনুভব করিতেছে) প্রকাশ—কালার মূককে প্রবোধনের মত—'কালে বোব সংবোহিঅ জইসা।—(৪০)।' সহজ সুখ 'বাক্‌পথাতীত'।)

বোধিচিত্ত মহাসুখরাজ

(চিত্ত-তত্ত্ব)

এতক্ষণ মহাসুখের যে লক্ষণ ও স্বরূপ বিচার করা হইল, তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত চিত্ত-তত্ত্ব। বোধিচিত্ত ও সুখ একার্থক। সুখ যেমন শূন্যতা-করুণার যুগনদ্ধ ফল, চিত্তও তেমনই শূন্যতা ও করুণার অভেদ মিলনের ফল। সুখের যেমন দুইটি রূপ—'ক'-সুখ ও 'খ'-সুখ, চিত্তেরও তেমনই দুইটি রূপ—সংবৃত্তি ও

সহজ। নিরন্তর রতিযুক্ত নির্বিকল্প মহাসুখে মগ্ন চিত্তই সহজ চিত্ত। টীকায় উহাকেই বলা হইয়াছে 'মহাসুখরত্ন' (৪৯) এবং 'মহাসুখরাজ' (টীকা ২)।

বৌদ্ধধর্মে চিত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। ধম্মপদের চিত্তবর্গে চিত্তকে বলা হইয়াছে—সুদুর্দর্শ, সুনিপুণ ও কামের লীলাভূমি ('সুদুদ্দসং সুনিপুণং যথ কামনিপাতিনং'—ধম্ম. ৩৬); উহা দূরগামী, একাকী বিচরণশীল, অশরীরী ও গুহাহিত ('দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং'—ধম্ম. ৩৭)। স্পন্দনশীল চপল চিত্ত অরক্ষণীয় ও দুর্নিবার ('ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারয়ং')। এই চিত্ত প্রমত্ত কুঞ্জরের মত। যিনি অঙ্কুশ দ্বারা এই চিত্তকে সংযত করেন, তিনিই শান্ত ও দান্ত। সংযত চিত্ত সুখাবহ—'চিত্তং দন্তং সুখাবহং'—ধম্ম. ৩৫।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে চিত্তের ভূমিকা আরও গুরুতর। সমগ্র মহাযান মতে—সৃষ্টি চিত্তের বিক্রিয়া—'চিত্তমাত্রং জগৎ সর্বং'।[১] অবিদ্যা-চালিত চিত্তই চৈতসিক (চিত্তধর্ম) সৃষ্টির মূল। শূন্যবাদীরা বলেন, পরমার্থতঃ জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—সৃষ্টি নাই, ধ্বংস নাই—ভব নাই, নির্বাণ নাই—নিরোধ নাই, উৎপাদ নাই, শাশ্বত নাই, উচ্ছেদ নাই—একার্থ বলিয়া কিছু নাই, নানার্থ বলিয়াও কিছু নাই—আগম নাই, নির্গমও নাই।[২] কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সৃষ্টিও আছে, ধ্বংসও আছে—আগমও আছে, নির্গমও আছে—উৎপাদও আছে, ভঙ্গও আছে—একও আছে, নানাও আছে। তবে এই 'আছে' গুলি অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ চিত্তের ভ্রান্তি। তাই শূন্যবাদীরা দুইটি সত্যকে স্বীকার করিয়া লইলেন, সংবৃত্তি সত্য (আরোপিত সত্য) এবং পরমার্থ সত্য।

পারমার্থিক সত্য চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত সর্বশূন্য, স্বচ্ছ, নির্মল, নভঃসম ; আর সংবৃত সত্য মিথ্যা মায়া। স্বচ্ছ নদীজল হইতে যেমন মাছ লাফাইয়া উঠে, তেমনই স্বচ্ছ সর্বশূন্যতা হইতে মায়াজাল অবতীর্ণ হয়।[৩] এই ভ্রান্ত মায়া-জালের নিমিত্তকারণ অবিদ্যা, উপাদানকারণ সংবৃত্তি চিত্ত। অতএব চিত্তেরও দুইটি রূপ। পরমার্থ চিত্তই প্রকৃত সত্য, তাহা সর্বশূন্য, অনুৎপন্ন। তখন তাহা

---

১. In the Mahayana the doctrine of Mind-only figures largely. All is mind and the stuff of the world is mind-stuff. Buddhism. C. Humphreys.

২. অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্।
অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্ ॥—মাধ্যমিক কারিকার বন্দনাশ্লোক।

৩. যথা নদীজলাৎ স্বচ্ছাৎ মীন উৎপতন্তি দ্রুতম্।
সর্বশূন্যাত্তথা স্বচ্ছাৎ মায়াজালমুদীর্যতে ॥ (৪২নং চর্যাটীকায় উদ্ধৃত আগম বচন)

চিত্তই নহে, অচিত্ত ; আর সংবৃত্তি চিত্ত মিথ্যা, তৎসৃষ্ট চৈতসিক সংসারও মিথ্যা। পরমার্থতঃ চিত্ত অস্তিত্বহীন।

বিজ্ঞানবাদীরা বলিলেন, পরমার্থতঃ চিত্ত শূন্য বটে, কিন্তু অস্তিত্বহীন নহে। বিজ্ঞানবাদের মূলে রহিয়াছে আচার্য অশ্বঘোষ-প্রচারিত 'তথতাবাদ'। তথতাবাদে ধর্ম বা বস্তুর এমন একটি শাশ্বত রূপকে স্বীকার করা হইয়াছে, যাহা নিত্য, অকৃত (uncreated) ও অপরিবর্তিত। ইহাকে বলা হইয়াছে ধর্মধাতু বা ভূততথতা। নিখিল সংসার ভূততথতার পরিণাম। অর্থাৎ অশ্বঘোষের মতে চিত্তের দুইটি দ্বার, একটি দ্বারে চিত্ত ধর্মধাতু—তাহা অদ্বয়, অকৃত্রিম ও নিত্য—অপর দ্বারে এই চিত্তেই কৃত্রিম দ্বৈত সৃষ্টির লীলা।[১] বিজ্ঞানবাদীরাও চিত্তের একটি শাশ্বত 'অভূত পরিকল্প' অবস্থায় বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান ও চিত্ত অভিন্ন। ইহার তিনটি রূপ—পরিনিষ্পন্ন, পরতন্ত্র ও পরিকল্পিত। পরিনিষ্পন্ন চিত্ত দ্বৈত বর্জিত, শূন্য, অখণ্ড ও পূর্ণ ; উহা নিখিল সংস্কারের কোষাগার এবং পরমার্থতঃ অনুৎপন্ন। পরতন্ত্রবিজ্ঞান হেতুপ্রত্যয় যুক্ত হইলেও সৃষ্টিতে অপ্রকাশিত, এ যেন নির্বিকল্প চিত্তের স্বপ্নাবস্থা। ইহাকে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন 'অন্তরাভব বিজ্ঞান'। আর পরিকল্পিত চিত্ত বাস্তব বিকল্পের অধীন।

বজ্রযানে চিত্ত শূন্যতা ও বিজ্ঞানের যুক্তবেণী। কিন্তু ইহার প্রকৃতি পৃথক, অর্থ-ব্যঞ্জনাও স্বতন্ত্র। তন্ত্রমতে বোধিচিত্ত অভেদে মিলিত শূন্যতা ও করুণার যোগফল—'শূন্যতা করুণাভিন্নং বোধিচিত্তমিতি স্মৃতম্' (হেবজ্র. ১০. ৪২)। এখানে শূন্যতা স্ত্রীরূপিণী প্রজ্ঞা এবং করুণা পুরুষরূপী উপায়। এই ভূমিকায় চিত্ত স্ত্রী-পুং-যোগের ফল শুক্র হইতে অভিন্ন ; শুক্রই চিত্ত। কাহ্নপাদ তাঁহার দোহায় সাংবৃত চিত্তকে বলিয়াছেন, 'বোহিচিঅ রজভূষিঅ'। মেখলাটীকাকার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 'বোধিচিত্তং সাংবৃতস্পন্দরূপং শুক্রং রজোভূষিতং'—ইহা দেহপদ্মের সুখস্বভাব বীজ। সংবৃত রূপে ইহা পঞ্চবুদ্ধাত্মক হইয়া পার্থিব ক্রীড়ারস অনুভব করে, অপরদিকে প্রভাস্বর রূপে শূন্য-বিজ্ঞান-স্বভাব হইয়া অনন্ত অনুত্তর রতিসুখ (অক্ষর মহাসুখ বা চতুর্থ সহজানন্দ) বিস্তার করে ('রতিমনন্তমনুত্তরসুখং তনোতি'—চর্যাটীকা ৪০)। বোধিচিত্ত যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দফল—'যুগনদ্ধরূপং

---

১. The mind has two doors from which issue its activities. One leads to a realization of the mind's pure essence, the other leads to differentiations of appearing and disappearing.—The awakening of Faith : Dr. Suzuki.

সহজানন্দফলং' (চর্যাটীকা. ১)। ইহা অনন্ত অনুত্তর রতিসুখযুক্ত জিনরত্ন -- 'জিণরঅণ'—৪০ বা 'মহাসুখরত্ন' (চর্যাটীকা ৪৯)। ইহা 'মহাসুখরাজ'।

মহাসুখরাজ চিত্ত শূন্যতা-করুণাস্বভাব হইলেও, সুখচিত্ত একদিকে ক্ষরসুখস্বভাব, সংবৃত ও চঞ্চল—উহা চঞ্চলচিত্ত (চঞ্চল চীঅ—২), সংসারচিত্ত,[১] বিকল্পচিত্ত বা স্বাধিষ্ঠান চিত্ত; অপরদিকে উহাই অকৃত্রিম, অকৃত, দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত. অনুৎপন্ন, অনাবৃত (অনাবাটা— ১৫), অক্ষর সুখস্বভাব নিস্তরঙ্গ প্রভাস্বর চিত্ত।

চিত্তই যে একাধারে সুখ ও মহাসুখ, চর্যাগানে নানা সঙ্কেতে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। বিরূপাপাদ চিত্তকে বলিয়াছেন 'বারুণি' (৩)। টীকাকার বলেন, সুখপ্রমোদহেতু বারুণিই বোধিচিত্ত ('বারুণীতি সুখপ্রমোদত্বাদ্ বোধিচিত্তং')। অনেক স্থলে ইহাই 'কমলরস' (চর্যা. ৪, ২০)। বহুক্ষেত্রে আবার 'ক' ও 'খ' বর্ণদ্বারা সংবৃত্তি ও পরমার্থ সুখচিত্তের দ্যোতনা করা হইয়াছে। যেমন 'কঙ্গুচিনা' (৫০): টীকাকার বলেন, 'কং সুখং সংবৃত্তি বোধিচিত্তং তেন যস্ত অঙ্গচিনমিতি'। কঙ্গুচিনা যখন পাকে, তখনই তাহা মহাসুখ। ক-সুখকে পালন করেন যিনি, তিনি 'কপালী' (কং সুখং পালিতুং সমর্থঃ—টীকা. ১০)। নৈরাত্ম্যা যোগিনী 'অঙ্কপালী'—তিনি অঙ্+ক (নঞ্+ক) অর্থাৎ শূন্য সুখ পালন করেন, উহা তাঁহার স্বচিহ্ন। খ-সম বাড়ীতে যখন শবর-শবরী মহাসুখে বিহ্বল হন, তখন 'কপাস' ফোটে, এখানে 'ক-পাস'—'ককারস্য পার্শ্ববর্তী খ-কারশ্চতুর্থশূন্যম্' (টীকা ৫০) অর্থাৎ মহাসুখ।

চর্যাগীতির সাধকগণ কবি। তাঁহারা সাধক অথচ শিল্পী—দার্শনিক অথচ রূপস্রষ্টা। সাধক-দৃষ্টি কবি-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এইজন্য পারিভাষিক শব্দের কণ্টক দলিত করিয়া তত্ত্ব গীতপুষ্পে বিকশিত হয়, দর্শনের নীরস তত্ত্ব সরস কাব্যমূর্তি ধারণ করে। গীতকারেরা কখনও সংবৃত্তি-পরমার্থ, স্বাধিষ্ঠান-প্রভাস্বর, বিকল্প-নির্বিকল্প শব্দগুলি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষায় চিত্ত 'হরিণা' (৬), 'ঠাকুর' (১২) 'নাঈ' ('মহাসুখকায়' টীকা ১৪), মুসা (২১), রাজা (চিঅরাঅ ৩২)। ইহাদেরই মধ্যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন মৃত্যুমার-বেষ্টিত, সংক্লেশারোপিত, তির্যক-নরকাদি দুর্গতির খনক সংবৃত্তি

---

১. অনল্প সংকল্প তমোভিভূতং প্রভঞ্জনোন্মত্ত তড়িচ্চলঞ্চ।
রাগাদি দুর্বার মলাবলিপ্তং চিত্তং হি সংসারমুবাচ বজ্রী ॥
—১নং চর্যাটীকায় উদ্ধৃত সম্পুটোদ্ভবতন্ত্ররাজ বচন।

চিত্তের রূপ ; আবার এই চিত্তের মধ্যেই তাঁহারা দেখেন নিঃস্বভাবীকৃত পরমার্থ প্রভাস্বর চিত্তের অশরীরী ('খুর ন দীসঅ'—৬) রূপ। তাঁহারা জানেন, যে চিত্ত ব্যাধের বেড়াজালে বেষ্টিত, সেই আবার অন্য বনে ভ্রমণ করিয়া সুখিত (৬) ; যে মূষকচিত্ত দেহের অমৃত ভক্ষণ করে, সেই আবার 'গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাম' (২১) ; যে চিত্ত চোর সেইই চোরের প্রহরী ('জো সো চৌর সৌ দুষাধী'—৩৩)। একদিকে চিত্ত 'শিআল' (শ্মশানচিত্ত), অপরদিকে তাহাই 'সিংহ' (প্রভাস্বর)। সংবৃত্তি বোধিচিত্তকে তাঁহারা বলেন দুষ্ট বলদ ('দুঠ্ঠ বলন্দ'—৩৯)—এই বলদই বিয়ায় ('বলদ বিআত্রল'—৩৩) অর্থাৎ সংসার প্রসব করে। চর্যাসাধকদের একমাত্র লক্ষ্য হইল বলদকে বিনষ্ট করা, শৃগালকে সিংহে রূপান্তরিত করা। শুণ্ডিনী যে চিকণ বাকলে 'বারুণি' বাঁধে, তাহারও অর্থ হইল সংবৃত্ত সুখচিত্তকে অক্ষর সুখপাশে বন্ধন করা। এইরূপে সংবৃত্তি যেদিন পরমার্থ হয়, স্বাধিষ্ঠান যেদিন প্রভাস্বরে যুক্ত হয়, সেইদিনই সঙ্কল্পাবলীর বিনাশ। টীকাকার বলেন, 'চিত্তরাজো যদাঽচিত্ততাং গচ্ছতি প্রভাস্বরে বিশতি তদা তস্য বিকল্পাবলী তত্রৈব লীনা ভবতি'। তখন স্বরাট বিরাট, ভূমি ভূমা, অন্ধকার আলোক।

॥ বোধিচিত্ত ও করুণা ॥

যে বোধিচিত্ত মহাসুখস্বভাব, তাহা শূন্যতা ও করুণার মিলিত রূপ। মহাসুখচিত্ত যে 'সর্বাকারবরোপেতশূন্য,' তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এইবার আমরা দেখিব যে, বোধিচিত্ত মহাকরুণাঘন।

আদৌ বোধিচিত্তের অর্থ ছিল বোধি-প্রয়াসী চিত্ত : 'A firm resolution to attain *bodhi* and to fulfil the paramitas and become a *buddha*' (Dr. N. Datta) : কিন্তু মহাযানে উহার তাৎপর্য সম্প্রসারিত হইয়া হইল, নিখিল বিশ্বের অখিল প্রাণীর সর্বদুঃখ দূর করিবার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প ('হিতাশংসা') এবং সেই সঙ্কল্প সংরক্ষণের নিমিত্ত সর্বস্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা। ইহাই হইল বোধিচিত্ত লাভের পূর্ণ তাৎপর্য। মৈত্রী ও কুশলকর্মের আকর 'বোধিচিত্তরত্ন'। ইহা জগদানন্দের বীজ, জগদ্দুঃখের ঔষধ।[১]

১. জগদানন্দবীজস্য জগদ্দুঃখৌষধস্য চ।
চিত্তরত্নস্য যৎ পুণ্যং তৎকথং প্রমীয়তাম্॥ বোধিচর্যাবতার ১. ২৬

মৈত্রীভাবনা বৌদ্ধধর্মের একটি সাধারণ লক্ষণ। বুদ্ধদেব বলিতেন, 'মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং'—সর্বলোকের প্রতি অপরিমাণ মৈত্রীভাবনা করিবে (খুদ্দক পাঠঃ মেত্তসুত্ত): মাতা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে সযত্নে রক্ষা করেন, তেমনই সকল প্রাণীর প্রতি মানস ভাবনা রক্ষা করিবে। 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা'—সকল জীব সুখী হউক, ইহাই যেন জীবনের ব্রত হয়। কিন্তু কল্যাণমিত্রতার এই আদর্শ আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত মহাযান বৌদ্ধধর্মে। সেখানে বোধিসত্ত্বত্ব অর্জন করাই মুখ্য লক্ষ্য। আর এই বোধিসত্ত্ব করুণার একাদর্শ। বোধিসত্ত্ব আর্য অবলোকিতেশ্বর বলেন, যতদিন পর্যন্ত জগতের একটি লোকও দুঃখমগ্ন থাকিবে, ততদিন আমি বুদ্ধত্ব চাই না, নির্বাণ কামনা করিনা।[১] শান্তিদেব 'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে করুণাকে বলিয়াছেন 'সর্বদুঃখ প্রশান্তিকৃৎ'। করুণা-চিত্তের সঙ্কল্প: আমি যেন অনাথের নাথ হই, পান্থজনের পথপ্রদর্শক হই, পারগামী লোকের পক্ষে হই নৌকা ও সংক্রম। যাঁহারা দীপার্থী, আমি তাঁহাদের দীপ হইব, যাঁহারা শয্যার্থী আমি তাঁহাদের শয্যা হইব। আমি হইব প্রাণিগণের সর্বফলদাতা চিন্তামণি রত্ন, ভদ্রঘট, সিদ্ধবিদ্যা, কল্পবৃক্ষ ও কামধেনু:

> দীপার্থিনামহং দীপঃ শয্যা শয্যার্থিনামহং।
> দাসার্থিনামহং দাসো ভবেয়ং সর্বদেহীনাং॥
> চিন্তামণি ভদ্রঘটঃ সিদ্ধবিদ্যা মহৌষধিঃ।
> ভবেয়ং কল্পবৃক্ষশ্চ কামধেনুশ্চ দেহীনাম্॥ বোধি. চ. ৩/১৮-১৯.

বোধিসত্ত্বের আদর্শ পরার্থে আত্ম-উৎসর্গ। যে কোন কুশল কর্ম করিয়া মহাযানীরা যে পুণ্য অর্জন করেন, তাহাও তাঁহারা পরার্থে উৎসর্গ করেন:

> এবং সর্বমিদং কৃত্বা যন্ময়াসাদিতং শুভং।
> তেন স্যাং সর্বসত্ত্বানাং সর্বদুঃখ প্রশান্তিকৃৎ॥ শান্তিদেব

মহাযানে বোধিসত্ত্ব বা বোধিচিত্ত করুণার প্রতিমা।

---

১. When a man knows everything, he knows the miseries of the world and therefore can not enter the Nirvana without stretching a helping hand to the suffering millions all around him. He resolves to remove the sufferings....None stand so high as the Arya Avalokitesvara, who has vowed not to enter the blissful region till there is a single being unemancipated. The conception is the highest that the Mahayana is capable of. And the conception may be regarded as one of the greatest things human intellect has attained by its exertion.—Hara Prasad Sastri : Journal & text Buddist text society, Pt II. 1894.

বজ্রযানে চিত্তের সাধারণ নাম 'করুণা'। শূন্যতা ও আনন্দের স্তরগুলি যেমন ক্রমবিন্যস্ত ও উত্তরোত্তর উত্তম, উর্ধ্বক্রমে করুণাও তেমনই উত্তরোত্তর উত্তম। প্রত্যেকটি আনন্দস্পন্দের সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত শূন্য ও করুণা। উর্ধ্বতর কায়গুলিতে উত্তরোত্তর উত্তম শূন্যতা ও উত্তম করুণার যোগ ঘটে, আর সেই সঙ্গে পুদ্গলচিত্তরূপী করুণারও রূপান্তর ঘটে।

প্রাচীন পালিসাহিত্যে ব্রহ্মবিহার-ভাবনায় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার কথা আছে। এগুলি একই মৈত্রী-ভাবনার ক্রমোন্নততর অবস্থা। মৈত্রী বলিতে বোঝায় সকল লোকের কুশল চিন্তা; করুণা দুঃখিতজনের প্রতি সর্বাত্মক দয়া, দান ও ত্যাগ; মুদিতা অপরের সুখে সুখবোধ এবং উপেক্ষা পরের দোষ-ত্রুটির প্রতি ঔদাসীন্য।[১]

সহজযানে করুণার আদর্শকে রাখা হইয়াছে সকলের পুরোভাগে। সেখানে ক্রম এইরূপ:—১. উপেক্ষাত্মক করুণা, ২. মুদিতালক্ষণ করুণা, ৩. মৈত্রী-ভাবনাময় করুণা এবং ৪. মহাকরুণা। সেকোদ্দেশ টীকায় চারিটি বজ্রযোগের প্রসঙ্গে এই চারি প্রকার করুণার কথা বলা হইয়াছে। নির্মাণকায় স্ফুরিত হইলে চিত্তের যে করুণা, তাহা 'উপেক্ষাত্মক'; সম্ভোগকায়ের স্ফুরণে যে করুণা, তাহা 'মুদিতা লক্ষণ'; ধর্মকায়ে চিত্তবজ্রের স্ফুরণে যে ভাব, তাহা 'মৈত্র্যাত্মক'; এবং সর্বশেষে সহজকায়ের স্ফুরণে শূন্যতা বিমোক্ষে যে মহাসুখময় করুণা, তাহা শুধু করুণা লক্ষণ (তুর্যাবস্থাক্ষয়াদ্ অক্ষরং মহাসুখম্। কং সুখং রুণদ্ধি ইতি করুণালক্ষণং জ্ঞানবজ্রং। স এব সহজকায়ঃ প্রজ্ঞোপায়াত্মকঃ—সেকোদ্দেশ টীকা)। অতএব শেষস্তরের করুণাই সহজ মহাসুখ। আচার্য শান্তিদেব এই করুণাকে বলিয়াছেন 'মহকরুণা'—উহা সর্বসত্ত্বের প্রতি বোধিসত্ত্বের মজ্জাগত প্রেম ('মহাকরুণাপ্রতিলব্ধস্য বোধিসত্ত্বস্যসর্বসত্ত্বেষু মজ্জাগতং প্রেমেতি'—শিক্ষা)।

১. The four sublime cotemplation, namely benevolence towards all creation (Maitri), compassion towards the distressed (Karuna), joy at others' happiness (Mudita), and indifference towards others' faults (Upeksha) are needed to expand one's mind—to make one fit to roam Brahman (brahma-vihara-bhavana). H. D Bhattacharjee : Early Buddhism (Hist. of Phil. Eastern & Western Vol I)

পাতঞ্জল যোগদর্শনে (সমাধি ৩৩) এগুলিকে চিত্তপ্রসাদনের বা প্রসন্নচিত্ততার কারণ বলা হইয়াছে—'মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যা পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্

চর্যার সিদ্ধ সাধকেরা এই সহজ করুণায় প্রতিষ্ঠিত। টীকায় বিরুপাপাদকে বলা হইয়াছে 'পরম করুণা ম্রেড়িতমনা' (৩), ভুসুকুপাদ 'পরার্থায় করুণান্দোলিত-চিত্ত' (৬), কৃষ্ণাচার্য 'জগদর্থ করুণাভারস্তিমিতহৃদয়' (৭), কম্বলাম্বরপাদ 'পরমকরুণানন্দমুদিতহৃদয়' (৮), সিদ্ধাচার্য ডোম্বী 'পরমকরুণাম্রেড়িত' (১৪), সিদ্ধাচার্য শবরপাদ 'মহাকরুণারসবিদ্ধ' (২৮), সরহপাদ 'মৈত্রীময়' (৩৮), কঙ্কণ সিদ্ধাচার্য 'পরমকরুণাসবপাণতঃ প্রমুদিত' (৪৪)। অদ্বয় চিত্ততরুতে করুণার ফুল ফোটানই সহজিয়াদের লক্ষ্য।

করুণা-মুদিত সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতেও তাই নানা প্রসঙ্গে করুণার কথা আসিয়াছে। এখানে পুদ্গল-চিত্ত 'করুণা' নামেই চিহ্নিত। এই করুণার দুই-রূপ—সংবৃত ও সহজ। সংবৃত অবস্থায় করুণা-পুদ্গল যাবতীয় প্রকৃতি-দোষের আকর—সমগ্র ভববলের বাহন। তাহা 'বলদ' (যাহা ভববল দান করে) : শুধু বলদ নহে, দুষ্ট বলদ—'দুঠ্ঠ বলন্দে'। এই বলদই বিয়ায় অর্থাৎ সংসার প্রসব করে। সাধকের চেষ্টা করুণা-পুদ্গলকে দোষমুক্ত করিয়া সহজ মহাসুখস্বভাবে প্রতিষ্ঠা করা। কাহ্নপাদ তাই করুণার পিঁড়িতে দাবা খেলার ছলে, এই পিঁড়িকে দোষ মুক্ত করিয়াছেন :

> করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
> সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥—১২

এই 'করুণা' যখন ভববল মুক্ত হয়, তখন তাহা শূন্যতায় ভরা করুণার নৌকা—তাহাতে রূপাদি বিষয় রাখিবার স্থান থাকে না। কম্বলাম্বরপাদ বলেন,

> সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
> রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥—৮

তখন চিত্তরূপী করুণা-নৌকা গগন (প্রজ্ঞা) উদ্দেশ্যে চলিবার উপযুক্ত হয়।

১৩ সংখ্যক গানের নৌকাখানি 'মহাসুখকায়'। তাহাতে শূন্যতা ও করুণা সার্থক ভাবে যুক্ত হইয়াছে—'নিঅ দেহ করুণা শূণ মেহেলী'। কাহ্নপাদ এই নৌকা লইয়া 'মহাসুখসাঙ্গে' চলিয়াছেন।

অবধূতী মার্গে 'করুণা'র একটি বিশেষ স্ফূর্তি ঘটে। ভাবাভাবের দ্বন্দ্ব দলিত করিয়া করুণামেঘ (ধর্মমেঘ) অর্থাৎ করুণার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ—'মহাকরুণা' স্ফূর্তি পায়। তখন প্রভামণ্ডল স্ফুরিত হয়—দেখা যায় সহজের স্বরূপ। ভুসুকুপাদ বলেন,

করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ॥
উইআ গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ॥—৩০

চরম অবস্থায় করুণার সহজস্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 'করুণা' ডমরু বাজায়, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত অনাহত শব্দ করে। আর্যদেবপাদ বলেন, 'অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ।' তখন সাধক নিরালম্ব, গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত। তখন সুখ দুঃখ এক, স্বপরবিভাগ লুপ্ত। চিত্ত মহাকরুণায় উদ্বেল।

চর্যাগীতি হইতে বোঝা যায়, 'করুণা' একদিকে সংবৃত্তি বোধিচিত্তের প্রতীক—অপরদিকে প্রভাস্বর হইলে উহাই 'মহাকরুণা'। বোধিচিত্ত সর্বত্রই শূন্যতা ও করুণার অভিন্ন মূর্তি—'শূন্যতাকরুণাভিন্নং বোধিচিত্তমিতি স্মৃতম্'। মহাসুখরাজ চিত্ত 'জগদর্থ-করুণাভারস্তিমিত হৃদয়।'

॥ চর্যাগীতির মিস্টিসিজ্‌ম্‌ ও প্রতীক ধর্ম ॥

'মিস্টিসিজ্‌ম্‌' শব্দটি বিদেশী, কিন্তু মিস্টিক ভাবের প্রসার সর্বকালে ও সর্বদেশে। দেশভেদে বিভিন্ন নামে এই একই ভাব 'বিশিষ্ট' মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাই কেহ কেহ বলেন 'mystical experience is as old as humanity.' (R. M. Jones), আবার কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, ভাবালু অনগ্রসর মানুষই এই ভাবে আবিষ্ট হয়; সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আলোকে মিস্টিকভাব অন্ধকারের মতই অপসারিত হয়।—একথা সত্য নহে। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, এমন কি বিংশ শতাব্দীর আকাশচারী আবিষ্কার মিস্টিক ভাবকে লুপ্ত করিতে পারে নাই। সত্য সন্ধানের আগ্রহ এবং পরম সত্যের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা যতদিন মানুষের মধ্যে থাকিবে, মিস্টিক ভাবও ততদিন থাকিবে। কবি, দার্শনিক, জ্ঞানী, কর্মী সকলেই মিস্টিক, এমন কি বৈজ্ঞানিকও মিস্টিক। 'অব্যক্ত জীবন'-এর রচয়িতা উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রকে কে না বলিবেন মিস্টিক?

তবে সৌন্দর্য ও ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রই মিস্টিক ভাবের প্রশস্ত ক্ষেত্র। বিহারীলাল বলেন,

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছ তারে যোগের সাধনে।

এই 'মিষ্টিসিজম্' বা মিষ্টিক ভাব বলিতে কি বোঝায়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বারবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, Mist (কুহেলিকা), Mystery (প্রহেলিকা), Maze (গোলক ধাঁধা), Magic (ইন্দ্রজাল) ও Miracle (অদ্ভুত ঘটনা) প্রভৃতির সঙ্গে মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর কোন যোগ নাই।[১] যাঁহারা অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করেন, নখ-দর্পণ করেন, কুমারী-প্রশ্নে ভবিষ্যৎ ফলাফল নিরূপণ করেন—তাঁহারা মিষ্টিক নাও হইতে পারেন। অবশ্য মিষ্টিকের ভিতর 'অষ্টসিদ্ধি'র প্রকাশ ঘটিতে পারে, সেগুলি মিষ্টিক ভাবের নিম্নস্তরের আনুষঙ্গিক ফল। সামুদ্রিক বিদ্যা, ভূতবিদ্যা, বিষবিদ্যা, মণি-লক্ষণ, অভ্যুজ্জলন, সৌভাগ্য-করণ প্রভৃতি মিষ্টিসিজ্‌মের বহির্ভূত। মিষ্টিসিজ্‌ম্ গূঢ়, কিন্তু রহস্যময় নহে—উহা গভীর, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য নহে—দিব্য, কিন্তু যাদু নহে। উহা তর্কাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও সত্য, ধ্রুব ও দৃঢ় অপরোক্ষ প্রত্যয়: 'Firsthand experience of direct intercourse with the Absolute.' (R. M Jones)

মিষ্টিসিজ্‌ম্ হইতেছে বিরাট অখণ্ড সত্যের সম্যক দর্শন। যে সত্য ধ্রুব, অবিনশ্বর, চিরন্তন—যে সত্য এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও সর্বব্যাপী—যে সত্য রূপের ভিতর প্রসৃত হইয়াও রূপ বিবর্জিত—নিঃসঙ্গ হইয়াও সংসর্গ—অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত রূপে প্রতিভাসিত; যাহা সূক্ষ্ম বলিয়া সাধারণের অবোধ্য, আবার জ্ঞানী ও ভক্তের সহজবোধ্য—যাহা দূর হইতেও দূরে, অথচ নিকট হইতেও নিকটে—যাহা অণুতম অথচ মহত্তম—যাহা নিখিল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত—জ্যোতির জ্যোতি, অন্ধকারের পরপারে আলো, মৃত্যুর অতীত অমৃত, অনন্দজয়ী আনন্দ—নিজের অন্তরে ও নিখিল জগতের মধ্যে তাহার একান্ত নিশ্চিত উপলব্ধিই মিষ্টিসিজ্‌ম্। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'The essential characteristic of mysticism is immediate, intuitive relation with the Absolute.[২]

এই অদ্বয় ধ্রুব নির্বিশেষ তত্ত্বকে কেহ বলেন ব্রহ্ম, কেহ বলেন ভগবান,

১. There is nothing misty or foggy about mysticism. Mysticism is not also sensetional mysteries or occultism ; neither it is parapsyclogical phenomena such as telepathy, clairvoyance, nor has it anything to do with ghosts etc.—The teachings of the Mystics : Walter. T. Stace.

২. L De La Vallee Poussin : Encyclo. of Religion and Ethics.

কেহ বলেন পরমাত্মা।[১] ব্যক্তিভেদে বা মত ও পথভেদে তত্ত্বের নাম পৃথক, কিন্তু অনুভব সর্বত্র একপ্রকার। এই অনুভবের আর একটি দিক—মানুষের অন্তরতম বিশুদ্ধ সত্তার সঙ্গে মানুষের পরিচয়। অর্থাৎ মিষ্টিসিজ্‌ম্ এক অর্থে আত্ম-দর্শনরূপ আত্ম-প্রত্যয়।[২] 'আমি'র স্বরূপ সম্পর্কে খাঁটি জ্ঞান

আমি যে মানুষটি আছি, তাহা অসার ও অনিত্য। আমার দেহ অসার, রূপ অসার। বাহিরের দিক হইতে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্-সমন্বিত এই যে পাঞ্চভৌতিক দেহ যেমন নশ্বর, তেমনই নশ্বর ও অসার আমার অন্তরিন্দ্রিয় মন এবং এই মনের সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞানাদি অনুভব। স্থূল মন নিজেই ক্ষণস্থায়ী, মনঃ-কল্পিত বস্তুগুলিও ক্ষণস্থায়ী। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়—কিছুই ধ্রুব নহে।

কিন্তু এই নাম ও রূপের অন্তরালে--দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত এমন একটি বিশুদ্ধ ও পূর্ণ কিছু আছে, যাহা অনশ্বর, সত্য ও অখণ্ড। অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল তাহাকে প্লাবিত করিতে পারে না, অস্ত্র তাহাকে ছিন্ন করিতে পারে না। ইহা নিত্য। পরিবর্তনশীল নাম ও রূপের অন্তরালে এই নিত্য শুদ্ধ পরম সত্যকে আবিষ্কার করা, তাহার সহিত মিলিত হওয়া ও প্রত্যয়বলে তাহাকে উপলব্ধি করাই মিষ্টিসিজ্‌মের গোড়ার কথা। এই যে নিত্য শুদ্ধ সত্য—ইহার কোন রূপ নাই, ইহার কোন বর্ণ নাই, ইহার কোন লক্ষণও নাই, ইহা অরূপ, অবর্ণ, অলক্ষণ ও অলক্ষ্য। ইহাকে আবিষ্কার করা বা জানা অত্যন্ত কঠিন। দুর্লক্ষ্য বলিয়াই ইহা দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্য কিন্তু অবোধ্য নহে। তাহাকে বোঝা যায় বিশেষ কতকগুলি প্রক্রিয়ায়। এবং বোঝা গেলে, মুহূর্তে আমার এই যে নামরূপাত্মক আমি, তাহা রূপান্তরিত হইয়া যায়। খণ্ড আমি তখন অখণ্ড, সঙ্কীর্ণ আমি তখন উদার, স্বরাট আমি তখন বিরাট, অনিত্য আমি তখন নিত্য। নিজের এই সঠিক স্বরূপটিকে বোঝাই মিষ্টিসিজ্‌ম্।

---

১. বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ।। ভাগবত, ১।২।১১.

২. To know and to find one's self . to know one's own soul in its true nature and glory, and through this knowledge to liberate and realize divine glory ; to find the abyssus, the depths within the self and discover the self as divine in its inmost depth.—Mysticism : Rudolph Otto.

এই নিজস্বরূপকে শুধু অদ্বয়, অখণ্ড, বিরাট রূপে উপলব্ধি করা নয়, তাহাকে আবার নিখিল বিশ্বে প্রতিফলিত করিয়া উপলব্ধি করা। তখন নিখিল বহির্বিশ্ব আব 'আমি' ভিন্ন নই। আমিই নিখিল বিশ্বব্যাপ্ত) নিখিল বিশ্বেও আর তখন দুই বা নানা থাকে না। আমারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া বহু বিভক্ত এই জগৎ এক হইয়া যায়, আবার আমিও বহির্বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়া যাই (The subject' and 'object' are fused into an undivided one :—R. M. Jones) এই Unity in diversity মিষ্টিসিজ্‌মের শেষ কথা। এখানে নানা এক, ভিন্ন অভিন্ন, বৈচিত্র্যগুলিও একমেবাদ্বিতীয়ম্। কাজেই মিষ্টিসিজ্‌মের ভিতর দুইটি ব্যাপারই ঘটে—একটি সান্তের ভিতর অনন্তের অনুভব (Mysticism is to possess the infinite in the finite—Rudolph Otto), অপরটি অনন্ত-অসীমে সান্তেব ব্যাপ্তি (Expansion of soul): একটিতে বিম্বে প্রতিবিম্বিত আকাশ, আর একটিতে আকাশে ব্যাপ্ত বিম্ব; একটিতে অণুতে বিরাটের প্রকাশ, আর একটিতে বিরাটে অণুব ব্যাপ্তি। সর্বত্রই একের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, অন্তরে যিনি 'একা একাকী', 'অন্তররূপিণী', জগতে তিনিই 'বিচিত্র', 'বিচিত্ররূপিণী।' এই একের প্রতি আকর্ষণ, তাঁহাকে লাভ কবিবার জন্য যাত্রা, এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অদ্বয় আনন্দেব অনুভব—এই গুলিই মিষ্টিসিজ্‌মের প্রাণের কথা)

আমরা বার বার করিয়া বলিতেছি, মিষ্টিসিজ্‌ম্ একপ্রকার বিশেষ অনুভব বা প্রত্যয় বা জ্ঞান। অনুভব বা প্রত্যয় বা জ্ঞান নানাপ্রকারের হইতে পারে: (১) ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা প্রত্যয়, (২) কল্পনা বা মনঃকল্পিত জ্ঞান এবং (৩) অপর প্রত্যয় বা প্রজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটক হইতে অমলের কথায় এই তিন প্রকার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

(১) অমল। ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ওই দেখো না যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে।

[এখানে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ। অমল যাহা চোখ দিয়া দেখিতেছে, তাহারই বর্ণনা দিতেছে। পিসিমা, জাঁতা, ভাঙা ডাল, কাঠবিড়ালির খুদ খাওয়ার দৃশ্য প্রভৃতি স্থূল দৃষ্টি-গ্রাহ্য। এই জ্ঞান সর্বসাধারণের।]

(২) আবার এই অমলই, যে গ্রামে সে কখনও যায় নাই, পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী-নদীর ধারে দইওয়ালার গ্রামের বর্ণনা দিয়াছে :

অমল। অনেক পুরোনো কালে খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায়
তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না ?
দইওয়ালা। ঠিক বলেছ বাবা।
অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।
দই। কী আশ্চর্য ! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গরু চরে
বই কি, খুব চরে।
অমল। মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসী নিয়ে যায়—
তাদের লাল শাড়ী পরা।
দই। বা। বা। ঠিক কথা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

[এখানে বর্ণনা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত বা অনুমান। কল্পনার জালে ধরা দিয়াছে বাস্তব সত্য। এই কল্পনা কবির সামগ্রী। ইহার সাহায্যে কবি অদেখা দৃশ্য দেখেন, অগম্য স্থানে গমন করেন, শব্দের জালে সুন্দর বর্ণনা প্রদান করেন। এই মানস-জ্ঞান বাস্তব সত্যের উপরে মায়ার ইন্দ্রজাল রচনা করে। বাস্তব সত্য হইতে উহা কোনও দিকে অসত্য নহে]

(৩) তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান প্রজ্ঞালব্ধ। তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান নহে, অতীন্দ্রিয়জ জ্ঞান। সে জ্ঞানও এক হিসাবে প্রত্যক্ষ ; কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সঙ্গে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য বলা হয় 'অপরোক্ষ' অনুভব। অপরোক্ষ মানে অপর অক্ষ (অপর চোখ)—যাহা দিয়া বস্তুজগতের অতীত জগতের রূপ ও দৃশ্য দেখা যায়। অর্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এই চক্ষু ('দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।'—গীতা)। অমল এই চক্ষু দিয়া অদৃশ্য রাজার ডাকহরকরার আগমন দৃশ্য দেখিয়াছে। এই চক্ষু অ-পর—পরের নহে নিজেরই চক্ষু।

অমল। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে
হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি।···আমি দেখতে পাচ্ছি।
রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই
নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে চিঠির থলি।

শুধু দেখা নহে, অমল শুনিতেও পায়—

ফকির, এই যে ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না।

এ দৃশ্য সকলে দেখিতে পায় না, এ বাজনা সকলে শুনিতে পারে না। মানুষের ভিতর কতিপয় মানুষের এই দিব্য দৃষ্টি বা দিব্য কর্ণ থাকে। ইহা দ্বারা যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা অপরোক্ষ। সত্যের এই অপরোক্ষ জ্ঞান বা স্ব-জ্ঞানই (Intuitive knowledge) মিষ্টিসিজ্‌ম্। মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর ভারতীয় প্রতিশব্দও আছে। কেহ Mysticism-এর বাংলা করিয়াছেন 'অতীন্দ্রিয়বাদ'; কেহ 'মরমিয়াবাদ', ; মোহিতলাল ইহাকে বলিয়াছেন 'তত্ত্ব-রস-রসিকতা'। 'তত্ত্ব-রসরসিকতা' শব্দটির ভিতর সৌন্দর্য ও রস-সম্ভোগের প্রতিবেদনটিই প্রবল। শিল্পের জগতে এ নাম চলিতে পারে।

আমাদের ধর্ম সাহিত্যের অপরোক্ষানুভূতিকে মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর প্রতিশব্দ বলা চলে। অপরোক্ষ মানে সাক্ষাৎ অধিগত। তাহা পরোক্ষ নহে অর্থাৎ পরদ্বারা শ্রুত বা অনুমিত নহে। পরের শ্রুত বা অনুমিত অনুভব বিকল্পাশ্রয়ী ও তর্কাপেক্ষ। কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি নির্বিকল্প ও তর্কাতীত। কারণ তাহা সাক্ষাৎকৃত। তত্ত্ব সাক্ষাৎকার বলিতে এই অপরোক্ষানুভূতিকেই বোঝায়। উহাকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি না বলিবার কারণ এই যে, উহা স্থুল ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হইতে পৃথক। অথচ উহাও একপ্রকার প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকার। সে সাক্ষাৎকার Sensory plane-এর নহে, ইন্দ্রিয়াতীত স্বানুভব।

হিন্দুরা যাহাকে বলেন অপরোক্ষানুভূতি, তান্ত্রিকেরা তাহাকেই বলিয়াছেন স্ব-সংবেদন ('Self experiencing'—Snellgrove) ; পাশ্চাত্য Mysticism-এর প্রবক্তারাও বলেন 'Mysticism is the science of self-evident Reality' (Underhill)—পরম সত্যের স্বসংবেদ্যাত্মক বিজ্ঞান। বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হইতেছে, স্বপরসংবিত্তি বর্জিত জ্ঞান স্বসংবেদন হইতে জন্মে ('স্বসংবেদ্যাদ্ ভবেদ্ জ্ঞানং স্বপরসংবিত্তি বর্জিতম্,' 'স্বসংবেদ্যমিদং জ্ঞানং বাক্‌পথাতীত গোচরম্')।[১]

এই স্ব-সংবেদ্য ব্যাখ্যা করিয়া হেবজ্রতন্ত্রের যোগরত্নমালা টীকায় কাহ্নপাদ বলিয়াছেন, : 'স্বসংবেদ্যম্ অপরপ্রত্যয়ং প্রত্যাত্মবেদ্যং স্বভাব ইতি।' অর্থাৎ স্ব-সংবেদন হইতেছে প্রত্যগাত্মার অপর প্রত্যয় বা আত্ম-প্রত্যয়।

তেষামেকং পরং নাস্তি স্বসংবেদ্যং মহৎসুখম্।
স্বসংবেদ্যা ভবেৎ সিদ্ধিঃ স্বসংবেদ্যা হি ভাবনা।।
স্বসংবেদ্যময়ঃ কর্ম বোধনাৎ কর্ম জায়তে।
স্বয়ং হর্তা স্বয়ং কর্তা স্বয়ং রাজা স্বয়ং প্রভুঃ।। হে বজ্র. ১।৭।৪৬, ৪৭

চর্যাকারগণও এই অর্থে স্বসংবেদন (সঅ সংবেঅণ) শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন স্বসংবেদনকে বলিয়াছেন, 'স্বয়ম্ভূয়মান নির্বিকল্প মহাসুখ।'

Poussin মনে করেন, কী হীনযান, কি মহাযান বৌদ্ধধর্মে 'Absolute' বলিয়া কোন সত্যকে স্বীকার করা হয় নাই।[১] Poussin-এর-মত একজন বৌদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত কেন এই কথা বলিলেন, তাহা বোঝা যায় না। হীনযান বৌদ্ধধর্মে 'নির্বাণে'র স্বরূপ সম্পর্কে বিতর্ক থাকিলেও, এই নির্বাণ লাভে বিমুক্তি-সুখের উল্লাস থের বা থেরী গাথায় অনুপস্থিত নহে। 'নির্বাণ'ই এখানে নির্বিশেষ সত্য। নির্বাণ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অনুভব অব্যক্ত। কিন্তু 'প্রজ্ঞাচক্ষু' দ্বারা তিনি পরম সত্যের স্বরূপ দেখিয়াছেন। সত্যদর্শন এবং আবেগহীন অনুভব—মিস্টিসিজ্‌মের একটি মূল কথা। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে এই কথা আরও বেশি প্রযোজ্য—বিশেষতঃ বিজ্ঞানবাদে ও বজ্রযানে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও মহাসুখ নিরালম্ব হইলেও অস্তিত্বহীন নহে। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, 'অভূত পরিকল্পোঽস্তি'—অভূত পরিকল্প (পরিনিষ্পন্নজ্ঞান) আছে। আর সুখবাদী তান্ত্রিকেরা তো আরও স্পষ্ট করিয়াই বলেন, অশরীরী মহাসুখতত্ত্ব শুধু আছে নহে, দেহজ না হইলেও এই দেহেই আছে: 'দেহস্থং চ মহাজ্ঞানং সর্বসঙ্কল্প বর্জিতং। ব্যাপকঃ সর্বভূতানাং দেহস্থোঽপি ন দেহজঃ'—হেবজ্র। দেহস্থ এই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই তাঁহাদের লক্ষ্য। ইহা মিষ্টিক অনুভব। বৌদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ D. T. Suzukiও এই ধরনের কথাই বলেন। তিনি বলেন। যে-কোন ধর্মের প্রাণ মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ মহাযান বৌদ্ধধর্মও মিষ্টিসিজ্‌ম্‌-বিরহিত নহে।[২]

চর্যাগীতির মহাসুখ বা সহজ তত্ত্বটিই একটি মিষ্টিক তত্ত্ব। যে অদ্বয় সর্বব্যাপী, নিত্য নির্বিশেষ তত্ত্ব মিষ্টিক অববোধের মূল, মহাসুখ বা সহজ সেই তত্ত্ব। সহজ মহাসুখ একটি নির্বিকল্প আনন্দ—উহা সর্বশূন্য অথচ প্রকৃতিপ্রভাস্বর। উহাই আবার গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত, বর্ণ-চিহ্ন-রূপহীন বিজ্ঞান বা চৈতন্য। তাহা অদ্বয়। এ তত্ত্ব অলক্ষ্য লক্ষণহীন,—'অলকখ লকখণ ন জাই'—১৫; উহাকে বাক্যে প্রকাশ

---

১. There is no mysticism in Buddhism, if the word mysticism is understood quite strictly......There is no Absolute according to all 'orthodox' forms of Buddhist thought—whether Little or Great vehicle and threfore there is no Bnddhist mysticism. Encyclo. Religion & Ethics.

২. Mysticism is the life of religion ; without it religion loses the reason of its existence ; all its warm vitality is gone and there remains nothing but the crumbling bones and cold ashes of death.—The Development of Mahayana Buddhism : D. T. Suzuki.

করা যায় না—'বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখাণী'—৩৭ ; উহাকে অনুভব করিতে ইন্দ্রিয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়—'জাস্থ মুণস্তে তুট্টই ইন্দিআল'—৩০ ; অথচ উহার অনুভবে কায় সংস্থখে মূর্ছিত হয়।

এই তত্ত্ব স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও, ইহার অনুভব হয় এই দেহেরই চক্রে চক্রে, বিশেষতঃ মহাস্থখচক্রে। সেইখানেই 'মহাস্থখসঙ্গ'। সাধকের সমগ্র লক্ষ্য, সমগ্র চেষ্টা এই স্থখের পথে যাত্রা ও সেই স্থখের সহিত মিলন। এই মিলনে মন ও হৃদয় এক হইয়া যায়, ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় জ্ঞান। ইহা স্বসংবেদ্য। সে সংবেদনে চেতন-বেদন বোধ থাকে না, সে এক মহাস্থখকর যোগনিদ্রা—'চেঅণ ণ বেঅণ ভর নিদ গেলা'—৩৬। উহা যেন নিদ্রাও নহে, আবার জাগরণের অবস্থাও নহে—'ঘুমই ণ চেবই'। সে অবস্থায় সমান স্থখ-দুঃখ, একাকার পাপপুণ্য, তুচ্ছ ভয়-ঘৃণা-লোকাচার—'ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার'—৩১। সমরসে আপ্লুত চিত্ত।—এ সকলই মিষ্টিক-বোধের লক্ষণ।

শুধু তাহাই নহে, মিষ্টিক জ্ঞানে সত্তার যে রূপান্তর বা পরাবৃত্তি (Retroversion বা 'Involution'), চর্যাগীতিতে তাহারও সঙ্কেত আছে। এ অবস্থায় সাধকের যেন পুনর্জন্ম ('New Birth') ঘটে। কারণ স্থূল চিত্ত তখন অচিত্ত ; স্থূল মন তখন অমন। তখন চঞ্চলতার অবসান, সত্তা নিশ্চল, দৃঢ়, বজ্রোপম। এই অবস্থায় আত্মপর-বিভাগ ('সপরবিভাগ') সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়, চূর্ণ হয় মোহের বন্ধন। প্রকৃতিদোষমুক্ত সত্তা তখন প্রকৃতিপ্রভাস্বর। শুধু তাহাই নহে, ভাবাভাবের দ্বন্দ্ব দলিত করিয়া মহাকরুণামেঘ স্ফুরিত হয় 'করুণামেহ নিরন্তর ফরিআ।' তখন সাধক 'জগদর্ণ করুণাভার স্তিমিত হৃদয়',।

মিষ্টিক সংবেদন সর্বত্র 'অনুত্তর' ও 'বাক্‌পথাতীত'। সে অবস্থার কথা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বচনদ্বারে প্রকাশ করা যায় না। তখন 'গুরু বোব সে সীসা কাল'—৪০। তবু মিষ্টিকেরা তাহাকে সঙ্কেতে-প্রতীকে আভাসিত করেন। চর্যাগীতির স্বসংবেদনকে ('a conscious union with a living Absolute')—কেহ বলেন 'Pragmatic mysticism' ; তাই মিষ্টিক সাধকদের চিরকালের mystic ভাষা—'সন্ধ্যাভাষা' ও রূপক-আবরণ চর্যাগীতিরও প্রধান উপজীব্য।

॥ প্রতীক-ধর্ম ॥

মহাস্থখের অনুভব অনির্বচনীয় ও মূকাস্বাদনবৎ হইলেও, উহাকে প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। বিশেষ করিয়া যে অনুভব মানুষের দীনতা ও

সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া মানুষকে পূর্ণ প্রস্ফুট পদ্মের মত সুন্দর ও সুরভিত করিয়া তোলে, যাহা মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া 'অন্ধকারে প্রদীপবৎ', জ্ঞানের স্বতঃ-উদ্ভাস প্রকট করে এবং সর্বোপরি ভ্রমজলধিতে নিমগ্ন মানুষকে শাশ্বত সত্য ও পরমার্থ মুক্তির পথ দেখায়, তাহা অবশ্যই প্রকাশযোগ্য। বিশেষতঃ যে-সকল কল্যাণমিত্র বজ্রসত্ব পরার্থে আত্মোৎসর্জনকে জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করেন, নিজের অর্জিত পুণ্যটুকু পরের জন্য দান করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তাঁহারা জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত, অশরণজনের প্রবোধের নিমিত্ত, স্বানুভবের তত্ত্বকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

কিন্তু যে-সকল তত্ত্ব 'বাক্‌পথাতীত', যাহা কথাবেদ্য নহে, তাহাকে কিভাবে কথাবেদ্য করিয়া তোলা সম্ভব? এইখানেই আসে রূপক-প্রতীকের প্রসঙ্গ এবং সঙ্কেতের প্রশ্ন। যাঁহারা মিষ্টিসিজ্‌ম্ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, মিষ্টিক মানুষ রূপক-প্রতীক ছাড়া তাঁহাদের ভাবকে প্রকাশ করিতেই পারেননা। এই রূপক-প্রতীক তাঁহাদের অনুভবের তুলনায় ভাবপ্রকাশের প্রতিস্পর্ধী না হইলেও, যখন তাঁহারা অনির্বাচ্য স্বসংবেদনকে প্রকাশ করেন, তখন অবশ্যই কোন সঙ্কেত বা কোন দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। এই সঙ্কেত ও দৃষ্টান্তগুলি সাধারণ-লোকের অন্তরে সেই অনির্বচনীয় অনুভবের ইঙ্গিত প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিষ্টিকেরা যে প্রতীক ব্যবহার করেন, তাহা কবির ভাষার মতই বাহ্য অর্থের অন্তরালে অন্যতর অর্থের ব্যঞ্জনা বহন করে।[১] অর্থাৎ স্বসংবেদনের ভাষা চিরকাল রূপকাশ্রয়ী ও প্রতীক ধর্মী। এই রূপক, প্রতীক বা সঙ্কেত তাঁহাদের স্বানুভব হইতে, মানবঅঙ্গের কুণ্ডলাদি অলঙ্কারের মত পৃথক্ বিন্যস্ত নহে, একেবারে 'অপৃথগ্‌যত্নে' নিবর্তিত। এ অলঙ্কার ভাষার অন্তর্নিহিত লাবণ্য।

চর্যাগীতি রূপক-প্রতীকের বিচিত্র চিত্রশালা। এখানকার কবিরা সকলেই সিদ্ধ আচার্য অর্থাৎ জাত-মিষ্টিক। তাঁহারা সকলেই বিশ্ব-সংবেদকদের সগোত্র। কাজেই

১ The mystic, as a rule, can not wholly do without symbol and image, inadequate to his vision though they must be; for his experience must be expressed if it is to be communicated, and its actuality is inexpressible except in some side-long way, some hint or parallel which will stimulate the dormant intuition of the reader, and convey, as all poetic language does, something beyond its surface sense.' Mysticism. Part I. Chap. IV. Evelyn Underhill.

তাঁহাদের প্রকাশভঙ্গী, প্রকাশের বিন্যাস এবং প্রকাশের ভাষা বিশ্ব মিষ্টিকদের ভঙ্গী ও ভাষা হইতে স্বতন্ত্র নহে। যদিও সাধকভেদে রূপকের আক্ষিপ্ত বস্তুগুলি (উপমান) পৃথক, তথাপি রূপকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও প্রকার এক। একজন বিদেশী সন্ত (Saint Martin) বলিয়াছেন,—'All mystics speak the same language for they come from the same country'; উক্তিটি এক হিসাবে সত্য। এখানে 'Same country' বলিতে বোঝায় একই অধ্যাত্মলোক, যেখানে রূপ ও অরূপ, সীমার জগৎ ও অসীম, খণ্ড-অখণ্ড অভিন্ন; যেখানে পৌঁছিয়া মানুষ পরাবৃত্ত (retroverted); বহুধা বিভক্ত মানুষ সংহত ও একীভূত (re-integrated); যেখানে মৃত্যু নাই, শুধু অমৃত—যেখানে অন্ধকার নাই, শুধু অনির্বাণ আলো, যেখানে ভূমি নাই, আছে ভূমা—যেখানে অনন্দ নাই, আছে আনন্দ। সেই আনন্দ ও জ্যোতির্লোকের সংবাদ যাঁহারা বহন করিয়া আনেন—তাঁহাদের গোত্র এক, মনোভাব এক, প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গীও এক।

শ্রদ্ধেয়া E. Underhill উদ্দেশ্যের দিক হইতে নিখিল মিষ্টিকদের রূপকগুলির তিন প্রকার বর্গ বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন :

(১) কতকগুলি রূপক হইতেছে নিম্নতর সত্তাকে অলোকের উপযোগী করিয়া তুলিবার রূপক। উহা সত্তার রূপান্তর সাধনের রূপক। আমি শান্ত, আমাকে অনন্তকে লাভ করিতে হইলে, আমাকেও অনন্তের সামিল হইতে হইবে। আমার এই কঞ্চুক-আবরণ অপসারিত করিয়া আমাকে কঞ্চুকমুক্ত করিতে হইবে। শূককীট আমি, আমি প্রজাপতি হইব—অসত্য আমি সৎ হইব—মরলোকের অধিবাসী আমি, অমৃত হইব—এই উদ্দেশ্যে সত্তার প্রস্তুতি—এই ধরনের রূপক-সৃষ্টির মূল প্রেরণা। এখানে কৃত্রিম উপায়ে রস-রসায়ণের প্রয়োগ, হঠযোগের প্রণালীতে আসন-প্রাণায়ামাদির প্রযত্ন, কখনও বা মদ্যপানের সঙ্কেতে সত্তার জাগরণের ইঙ্গিত। এগুলিকে বলা যায় 'Alchemic symbol'; অথবা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ভাষায় বলা যায়—'বিশুদ্ধি'মূলক রূপক।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের রূপক হইতেছে কঞ্চুকমুক্ত সত্তার আনন্দ ও আলোকের পথে যাত্রার রূপক—Symbol of pilgrimage; এখানে মানব পথিক, অভিযাত্রী। চিরন্তন সত্য, শাশ্বত আনন্দ ও অনির্বাণ আলোকের প্রতি অনুসন্ধিৎসু সত্তার যাত্রা। এখানে শুধু প্রস্তুতি নহে, সত্যকারের অভিযান। এ যেন কৃষ্ণমুখী রাধার অভিসার। ঝড়-বাদলে ভ্রূক্ষেপ নাই,

পিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ সর্পভয় সঙ্কুল পথের জন্যও ভয় নাই। নির্ভীক সত্তার অভিসার—একের প্রতি একের যাত্রা ('Flight of the alone to the Alone'); এখানে শুধু চলা আর চলা—সে চলার লক্ষ্য সুখাবতী, আনন্দলোক। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র মানস-সরোবরের দিকে উড়িয়া চলা—উড়িয়া চলা ঝড়-বিদ্যুৎ-ঝটিকার আবর্তে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা ইহাকে বলিবেন, 'প্রবাহাভ্যাস'।

(৩) তৃতীয় প্রকারের রূপক হইতেছে 'imagery of human love and marriage';—প্রেমের রূপক, বিবাহের রূপক ও মিলনের রূপক। এখানে সত্তার বহু প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি—'fulfilment of life'; প্রেমের রূপকগুলি দেহ-সম্ভোগের বাসনায় বিলসিত হইলেও, উহা পূর্ণ আনন্দ ও পরিপূর্ণ চৈতন্যের সহিত মিলনের প্রতীক—দেহের অতীত এক দেহাতীত বিলাস। এইখানেই তত্ত্বের উপলব্ধি বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার।*

চর্যাগানেও রূপকের এই বর্গবিভাগগুলি লক্ষণীয়। অবশ্য চর্যায় অনেক স্থলেই এক বর্গের রূপকের সঙ্গে অন্য বর্গের রূপক মিশিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, চর্যাগানগুলি সাধন-প্রধান; সাধ্যতত্ত্ব আসিয়াছে সাধনের ফলরূপে। শুদ্ধিমূলক রূপক ও অভ্যাস প্রকর্ষমূলক রূপকে পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই, আবার কোথায়ও ইহাদেরই সঙ্গে একসঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের মহাসুখ ও বিহ্বলতা বা মিলনরূপক।

চর্যায় বিশুদ্ধিমূলক রূপকের প্রসঙ্গে আসিয়াছে মদ চোলাই (৩), দাবাখেলা (১২), যোগিকালঙ্কার ধারণ (১১), বীণা নির্মাণ ও বীণা বাদন (১৭), তরু ছেদন (৪৫) প্রভৃতি রূপক। এই রূপকগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ পুদ্গল, নাড়ী ও চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা। যে পর্যন্ত বিশুদ্ধি না হয়, সে পর্যন্ত কেহই পরমতত্ত্ব লাভের উপযুক্ত হয় না। কাহ্নপাদের দাবাখেলার রূপকটিই যদি ধরা যায়, সেখানেও দেখিতে পাই, দাবার ছকে সপক্ষ ও বিপক্ষের গুটি গুলি সাজানো থাকে। বিপক্ষের গুটিগুলিকে নির্জিত করিয়া বিপক্ষের ক্লেশারোপিত ঠাকুর বা রাজাকে বন্দী করা বা মাত করাই এই খেলার লক্ষ্য। বিপক্ষের এই গুটি গুলিই সত্তার জাগরণের পক্ষে বাধা। বড়েকে মারা মানেই প্রকৃতিদোষগুলিকে অপসারিত করা।

* 'Mysticism' গ্রন্থে রূপকের বর্গবিভাগের ক্রম—(1) Symbol of pilgrimage (2) Symbol of love (3) Alchamy Symbol—এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য ক্রমভঙ্গ করিয়া সাজানো হইল।

মদের রূপকগুলিও সুন্দর। মদ এখানে সুখপ্রমুদিত অবিশুদ্ধ চিত্ত। তাহাকে চিকণ বাকলে শোধন করিয়া সরুনালে ঘটে ঢালিতে হয়। এই মদ তখন বিশুদ্ধ; ইহা তখন স্কন্ধকে (স্কন্ধাত্মক চিত্তকে) দৃঢ় করে, অজরামর হইবার পথ প্রশস্ত করে। গ্রাহকের আসক্তিও এই মদে। রূপকার্থে মদের তাৎপর্য এই যে, ইহা চিত্তের অসাড়তা দূর করে।

সত্তার জাগরণের পক্ষে সঙ্গীত একটি প্রশস্ত উপাদান। সঙ্গীত-ধ্বনিরও নানা প্রকারভেদ আছে। যে সঙ্গীত স্বতস্ফূর্ত, অনাহত—তাহার ক্ষমতা অসাধারণ। মহীধরপাদের চিত্ত-গজেন্দ্র অনাহত নাদ শুনিয়া পাগল। সে তখন শিকল ছিঁড়ে, বন্ধনস্তম্ভ চূর্ণ করে, প্রজ্ঞালোকের দিকে ধাবিত হয় (১৬)। ১৭ সংখ্যক গানে বীণাতন্ত্রীধ্বনির অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্তবীণা তো সহজে বাজে না। লাউয়ের সঙ্গে তন্ত্রী জুড়িতে হয়, সেই তারকে আবার দাঁড়ার সঙ্গে যুক্ত করিতে হয়। করস্থ করে যখন বীণা সঞ্চালিত হয়, তখন বত্রিশ তন্ত্রী সমস্বরে বাজিয়া উঠে—শোনা যায় শূন্যতাধ্বনি। সে ধ্বনি শ্রবণে সাধক-সাধিকাব আনন্দ-জাগরণ ঘটে, তাঁহারা নৃত্যে-গানে মুখর হয়,

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥—১৭

চর্যাব অভিসার-মূলক রূপকগুলি আরও সুন্দর। নদী বা সাগরের প্রান্তে রহিয়াছে জিনপুর বা সুখাবতীপুর। সেই আনন্দলোকেব উদ্দেশ্যে সাধকের যাত্রা নৌ-বাহনে। নৌকাকে মজবুত করিবার জন্য কত যত্ন। সোনার ভরা লইয়া নৌকার যাত্রা। খুঁটি কাছির বন্ধনমুক্ত নৌকা উজানের দিকে বহিয়া চলে। চারিদিকে চাহিয়া, ডাহিনে বাঁয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সোজাপথে নৌকা চালাইতে হয়। এইভাবেই পথে মিলিয়া যায় মহাসুখের সঙ্গ (৮)। ১৪ সংখ্যক গানেও নৌবাহনের রূপক। তবে এখানে সাধক একা নহেন, পারের কর্ত্রী আছেন অভিজ্ঞা মতঙ্গকন্যা, তাহার উদ্দেশ্যে যাত্রীর ব্যাকুল মিনতি—'বাহ তু ডোম্বী, বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।'

চর্যার প্রেম-মিলনমূলক প্রতীকগুলি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। অন্যান্য মিষ্টিকের প্রেম বা মিলন, পরমতত্ত্বের সহিত সাধক-সত্তার মিলন। চর্যার পরমতত্ত্ব সহজানন্দ বা মহাসুখ। এখানে কিন্তু মহাসুখের সঙ্গে মিলন নহে, নৈরাত্ম-ধর্মের সহিত করুণা চিত্তের মিলন; তাহার ফলে মহাসুখের উপলব্ধি। অবশ্য

বৌদ্ধতন্ত্রে কামিনীকেই 'সুখ' বলা হইয়াছে।[১] পুং-তত্ত্ব ও স্ত্রী-তত্ত্বের যোগে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহারই বিশুদ্ধ বিলক্ষণ রূপটিই মহাসুখ। চর্যায় বোধিচিত্ত পুং-তত্ত্ব, নৈরাত্ম্যা যোগিনী বা পরিশুদ্ধাবধূতিকা অর্থাৎ দেহস্থ মধ্যমা নাড়ী হইতেছে স্ত্রী-তত্ত্ব। এই মধ্যমা নাড়ীর সঙ্গে মিলনে মহাসুখের উদয়। সাধকের প্রেম এই মধ্যমা নাড়ী রূপিণী অবধূতিকার সঙ্গে। ইহার সহিত মিলিত হইয়াই সাধক পরমানন্দে বিরমানন্দকে স্থির করেন এবং বিরমানন্দ হইতে সহজানন্দ বা মহাসুখ অনুভব করেন। এই মাধ্যমা নাড়ার রূপক যোগিনী, ডোম্বী, প্রভৃতি। একদিকে তাঁহারা মহাসুখ লাভের উপায়, অন্যদিকে তাঁহারাই মহাসুখরূপিণী। চর্যাধরেরা ইহাঁদের সহিত মিলিত হইয়া পরমার্থ মহাসুখ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন।

৪ সংখ্যক চর্যায় পরিশুদ্ধা অবধূতিকাই নৈরাত্ম্যা যোগিনী। তাঁহার বক্ত্রই সহজানন্দ, ক্ষণভেদে উহাই উষ্ণীষকমলরস। তাই সাধক বলেন,

যোইনি তঁই বিনু খনহি ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

এখানে 'কমলরস'—'উষ্ণীষকমল মধুমদনং পরমার্থবোধিচিত্তং' (টীকা) সাধক নৈরাত্ম্যা যোগিনীর মুখচুম্বন করিয়া, অর্থাৎ বিশুদ্ধা মধ্যমানাড়ীরমুখ চুম্বন করিয়া সেই রস আস্বাদন করেন অর্থাৎ বোধিচিত্ত মহাসুখ লাভ করেন।

কাহ্নপাদের কয়েকটি গানে (১০, ১৮, ১৯) অবধূতিকা ডোম্বী (ডোম নারী) রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই ডোম্বীর দুই প্রকৃতি: অধিকারীভেদে তাহা কোন সাধকের বোধিচিত্ত নষ্ট করিয়া দেয়, কোন সাধককে মহাসুখের অধিকারী করে। সাধক জানেন, এই ডোম্বীর প্রকৃতি ভ্রষ্টা নারীর (ছিণালী) মত। কখনও ইনি কুলীন জনের সেবা করেন, কখনও বা কাপালিকের। তাই অভিযোগ করিয়া বলেন,

কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝেঁ কাবালী॥—১৮

কিন্তু সাধক ইহাও জানেন, বিদ্বজ্জন তাহাকে কণ্ঠালিঙ্গন হইতে মুক্ত করে না।

এই ডোম্বী সাধকের চোখে নেশা সৃষ্টি করে। সে চৌষাট্টিদল পদ্মে কখনও নৃত্য করে, কখনও কাহারও নৌকায় যাতায়াত করে। সাধক তাহার সহিত

১ শুক্রাকারো ভবেৎ ভগবান্ তৎসুখং কামিনী স্মৃতম্।
ধর্মসম্ভোগরূপত্বং বজ্রধরস্য লক্ষণম্॥—যোগরত্নমালা

মিলিত হইতে চান—'আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।' সমাজে সে অস্পৃশ্যা, নগরের বাহিরে তাঁর ঘর, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ছোঁয় না—তাহাতে সাধকের ভ্রূক্ষেপ নাই। ডোম্বার জন্য তিনি হাড়ের মালা ধারণ করেন, অর্থাৎ সংসার-বিরাগী হন। প্রেমিকার জন্য এখানে প্রেমিকের সর্বত্যাগ। প্রেম জাতিকুল মানে না, ভাবকও প্রেমের জন্য জাতিকুল, ঘৃণা-লজ্জা সর্বস্ব বিসর্জন দেন।

১৯ সংখ্যক গানে এই ডোম্বীকে বিবাহ করিবার জন্য সাধকের যাত্রা। বরের বিবাহ-যাত্রায় পটহ মাদল বাজে,, জয়-জয় শব্দ উঠে। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া ডোম্বীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ভাবকের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়,

অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইণি জালে রঅণি পোহাঅ।

শবরপাদের দুইটি গানে (২৮, ৫০) প্রেম-মলনের চিত্র অধিকতর সুন্দর। এখানে শবর ভুজঙ্গ (প্রেমিক পুরুষ) নৈরামণি 'দারী' (প্রেমিকা ঘরণী)। নিজ গৃহিণীকে পরকীয়া নায়িকা মনে করায় এখানে প্রেমে অপূর্ব ভ্রান্তিবিলাস। পর্বতের উপবিভাগে রহিয়াছে শবরী বালিকা। ময়ূর পুচ্ছ, গুঞ্জা মালায় তাঁহার অঙ্গ-সজ্জা, প্রেমের উদ্দীপন বিভাবরূপে প্রকৃতিরও আজ বসন্ত-সজ্জা:

নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী

এই পরিবেশে শবর খাট পাতিলেন শয্যা বিছাইলেন, শৃঙ্গার উপাদান তাম্বুল-কর্পূর ভক্ষণ করিলেন এবং

সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥ ২৮

৫০ সংখ্যক গানে দেখা যায়, আকাশচুম্বী তেতলা বাড়া, সেখানে নৈরামণি শবরী জাগিতেছেন শবর তাহাকে লইয়া বিলাস করিতেছেন। এই তেতলা বাড়ীর পাশে ইন্দু মণ্ডল 'জোহ্নাবাড়ি'। সেখানে অন্ধকার নাই, আকাশফুল কাপাস ফুটিয়াছে কঙ্গুচিনা পাকিয়াছে। এই পরিবেশে প্রমত্ত শবরাশবরী—

অণুদিন শবরো কিংপি ন চেবই মহাসুখে ভোলা।

(চর্যার সব রূপকই মিষ্টিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত। যে স্বসংবেদন অনির্বচনীয়, সাধকেরা তাহাকে রূপক-প্রতীকেই প্রকাশ করেন। মিষ্টিকের ভাষা রূপময়। এই রূপ বাহির হইতে আক্ষিপ্ত নহে। অন্তর-ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত। ফলে উহা স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও, 'অপৃথগ্‌যত্নে নির্বর্তিত'। চর্যার সাধকদের রচনায় শূন্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে, এই খ-পুষ্প অলীক নহে—

বাস্তব, সুন্দর ও সুরভিত। এইখানেই Mystic হইয়া উঠিয়াছেন কবি, কবিতা হইয়া উঠিয়াছে অচিন্ত্য স্বসংবেদনের রূপময় প্রকাশ।

সহজ-সাধন : মহারাগনয়

তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ধর্মজীবনের চরম প্রাপ্তি। সাধন বা 'চর্যা' সেই সাক্ষাৎকারের উপায়। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, 'সাধ্য বস্তু সাধন বিনে কেহ নাহি পায়।' জীবনের যে-কোন প্রাপ্তি সম্পর্কেই এই উক্তি খাটে। উপায় ব্যতীত উপেয় লাভ সম্ভব নহে। যে পথে অগ্রসর হইলে তত্ত্বসাক্ষৎকার ঘটে, ধর্ম জীবনে সেই পথ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিই সাধন-অঙ্গ।

গৌতম বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন দুঃখের হাত হইতে আত্যন্তিক মুক্তি। সেই লক্ষ্যে কত তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনা, কত তপস্যা, কত ধ্যান। অবশেষে তিনি বুঝিলেন, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনে নহে, শিথিল সম্ভোগেও নহে—মধ্যপথ অবলম্বনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনে মানুষ দুঃখের স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'ছিন্নসোতা' হইতে পারে। এই অবস্থাই নির্বাণ।

প্রাচীন বৌদ্ধমতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণের পথ। দৃষ্টি, সঙ্কল্প, বাক্য ও কর্মকে নিয়মিত করিয়া, নিরন্তর ব্যায়াম (অভ্যাস), স্মৃতি, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা নামরূপাত্মক দুঃখজর্জর পুদ্গল তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। 'জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু'রূপ দুঃখের আবর্তন রোধে উহাই একমাত্র পথ।

বুদ্ধদেবের পূর্বে ছিল বন্ধন-মুক্তির উপায়রূপে যোগ ও যাগের পথ, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানের পথ। তন্ত্র-সাধনাও অজ্ঞাত ছিল না। আর ছিল জৈন নিগ্রন্থদের সুকঠিন তপশ্চর্যা। গৌতম বুদ্ধ যজ্ঞকর্মকে নিন্দা করিলেন, তান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে হীনকর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিলেন, জৈন নিগ্রন্থদের কঠিন দেহ-প্রত্যাখ্যানকেও বর্জন করিলেন। নির্বাণ লাভ করার ব্যাপারে শীলাচার ও ধ্যান-সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞাচক্ষু অর্জন করার দিকেই তাঁহার সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল।

গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে বৌদ্ধমত ও পথ লইয়া, লক্ষ্য ও লক্ষ্যভেদের উপায় লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয়। একদল বলিলেন, শাস্তা নির্বাণ-লাভের জন্য যে শীল-মহাশীলাদির উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নিম্নাধিকারীদের জন্য। উচ্চাধিকারীদের জন্য তিনি 'গম্ভীর সুদুর্দর্শ' ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায় কালক্রমে প্রধান দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়—হীনযান ও মহাযান। শীলাচারী নির্বাণলাভী বৌদ্ধগণ হীনযানের অন্তর্ভুক্ত; মহাযান

'গম্ভীরোদার' ধর্মের ধারক। মহাযানের প্রধান দুই শাখা—মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদ। উহাতে যথাক্রমে 'শূন্যতা' ও 'বিজ্ঞান' নির্বাণের ভূমিকা গ্রহণ করে। উভয়েরই সাধন পারমিতানয়—অর্থাৎ দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা পারমিতাগুলির অনুশীলন। ইহাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাপারমিতা —'প্রজ্ঞাপারমিতা হি পঞ্চপারমিতানাং স্বভাবঃ'। অতএব মাধ্যমিকই হউন আর বিজ্ঞানবাদীই হউন, প্রজ্ঞায় স্থিতিই সাধনের শেষ লক্ষ্য। শূন্যবাদী মাধ্যমিকদের মতে প্রজ্ঞাই 'সর্বাকারবরোপেতশূন্যতা'; বিজ্ঞানবাদীদের মতে উহাই 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'। অবশ্য বিজ্ঞানবাদীদের সাধন আরও একটু বিশেষত্ব মণ্ডিত। বিজ্ঞানবাদের অপর নাম যোগাচার। তাঁহাদের মতে প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় প্রতিষ্ঠার উপায় যুগপৎ যোগ ও আচার অর্থাৎ একদিকে প্রজ্ঞার সঙ্গে যোগ, অপরদিকে অপরাপর পারমিতার অনুশীলন। ['One is the higher yoga, the other is the duties (acara or carya) to be performed'—Dr. N. Datta]

'যোগ' শব্দটি গ্রহণ করার ফলে, যোগাচারে বুদ্ধের ত্রিকায়ের কল্পনা ও চিত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছ। (বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞান ও চিত্ত অভিন্ন। বিজ্ঞানের তিনটি রূপ—বিশুদ্ধ, পরতন্ত্র ও পরিকল্পিত। এগুলি যথাক্রমে বুদ্ধের ত্রিকায়ের প্রতীক। এই কায়গুলির নাম—ধর্ম, সম্ভোগ ও নির্মাণ। বুদ্ধের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন কায়ই ধর্মকায়, তাহা সঙ্কল্প-বিকল্প বর্জিত, জন্ম-মৃত্যু রহিত, ধ্রুব, অবিনশ্বর—তাহা 'অভূত পরিকল্প'। সম্ভোগকায় পরতন্ত্র বিজ্ঞানের প্রতীক, এখানে চিত্তরূপী বুদ্ধ স্থির ও চলের মধ্যবর্তী অবস্থায় কুশলকর্মের শান্তি ও ঋদ্ধি ভোগ করেন। তাহা অজাত হইলেও মর্তজন্মের সম্ভাবনা যুক্ত। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, উহা অন্তরাভব বিজ্ঞানের স্তর; আসলে জন্ম-মৃত্যু নাই, অথচ কল্পনায় যেন জন্ম-মৃত্যুর অভিনয় হইতেছে। নির্মাণ কায়ের বুদ্ধ পার্থিব বুদ্ধ—স্থূল জন্ম-মৃত্যুর অধীন: উহা পরিকল্পিত মিথ্যা জ্ঞান। পুদ্গল চিত্ত এই পরিকল্পিত জ্ঞান, অথচ তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞান বা বুদ্ধত্বের সম্ভাবনা যুক্ত। চিত্ত নির্মাণ-সম্ভোগকায় অতিক্রম করিয়া ধর্মকায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বিজ্ঞানবাদে চিত্তভূমির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে—এগুলিকে দশবোধিসত্ত্বভূমি বলা হয়।) কি ভাবে বিজ্ঞান চিত্ত ক্রমে আবরণ যুক্ত হইয়া বিকল্পিত চিত্তের রূপ পরিগ্রহ করে এবং পুনরায় আবরণ (দৌষ্ঠুল্য = ক্লেশাবরণ

ও জ্ঞেয়াবরণ) মুক্ত হইয়া শেষভূমি ধর্মমেঘভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যোগাচারে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। ধর্মমেঘভূমিতে বোধিসত্বের পূর্ণ স্ফূর্তি অর্থাৎ ধর্মকায়ে অবস্থান। শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের, বিশেষতঃ যোগাচারী বৌদ্ধদের সাধনপদ্ধতির ভিতরেই তান্ত্রিক সাধনার বীজ নিহিত ছিল। কালক্রমে মহাযানের এক শাখা বজ্রযান নাম গ্রহণ করে। তন্ত্রাচারের পূর্ণপ্রকাশ বজ্রযানে। বজ্র হইতেছে দৃঢ়, ধ্রুব, অবিনাশী শূন্যতা।[১] এই শূন্যতা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মত অস্তিত্বসম্পন্ন। উহা গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত নিরালম্ব হইলেও স্বয়ম্ভু, স্বাশ্রয়, স্বয়ংজ্যোতি ও সর্বব্যাপী। অনির্বচনীয় বিকল্প-রহিত বজ্রচিত্তই বজ্রসত্ব। বজ্রযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের চরম লক্ষ্য এই বজ্রসত্বত্বে প্রতিষ্ঠা।

বস্তুত বজ্রসত্ব বোধিসত্বেরই পূর্ণপ্রজ্ঞ রূপ। মহাযান বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ব ও বোধিচিত্তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হীনযানে অর্হৎ সক্রিয় তত্ব ('active principle') এবং প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ('concern of the present') ; বোধিসত্ব এখানে অতীত বস্তু ('matter of the past') মাত্র। কিন্তু মহাযানে অর্হৎ বা বুদ্ধ অতীত অবদানের পূজনীয় ঋষি ('Sages of the past'), বোধিসত্বই জীবন্ত প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ('Living wise men of the present')[২] ; বোধিসত্বত্ব অর্জন করাই মহাযানীদের মুখ্য লক্ষ্য। তাঁহারা বলেন, সংবোধি চিত্তই পাপকে দমন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, প্রাণি নিবহকে উদ্ধার করিবার জন্য ইহাই একমাত্র হিতমার্গ ('হিতমেতদেব')। যাঁহারা ভবচক্রের দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন ('ভবদুঃখ শতানি তর্তুকামৈঃ'), যাঁহারা লোকদুঃখ হরণ করিতে চাহেন ('সত্ত্বব্যসনানি হর্তুকামৈঃ) এবং যাঁহারা অনন্ত সৌখ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন ('বহুসৌখ্যশতানি ভোক্তুকামৈঃ'), তাঁহাদের নিকট বোধিচিত্ত অত্যাজ্য, অতএব 'সুদৃঢ়ং গৃহ্নত বোধিচিত্তরত্নং'।[৩] (সাধারণ অর্থে বোধিতে প্রতিষ্ঠিত চিত্তই বোধিচিত্ত, কিন্তু বজ্রযানমতে প্রজ্ঞা ও উপায় যোগে গঠিত চিত্তই বোধিচিত্ত। 'উপায়' হইল করুণা বা কুশল কর্মের দিক এবং প্রজ্ঞা হইল 'শূন্যতা' বা প্রজ্ঞাচক্ষুর দিক।) এই প্রজ্ঞা চক্ষুর উদয়ে 'প্রতীত্য সমুৎপাদ'

১. দৃঢ়ং সারমশৌবীর্যমচ্ছেদ্যাভেদ্য লক্ষণং।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে ॥—যোগরত্নমালা

২. দ্রষ্টব্য Buddhism : Rhys vids এবং Introduction to Saddharma Pundarika : H. Kern.

৩. অশুচি প্রতিমামিমং গৃহীত্বা জিনরত্ন প্রতিমাং করোত্যনর্ঘং।
রসজাতমতীব বেধনীয়ং সুদৃঢ়ং গৃহ্নত বোধিচিত্ত রত্নং ॥ বোধিচর্যাবতার ১।১০ : শান্তিদেব

তত্ত্ব অধিগত হয়, পরিষ্কার বোঝা যায়—যাহা কিছু উদয় ধর্মা, তাহা ব্যয় ধর্মা। এই জ্ঞানই নিরোধমার্গের চরম কথা। মাধ্যমিক দর্শনে উহাই সর্বশূন্যতা, বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা। বজ্রযানের সমগ্র লক্ষ্য—প্রজ্ঞোপায় যোগে এই বোধিচিত্ত গঠন করা। তন্ত্রমতে শূন্যতা ও করুণার যুগনদ্ধই বোধিচিত্ত। মহারাগে শূন্যতা ও করুণার মিলনকেই বলা হয় 'মহারাগনয়'। এই যোগ তন্ত্রমতে দেহকেন্দ্রিক। কায়া-সাধনই মুখ্য ক্রিয়া। অতএব 'মহারাগনয়' বা 'প্রজ্ঞোপায় যোগ'-এর তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে বোঝা প্রয়োজন দেহতত্ত্ব।

দেহতত্ত্ব

মানবদেহ ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু যোগ-তন্ত্রে দেহই সাধনভূমি। তান্ত্রিকগণ এই দেহের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। সহজিয়া বৌদ্ধগণও এই দেহের মধ্যে সর্বতত্ত্বের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন। দেহেই রহিয়াছে মুদ্রা, দেহেই মণ্ডল-চক্র, দেহেই তীর্থ-পীঠ-মহাপীঠ। অদ্বয়, অকায়, নির্বিকল্প, সর্বশূন্য, বিজ্ঞানঘন যে সহজ চিত্ত, তাহাও রহিয়াছে এই দেহে ('অসরীর সরীরহি লুক্কো'—সরহদোহা); আবার এই চিত্তের বিবর্ত বা পরিণাম যে সংবৃত সংসার, তাহারও আলয় দেহ। হেবজ্র তন্ত্র বলেন, 'দেহস্থং চ মহাজ্ঞানং সর্বসঙ্কল্প বর্জিতম্। ব্যাপকঃ সর্ববস্তূনাং'—সর্বসঙ্কল্প-বর্জিত যে মহাজ্ঞান সর্ববস্তুর আবরক, তাহাও দেহস্থ। মেখলাটীকায় (২৭) বলা হইয়াছে,—রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ, পৃথিব্যাদি তত্ত্বপঞ্চক, কায়-বাক্-চিত্ত—সবই 'ক্ষীর-নীর-ন্যায়ে' বজ্রধর-শরীরে সমরসীভূত হইয়া থাকে, তাহাই আবার 'জলতরঙ্গ-ন্যায়ে' বাহিরে স্ফুরিত হয়।

॥ নাড়ী-সংস্থান ॥

দেহের উপাদানগুলির ভিতর সাধনতত্ত্বে অধিক গুরুত্ব নাড়ীর। দেহস্থ পঞ্চভূত—মাটি, জল, তেজ, বায়ু ও শব্দের বাহিকা নাড়ী; নাড়ীগুলিই রক্ত, শুক্র, মল-মূত্র বাহিনী। এক কথায় দেহের পরিচারিকা ও পরিচালিকা নাড়ী-চক্র।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াগণ মনে করেন, এই দেহে বোধিচিত্তবহা বত্রিশটি নাড়ী আছে। এগুলি বোধিচিত্তকে বহন করিয়া মহাসুখস্থানে দ্রবীভূত করে ('দ্বাত্রিংশদ্ বোধিচিত্তবহা মহাসুখস্থানে স্রবন্তে')। সেকোদ্দেশটীকায় এই বত্রিশটি নাড়ীর ভিতর ছয়টি নাড়ীকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নাভির ঊর্ধ্বে ও অধোভাগে তিনটি তিনটি করিয়া ছয়টি নাড়ী। ঊর্ধ্বে মেরু-দণ্ডের বামে, দক্ষিণে ও মধ্যভাগে যথাক্রমে ললনা, রসনা ও অবধূতী। বামা

ললনা চন্দ্র ও তোয়বাহিনী, দক্ষিণা রসনা সূর্য ও তেজোবাহিনী এবং মধ্যা অবধূতী চন্দ্র-সূর্যের সমবাহিত্ব হেতু শূন্যবাহিনী। নাভির অধোদেশে তিন নাড়ী—মধ্যা বিট্‌নাড়ী মলবাহী, উহার যোগ ঊর্ধ্বের ললনা নাড়ীর সঙ্গে; বামা বায়ু ও মূত্রবাহিনী—উহার যোগ ঊর্ধ্বের সূর্য নাড়ী রসনার সঙ্গে; অধো দক্ষিণা নাড়ী শুক্র বা জ্ঞানবাহিনী—উহার যোগ ঊর্ধ্বের শূন্য বা বোধিচিত্তবহা অবধূতীর সঙ্গে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা মনে করেন, অবধূতী বাদে আর পাঁচটি নাড়ী পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক। পঞ্চস্কন্ধ (রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান) যথাক্রমে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ বা পঞ্চতথাগত—(বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য)—'পঞ্চস্কন্ধাঃ সমাসেন পঞ্চবুদ্ধাঃ প্রকীর্তিতাঃ' (যোগরত্নমালা)। বৈরোচন রূপ, রত্নসম্ভব বেদনা, অমিতাভ সংজ্ঞা, অমোঘসিদ্ধি সংস্কার এবং অক্ষোভ্য বিজ্ঞান। পাঁচটি নাড়ী আবার পঞ্চ তথাগতের যোগিনী বা মুদ্রারও প্রতীক; বৈরোচনের মুদ্রা লোচনা, রত্নসম্ভবের বজ্রা, অমিতাভের পাণ্ডরা, অমোঘসিদ্ধির তারা এবং অক্ষোভ্যের লোচনা। এই নাড়ীগুলিই আবার পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক। অতএব তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে নাড়ীই দেবতা, নাড়ী হইতেই পঞ্চকুল, পঞ্চমুদ্রা প্রভৃতির প্রকাশ। নাড়ীর সহিত যোগই দেবতাযোগ।

কিন্তু এই ছয় নাড়ীর মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ী ('তাসাং মধ্যে তিস্রো নাড্যঃ প্রধানাঃ') ললনা, রসনা ও অবধূতী। মেরুর বামভাগে কণ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোমুখে রহিয়াছে ললনা, দক্ষিণে নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত ঊর্ধ্ব মুখে রহিয়াছে রসনা আর মধ্যপ্রদেশে হৃদয়পদ্মের মধ্য দিয়া ('হৃৎ-সরোরুহ মধ্যগা') লম্বমানা অবধূতী। রসনা রক্তবাহিনী, সূর্য স্বরূপিণী সূর্য নাড়ী; উহাই 'উপায়'। ললনা তোয় বা অক্ষোভ্যবহা চন্দ্রনাড়ী—বিজ্ঞান-স্কন্ধের প্রতীক বলিয়া উহা প্রজ্ঞা-স্বভাবা; আর মধ্যগা অবধূতী শূন্যবাহিনী বোধিচিত্ত বহা।[১]

এই তিনটি নাড়ী আবার কায়-বাক্‌-চিত্তেরও প্রতিনিধি। রসনা=কায়,

১. ললনা প্রজ্ঞাস্বভাবেন রসনোপায় সংস্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিতা॥
অক্ষোভ্যবহা ললনা রসনা রক্তবাহিনী।
প্রজ্ঞা চন্দ্রবহা খ্যাতাবধূতী সা প্রকীর্তিতা।' (হেবজ্র ১ম কল্প, ১ম পটল)

ললনা = বাক্ এবং অবধূতী = চিত্ত। রসনা আবার উপায় বা করুণাও বটে। এইদিক হইতে ললনা হইতেছেন প্রজ্ঞা বা শূন্যতা। এই দুইয়ের যোগে উৎপন্ন হয় প্রথমে বজ্ররূপী স্পন্দযুক্ত মলাবৃত শুক্র, অধো-দক্ষিণা শুক্র নাড়ীতে তাহার গতি; তাহা সংবৃত বোধিচিত্ত। এই চিত্তই সাধন-কৌশলে নিস্তরঙ্গ চিত্তে পরিণত হইয়া অবধূতীতে প্রবেশ করে। একশুষির বশতঃ উর্ধ্বের অবধূতীর সঙ্গে, অধোভাগের শুক্রনাড়ীর যোগ রহিয়াছে। নিম্নের দুই নাড়ীর (বিট্ ও মূত্র নাড়ীর) গতি নিরুদ্ধ হইলেই বিশুদ্ধ শুক্র বা চিত্ত নিস্তরঙ্গ বা স্থির হয় এবং উপরের দক্ষিণা ও বামা নাড়ীর নিরোধে উহা উর্ধ্বস্থ অবধূতী মার্গে প্রবেশ করিয়া মহাসুখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সংসার-চিত্তের উৎপাদন, গতি নিয়ন্ত্রণ এবং উর্ধ্ব যাত্রায় নাড়ীগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ললনা-রসনা ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে দেহমধ্যে মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে রহিয়াছে ললনা নাড়ী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে রসনা নাড়ী। দেহসাধনায় এই নাড়ী দুইটি প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক। দক্ষিণা রসনা নাড়ীকে বলা হয় সূর্য বা কালি। সূর্য আলোক বা কালজ্ঞান। সংসার কালেরই সৃষ্টি। কালবোধেই পুদ্গল বোধ, আমার আমিত্ব বোধ। রসনা একদিকে কায়েরও প্রতীক। আমার অহঙ্কার, তৃষ্ণা, ভবচক্র প্রধানতঃ কায়-বোধ হইতে উৎপন্ন। পঞ্চস্কন্ধের বিস্তীর্ণ মায়াজাল ও ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ও ইহার রচনা। এক কথায় রসনাই গ্রাহ্যতত্ত্ব। ইহাই কালি অর্থাৎ ক-কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণমালা। ব্যঞ্জন বা হল্‌বর্ণের মত উহাদের স্বাধীন সত্তা নাই। ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রূপেই উহাদের অবস্থান। রসনা পুরুষ-তত্ত্ব উপায় বা করুণারও প্রতীক। ইহা রশনাও (কোমর বন্ধ অর্থাৎ শৃঙ্খল) বটে। ইহা শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা, করুণা প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকার দোষের আকর—তাই বন্ধন। এই রসনা নাড়ীর বিশোধন ও নিরোধে পুদ্গল-শূন্যতার বোধ জন্মে। ইহা প্রথম শূন্যবোধ।

তুলনায় 'ললনা' একটু উচ্চ স্তরের। উহা চন্দ্র ও আলি (অ-কারাদি) বর্ণমালার প্রতীক। চন্দ্র আলোকজ্ঞান। উহাও কালবোধ জন্মায়। ফলে উহাও বন্ধন। উহাতে আছে কাম, সুখ, সন্তোষ প্রভৃতি চল্লিশ প্রকার প্রকৃতিদোষ। উহাকে 'আলি' (অ-কারাদি) বলার তাৎপর্য এই যে, অ-কারাদি স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জন বর্ণের গ্রাহক, তেমনই 'ললনা'—রসনা-সৃষ্ট বিষয়গুলির গ্রাহক। ইহাকে গ্রাহক তত্ত্বও বলা হয়। উহা বাক্‌তত্ত্বেরও প্রতীক। কারণ অ-কারাদি স্বর হইতেই বাক্ বা নাদ জাগে। কিন্তু

এই ললনা নিম্নস্তরের প্রজ্ঞা বা স্ত্রী-রূপিণী শূন্যতার দ্যোতক। কারণ, আলি অর্থাৎ অ-কারাদি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'অ' নঞর্থক অর্থাৎ শূন্যতার প্রতীক।[১] গ্রাহ্যগুলি যে শূন্য তাহাই নহে, গ্রাহকও যে শূন্য, ললনা সেই বোধ জাগায়। অর্থাৎ উহা মহাযান দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য ধর্মশূন্যতার স্মারক। ইহা দ্বিতীয় শূন্যের বোধ। সাধকের লক্ষ্য ললনা-রসনার গতিপথ রোধ করিয়া উভয়ের একীকরণ। এই প্রক্রিয়ায় বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয় এবং দুইদিকের পথ রুদ্ধ হওয়ায় চিত্ত মধ্যমায় প্রবেশ করিতে পারে।

অবধূতী: ললনা-রসনার মধ্যবর্তী অবধূতী সাধকের প্রিয়া, প্রিয়তমা। অবধূতীই তান্ত্রিক বৌদ্ধের মার্গ (স্থবিরবাদের নিরোধ মার্গ) বা সহজ মহাসুখের পথ।[২] অবধূতী নিজে গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিতা, উহা পুদ্গল শূন্যতা ও ধর্মশূন্যতা-বোধের ঊর্ধ্বে। কাজেই উহা বোধিচিত্তের শূন্যতা বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান উপলব্ধির পথ। তন্ত্রমতে অবধূতী তৃতীয় শূন্য বা মহাশূন্য। এই শূন্য সর্বশূন্য নহে, ইহাতে বিস্মৃতি, ভ্রান্তি প্রভৃতি সাত প্রকার প্রকৃতিদোষ থাকে। কাজেই উহাও বন্ধন। ললনা-রসনা যদি হয় লোহার নিগড়, অবধূতী সোনার শৃঙ্খল। কিন্তু শৃঙ্খল তো বটে। তবে অবধূতীর নিজেরই এই দোষ বা শৃঙ্খল চূর্ণ করার ক্ষমতাও আছে। অবহেলায় ক্লেশাদি পাপ ধৌত করে বলিয়াই ইহার নাম অবধূতী ('অবহেলয়া অনাভোগেন ক্লেশাদি পাপান্ ধুনোতি ইত্যবধূতী'-মেখলা টীকা)। অবধূতি ছায়ায় সূর্যরশ্মি (আতপ), 'অন্ধকারে প্রদীপবৎ'। ক্লেশাবরণ যেন ছায়া, অবধূতী সূর্যের আলো সেই ছায়াকে বিনষ্ট করে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সূর্যের আলো থাকে না; সে অন্ধকার (জ্ঞেয়াবরণ) কে দূর করিবে? তাহাও দূর করিবে অবধূতী। অবধূতীর নিম্নগা গতি রুদ্ধ হইলে অবধূতীই সহজানন্দ-দায়িকা।

অবধূতীর দুইরূপ: অপরিশুদ্ধা ও পরিশুদ্ধা। নির্মলগিরা টীকায় (চর্যাটীকা ৩) বলা হইয়াছে—একই অবধূতী ছয় নাড়ীতেই আছেন—'একৈকা ষট্ পথ-যোগাৎ সা অবধূত.'। নাভির নিম্নে শুক্র নাড়িকাও অবধূতী, নাভির ঊর্ধ্বে

১ (i) অকারঃ সর্ববর্ণাগ্রো মহার্থঃ পরমাক্ষরঃ।
মহাপ্রাণোহ্যনুৎপাদো বাগ্ উদাহারবর্জিতঃ ॥ নামসঙ্গীতি

(ii) অ-কারো মুখং সর্বধর্মানামাদ্যনুৎপন্নত্বাৎ—অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ

২. এষ মার্গবরঃ শ্রেষ্ঠো মহাযান মহোদয়ঃ।
যেন যূয়ং গমিষ্যন্তো ভবিষ্যথ তথাগতাঃ ॥—রতিবজ্র

মধ্যানাড়ীও সেই অবধূতী। শুক্র নাড়িকায় অবধূতী অপরিশুদ্ধা, স্পন্দরূপ শুক্র বা সংবৃত্তি বোধিচিত্তের বাহিকা। চিত্রকর যেমন নিজেই ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন করিয়া নিজে ভয় পান, অপরিশুদ্ধা অবধূতীও তেমনি স্বয়ং দিবাদি জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া নিজেই ভীতা হন।[১] এ অবধূতী সংসার-জ্ঞানের নির্মাতা, বালযোগীর পক্ষে ভয়ঙ্করী। আবার এই অবধূতীই ঊর্ধ্ব-মধ্যপথে পরিশুদ্ধা, কামরূপের (সহজমহাসুখপীঠের) যাত্রী। তখন তিনি নৈরাত্মাযোগিনী, 'সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী'—জিনপুরের পথসঙ্গিনী। সহজসাধনার সমগ্র লক্ষ্য এই পরিশুদ্ধাবধূতিকা 'নৈরামণি'র সহিত মিলিত হওয়া।

।। চক্র বা পদ্ম ।।

শুধু নাড়ী নহে, এই দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে, দেহস্থ মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া অবধূতী মার্গে, মৃণালে গ্রথিত পদ্মের মত, গ্রথিত রহিয়াছে চারিটি চক্র বা পদ্ম। এই চক্রগুলিকে কায়ও বলা হয়। মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের ত্রিকায় কল্পনার সঙ্গে ইহাদের যোগ আছে। চতুর্থকায়ের কল্পনা বজ্রযানে নূতন ও বিশিষ্ট। দেহমধ্যে নাভি, কণ্ঠ, হৃদয় ও উষ্ণীষ (শীর্ষ বা মস্তক)—এই চারিটি স্থান তত্ত্বাববোধের বিশিষ্ট কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলিই চক্র বা পদ্মের স্থান।[২]

নাভিতে যে চক্র, তাহাকে বলা হয় নির্মাণচক্র বা নির্মাণকায়। নির্মাণ-কায়ের পদ্ম চতুঃষষ্টিদল যুক্ত। এইখানেই প্রজ্ঞোপায়যোগে শুক্ররূপী সংসার-চিত্তের জন্ম ও সংসার প্রবেশের উন্মুখতা। এখানে প্রজ্ঞা কর্মমুদ্রা। পঞ্চস্কন্ধের মায়াজালে বদ্ধ চিত্তের প্রস্ফুট জাগ্রদবস্থা। এখানে সঙ্কল্প-বিকল্পের দ্বন্দ্ব, ভবচক্রের উল্লোল, ইন্দ্রিয় তাড়িত মৃত্যু-মারের কোলাহল। চিত্ত এখানে সংবৃত্তি চিত্ত—মোহ-মলাবলিপ্ত, চঞ্চল, কালভয়ে ক্লিষ্ট। আবার এই নির্মাণ চক্রেই ললনা-রসনার গতি নিরোধে চিত্তের ঊর্ধ্বায়ন ও পরাবৃত্তির সম্ভাবনা। এইখানেই চঞ্চল চিত্তকে অচঞ্চল করিবার, মোহমললিপ্ত চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবার, তাহাকে মহাসুখের দিকে চালিত করিবার নিমিত্ত নানা আয়োজন। এখানে চিত্ত যেমন স্পষ্ট সংসারচিত্তের রূপ লাভ করে অর্থাৎ নির্মিত হয়, তেমনই উহা প্রজ্ঞোপায়-

---

১. যথা চিত্রকরো রূপং যক্ষস্যাতিভয়ঙ্করং।
সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেহপ্যবুধস্তথা ।।—মহাযান বিংশিকা

২. ধর্মচক্রং সম্ভোগচক্রং নির্মাণচক্রং হৃৎকণ্ঠযোনিষু যথাক্রমম্। কায়বাক্চিত্ত ইতি তদেব চক্রত্রয়ম্। কায়চক্রং যোনৌ বাক্চক্রং কণ্ঠে চিত্ত চ চক্রং হৃদি। ত্রয়াণাং পরিজ্ঞানস্বভাবং মহাসুখ-চক্রং মূর্ধ্নি বিজ্ঞাতব্যম্—যোগরত্নমালা।

যোগে পরমার্থ চিত্তে পরিণত হয়। তাই ইহার নাম নির্মাণচক্র। বিশোধন-ক্রমে সংক্লেশারোপিত চিত্ত এখানে যে কায় লাভ করে, তাহা নির্মাণকায়।

নির্মাণকায়ের পরে সম্ভোগকায় বা সম্ভোগ চক্র। সম্ভোচক্রের স্থান কণ্ঠ। উহা ষোড়শদল পদ্ম। এখানে প্রজ্ঞোপায়যোগে চিত্তের সম্ভোগ। এখানে প্রজ্ঞা সময়মুদ্রা। প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইয়া এখানে চিত্তের এক স্বপ্নময় আবেশ। স্বপ্নের জগৎ যেমন সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে—এখানকার ভোগও সেইরূপ। এখানে মন সক্রিয় থাকিলেও স্বপ্নাতুর। আনন্দের ক্রমিক স্তরে ইহা পরমানন্দ সম্ভোগের অবস্থা। এই অবস্থায় বাক্-তত্ত্ব বজ্রদৃঢ় হয়। বাগ্‌বজ্রের প্রতিষ্ঠায় দ্বিতীয় শূন্যতার উপলব্ধি অর্থাৎ ধর্মশূন্যতার উপলব্ধি হয়।

ধর্মচক্রের স্থান হৃদয়। ইহা অষ্টদল পদ্ম। ইহা বিরমানন্দের স্থান। প্রজ্ঞোপায়যোগ তখনও অব্যাহত। কিন্তু এখানে প্রজ্ঞা ধর্মমুদ্রা। ধর্মমুদ্রা সাক্ষাৎকারে বিরমানন্দে জাগতিক আনন্দবোধের বিরাম ঘটে। তখন চিত্তের সুষুপ্ত অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত, নপুংসক। উহা তৃতীয় শূন্যের স্তর। আপনাতে আপনি নিলীন। সেখানে বিকল্পজ্ঞান নাই, আছে পরতন্ত্রজ্ঞান। সংসার-সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ লুপ্ত হওয়ায় চিত্ত তখন বজ্রচিত্ত। বজ্রচিত্তের এই প্রতিষ্ঠায় ধর্মকায় স্ফুরিত হয়। বিজ্ঞান-বাদীদের মতে উহাই আলয়বিজ্ঞানের অন্তর্গত মনোবিজ্ঞান বা অন্তরাভব বিজ্ঞানের স্তর। এখানকার চিত্তকে বলা হয়, স্বাধিষ্ঠান চিত্ত।

বজ্রযানে বা সহজ যানে ধর্মকায়ের উপরেও আর একটি স্তর কল্পনা করা হইয়াছে। উহা চিত্তের সহজকায় বা স্বভাবকায়। নাম উষ্ণীষচক্র বা উষ্ণীষকমল। উহার চারিটি দল, অবস্থান উষ্ণীষে (মস্তকে)। এই চারিটি দল প্রকৃতপক্ষে চতুরার্য সত্য (দুঃখ, সমুদায়, নিরোধ, নিরোধমার্গ), চতুর্নিকায় (স্থবিরী, সর্বাস্তিবাদ, সম্মিতি ও মহাসঙ্ঘী), চতুরানন্দ (আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ) প্রভৃতির প্রতীক। বস্তুতঃ মহাসুখকমল সকল চক্র বা পদ্মের মিলিত রূপ—নির্মাণ-সম্ভোগ-ধর্মও উহার অন্তর্লীন। কাহ্নপাদ বলেন,

ললনা রসনা রবিশশি তুড়িঅ বেণ বি পাসে।
চউপত্তর চউক্কম চউমৃণাল থিঅ মহাসুখ বাসে॥—দোহা

দুই পাশের ললনা-রসনা, রবি-শশী বিনষ্ট হইলে মহাসুখবাসে চিত্ত এই চতুষ্পত্র, চতুর্মৃণাল পদ্মে অবস্থান করে। অর্থাৎ চিত্ত এখানে 'সমাজরূপী'।

মেখলা-টীকাকার বলেন, মহাসুখচক্র জ্ঞেয়-জ্ঞান, জন্য-জনক ও এতদুভয়ের বিপর্যাসাভাবে—'শূন্যাতিশূন্য-মহাশূন্য-সর্বশূন্যমিতি পত্রচতুরাদি স্বরূপেণ চতুর্মৃণালসংস্থিতা।' ইহার বাস সেইখানে, যেখানে মহাসুখের বসতি। তাহা 'সর্বশূন্যালয় ডাকিনীজালাত্মক জালংধরাভিধান মেরুগিরিশিখর'। এইখানেই মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার। সাধকচিত্ত এখানে প্রকৃতিপ্রভাস্বর (Self illumined)। সর্বশূন্যতায় পূর্ণ, অথচ মহাকরুণায় 'জগদর্থকরুণাভারস্তিমিত হৃদয়'।

সাধনক্রম

সহজসাধনায় বা মহারাগনয়ে দুষ্কর নিয়মাদি পালনের প্রয়োজন নাই। সরহপাদ তাঁহার দোহায় যাগযজ্ঞ, দণ্ডিব্রত, যোগক্রিয়া, পূজা-অর্চনা, ক্ষপণকধর্ম, প্রব্রজ্যাশ্রিত স্থবিরবাদ, মহাযানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা, এমনকি তন্ত্রের মণ্ডল-চক্রাদিরও অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সহজের পরিজ্ঞান ভিন্ন অন্য মোক্ষ নাই। আর এই সহজ লাভ করার একমাত্র পথ প্রজ্ঞোপায় যোগ।

প্রজ্ঞোপায় যোগ : প্রজ্ঞাসেবনই প্রজ্ঞোপায় যোগের মূল কথা। স্থূলার্থে জগতের যোষিৎ মাত্রই প্রজ্ঞা। রজকী, নটী, ডোম্বী, চণ্ডালী, ব্রাহ্মণী, এমনকি ভগিনী-জননীও প্রজ্ঞারূপিণী ('নৈরাত্মরূপিণী যোষিৎ')। উপায় হইলেন করুণারূপী পুদ্গল। উপায়ের সহিত প্রজ্ঞার এই মিলন প্রজ্ঞোপায়যোগ বা শূন্যতা-করুণার মিলন। অক্ষরার্থে বিষয়টি অসামাজিক। বিষয়টির গূঢ়ার্থ অনুধাবন করিতে হইলে জগৎ সম্পর্কে সহজ সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। সহজসাধন নিশ্চিত রাগের সাধন। যে রাগ দ্বারা বালযোগী সংসারে বদ্ধ হয়, সেই রাগকে অবলম্বন করিয়া সাধক মুক্তিলাভ করেন ('রাগেণ বধ্যতে লোকঃ রাগেণৈব প্রমুচ্যতে'—হেবজ্র)। মহারাগনয়ের চর্যায় পঞ্চ কামোপভোগে বাধা নাই।[১] সরহপাদ বলেন, সূক্ষ্ম চিন্তাঙ্কুর যদি বিষয়রস দ্বারা সিক্ত না হয়, তবে কি তাহা গগনব্যাপী ফলদ কল্পতরুত্ব লাভ করিতে পারে? প্রজ্ঞারূপিণী কামিনী সেবনেই অনুত্তর সিদ্ধি। পদ্ধতি-বিশেষে প্রাণান্তক বিষ মহৌষধে পরিণত হয়। করুণার প্রজ্ঞাসেবনও কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা। সরহপাদ বলেন, সাধক বিষয়ে রমণ করেন, কিন্তু বিষয়ে বিলিপ্ত হন না; জলের উপরে পদ্ম আহরণ করেন—জলে লিপ্ত হন না।[১] কিন্তু

পঞ্চ কামান্ পরিত্যজ্য তপোভি র্ন চ পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্ বোধি যোগতন্ত্রানুসারতঃ ॥—শ্রীসমাজতন্ত্র

এহো বাহ্য। এখানে পুরুষ ও স্ত্রী-তত্ত্ব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক—দেহস্থ নাড়ীর প্রতীক। কামিনী-তত্ত্ব—রজকী শুক্র কর্মরতা, নটী পটুপ্রচারা, চণ্ডালী ক্ষমাশীলা, ডোম্বী ধ্যানপ্রেয়া ও ব্রাহ্মণী অনবদ্য কর্মরতা। ভগিনী (বৎসলা) ললনা-রসনার রূপক, জননী (হিতৈষিণী মাতা) অবধূতীর প্রতীক। প্রজ্ঞা শূন্যতা বা নৈরাত্মা, উপায় মহাকরুণা। প্রজ্ঞোপায় যোগ বলিতে এই শূন্যতা (নৈরাত্মা) ও মহাকরুণার যোগ। দেহ ভোগ নহে, দেহের রূপান্তর সাধনই এই যোগের লক্ষ্য। আর্য বিমলকীর্তি নির্দেশে বলা হইয়াছে,—

"প্রজ্ঞা রহিত উপায়ো বন্ধঃ। উপায়রহিতা প্রজ্ঞা বন্ধা। প্রজ্ঞা সহিত উপায়ো মোক্ষঃ। উপায় সহিতা প্রজ্ঞা মোক্ষঃ।"—'তাদাত্ম্যং চানয়ো

সদ্‌গুরুপদেশতঃ প্রদীপালোকয়োরিব সহজসিদ্ধিমেবাধিগম্যতে।' পরমার্থতঃ প্রজ্ঞা ও উপায় কোন অবস্থাতেই বিযুক্ত নহে। অদ্বয়-বজ্র সংগ্রহের 'প্রেম পঞ্চক' বা 'প্রজ্ঞোপায়োদয় পঞ্চকে' দেখানো হইয়াছে, কান্ত উপায় প্রজ্ঞাবিরহিত হইয়া বদ্ধ, আর কান্তা প্রজ্ঞা উপায়-রহিতা হইয়া মৃতা। ইহা দেখিয়া গুরু উভয়ের ভিতর সহজ প্রেমের বিধান করিয়া দিলেন, ফলে তাঁহারা হইল সদা যুগনদ্ধ। সহজ সাধককেও প্রতিনিয়ত এই সহজপ্রেম বা মহারাগ অব্যাহত রাখিতে হয়। সহজ সাধনায় ইহাই প্রধান ক্রিয়া। এই যোগেই বিষয়-বিশুদ্ধি, এই যোগেই জগৎ নিঃস্বভাব-স্বভাব ও বিকল্প মুক্ত। ইহা এক মহাসুখের অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন, 'শূন্যতাজ্ঞানবজ্র স্বভাবাত্মকোঽহম্' (দ্রষ্টব্য সাধনমালা)।

প্রজ্ঞোপায় যোগের সূত্রঃ প্রজ্ঞোপায়যোগের মূল সূত্র এবং সাধন-ক্রমের সঙ্কেত—'এবং ময়া শ্রুতম্'—এই মহাবাক্য। প্রাচীন বৌদ্ধদের যে কোন পালি গ্রন্থের সূচনা বাক্য—'এবং মে সুতং'—আমি এইরূপ শুনিয়াছি। তেমনই বজ্রযানের প্রত্যেকটি তন্ত্রের সূচনা 'এবং ময়া শ্রুতম্'—এই মহাবাক্য লইয়া। বাহ্য অর্থে উহা—আমা কর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে বুঝাইলেও, উহার গূঢ়ার্থ ভিন্ন। 'এ'=ভগ বা পদ্ম, 'বং'=কুলিশ বা বজ্র, 'ময়া' অর্থ চালন এবং 'শ্রুতম্' এর অর্থ দ্বিবিধ—উৎপত্তি ও উৎপন্ন ক্রম।[২] সহজসাধনার সমগ্র

১. বিসঅ রমন্ত ন বিসঅঁ বিলিপ্পই। উঅর হরই ন পানী ছিপ্পই॥—সরহ-দোহা

২. একারং ভগমিত্যুক্তং বং-কারং কুলিশং স্মৃতম্।
মস্নেতি চালনং প্রোক্তং শ্রুতং যদ্ভুতা দ্বিধামতম্॥—যোগরত্নমালা

রহস্য ইহাতে নিহিত। সাধনের পঞ্চক্রমও ইহাতে সঙ্কেতিত। আসলে 'এ' হইতেছেন প্রজ্ঞা বা শূন্যতা, 'বং' হইতেছেন করুণা বা উপায়, 'ময়া' এতদুভয়ের যোগ এবং 'শ্রুতং' বোধিচিত্তের দ্বিবিধ গতি—সংসার গতি ও সহজ গতি। সহজ সাধনের পঞ্চক্রমও ইহাই : ১. 'এবং' তত্ত্বের জ্ঞান ২. 'এবং' তত্ত্বদ্বয়ের বিশোধন, ৩. 'এবং'-তত্ত্ব দ্বয়ের মিলন বা একীকরণ ৪. 'এবং' যোগে সংবৃত সুখরূপ চিত্তের উৎপত্তি, ৫. 'এবং' যোগে সেই সংবৃত চিত্তের পরমার্থ পরিণতি।

উৎপত্তি ও উৎপন্নক্রম : শেষের দুইটি ক্রমকে ('শ্রুতং' পর্যায়ের দুইটি ক্রমকে) বলা হয় উৎপত্তিক্রম ও উৎপন্ন ক্রম। তন্ত্রকারেরা বলেন, উৎপত্তি ও উৎপন্ন ক্রম অবলম্বনেই বুদ্ধদের উপদেশ :—

ক্রমদ্বয়মুপাদায় দেশনা বজ্রধারিণাম্ ॥
উৎপত্তি ক্রমপক্ষঞ্চ উৎপন্নক্রমমেব চ।

উৎপত্তি ক্রমে কেমন করিয়া বোধিচিত্ত উষ্ণীষ কমল হইতে ক্ষরিত হইয়া ধর্ম-সম্ভোগ কায় অতিক্রম করিয়া নিম্নে নির্মাণকায়ে আসিয়া সংসার-চিত্তে পরিণত হয়, তাহার ক্রম। বোধিচিত্ত-চন্দ্র বিশুদ্ধ, নিস্তরঙ্গ। তাহা 'হং' রূপে আছেন উষ্ণীষ কমলে; আর অ-কারজা নৈরাত্ম্যা আছেন নির্মাণ-কায়ে। 'এবং' যোগে চণ্ডালী প্রজ্জলিত হইলে উষ্ণীষ কমলস্থিত নিস্তরঙ্গ শূন্য নিষ্পন্নবিজ্ঞানরূপী বোধিচিত্ত-চন্দ্র 'হং' ক্ষরিত হইয়া পঞ্চাকার পঞ্চতথাগতরূপে ধর্মকায়ে আসেন। তথা হইতে সম্ভোগকায়ে আসিয়া বিংশত্যাকার আয়তন (পঞ্চস্কন্ধ, পঞ্চধাতু, পঞ্চ বিজ্ঞান ও পঞ্চভূত) লাভ করেন এবং সেখান হইতে নির্মাণকায়ে অ-কারের সহিত মিলিত হইয়া পার্থিব 'অহং'-এ পরিণত হইয়া মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া তৃষ্ণা-জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অধীন হন। ইহাই 'এবং'-যোগে (প্রজ্ঞোপায় যোগে) বোধি চিত্তের উৎপত্তি ক্রম। এখানে চিত্ত সংবৃত। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়া জীব-জন্মেরই প্রক্রিয়া।

উৎপন্ন-ক্রমে এই চিত্ত আবার সাধন-কৌশলে ঊর্ধ্বগতি লাভ করিয়া সহজ নিষ্পন্দ গতি লাভ করে। এখানেও প্রজ্ঞোপায় যোগে ('এবং' যোগে) নির্মাণ-কায়ে চণ্ডালী জ্বলিয়া ওঠে। দগ্ধ হয় মায়াজাল; ক্রমে সম্ভোগকায়ে দগ্ধ হয় বিংশতি আকার আয়তন—ধর্মকায়ে পঞ্চাকার পঞ্চতথাগত। তখন উষ্ণীষ কমল প্রস্ফুটিত হয়, সেইখানে আসিয়া সহজ মহাসুখে পরিণত হন 'অহং' চিত্ত।[১] এ

১. চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ দহতি পঞ্চতথাগতান্।
দহতি লোচনাদীন্ দগ্ধে হং স্রবতে শশী ॥—হেবজ্র ১।১।৩১.

'অহং' মহাসুখরাজ, সহজস্বভাব, সর্বশূন্য-সম্বোধি অথচ মহাকরুণা। সহজ সাধকের লক্ষ্য ইন্দ্রিয় সহ দেহের ও চিত্তের পরাবৃত্তি সাধন (Retroversion বা Involution) সহজ-সাধনের এই ক্রম ও গূঢ়ার্থ না বুঝিলে সহজসাধন সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে।

আদিকর্ম ঃ কিন্তু এই প্রজ্ঞোপায় যোগ সাধনের পূর্বে অন্যান্য কতকগুলি ক্রিয়া অবশ্য করণীয়। এগুলিকে বলা হয় আদিকর্ম। এগুলি প্রজ্ঞোপায়-যোগের ভূমিকা এবং সকল যোগেরই পরিকর।

মাধ্যমক সম্প্রদায়ে ও যোগাচারে পারমিতার অনুশীলন ছিল সাধনের অঙ্গ। সহজসাধনায় পঞ্চ পারমিতার (দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য ও ধ্যান) অনুশীলনকে আদিকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রজ্ঞা-সেবনকে রাখা হইয়াছে শেষ পর্যায়ে। তৎপূর্বে সাধককে শরীর শুদ্ধ করিয়া মনোরম স্থানে সুখাসনে বসিয়া পাপদেশনা, পুণ্যানুমোদনা, আত্মনির্যাতনা প্রভৃতির ভাবনা করিয়া দান-শীলাদি পঞ্চ পারমিতা অনুশীলন পূর্বক বোধিচিত্ত উৎপাদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া গুরুর সমীপে উপনীত হইতে হইবে। গুরুই আচার্য। আচার্য তিনি, যিনি পাপক ধর্ম হইতে দূরে থাকেন ('আরাদ্দূরং পাপকেভ্যো ধর্মেভ্যশ্চরতীতি আচার্যঃ'—যোগিনীতন্ত্র)। তিনি শিষ্যকে উপদেশ দান করিবেন—প্রাণি-হত্যা করিও না, অসত্য হইতে দূরে থাকিও ইত্যাদি। তৎপরে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাত্মক ব্রহ্মবিহার শিক্ষা দিবেন। শিষ্য তখন সেই অনুসারে বুদ্ধ, গুরু ও বোধিসত্ত্বদের বন্দনা করিয়া এই সঙ্কল্প উচ্চারণ করিবেন,

স্বপরার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত আমি বোধিচিত্ত উৎপাদন করিব।

আমি বোধিচর্যা পালন করিব। আমি জগদ্ধিতায় বুদ্ধ হইব।[১]

গুরু তখন শিষ্যকে মণ্ডল প্রবেশ করাইয়া, প্রজ্ঞোপায় যোগ বা বজ্র-যোগের গূঢ় কৌশল শিক্ষা দিয়া মুদ্রা দান করিবেন।

সেক-বিধান ঃ যাহাকে বলা হয় অভিষেক, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহাই 'সেক'। মল ক্ষালণের উদ্দেশ্যে সিঞ্চন ও স্বপনকেই বলা হয় সেক ('সিচ্যতে স্নাপ্যতে অনেন সেক ইত্যভিধিয়তে')। সেক শুধু মলাপকর্ষণী নহে, সেক তত্ত্বের সাক্ষাৎ

---

১. উৎপাদয়ামি বরবোধিচিত্তং নিমন্ত্রয়াম্যহং সর্বসত্ত্বান্ ।।
ইষ্টাং চরিষ্যে বরবোধিচারিকাং বুদ্ধোভবেয়ং জগতোহিতায় ।।—সাধনমালা

প্রতীতি ('অভিষেকাদ্ জায়তে এবংকারং মহৎসুখং'—হেবজ্র)। সহজসাধনায় এই সেকের গুরুত্ব অসাধারণ। আদিকর্মও প্রথম সেকের অন্তর্গত। কোন-কোন তন্ত্রে, যেমন কালচক্রতন্ত্রে একাদশ প্রকার সেকের উল্লেখ ও ক্রিয়া দেখা যায়—উদক, মুকুট, পট্ট, বজ্রঘণ্টা, বজ্রব্রত, নাম ও অনুজ্ঞা—এই সাতটি লৌকিক অভিষেক; তৎপরে চারিটি লোকোত্তর অভিষেক—কলশ (কুম্ভ), গুহ্য, প্রজ্ঞা এবং চতুর্থ অভিষেক। প্রথম সাতটি অভিষেক প্রকৃতপক্ষে কায়, বাক্, চিত্ত ও জ্ঞানবিশুদ্ধির সাধারণ অভিষেক; এগুলি প্রকৃতপক্ষে আদিকর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। শেষের চারিটি অভিষেকই বজ্রযোগ বা লোকোত্তর বা অনুত্তর যোগের অভিষেক। হেবজ্র তন্ত্রে এবং উহার টীকা যোগরত্নমালায় এই শেষোক্ত চারিপ্রকার সেকের কথাই বলা হইয়াছে :

> সেকং চতুর্বিধং খ্যাতং সত্ত্বানাং হিতহেতবে।
> সিচ্যতে স্নাপ্যতে চ এতে চত্বারঃ সেকাঃ প্রভেদতঃ ॥

আচার্য, গুহ্য, প্রজ্ঞা ও চতুর্থ অভিষেক—এইগুলিই বস্তুতঃ মহারাগনয় বা প্রজ্ঞোপায়যোগের সেক। এই সকল সেকে অধিকারী ভেদ স্বীকার করা হয়। সকলের জন্য সকল অভিষেক নহে। মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর ভেদে অধিকারী চারপ্রকার। মৃদু-ইন্দ্রিয় শিষ্যের জন্য আচার্য অভিষেক, মধ্য-ইন্দ্রিয় অধিকারীর পক্ষে গুহ্য, অধিমাত্রের জন্য প্রজ্ঞা, অধিমাত্রতর ব্যক্তির জন্য চতুর্থ অভিষেক। একই ব্যক্তি উত্তরোত্তর অভ্যাস-প্রকর্ষের ফলে উচ্চতর অধিকার লাভ করিতে পারেন। এযেন সত্তার ক্রমোত্তরণ ও ক্রমাভিব্যক্তি। সর্বশেষ স্তরের সত্ত্বই দশভূমীশ্বর বোধিসত্ত্ব অথবা বজ্রসত্ত্ব। প্রত্যেকটি স্তরের মুদ্রাও পৃথক পৃথক। মৃদু ইন্দ্রিয়ের কর্মমুদ্রা, মধ্যের সময়মুদ্রা অধিমাত্রের ধর্মমুদ্রা এবং অধিমাত্রতরের মহামুদ্রা। মহামুদ্রা-সিদ্ধিই সহজসিদ্ধি।

প্রথমে আচার্য-অভিষেক। ইহাকে কলশ বা কুম্ভাভিষেকও বলা হয়। আচার্য এখানে শিষ্যকে ক্রিয়াতন্ত্রাদির উপদেশ দান করেন, যোগিনী-তন্ত্রের শ্রুতি-চিন্তা-ভাবনা করণার্থ শিক্ষা দিয়া নিরীর্ষ্য ক্রোধবর্জিত শিষ্যকে 'কর্মমুদ্রা' প্রদান করেন এবং বলেন, 'গৃহ্ণ মুদ্রাং সুখাবহম্', 'কুন্দুরং কুরু বজ্রধৃক্'।

মুদ্রা বলিতে সাধারণ অর্থে বোঝায় 'করস্ফোট' অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বারা সূচিত কতকগুলি চিহ্ন। কিন্তু আভিপ্রায়িক অর্থে মুদ্রা বলিতে বোঝায় পার্থিব জগতের

'যোষিৎ'। এই মুদ্রা কুলভেদে পৃথক—ডোম্বী, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী ও চণ্ডালিনী। 'কুন্দুর' শব্দের সাধারণ অর্থ 'দ্বি-ইন্দ্রিয় যোগ'। মুদ্রা সহ কুন্দুর বলিতে নর-নারীর মিলনকেই বোঝায়। হয়তো বৌদ্ধতন্ত্রে এই ধরনের স্থূল মিলন, মৃদু অধিকারীর জন্য অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু গূঢ় তন্ত্রার্থে এই মুদ্রা, এই কুন্দুর সম্পূর্ণ প্রতীকধর্মী। বিশেষতঃ সহজ সাধনায় মুদ্রা দেহস্থ নাড়ী—তাহা শূন্যতা জ্ঞানরূপিণী প্রজ্ঞা। আর সাধক নিজে করুণা বা উপায়; তাহাও দেহের কোন নাড়ী। এই দুই নাড়ীর মিলন-যোগই 'প্রজ্ঞোপায়-যোগ।' নর-নারীর সাধারণ মিলনে যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাই গূঢ়ার্থে চিত্ত। কর্মমুদ্রাসহায়ে এই চিত্ত উৎপন্ন হয় নির্মাণকায়ে। কিভাবে, কোন্ প্রক্রিয়ায় নাড়ী ও বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া চিত্তোৎপাদ সম্ভব—তাহাই আচার্য-অভিষেকের লক্ষ্য। কর্মমুদ্রা যোগে চিত্তনির্মাণে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা সুখস্বভাব। বস্তুজগতে নারীই সেই সুখের কারণ, এইজন্য নারী বা মুদ্রা সুখরূপিণী। এ যোগেও চতুঃক্ষণে (বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ) চতুরানন্দের (আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ) তরঙ্গ জাগে। কিন্তু সে আনন্দ অকৃত্রিম সহজাখ্য আনন্দ নহে দর্পণার্পিত মুখের প্রতিবিম্ব যেমন প্রকৃত মুখ নহে, সহজানন্দের সদৃশ হইলেও এ আনন্দ প্রতিবিম্বই মাত্র। বালযোগীরা ইহাকেই সহজানন্দ বলিয়া ভ্রম করে।

দ্বিতীয় অভিষেক গুহ্য অভিষেক। আচার্য অভিষেকে প্রজ্ঞোপায়-যোগে যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সম্ভোগ গুহ্য অভিষেকে সম্পন্ন হয়। এখানকার প্রজ্ঞা বা মুদ্রা সময়মুদ্রা। সময়মুদ্রা তিনি, যিনি স্বচ্ছ সম্ভোগ-নির্মাণ কায়াকার। তিনি সাধকের চিত্তে সহজানন্দের বিস্ফুরণ ঘটান, আদর্শ সমতা প্রত্যবেক্ষণা আনয়ন করেন। উপায়রূপী বোধিসত্ত্ব এখানে সময়সত্ত্ব। সময়মুদ্রার সহিত নিত্য যুক্ত বলিয়াই উপায় বা করুণার নাম সময়সত্ত্ব। তন্ত্রবাক্যও এই কথাই বলে, 'নিত্য সময়প্রবৃত্তাৎ সময়সত্ত্বোঽভিধিয়তে' (হেবজ্র)। সময়সত্ত্ব মধ্য ইন্দ্রিয়ের সত্ত্ব। এখানে মৃদু মধ্যমে পরিণত হয়। এখানেও আনন্দ জাগতিক স্তরের—নাম পরমানন্দ। সম্ভোগের স্থান কণ্ঠ বা সম্ভোগচক্র। প্রপঞ্চসম্ভোগের এই যে তত্ত্ব, তাহা অপ্রকাশ্য বলিয়াই গুহ্য। প্রকৃতপক্ষে গুহ্য অভিষেকে বামগা নাড়ী চন্দ্রতত্ত্বের সহিত দক্ষিণা নাড়ী সূর্যতত্ত্বের মিলন ঘটে। সে মিলন অনবচ্ছিন্ন। এই অনবচ্ছিন্ন যোগে ধর্মমুদ্রা-সম্ভোগের দ্বার উন্মোচিত হয়।

তৃতীয় অভিষেক প্রজ্ঞা অভিষেক। এখানকার মুদ্রা ধর্ম মুদ্রা। উহা তত্ত্বতঃ অবধূতী মার্গে চিত্তের উত্তরণ। অবধূতী ললনাও নহে, রসনাও নহে। উহা গ্রাহকও নহে, গ্রাহ্যও নহে। অবধূতী গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিতা। ধর্মমুদ্রাও 'ধর্মধাতুস্বরূপা, নিষ্প্রপঞ্চা নির্বিকল্পা, অকৃত্রিমা, উৎপাদরহিতা, করুণাস্বভাবা'। এই মুদ্রার সহিত যোগের উপদেশই প্রজ্ঞা-অভিষেকের লক্ষ্য। এই যোগে বজ্রচিত্ত গঠিত হয়। জাগতিক আনন্দের বিরামে বিরমানন্দের অনুভব জাগে। সাধক এখন মহাসত্ত্ব ('মহাজ্ঞান রসৈঃ পূর্ণো মহাসত্ত্বো নিগদ্যতে'—হেবজ্র)'—অর্থাৎ সাধক এখানে অধিমাত্র, তিনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। যোগরত্নমালায় সুন্দর ভাবে এই অভিষেকের ক্রিয়া ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হইয়াছে: 'প্রকৃষ্ট জ্ঞানং প্রজ্ঞা। সর্বধর্ম স্বচিত্তমাত্রাজ্ঞানং তৎপ্রতিপাদনার্থং অভিষেকঃ প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকঃ' এখানে কল্পিত-পরতন্ত্র-পরিনিষ্পন্ন বিজ্ঞানত্রয় যে এক, নাড়ীগুলি যে এক, সেই জ্ঞান জন্মে। ধর্মমুদ্রাভিষেকে মহামুদ্রা সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা অবারিত হয়।

চতুর্থ অভিষেককে তন্ত্রে 'চতুর্থ' অভিষেকই বলা হইয়াছে। উহা দ্বারা মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার ঘটে। মহতি যে মুদ্রা তাহা মহামুদ্রা, উহা নিঃস্বভাবা, জ্ঞেয়াদি-আবরণ বিবর্জিতা, শরৎকালের মধ্যাহ্ন গগনের মত নির্মল, 'ভবানির্বাণৈকরূপা অনালম্বন করুণাশরীরা মহাসুখৈকরূপা' (অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ)। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে ইহাকেই—'আকাশমেব নির্লেপাং নিষ্প্রপঞ্চাং নিরক্ষরাং' রূপে বন্দনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইনিই সর্বশূন্যা 'অ-কারজা', উহাতেই 'অমনসিকার'—অমন ধর্মে প্রতিষ্ঠা। উত্তপ্তরবীয় অধিমাত্রতর সাধক এই অভিষেকে স্বসংবেদ্য সহজতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন।

উপরে চারিটি অভিষেকের কথা বলা হইলেও এই অভিষেক প্রকারান্তরে আটটি। সমগ্র সহজ-সাধন প্রধানতঃ দুইটি ক্রমে বিভক্ত: উৎপত্তিক্রম ও উৎপন্ন বা নিষ্পন্ন ক্রম। একটি ক্রম চিত্তের উৎপত্তি বিষয়ক, অপরটি সংবৃত্তি চিত্তের পরাবৃত্তি বিষয়ক। প্রথমটিতে কিভাবে শূন্য নিস্তরঙ্গ বিজ্ঞানরূপী বোধিচিত্ত উষ্ণীষ চক্র হইতে ধর্ম সম্ভোগ কায়ের ভিতর দিয়া নির্মাণ চক্রে স্থূলরূপ ধারণ করে, অচিত্ত চিত্ত-চৈতসিকের অধীন হয়—তদ্‌বিষয়ক অভিষেক। তাহাও আচার্য, গুহ্য, প্রজ্ঞা ও চতুর্থ ভেদে চারিপ্রকার। উহা পার্থিব জগতের নর-নারীর মিলনরূপকে, দেহস্থ নাড়ীর যোগের কথা; তাহার

ফলে সুখরূপ শুক্র বা সংবৃত্তি চিত্তের উৎপাদনের কথা। অপরটি নিষ্পন্ন ক্রমে এই সংবৃত্তি চিত্তের রূপান্তরীকরণের কথা। এখানেও আবার 'তৎপুনঃ' —আচার্য, গুহ্য, প্রজ্ঞা ও চতুর্থ অভিষেকের প্রসঙ্গ। প্রথমটিতে চিত্তের অবরোহণ, দ্বিতীয়টিতে চিত্তের পুনরারোহণ। উৎপত্তি ক্রমে, প্রজ্ঞোপায় যোগে চিত্তের উৎপত্তি হইলে, শিষ্যের প্রতি গুরুর চরম উপদেশ—

'শাস্তা ক্রয়াৎ মহাসত্ত্ব ধারণীয়ং মহৎসুখম্'

এই মহৎসুখ বা শুক্র বা চিত্তের অস্খলিত রূপে ধারণ হইতেই সাধনায় উৎপন্নক্রমের সূচনা। সেখানে গুরু শুধু উপদেশই দেন, ক্রিয়া ও অনুভব শিষ্যের নিজের—কারণ মহাসুখ স্বসংবেদ্য। তন্ত্র বলেন, 'আত্মনা জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্ গুরুপর্বোপসেবয়া।' গুরুর উপদেশ লাভ করিয়া ষড়ঙ্গযোগে সে মহাসুখের সংবেদন শিষ্যকেই লাভ করিতে হয়। উৎপন্নক্রমপক্ষে প্রজ্ঞোপায়-যোগের (বজ্রযোগের) বিপরীত অভিসম্বোধি ও প্রতিপত্তি সাক্ষাৎকৃত হয়।

প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি ও সমাধি—এইগুলিই ষড়ঙ্গ যোগের অঙ্গ। রূপাদি বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্তিই 'প্রত্যাহার'। প্রত্যাহারে যোগী মন্ত্রসিদ্ধ হন। পঞ্চবুদ্ধাকারে সকল ধর্মের ভাবনা 'ধ্যান'। ধ্যানে দিব্য চক্ষু ও দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়। 'প্রাণায়ামে' ললনা-রসনার নিরোধে প্রাণ মধ্যমা-বাহী হয়। ফলে শুদ্ধ সৎ দর্শন হয় এবং নিমিত্ত দর্শন (ধূমাদি দর্শন) ঘটে। 'ধারণা'য় নাভিতে চণ্ডালী জ্বলিয়া উঠে, তথাগতাত্মক সৃষ্টি দগ্ধ হয়, সহজকমলে চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ায় সর্বাঙ্গ অমৃতধারায় আপ্লাবিত হয়। 'অনুস্মৃতিতে' সংবৃত্তি সত্যাকারে জগৎ স্ফুরিত হয় এবং প্রভামণ্ডল উদিত হয়। 'সমাধি'তে জ্ঞেয়-জ্ঞান একলোলীভূত হওয়ায় স্থাবর-জঙ্গম সংহৃত হইয়া যায় এবং একরস প্রভাস্বর মহাসুখ সাক্ষাৎকার ঘটে।

চর্যাগানে সহজ সাধন-প্রসঙ্গ

চর্যাগানগুলির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় মহাসুখ লাভের উদ্দেশ্যে সাধকদিগের 'দুষ্কর ব্রত চরণ' অর্থাৎ চর্যা। কিন্তু এই চর্যা তন্ত্রোল্লিখিত আদিকর্ম বা প্রাথমিক চর্যা নহে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি ক্রিয়া, চর্যা, যোগ, অনুত্তরযোগ ভেদে নানা পর্যায়ে বিভক্ত। ক্রিয়া-চর্যা-যোগ তন্ত্রগুলি নিম্নাধিকারীর তন্ত্র। মৃদু-মধ্য-অধিমাত্র সাধকদের লক্ষ্যেই সেগুলি রচিত। কিন্তু সহজ সাধকের

লক্ষ্য 'আহুতু ধাম'—অনুত্তর সহজানন্দের ধাম। সে ধামে পৌঁছিয়া যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই চর্যাগীতির রচয়িতা। এই সকল সিদ্ধাচার্য—অনুত্তর-যোগে সিদ্ধ 'অনুত্তর সামী'। তাঁহাদের তন্ত্র অনুত্তর যোগতন্ত্র। তাহার সাধন ও চর্যা অতি উত্তম স্তরের সাধন ও চর্যা। যেখানে ক্রিয়া-তন্ত্রের শেষ, সেইখানে সহজচর্যার শুরু।)

অনেকেই মনে করেন, কালানুক্রমিকতার দিক হইতে সহজযান বজ্রযানের শেষস্তর অর্থাৎ উহা বৌদ্ধতন্ত্রের সর্বকনিষ্ঠ রূপ। আমাদের তাহা মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, বৌদ্ধ তন্ত্রযানের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ সহজযান। সেখানে পৌঁছিবার সোপান ক্রিয়া-চর্যা-যোগাদি-তন্ত্র। হিন্দুতন্ত্রে যেমন অধিকারী ভেদে ভাব ও আচার ক্রমবিন্যস্ত; পশু, বীর প্রভৃতি ভাব অতিক্রম করিয়া দিব্যভাব ও দিব্যাচার ('দিব্যভাবং মহৎভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমম্')—তেমনই বৌদ্ধ তন্ত্রে সহজের স্তর। সহজিয়া সাধক দিব্যভাবের সাধক।

(চর্যাগীতির সাধন-বিষয়ক চর্যাগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এখানে তন্ত্রের উৎপত্তিক্রমের প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত।) যে ক্রমে কর্মমুদ্রা প্রসঙ্গে স্থূল বজ্রযোগে চিত্ত উৎপন্ন করিতে হয়, মেলাপক স্থানে কুলকন্যা ও কুলীনের দেহসংযোগ ঘটে—চর্যাগানে তাহার প্রসঙ্গ নাই। এখানে সাধক 'সহজ-উন্মত্ত'। (এখানে উৎপন্ন চিত্তকে উৎপন্ন ক্রমে পরিশুদ্ধ করিয়া, ললনা-রসনার গতি রুদ্ধ করিয়া, অবধূতিকা মার্গে চালনা করাই সাধকদের একমাত্র লক্ষ্য। সিদ্ধাচার্যগণ অবধূতী-প্রেমিক।) তাঁহাদের মহারাগনয়ের সাধন যোগিনী নৈরামণিকে কেন্দ্র করিয়া। শুধু তাহাই নহে, চিত্তের ঊর্ধ্বায়নই তাঁহাদের দেহ-সাধনার মূল আদর্শ। এই ক্রিয়ায় বিশুদ্ধ বোধিসত্ত্ব, সময়সত্ত্ব ও মহাসত্ত্বের স্তর অতিক্রম করিয়া, বজ্রসত্ত্বে রূপান্তরিত হন। ইহা হইল জীবনের গতিকে আসক্তির পথ হইতে ঘুরাইয়া উন্নততর আনন্দের দিকে চালনা করা। তাঁহাদের অভিষেক চতুর্থ অভিষেক, তাঁহাদের ক্রিয়া চতুর্থ অভিষেকের পরবর্তী ক্রিয়া, তাঁহাদের প্রাপ্তি—সর্বশূন্যতা, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও চতুর্থ আনন্দ। চতুর্থ তুরীয় স্তরই তাহাদের জিনপুর বা মহাসুখচক্র।

মহাসুখলাভের পথে চর্যাসাধকেরাও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মকে অসার বলিয়াই মনে করিয়াছেন। মহারাগনয়ে যে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নাই, তাহা তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। লুইপাদ বলেন,

থেরবাদীদের চর্ব সমাধিসমূহে কি হইবে? কুশলছন্দ লাভের নিমিত্ত হঠ-যোগের প্রক্রিয়া, আসন-বন্ধ ও করণাদিও মহারাগনয়ে নিষ্ফল :

সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥
এড়িএড় ছান্দক বান্ধ-করণ-কপাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহুরে পাস ॥—১

সরহপাদ বলেন, জন্মমৃত্যু রোধের জন্য কেহ কেহ রস-রসায়ণ সাধন করেন। অচিন্ত্য যোগীদের নিকট জন্ম-মৃত্যু সমান—'জীবন্তে মঅলে ণাহি বিশেসো'। কাজেই মৃত্যুভয়ে যিনি কাতর, তিনি রস-রসায়ণের আকাঙ্ক্ষা করুন,

জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা।
সো করউ রসরসানেরে কঙ্খা ॥—২২

নির্বাণ লাভের নিমিত্ত কেহ কেহ তন্ত্র পাঠ করেন, কেহ কেহ ধ্যান-ব্যাখ্যান করেন, কেহ কেহ বাহ্য মন্ত্রজাপ করিয়া থাকেন। দারিকপাদ বলেন, এগুলির কি প্রয়োজন? অপ্রতিষ্ঠান মহাসুখলীলা দ্বারা যে দুর্লক্ষ্য নির্বাণ লাভ হয়—ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে
কিন্তোরে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীলেঁ
দুলখ পরমনিবাণে ॥—৩৪

কাহ্নপাদ আগম, পুথি, ইষ্টমন্ত্র জপের মালারও অসারতা ঘোষণা করিয়াছেন। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, আগম-বেদ-পুরাণ পাঠ করিয়া যাঁহারা পণ্ডিতম্মন্য, তাঁহারা সহজানন্দের আস্বাদ লাভ করিতে পারেন না। ভ্রমর যেমন পক্ব শ্রীফলের গন্ধামোদে বিহ্বল হইয়া ফলের বাহিরেই ভ্রমণ করে, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, বেদ-পুরাণে-অভিমানী পণ্ডিতের দশাও সেইরূপ।[১] আর চর্যাগানে তিনি বলিতেছেন, আগম-পুথি মনোগোচর সঙ্কল্প-বিকল্পজাল। 'বাক্‌পথাতীত' সহজকে ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই (৪০)

বস্তুতঃ যাহা স্বসংবেদ্য, তাহা তো শাস্ত্র ব্যাখ্যাগম্য নহে; তাহা বাহিরের

১. আগমবেঅপুরাণেঁ পণ্ডিআ মাণ বহন্তি।
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি ॥—দোহা

কতকগুলি ক্রিয়ার সমষ্টিও নহে। মহাসুখের পথ মহারাগনয়—শূন্যতা ও করুণার মেলন ; স্বাধিষ্ঠান চিত্তকে প্রভাস্বরের সঙ্গে যুক্ত করা।

(তবু সহজসাধনা ক্রিয়াহীন নহে। যোগ ও তন্ত্রের অনেক ক্রিয়াই ইহার অন্তর্ভুক্ত। উহাতে দেহতত্ত্বের জ্ঞানও অত্যাবশ্যক। দেহস্থ চিত্তের সাংবৃত স্পন্দকে স্থির করিয়া নিস্তরঙ্গভাবে ঊর্ধ্বে চালনা করিতে হইলে নাড়ীর গতি-প্রকৃতি, চক্রের সংস্থান ও আনন্দস্পন্দকে অবশ্যই বুঝিতে হইবে।)

॥ নাড়ী-প্রসঙ্গ ॥

(চর্যাগীতিতে বহুস্থলে নাভির অধঃস্থ শুক্রনাড়ী এবং নাভির ঊর্ধ্বে ললনা-রসনা-অবধূতীর প্রসঙ্গ আসিয়াছে। প্রসঙ্গগুলি আসিয়াছে রূপকের ভাষায়।)

গানে বামগা নাড়ী ললনার নাম—ধমণ (১), চন্দ্র (৪), আলি (৭), সোনা(৮), এ (৯), শূন (১৩), গঙ্গা (১৪), সংহার (১৪), শশী (সসি ১৭), নির্বাণ (১১), অভাব (২৯), বিন্দু (৩২, ৪৪)।

দক্ষিণা নাড়ী রসনার নাম—চমণ (১), সূর্য (৪), কালি (৭), করুণা (৮), বং (৯), যমুনা (১৪), সৃষ্টি (১৪), রবি (৩২), ভব (১৯), ভাব (২৯), ও নাদ (৪৪)।

ললনা-রসনা নাম দুইটি কোন চর্যাগানে পাওয়া যায় না। চর্যাটীকা হইতে এই নাম দুইটি পাওয়া যায়। টীকা হইতে বামগা নাড়ীই যে ললনা, প্রজ্ঞা, গ্রাহক, আলোকজ্ঞান, বাক্ ও রাত্রি—তাহা জানা যায়। এবং দক্ষিণা নাড়ী—রসনা, উপায়, গ্রাহ্য, আলোকাভাস, কায় ও দিবা।

যুক্তভাবে চর্যাগানে এই দুই নাড়ীকে বলা হইয়াছে—ধমণ-চমণ (১), চন্দ্র-সূর্য (চান্দসুজ ৪, ১৪), আলিকালি (৭), 'এবং' (৯), 'দুআ' (১২) সুন-করুণা (৩৪), ভব-নির্বাণ (১৯), ভাবাভাব (৩০), গঙ্গা-যমুনা (১৪), সৃষ্টি-সংহার (১৪), বামদাহিণ (১৪, ১৫), খাল-বিখলা (৩২), রবি-শশী (১১, ৩২), বিন্দুনাদ (বিন্দুনাদ-৪৪) ও সোণ-রুঅ (৪৯)।

চর্যাটীকায় ললনা-রসনার যুক্ত নাম—আলোকজ্ঞান-আলোকাভাস (৭), কায়-বাক্, দিবা-রাত্রি, যোগ-যোগিনী (৭), গ্রাহ্য-গ্রাহক, প্রজ্ঞা-উপায় (৪৪)।

টীকায় পাওয়া যাইতেছে তন্ত্রোক্ত পারিভাষিক নাম ; গানে কোথায়ও কোথায়ও পারিভাষিক নাম গৃহীত হইলেও অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে কাব্যকল্পনায় উদ্ভাসিত নাম।

চর্যার সাধক-কবিদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে ললনা-রসনার

মধ্যবর্তী নাড়ী 'মঝবেণী' (১৩) অবধূতীর প্রতি। অবধূতী সাধকদের শ্রেষ্ঠা প্রিয়তমা—তাঁহার নামকরণেও কাব্যালঙ্কার নিঃশেষিত। চর্যাগানে ইনি শূন্যতা পক্ষ (সুনপাখ ১); অবধূতী মার্গ ('মাগে অবধূই'—২৭), শূন্যতা মার্গ (সুনত মাঙ্গ—১৩) বা শুধু মার্গ (মাঙ্গ—৯), গগন সমুদ্র (গঅণ সমুদা—৩৫); ইহাই রাজপথ (১৫), 'উজুবাট' (১৫), অনাহত দাঁড়া (অণহা দাণ্ডী কিঅত অবধূতী—১৭)। মুদ্রা বা যোগিনীরূপে অবধূতীই 'কামিনী'—কোথাও বিয়াতী, বহুড়ী (২) শুণ্ডিনী (৩), কোথাও সাধকের প্রিয়া যোগিনী—জোইনি (৪), ডোম্বী (১০, ১৪, ১৮, ১৯), বুড়িলী মাতঙ্গী (১৪), কমলিনী(২৭) ও গৃহিণী (ঘরিণী ৪৯)। অবধূতী 'পুলিংদা' (নপুংসক ১৪), অতএব ইনিই মহাসুখচক্রের ঢলী (২), বন্ধ্যা গাভী ('গবিআবাঁঝে'—৩৩), যোগিনী 'নিরামণি', 'সহজসুন্দরী' ও 'শবরী' (২৮)।

গানেও অবধূতীর দুইটি রূপ : অপরিশুদ্ধা ও পরিশুদ্ধা। নাভির অধোভাগে শুক্র নাড়িকাও অবধূতী, তাহা অপরিশুদ্ধা। নাভির ঊর্ধ্বভাগে অবধূতীও সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধা নহে ; নির্মাণ-সম্ভোগের মধ্যবর্তী অবধূতী সাত প্রকার প্রকৃতি দোষের আকর। ধর্মকায়ের বিরমানন্দ অবধূতী পরিশুদ্ধ—উহাই প্রজ্ঞাসমুদ্র বা গগন। সাধকচিত্তের প্রধান লক্ষ্য অপরিশুদ্ধা অবধূতীকে বিনাশ বা বিশুদ্ধ করিয়া এই প্রজ্ঞা-সমুদ্রে প্রবেশ করা। চর্যাগানে অপরিশুদ্ধা অবধূতীকে কখনও বলা হইয়াছে 'শুণ্ডিনী', সে মদ চোলাই করে, বারুণি বান্ধে (৩)। ২ সংখ্যক গানে ইনি দুশ্চরিত্রা বিয়াতি বহুড়ী, তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসেন। কাহ্নপাদ বায়ুরূপা অপরিশুদ্ধা ডোম্বীকে বলিয়াছেন 'বিরুআ' (বিরূপা), 'চ্ছিণালী' (১৮) ; সে সরোবর ভাঙ্গিয়া মৃণাল ভক্ষণ করে—'সরবর ভাঞ্জীঅ খাঅ মোলাণ' (১০)। কিন্তু এই অবধূতীই আবার পরিশুদ্ধা অবস্থায় শুদ্ধা যোগিনী—'বুড়িলী মাতঙ্গী' (১৪), কামরূপের যাত্রী ('কামরু জাঅ' ২)। একই অবধূতী দ্বিচারিণী—কখনও দেহ-ভোগে আসক্তা, কু-লীন (দেহমগ্ন) জনের পরিচারিণী—কখনও 'কপালিনী' (১৮), অঙ্কপালী (৪)। গুণ্ডরীপাদ বলেন, যে যোগিনী মোহাবলিপ্তা, তিনিই আবার মহাসুখপথের যাত্রী :—'মণিমূলে বহিঅ। ওড়িআণে সমাঅ ।।—৪

॥ কায় বা চক্র ॥

(নির্মাণ, ধর্ম, সম্ভোগ প্রভৃতি পারিভাষিক নাম না থাকিলেও চর্যাগীতিতে কবিতার ভাষায় চক্র বা পদ্মগুলির কথাও বলা হইয়াছে। চর্যাগান কবিতা,

কাজেই শাস্ত্রীয় শব্দগুলি এখানে অলঙ্কৃত ও রূপিত। চৌষট্টি দলযুক্ত নির্মাণ-কায় এখানে চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্ম—'এক সো পদুমা চৌসঠী পাখুড়ী।')

৪ সংখ্যক গানে ইহাকে বলা হইয়াছে 'মণিমূল'। এই নির্মাণচক্রেই অপরিশুদ্ধ সংবৃত সংসার-চিত্তের বিশোধন হয়, ঊর্ধ্ব যাত্রায় চিত্তের নব নির্মাণ ঘটিয়া থাকে। আচার্য কাহ্নপাদ দাবা খেলার রূপকে তাই ইহাকে বলিয়াছেন, 'চউষট্‌ঠি কোঠা' যুক্ত দাবাখেলার ছক বা পিঁড়া ('করুণা পিহাড়ি'—১২)।

সম্ভোগচক্রের স্থান কণ্ঠ। চর্যাগীতিতে সর্বত্রই সম্ভোগচক্রের পরিবর্তে 'কণ্ঠ' শব্দটিই ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধকের সময়মুদ্রা-সম্ভোগ এই কণ্ঠে। কাহ্নপাদ ডোম্বীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, বিদ্বজ্জন তোমাকে কণ্ঠ হইতে পরিত্যাগ করে না ('বিতুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠে ন মেলঈ'—১৮)। টীকাকার বলেন, এই কণ্ঠ সম্ভোগচক্র ('কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে' টীকা ১৮)। ২৮ সংখ্যক গানে দেখা যায়, শবরী বালিকা গ্রীবায় গুঞ্জামালা ধারণ করিয়াছেন—'গীবত গুঞ্জরি মালী'। টীকাকার বলেন এই 'গ্রীবা' সম্ভোগচক্র ('গ্রীবায়াং সম্ভোগচক্রে'—টীকা ২৮)। এই চর্যাতেই শবর শূন্য নিরামণিকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহাসুখে রাত্রি প্রভাত করিলেন ('সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই'—২৮)। টীকাকার বলেন. এই কণ্ঠ সম্ভোগচক্র। ৫০ সংখ্যক গানেও 'কণ্ঠে নৈরামণি বালি' অংশের ব্যাখ্যায় টীকাকার কণ্ঠকে সম্ভোগচক্র বলিয়াছেন।

'ধর্মকায় 'শব্দটি স্পষ্টতঃ চর্যাগানে নাই। বিরমানন্দ অবধূতী-মার্গই ধর্ম-কায়ের স্থান। টীকাকার মুনিদত্ত একাধিকবার 'বিরমানন্দ অবধূতী'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। এই কায়েই বজ্রচিত্ত গঠিত হয়। সাধকের মার্গাভ্যাস বা প্রবাহাভ্যাসও এই কায়ে। বজ্রচিত্তেই সহজচিত্তের স্ফুরণ ঘটে এবং বিরমানন্দে সহজানন্দ স্থিরীকৃত হয়। এই বিরমানন্দের কথা চর্যাগানে আছে। সাধক ভুসুক বলেন, 'বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ। জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ।।'—২৭

ধর্মকায় যেমন বিরমানন্দের স্থান, তেমনই তৃতীয় শূন্য মহাশূন্যের স্থান। এই শূন্যের (তৃতীয়শূন্যের) কথা আভাসে ব্যক্ত হইয়াছে কঙ্কণপাদের চর্যায়—

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ। সঅল ধাম উইআ তবেঁ ।।—৪৪

টীকাকার বলেন, 'সুনে ইত্যাদি তৃতীয় স্বাধিষ্ঠান শূন্যে'। ৫০ সংখ্যক গানে স্পষ্টতঃ 'তইলা বাড়ি'র প্রসঙ্গ আছে। টীকাকার বলেন, ইহা শূন্যাতিশূন্য —এই দুই শূন্যের সংলগ্ন তৃতীয় মহাশূন্য হৃদয় ('তৃতীয়ং মহাশূন্যঞ্চ হৃদয়েনেতি')। এই তৃতীয় শূন্যপার্শ্বে 'জাহ্নবাটিকেতিজ্ঞানেন্দুমণ্ডল'। গানে ধর্মকায় রূপিত হইয়াছে 'বিরমানন্দ', 'সুন' ও 'তইলা বাড়ি'র রূপণায়।

চতুর্থানন্দ সহজ মহাসুখের স্থান মহাসুখচক্র বা উষ্ণীষকমল। চর্যায় এই চক্রের স্থান সর্বোচ্চে—উচ্চ পর্বত চূড়ায় (২৮) বা 'টালে' (৩৩)। শাস্ত্রীয় ভাষায় এই চক্র কোথাও কামরূপ ('কামরু'—২), কোথায়ও 'ওড়িআণ' (৪) বা জিনপুর। কাব্যের ভাষায় ইহাই (৭), চিত্তগজেন্দ্রের 'সহজ নলিনীবণ' (৯)। সাধকের যাবতীয় আয়োজন, যাবতীয় 'চর্যা' এই মহাসুখস্থানে গমনের উদ্দেশ্যে। ইহা সর্বশূন্যতার আলয়, সাধক এখানে পৌঁছিয়া দশদিক শূন্য দেখেন, যাহা লইয়া থাকেন বা ছিলেন, তাহাও বিনষ্ট হয়—বিনষ্ট হয় ইন্দ্রের ঐশ্বর্য (ইন্দি-বিষয়), পঞ্চপাটন, চতুষ্কোটি ভাণ্ডার। এখানে শবরের মৃত্যুতে, তাহার 'সবরালি' ঘুচিয়া যায় ('ফিটলি-সবরালী—৫০)। কিন্তু এই মৃত্যু মিষ্টিক মৃত্যু[১], ইহা চেতন-বেদন রহিত যোগনিদ্রা। কারণ এইখানেই নূতন করিয়া সাধকের পরিশুদ্ধ সম্ভোগকায় স্ফুরিত হয়, সেই কায়ে ঘটে অনুত্তর মহাসুখের সম্ভোগ। বজ্রধর তখন নৈরাত্ম্য-যোগিনী সহজসুন্দরীর সহিত মিলনে মহাসুখে বিহ্বল হন ('মহাসুহে ভোলা')।

অনেকেই মনে করেন, চক্রের ক্রম তন্ত্রে, তথা চর্যায় বিপর্যস্ত। বুদ্ধের ত্রিকায়ের শাস্ত্রীয় কল্পনা অনুসারে চিত্তের ক্রমোর্ধ্ব যাত্রায় ক্রম হওয়া উচিত নির্মাণ→সম্ভোগ→ধর্ম। বজ্রযানীরা চতুর্থ সহজকায় স্বীকার করেন, উহা ধর্মকায়ের উপরে নির্বিকল্প মহাসুখঘন কায়। অতএব ধর্মকায়ের পরে সহজ-কায়ের স্থান। কিন্তু তন্ত্রে দেহমধ্যে চক্রের স্থানগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে এই ক্রমে—নাভিতে নির্মাণকায়, কণ্ঠে সম্ভোগকায়, হৃদয়ে ধর্মকায় এবং উষ্ণীষে (মস্তকে) সহজকায়। তাহা হইলে বোধিচিত্ত কি নাভি হইতে কণ্ঠে, তৎপরে নামিয়া হৃদয়ে, তৎপরে হৃদয় হইতে উষ্ণীষে যায়? ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন, চক্রের ক্রমসংস্থানে গোলমাল আছে। উহা হওয়া উচিত ছিল—নাভিতে নির্মাণ, হৃদয়ে সম্ভোগ, কণ্ঠে ধর্ম ও উষ্ণীষে সহজ। তাহা হইলে

১. 'মরণং মোক্ষঃ। তত্রৈব চিত্ত-চৈতসিক অবিদ্যালক্ষণানাম্ অস্তং গমনাৎ তদেব মরণং'—যোগরত্নমালা

ক্রমোর্ধ্ব ঠিক থাকে।[১] ডঃ Snellgrove'ও মনে করেন, There is some contradiction in the actual arrangement'—Intro. to Hevajra.

আমাদের মনে হয়, তন্ত্রে কায় বা চক্রের ক্রমোৎকর্ষ বিচারে স্থান মুখ্য নহে, গুণই মুখ্য। চক্রের স্থান যেখানেই নির্দিষ্ট হউক, ঊর্ধ্বযাত্রায় আনন্দের বিশুদ্ধি, পরিমাণ ও স্বাদই প্রধানতঃ বিচার্য। তাহাতে তন্ত্রে যে ক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই যথাযথ। সম্ভোগের আনন্দ নির্মাণের দ্বিগুণ, ধর্মকায়ের আনন্দ ততোধিক, সহজকায়ে কোটিগুণিত নির্বিকল্প আনন্দ (হেবজ্র)। তাহা ছাড়া হেরুক তন্ত্রে নাড়ী, তথা আনন্দ-স্পন্দনের যে গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নির্মাণকায়ের সুখস্রোত দক্ষিণা নাড়ীতে কণ্ঠে যায়, কণ্ঠ হইতে সেই স্রোত বামা নাড়ীতে নিম্ন গতিতে নির্মাণে আসে, তৎপরে বাম-দক্ষিণ নিরুদ্ধ হইলে চিত্ত মধ্যমায় বিরমানন্দ অবধূতীতে আসে—সেখানে অবধূতীর পথ রুদ্ধ হইলে ধর্মকায় অতিক্রম করিয়া সোজা সহজকায়ে মহাসুখস্বরূপ হয়।

চর্যা বা চর্যাটীকাতেও চক্রের স্থান-বিন্যাসে দর্শন ও তন্ত্র ধারার সঙ্গে কোন বিরোধ নাই; এখানেও নাভিতে নির্মাণ কণ্ঠে সম্ভোগ, হৃদয়ে ধর্ম ও সর্বোচ্চ স্থানে সহজ। এখানেও হৃদয়স্থ মধ্যমা অবধূতীর তৃতীয় চক্রই— বিরমানন্দরূপ তৃতীয় আনন্দ এবং উহাই 'তইলা বাড়ি' তৃতীয় শূন্যের স্থান (দ্রষ্টব্য চর্যা, ২৭)। আর এই বিরমানন্দেই যে সহজানন্দের স্বরূপ দেখা যায়, তাহা আরও স্পষ্ট ৩০ সংখ্যক চর্যা ও চর্যা টীকায়—

উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ॥ ৩০

টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'ভো ভুসুকুপাদ...তৃতীয়ানন্দে সহজানন্দ-স্বরূপং পশ্য জানীহ।' আর তৃতীয়ানন্দ যে বিরমানন্দ, তাহা আরও স্পষ্ট, যখন টীকাকার বলেন, 'বিরমানন্দে পরমানন্দমবগম্য তেন সহজানন্দচন্দ্রেণ মোহান্ধকারং নাশিতম্' (টীকা ৩০)।

১. In this theory of the Cakras there are some anomalies as regards the number, location and descriptions. Intro. to Tantric Buddhism. অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'In the natural order, however, the cakras in the heart being next to Nirmanakaya ought to have been Sambhogakaya and cakra below the neck ought to have been Dharmakaya; this would have been consistent with the general order of the Kayas.—Obscure Religious cults : S. B. Dasgupta,

তৃতীয় চক্র 'তইলা বাড়ি' শুধু তৃতীয়ানন্দ বিরমানন্দের স্থান নহে, উহাই আবার 'তৃতীয়ং মহাশূন্যঞ্চ হৃদয়ম্' (টীকা ৫০)। ইহারই সহিত সংলগ্ন চতুর্থ 'জোহ্না বাড়ি'—জ্ঞানেন্দু মণ্ডল। অতএব তৃতীয় ধর্ম্মকায়ের পরেই যে সহজকায়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

একটু গোলযোগ সৃষ্টি হইতে পারে ২৮ সংখ্যক গানের শবরী-সম্ভোগের ব্যাপারটি লইয়া। শবরী বালিকার গ্রীবায় গুঞ্জামালা, এই গ্রীবা সম্ভোগচক্রের প্রতীক। শবরী আবার বাস করেন পর্বতের উচ্চতম স্থানে অর্থাৎ মহাসুখচক্রে। তাহা হইলে সম্ভোগের পরেই কি মহাসুখচক্র? কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, মহাসুখচক্রের চতুর্দল—নির্মাণ-সম্ভোগ ধর্ম-সহজের সমাঙ্গরূপ, উহা চতুরানন্দ ও চতুঃশূন্যের মিলন স্থল। সহজকায়েও সম্ভোগ আছে। সে সম্ভোগ বিশুদ্ধ সম্ভোগ; তাহা অ-কার নৈরাত্মা যোগিনীর সঙ্গে বজ্রধরের মহাসুখের সম্ভোগ। ২৮ সংখ্যক গানে যোগীন্দ্রের স্বকায় কঙ্কালদণ্ডের উন্নত সুমেরু শিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে গৃহিণী নৈরাত্মা শবরীর সঙ্গে যে সম্ভোগ, তাহা এই সম্ভোগ। তৃতীয় বিরমানন্দে দ্বিতীয় পরমানন্দের স্বরূপ বুঝিয়া আনন্দবিরতি ঘটিলে, চতুর্থ সহজানন্দের সংবেদন জাগে। ধর্মকায়ের পরেই সহজকায় স্ফুরিত হয়।

॥ চর্যার সাধন-ক্রম ॥

নাড়ী-চক্রাদির সন্নিবেশ বুঝিয়া এইবার সহজসাধনের যে ক্রমটি চর্যাগীতিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সহজ সাধন দিব্য সুরের সাধন, উহা উৎপন্ন বা নিষ্পন্নক্রমের সাধন। উহার সূচনা উৎপত্তি-ক্রমের চতুর্থ সেক হইতে, যেখানে প্রজ্ঞোপায় যোগে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং সাধক স্বসংবেদনক্রমে নাভিতে সংবৃত্তি সহজানন্দের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন। এখন মলাবৃত বোধিচিত্তকে বিশুদ্ধ ও স্থির করিয়া ঊর্ধ্বমার্গে স্বস্থানে চালনার ক্রিয়া।[১] ইহা পরাবৃত্তির সাধন, উজান বাওয়ায়

---

১. The external ceremonial by means of which Utpannakrama takes place, is the latter part of Seka (Lokottara Seka). After the three former ceremonies corresponding to Utpattikrama, which are performed by the Sisya in connection with his Mudra, so that Bindu sinks down to Vajramani without going forth, the first part of the initiation has been performed and the plane of Sahaja has been attained by the Neophyte in the lower part of his organism ...Now the disciple drives back the flow of vital energy to his forehead in order to achieve sublimation. —Sekoddesh Tika, Introduction. M. Carelli (G. O. S. Xc).

সাধন—ইহা অনুত্তর যোগ। যেখানে ক্রিয়া-চর্যা-যোগ-তন্ত্রের শেষ, সেইখানে সহজ সাধন বা অনুত্তর যোগের সূচনা। এখানে গুরুর প্রথম আদেশ, 'দিঢ করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।'

॥ **প্রজ্ঞোপায় যোগ ও সপ্রপঞ্চ চর্যা** ॥ (সহজ-সাধনার প্রধান, প্রথম ও শেষ কথা প্রজ্ঞোপায় যোগ।) অক্ষর মহাসুখ প্রজ্ঞোপায় বা কুলিশারবিন্দ সংযোগের যুগনদ্ধ ফল। যে-কোন ক্রিয়াই হউক না কেন, প্রজ্ঞোপায় যোগ সর্বদা অব্যাহত রাখিতে হয়। (এই যোগে সংবৃত্ত বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়, এই যোগে দেহমল বিনষ্ট হয়, তথতা-বোধ সদাজাগ্রত থাকে, দেবতা যোগ সম্পন্ন হয় এবং অদ্বয় সমরসে সাধকচিত্ত পূর্ণ থাকে।) অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই যোগ অক্ষুন্ন রাখিয়া অন্যান্য যাবতীয় চর্যা পালন করিতে হয়। সঙ্গীতের সমধ্রুব পদের মত তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার আসিয়াছে এই যোগের প্রসঙ্গ। 'কমল কুলিশ ঘান্টে করহুঁ বিআলী' (৪), ('বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ' (৪৯) প্রভৃতি এই প্রজ্ঞোপায যোগেরই সঙ্কেত। সাধারণ ভাবে মনে হয়, ইহা বাহিরের কর্মমুদ্রা বা কামিনীর সহিত সাধকের মিলন বা দ্বি ইন্দ্রিয় সমাপত্তি কিংবা নব-নারীর 'কুন্দুরু'। সাধকেরা ইহাকে স্বচ্ছন্দচর্যা বা সপ্রপঞ্চ চর্যাও বলেন। ইহা বিষয়-বিষ লইয়া খেলা। পঞ্চবর্ণ বিহারে পঞ্চকামোপভোগ।

কিন্তু উহার তাৎপর্য সম্পূণ পৃথক, আদৌ উহা পুদ্গল-শূন্যতা ও ধর্ম-শূন্যতার যোগ।(আধ্যাত্মিক অর্থে উহা বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহস্থ দুই নাড়ী ললনা-রসনার মিলন-যোগ, শূন্যতা ও করুণার একীকরণ।) কাজেই নীতার্থে প্রজ্ঞোপায়যোগের লক্ষ্য নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা। প্রথমতঃ বামগা ও দক্ষিণা নাড়ীর যোগ, দ্বিতীয়তঃ উহা করুণারূপী সংবৃত চিত্তের সহিত মধ্যমা অবধূতী নাড়ীর যোগ, তৃতীয়তঃ উহা অবধূতীগত স্বাধিষ্ঠান চিত্তের সহিত প্রভাস্বর চিত্তের যোগ, চতুর্থতঃ উহা সহজকমলে নৈরাত্মা যোগিনীর সাহত মহাকরুণা বজ্রধরের যোগ। এই যোগে 'দুলী' দোহন করা হইলে পাত্র ভরিয়া যায ('দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই'—২), এই যোগে 'খমণ ভতারী' 'বাযুড়া' প্রসব করে (২০), প্রজ্ঞোপায়যোগেই ('রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ' (২)) ভববল নিঃশেষে জিত হয় (১২); প্রজ্ঞোপায় সমতা যোগেই চণ্ডালী জ্বলিযা উঠে (('সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী'—৪৭), ধ্বংস হইয়া যায় মায়ার জগৎ; এই যোগেই সহজানন্দ মহাসুখ লাভ হয়:

ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ ॥—২৭.

(চর্যাগানে নানা প্রসঙ্গে এই যোগের উল্লেখ দেখা যায়।)

॥ **চিত্ত-বিশোধন** ॥ (প্রজ্ঞোপায় যোগে যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহা শৃগাল চিত্ত বা সংসার চিত্ত। সে চিত্ত মলাবৃত, সংবৃত ও চঞ্চল।) তাহা সংসার সৃষ্টি করে। চর্যায় একাধিক বার এই চিত্তকে বলা হইয়াছে 'বলদ'—যাহা বল বা মাংসের পিণ্ড। সেই বলদই বিয়ায় অর্থাৎ সংসার প্রসব করে, ফলে 'ব্যঙ্গ সংসার বড্‌ঢিল জাঅ' (৩৩)। সরহ-পাদ বলেন, বরং শূন্য 'গোহাল' (দেহ) ভাল, দুষ্ট বলদে প্রয়োজন নাই—

বরসুণ গোহালী কি মো দুঠ্য বলন্দেঁ।—৩৯.

কাজেই (প্রয়োজন এই চিত্তের বিশোধন।) কাহ্নপাদ এই চিত্ত বা মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, মন তরু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, আশা-তৃষ্ণা তাহার ফুল-ফল। 'অনাদি ভব বাসনা' এই মনের বিক্রিয়া। অতএব তিনি বলেন, তরুর মূল 'বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ'। (৪৫)

লুইপাদ প্রথম গানেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল'।) ভুসুকুপাদ এই চঞ্চল চিত্তের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন হরিণ (৬) ও মুসার (২১)-রূপকে। হরিণচিত্ত মৃত্যুমার বেষ্টিত, প্রজ্ঞা-হারা; আর মূষক চিত্ত 'খণঅ গাতি' —সে দেহের অমৃত ভক্ষণ করে, বহন করিয়া আনে তির্যক-নরকাদি দুর্গতি। এই চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে বিশুদ্ধ করিয়া। (তাই উপদেশ—

মাররে জোইআ মুসা পবণা।
জেঁণ তুটঅ অবণা গবণা ॥—২১.)

সাধকেরা জানেন, যে চিত্ত সংবৃত, বিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাই পরমার্থ। সংবৃত চিত্ত মলাবৃত, বাসনা-তাড়িত—বিশুদ্ধ চিত্ত প্রকৃতিপ্রভাস্বর। চিত্তকে বিনাশ করা মানে, সংক্লেশারোপিত চিত্তকে রূপান্তরিত করিয়া নির্বাণের উপযোগী করিয়া তোলা। (গুরুর উপদেশে এই রূপান্তর সাধিত হয়। কাহ্নপাদ দাবাখেলার রূপকে (১২) চিত্ত-বিশোধনের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।) চিত্তেই রহিয়াছে কাল-জ্ঞান, চিত্তেই আছে পঞ্চস্কন্ধের খেলা। দাবা খেলায় যেমন খেলোয়াড় বড়েকে বিনাশ করেন, গজদিয়া পঞ্চগুটিকে ঘায়েল করেন এবং মন্ত্রীদ্বারা রাজাকে মাত করেন—কাহ্নপাদও তেমনই কল্যাণমিত্রের উপদেশে চিত্তের

প্রকৃতি দোষ খণ্ডন করিয়াছেন। চতুঃষষ্টি দলযুক্ত নির্মাণকায়েই এই বিশোধন-ক্রিয়া চলে; কাহ্নপাদের দাবার ছকেও 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা'। চিত্তের মোহনাশ করাই এই বিশোধন-ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। (এই বিশোধন-ক্রিয়া ষড়ঙ্গ যোগের প্রত্যাহার ও ধ্যানের অঙ্গ। প্রত্যাহারে বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও ধ্যানে বিতর্ক-বিচারের অবসান। এইরূপে যে চিত্ত নির্মিত হয়, তাহাতে মায়াজাল অপসারিত হওয়ায়, মায়াজাল-শূন্যতা বোধ জন্মে এবং চিত্ত মধ্যমা মার্গে প্রবেশের উপযোগী হয়।)

॥চন্দ্রার্ক গতি ভঞ্জন॥ (চিত্তকে মধ্যমায় প্রবিষ্ট করাইতে হইলে চন্দ্র-সূর্যের গতি ভঞ্জন করিতে হয়।) নির্মাণকায়ে চিত্তের 'কায়'অংশ পরিশুদ্ধ ও দৃঢ় হয়। ঊর্ধ্বযাত্রায় তৎপরে চিত্তের 'বাক্' অংশকে বজ্রদৃঢ় করিতে হয়। সম্ভোগচক্রে ললনা-রসনার মিলনে বাগবজ্র দৃঢ় হয়। চন্দ্র-সূর্য বা আলি-কালির গতি রুদ্ধ হইলে এই ক্রিয়া সাধিত হয়। চিত্তের উত্তরণে প্রচণ্ড বাধা কালজ্ঞান: চন্দ্র-সূর্য সেই প্রতিবন্ধক। উহারা চিত্তকে সংসার-গতির দিকে টানে। সিদ্ধাচার্য চাটিলপাদ ধর্মার্থে সেতু গঠন করিতে গিয়া বলেন, ভবনদীর দুই তীর পঙ্কলিপ্ত: এই দুই তীর বাম ও দক্ষিণের ললনা-রসনা।[১] বিশেষ প্রক্রিয়ায় ললনা-রসনাকে যুক্ত করিয়া চন্দ্র-সূর্যের পক্ষগ্রহ খণ্ডন করিতে হয়: গুণ্ডরী পাদ বলেন, 'চান্দসূজ বেণি পখা ফাল' (৪)—চন্দ্রসূর্যের পক্ষগ্রহ খণ্ডন কর। তন্ত্রেরও সেই নির্দেশ, চন্দ্রার্কের গতিভঞ্জন করিয়া বজ্রকে (চিত্তকে) ঊর্ধ্বদিকে চালনা কর। (নচেৎ অবধূতীতে প্রাণ মারুত প্রবেশ করিবে।[২])

ষড়ঙ্গযোগের প্রাণায়ামে এই ক্রিয়া সাধিত হয়। চর্যাকারও বলেন, 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ' (২)। এই 'কুম্ভীর' কুম্ভকসমাধি—উহা প্রাণায়ামের অঙ্গ। উহা দ্বারা চন্দ্র-সূর্য নিঃস্বভাবীকৃত হয়। কিন্তু এই ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও গুহ্য। 'গুহ্য'অভিষেক এই স্তরের। ইহা বিশেষ প্রক্রিয়ায় (Sexo-yogic Process) প্রজ্ঞোপায় বা ললনা-রসনা যোগ। ইহাকে তন্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় 'বজ্রজাপ'। ইহাতে বহির্মুখ মলাবলিপ্ত চিত্ত শুদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখী হয়।

চর্যাগানে গুহ্য প্রক্রিয়ার কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। রূপকে-সঙ্কেতে

[১] 'অন্তর্দ্বয়ং পারাবারং বামদক্ষিণং চিখিলমিতি প্রকৃতিদোষপঙ্কানুলিপ্তম্' —টীকা ৫.

[২] বজ্রোত্থানং সদা কুর্যাৎ চন্দ্রার্ক গতি ভঞ্জনাৎ।
অন্যথা অবধূত্যংশে বিশতি প্রাণমারুতঃ॥

আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র। বিরূপাপাদ শুণ্ডিনীর মদ চোলাই করার রূপকে বলিয়াছেন, 'এক সে শুণ্ডিণী দুই ঘরে সান্ধঅ'—শুণ্ডিনী দুই বলবান্ উত্তেজক চন্দ্রসূর্যকে এক ঘরে (অবধূতিকার ঘরে) সান্ধায়।[১] বীণা-নির্মাণের রূপকে বীণাপাদও লাউরূপ সূর্য এবং তন্ত্রীরূপ চন্দ্রকে এক করিয়া মধ্য দাঁড়ার সহিত যুক্ত করিয়া দেন:

> সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তি।
> অণহা দাণ্ডী একিকিঅত অবধূতী ॥—১৭.

কৃষ্ণাচার্যের মত্তচিত্ত গজেন্দ্র 'এবং কার দৃঢ় বাখোড়' মর্দন করেন। সমগ্র চেষ্টা দুইকে এক করিয়া মধ্যমার সহিত যুক্ত করা। ললনা-রসনা সৃষ্টি ও সংহার, বিকল্প জ্ঞানের চরম, উহারাই আভাস জ্ঞান, উহারাই বজ্র-মার্গের বামে-দক্ষিণে ভীষণ খদ। চন্দ্র-সূর্যের গতিভঞ্জন এই আভাসদ্বয়ের নিরোধ। তাহাতে বাগ্‌বজ্র সুদৃঢ় হয় এবং মন হয় বিশিষ্ট মন। কৃষ্ণাচার্য বলেন,—আলি-কালির বর্ত্ম রুদ্ধ হওয়াতে তিনি 'বিমন' (বিশিষ্টমন) হইয়াছেন (৭)। চর্যাগানে দেখা যায়, সাধকেরা কেহ আলি-কালিকে আসন করিয়া বসেন, 'ধমন চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা' (১), কেহ বা চন্দ্রসূর্যকে পায়ের নূপুর ও কানের কুণ্ডল করিয়া যোগিকালঙ্কার ধারণ করেন:

> আলি-কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
> রবিসসি কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥—১১

কপালচর্যা বা নিরংশুচর্যা: (অবধূতী প্রবেশের পূর্বে 'কপালচর্যা'ও আচরণীয়। ইহার উদ্দেশ্য অবধূতী যোগিনীর সহিত মিলিত হইবার জন্য সাধকের প্রস্তুতি। 'কপাল' মানে অস্থি-আভরণ। উহা নগ্নতা বা শূন্যতার প্রতীক।)তন্ত্রের ভাষায় এই চর্যাকে বলা হয় 'নিরংশু চর্যা'। অবধূতী গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিতা শূন্যতা। সাধককেও তাই শূন্য বা নগ্ন হইতে হয়। (কাহ্নপাদের ১০ ও ১১ সংখ্যক গানে এই নিরংশু-চর্যা বা অস্থি-আভরণাদি ধারণের বিবরণ পাওয়া যায়।) সাধক আলি-কালিকে করেন ঘণ্টানূপুর, চন্দ্রসূর্যকে করেন কানের কুণ্ডল। শুধু তাহাই নহে। ডোম্বী (অবধূতিকা) আবরণরূপ অবিদ্যা (তন্ত্রী, চাঙ্গাড়ি) বিক্রয় করে বা পরিত্যাগ করে, সাধকও তাঁহার জন্য সংসার-পেটক ত্যাগ করেন;

---

১. চন্দ্রসূর্যৌ বামদক্ষিণৌ প্রৌঢ়যোগী বলবন্তৌ দ্বৌ সন্ধয়তি মধ্যমায়াং প্রবেশয়তি—টীকা. ৩

তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবরণা চাঙ্গড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া ॥
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥—১০

ডোম্বী ঘৃণা-লজ্জা-ভয়ের অতীত, কাহ্নুও তাঁহার জন্য নিঘৃণ ও নগ্ন—'নিঘিণ কাহ্নু কাপালি জোই লাঙ্গ।'

॥ **অবধূতী প্রবেশ** ।। সহজ সাধনার উৎপন্নক্রমে তৃতীয় স্তরের সকল সাধন অবধূতী মার্গকে (ধর্মকায়) কেন্দ্র করিয়া। এখানকার অভিষেক 'প্রজ্ঞা' অভিষেক। অবধূতীই প্রজ্ঞা। কিন্তু প্রজ্ঞাও মায়া ('প্রজ্ঞা মায়া চ ভণ্যতে'—যোগরত্নমালা)। বস্তুতঃ ললনা-রসনা-অবধূতী—তিনটিই বন্ধন। সাধক বলেন, 'চন্দ সুজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা' (১৪)—চন্দ্র, সূর্য, পুলিন্দা—তিনটিই সংসারের সৃষ্টি-সংহার কারক।[১] কাজেই অবধূতী পুলিন্দা (নপুংসক) হইলেও, উহা বিশুদ্ধজ্ঞান বা সর্বশূন্যতা নহে। উহা তৃতীয় শূন্য বা তৃতীয় স্তরের জ্ঞান মাত্র। উহাতেও সাতটি প্রকৃতি দোষ রহিয়াছে। অবধূতী মার্গে চিত্তের প্রবাহ-অভ্যাসের ফলে ওই দোষ ক্ষালিত হয়। এই প্রবাহ-অভ্যাসে অবধূতী মার্গকেও দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করিতে হয়—'সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চাতাল' (৪)—শ্বাসকেঅবধূতীর ঘরে বন্দী করিয়া অবধূতীর দুয়ারে দৃঢ় তালা-চাবি দিতে হয়। তখন চিত্তের অবধূতীর ঘর ছাড়া অন্য আশ্রয় থাকে না। এই অবস্থাতেই কাহ্নুপাদ বলেন, 'কহিঁ গই করিব নিবাস' (৭)। কাহ্নুপাদের চিত্ত-গজেন্দ্র যেমন 'এবং'-কার স্তম্ভদ্বয় চূর্ণ করে, তেমনই অবধূতীর ব্যাপক বন্ধনও ধ্বংস করে :*

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥ ৯

বীণাপাদ বীণা-নির্মাণের রূপকে সূর্য ও চন্দ্রকে অবধূতীর সহিত সংলগ্ন করেন ; অর্থাৎ বীণার লাউ ও তন্ত্রীকে দাঁড়ার সহিত যুক্ত করেন (১৭)।†

১. চন্দ্রং প্রজ্ঞাজ্ঞানং সূর্যমুৎপাদাদদ্বয়জ্ঞানং পুলিন্দং সন্ধ্যাভাষয়া নপুংসকং। ত্রয় এতে সংসারস্য সৃষ্টিসংহার কারকাঃ—চর্যাটীকা ১৪

* 'একারশ্চন্দ্রাভাসং বংকারঃ সূর্যঃ উভয়ং দিবারাত্রি জ্ঞানং বাখোড় স্তম্ভদ্বয়ং মর্দয়িত্বা নিরাভাসী-কৃত্য বজ্রজাপক্রমেণ। অপরং বিবিধ প্রকারানবধূতী ব্যাপক বন্ধনং তোড়িঅ'—চর্যাটীকা ৯

† সূর্যাভাসং তুংবিনাকারমুৎপ্রেক্ষ্য চন্দ্রাভাসেন তান্ত্রিকাঞ্চ। বিষয়চক্রী অবধূতিকয়া সহ একীকৃত্য—চর্যাটীকা, ১৭,

এই ভাবেই অবধূতী-বজ্রবনিতার অভিঘাতে ত্রিভুবন অর্থাৎ কায়-বাক্-চিত্তের একশত ষাট প্রকার দোষ ('ষষ্ট্যুত্তর শত প্রকৃতিদোষ'—কায়ের ৩৩ প্রকার দোষ, বাকের ৪০ প্রকার দোষ, এবং চিত্তের ৭ প্রকার দোষ—একুনে ৮০ প্রকার দোষ—দিবারাত্রিতে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৬০ প্রকার হয়। বস্তুতঃ এ দোষগুলি যথাক্রমে—দক্ষিণা, বামা ও মধ্যা নাড়ীর দোষ) অপসারিত হয়। কাহ্নপাদ বলেন, 'তিনি ভুবন মই বাহিঅ হেলেঁ।'—১৮—আমি তিন ভুবনের বাধা, অর্থাৎ কায়-বাক্-চিত্তের দোষ অতিক্রম করিয়াছি।

॥ **প্রবাহাভ্যাস** ॥ অবধূতী-মার্গের চিত্ত বজ্রচিত্ত। কিন্তু তাহাও স্বাধিষ্ঠান-চিত্ত; প্রভাস্বর নহে। বিশোধিত অবধূতী মার্গেই এই চিত্তকে প্রভাস্বরের দিকে চালিত করিতে হয়। চর্যাগীতিতে বহুস্থলে নৌ-বাহনের রূপকে বজ্রচিত্তকে সহজপুরীর দিকে লইয়া যাইবার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এ চিত্ত শূন্যতা ও করুণার মিলনে অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যের একীকরণে গঠিত অবধূতী মার্গে প্রবিষ্ট চিত্ত। কম্বলাম্বর-পাদ জন্ম-মৃত্যু নিরোধের উদ্দেশ্যে সোনায় ভরা এই করুণা-নৌকাকে গগনের উদ্দেশে বাহিয়া লইয়া যান,

> সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
> রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥
> বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
> গেলী জাম বহুড়ই কইসে॥—৮

ডোম্বী পাদের নৌবাহনের চিত্র আরও সুন্দর:—

> গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
> তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই॥—১৪

[এখানে গঙ্গা-যমুনা = ললনা-রসনা, মাঝেঁ = অবধূতী মার্গে; এখানে স্বয়ং অবধূতী নৈরাত্মা যোগিনী নৌকার কর্ণধারিণী]

অবধূতী মার্গ বা ধর্মকায়েও চিত্তের পতনের ভয় থাকে। এখানেও সংসার-তরঙ্গ জাগিতে পারে, নৌকার ছিদ্রপথে বিষয়-বাসনা প্রবেশ করিতে পারে, বামে-দক্ষিণে চিত্ত হেলিতে পারে। তাই সাধকদের অশেষ সাবধানতা। ডোম্বী পাদ বলেন, 'বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহতু ছন্দা।'—১৪

চাটিল পাদ বলেন,

> সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী—৫

আর কম্বলাম্বর পাদ বলেন,

বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুখ সঙ্গা ॥—৮

॥ **অবধূতী মার্গের ফল : পঞ্চাকার সম্বোধি** ॥ অবধূতী মার্গে প্রবাহ-অভ্যাসের ফলে বজ্রচিত্ত সম্পূর্ণ নির্বিকল্প না হইলেও প্রায় নির্বিকল্প। এখানকার সম্বোধি পঞ্চাকার-সম্বোধি। অর্থাৎ যে পঞ্চস্কন্ধ সংসার সৃষ্টি করে, সেই পঞ্চস্কন্ধের অধিদেবতা পঞ্চবুদ্ধ শূন্য, এই বোধ জন্মে। তখন পঞ্চবুদ্ধ বোধিচিত্তের সম্পূর্ণ বশীভূত। তাই বহু গানেই দেখা যায়, নৌকার (বোধিচিত্তের) পঞ্চ কেড়ুয়ালের পিঠে কাছি বাঁধা, তাঁহারা সহজপথ যাত্রীর সহায়ক। কাহ্নপাদ বলেন, 'পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুআল' (১৩); ডোম্বীপাদ বলেন, 'পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছি বান্ধী' (১৪)। অবধূতী মার্গে 'প্রজ্ঞা' অভিষেকে পঞ্চতথাগতাত্মক বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবোধ জাগে। অবধূতী জ্ঞানমুদ্রা। এই জ্ঞানমুদ্রার সহিত মিলনে অদ্বয়-তথতা ও সমরস বোধ জন্মে। সাধকেরা বোঝেন, 'তে তিনি তে তিনি তিনি অভিন্না' (৭)—অর্থাৎ কায়-বাক্ চিত্ত, যোগ-যোগিনী-তন্ত্র, স্বর্গমর্ত্য পাতাল—সমস্ত কিছুই শূন্য-সম্ভব পঞ্চতথাগতের সৃষ্টি। কাজেই 'গন্ধ পরসরস জইসো তইসো' (১৩)—গন্ধ-স্পর্শ-রস যেমন, তেমনই; 'পঞ্চ বিষয়ের নায়করে বিপখ কোবি ন দেখী' (১৬)—পঞ্চতথাগত কেহই আর বিপক্ষ নহে। পঞ্চাকার সম্বোধিতে পক্ষাপক্ষ, ভাবাভাব, ভব-নির্বাণ, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় সব একাকার হইয়া যায়।

অন্তরাভব বিজ্ঞান :—মধ্যমামার্গে বজ্রচিত্তের নিরোধে সাধকের পঞ্চতথাগতাত্মক অনুভব, প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানবাদের অন্তরাভব বিজ্ঞানের অনুভব। মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রাণিদের যে শূন্যতা-লক্ষণ ত্রিভুবন দর্শন হয়, তাহা আলয়বিজ্ঞানের মনোবিজ্ঞান বা অন্তরাভব বিজ্ঞানের স্তর। তাহা একপ্রকার সুষুপ্তির অবস্থা। সে অবস্থায় জন্ম হয় না, স্পষ্ট চেতনাও থাকে না, অথচ অবচেতন স্তরে, আমি জন্মিতেছি, আমি মরিতেছি—এইপ্রকার হেত্বাভাস জনিত একটি বোধ জন্মে। শূন্যতালক্ষণ এই দর্শন সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে—'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা' (২৯)। এ যেন স্বপ্নের স্বপ্রতিভাস, কিংবা দর্পণের প্রতিবিম্ব। জয়নন্দীপাদ বলেন,

পেখু সুঅণে অদশ জইসা। অন্তরালে মোহ তইসা ॥—৪৬*

যথা স্বপ্নে স্বপ্রতিভাসং যথাদর্শে প্রতিবিম্বং তাদৃশমন্তরাভব বিজ্ঞানং পশ্য—টীকা ৪৬

তিনি আরও বলেন, মনকে এ অবস্থা হইতেও মুক্ত করিতে হইবে

মোহ বিমুক্কা জই মণা। তবেঁ তুটই অবণা গমণা ॥—৪৬

নিমিত্ত দর্শন : (অবধূতী-মার্গে সাধকের যেমন বিচিত্র অনুভূতির সহিত পরিচয় ঘটে ; তেমনই অবধূতী মার্গে নিশ্চল চিত্তের ধারণায় নানা নিমিত্ত দর্শন ঘটিতে থাকে : প্রথমে মরীচিকাকার, দ্বিতীয়ে ধূম্রাকার, তৃতীয়ে খদ্যোতাকার, চতুর্থে উজ্জ্বল দীপ, পঞ্চমে নিরভ্র গগনের সদা অনির্বাণ আলো।[১] ৩০ সংখ্যক চর্যায় ভুসুকুপাদ এই সহজ নিমিত্তোদ্‌গ্রহের সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।) ভাবাভাবের দ্বন্দ্ব দলিত হওয়ায় গুরুপ্রসাদে করুণামেঘ প্রস্ফুরিত হইল। ভুসুকু বলিতেছেন, ভুসুকু দেখ, গগনমাঝে সহজ স্বরূপের অদ্ভুত উদয় :

করুণামেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ ॥
উইত্তা গঅণ-মাঝেঁ অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ ॥[২]

॥ **চণ্ডালী প্রজ্জ্বলন** ॥ কিন্তু এই যে পঞ্চাকার সম্বোধি, এই যে অন্তরাভব বিজ্ঞান, এই যে নিমিত্তরূপে সহজস্বরূপ দর্শন—এগুলিও মোহ, কারণ এগুলি আভাসাত্মক। চন্দ্র-সূর্য যেমন আভাস, মধ্যমা অবধূতী 'সন্ধ্যা' বা 'নপুংসক' হইলেও—তাহাও আভাস। অবধূতীর জ্যোতি স্বয়ংজ্যোতি (self effulgent) নহে, তাহা প্রতিভাস মাত্র ; অবধূতীর শূন্যতা-সম্বোধি অন্তরাভব বিজ্ঞানের সম্বোধি। তাহা 'মায়া স্বপ্ন সদৃশ'। অনুভব বা দর্শনেরও প্রকারভেদ আছে—মাংস-চক্ষুর

১ নিরোধ বজ্রগতে চিত্তে নিমিত্তোদ্‌গ্রহঃ প্রজায়তে।
পঞ্চধা তন্নিমিত্তং তু বোধিবজ্রেণ ভাষিতম্ ॥
প্রথমং মরীচ্যাকারং ধূম্রাকার দ্বিতীয়কম্ ॥
তৃতীয়ং খদ্যোতাকারং চতুর্থং দীপমুজ্জ্বলম্ ॥
পঞ্চমং তু সদালোকং নিরভ্র গগনোপমম্।
স্থিরং তু বজ্রমার্গেণ স্ফারয়েত্তং স্বধাতুম্ ॥ (সেকোদ্দেশ টীকায় উদ্ধৃত সমাজোত্তরতন্ত্র বচন)

২ সেকোদ্দেশ টীকায় ভুসুকুর নামে এই ধরনের আর একটা বজ্রগীতি উদ্ধৃত হইয়াছে :

উই দূরে গঅণ মজ্ঝে অদভুআ।
পেক্‌খুরে ভুসুকু সুন্ন সরুআ ॥
ভুসুকু ফুলিঙ্গৌ অনুপমফুল্লা
লেহুরে কুসুম অনগ্‌ঘ বিমুল্লা ॥

দর্শন ও দিব্য চক্ষুর দর্শন এক নহে, তেমনই তথাগতাত্মক চক্ষুর দর্শন ও সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শনেও পার্থক্য আছে। তথাগতের শূন্যতাদর্শনও একপ্রকার মাংস-চক্ষুরই দর্শন। অবধূতী মার্গে সেই দর্শন ও অনুভব ঘটে। কারণ পঞ্চতথাগত পঞ্চভূতেরই প্রতীক: বৈরোচন—পৃথিবী, অক্ষোভ্য—জল (শুক্র), অমিতাভ—তেজ; অমোঘসিদ্ধি—বায়ু, রত্নসম্ভব—আকাশ। ইহাদের যে মুদ্রা—লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা, তারা ও নৈরাত্মা বজ্রা—সেগুলিও রূপ ও বেদনাদি স্কন্ধের যোগিনী। দেহস্থ মণ্ডল-চক্র ইহাদেরই বিক্রিয়া মাত্র। অবধূতীতেও সেই ক্রিয়া চলে অতি সূক্ষ্ম আকারে। কিন্তু এই অবধূতী মার্গেই নিশ্চলীভূত চিত্তের ধারণায় আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। নাভিতে প্রচণ্ডা প্রজ্ঞা 'চণ্ডালী' প্রজ্বলিত হয়।[১] ইহার ফলে পঞ্চতথাগত দগ্ধ হইয়া যায়, সেই সঙ্গে দগ্ধ হইয়া যায় পঞ্চতথাগতের মুদ্রা 'লোচনাদি'। তখন বোধিচিত্ত অবধূতী-মার্গে মহাসুখ চক্রে দ্রবীভূত হইয়া 'হম্' ক্ষরণ করে। এই 'হম্' নাভিচক্রস্থ নৈরাত্মা 'অ'-কারের সহিত মিলিত হইয়া সাধকের চিত্তকে সবশূন্যতায় প্লাবিত করে।[২] তখন সাধক রূপান্তরিত 'অহম্' (Retroverted 'I') হইয়া যান।

চর্যাগানে এই 'চণ্ডালী' প্রজ্বলনের প্রসঙ্গ আসিয়াছে দুইটি গানে। ১৯ সংখ্যক গানে ভুসুকুপাদের বজরা (বজ্রা) নৌকা পদ্মাখালে (মধ্যমায়) পড়িতেই অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুণ্ঠন করিল, 'চণ্ডালে' নিল গৃহিণীকে (যোগিনীকে)। সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইল পঞ্চপাটন (পঞ্চতথাগতের রাজ্য) এবং ইন্দ্রিয় বিষয়। এই ভাবটি আরও স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে গুণ্ডরীপাদের গানে—

> কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী।
> সমতাজোএঁ জলিঅ চণ্ডালী ॥
> ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
> সসহর লই ষিঞ্চহুঁ পাণী ॥
> ফাটই হারহর বাঙ্ক ভরা।
> ফীট্টা হই ণবগুণ শাসন-পড়া ॥—৪৭

প্রজ্ঞা 'অং'কার এবং বজ্রসত্ত্ব 'হং'-কার বিন্দুরূপে একরসীভূত হইলে মহারা-

[১] ধারণান্তরং স্বরসতঃ চণ্ডালী জ্বলতী৷৷ ৩ গুরূপদেশঃ—সেকোদ্দেশ টীকা

[২] চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ দহতি পঞ্চতথাগতান্।
দহতি লোচনাদীন্ দগ্ধে হং স্রবতে শশী ॥—হে বজ্র ১।১।৩২

গানল জ্বলিয়া উঠিল। ইহাই চণ্ডালী (প্রচণ্ডা প্রজ্ঞা)। ডোম্বীর ঘরে আগুন লাগিল, ফলে দগ্ধ হইল নাভির অধোভাগে হরি (মূত্র নাড়ী), হর (শুক্রনাড়িকা), ব্রাহ্ম (বিট নাড়ী) এবং নাভির উর্ধ্বে ললনা-রসনাদি নাড়ী, নবগুণ (নয় প্রকার বায়ু) এবং শাসন (চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি বিষয়)। ইন্দ্রিয় রাজ্যের 'অহং' বিনষ্ট হইল, সৃষ্টি হইল ইন্দ্রিয়াতীত পরাবৃত্ত (Retroverted বা Involutioned) 'অহং'। ইহাই বজ্রচিত্তরূপী বোধিচিত্ত। ইহার পরে স্বাধিষ্ঠান চিত্তের প্রভাস্বরে টলিয়া প্রবেশ করিবার কথা। এইখানেই স্বাধিষ্ঠানের বিদায়, উদিত প্রভাস্বর।

॥ প্রভাস্বর গগন-সমুদ্র বা মহাসুখচক্র ॥ চণ্ডালী প্রজ্জ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিষ্ঠান-চিত্ত টলিয়া (অসদ্রূপ মুক্ত হইয়া) প্রভাস্বর গগন-সমুদ্রে প্রবেশ করে। এই মুহূর্তকে সাধকেরা বলেন, 'চতুর্থী সন্ধ্যা', চর্যাকারেরা বলেন, 'অধরাতি' (অর্ধরাত্রি)। এখানকার অভিষেক 'চতুর্থ' অভিষেক। এখানে গুরু 'তথতা', 'ভূতকোটি' ও 'ধর্মধাতু'র উপদেশ দেন। সে উপদেশের সারকথা—'নাস্তি রূপং ন দ্রষ্টা চ' প্রভৃতি: জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা নাই—গ্রাহ্য নাই, গ্রাহক নাই—'ন চিত্তং নাপি চৈত্তিকং'; ('চিত্তং পরিনিষ্পন্ন বিজ্ঞানং চৈত্তিকং পরতন্ত্রং কল্পিতম্—এতৎ ত্রয়ং স্বরূপেণ নাস্তি'—যোগরত্নমালা); সকল ধর্ম 'আদি শান্তাহ্যনুৎপন্ন'—অতএব রাগ-বিরাগ-মধ্যমা ('তিনি'), হীন-মধ্য-উৎকৃষ্ট সব সমান, সব সমরস। গুরু আরও বলেন, সকল তত্ত্ব এক তত্ত্বেরই প্রকাশ মাত্র—'একং পরং নাস্তি'; এই এক শূন্য, বিজ্ঞান-লক্ষণ এবং মহৎসুখ, আত্ম-অনুভব দ্বারা ইহাকে অনুভব করিতে হয়—'স্বসংবেদ্যং মহৎ সুখম্'। গুরু এই উপদেশ দেন বটে, কিন্তু অনুভব সাধকের—'আত্মনা জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্ গুরু পর্বোপসেবয়া'। সাক্ষাৎকার স্বসংবেদ্য।

বস্তুতঃ চতুর্থস্তরে কোন ক্রিয়া নাই, আছে শুধু অনুস্মৃতি ও সমাধির সংবেদন। গুরুর উপদেশ শুনিতে শুনিতে যেন স্বাধিষ্ঠান মুহূর্তে প্রভাস্বরের সহিত এক হইয়া যায়। সংবৃত-পরমার্থের ঐক্য সাধন করিবার জন্য চাটিলপাদ 'সাঙ্কম্' (সেতু) গড়িয়াছেন—'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই' (৫); বস্তুতঃ গুরুর উপদেশই এই স্বাধিষ্ঠান-প্রভাস্বরের ঐক্যসেতু। চাটিলপাদও তাহাই বলিয়াছেন, যদি এই সাঁকোয় চড়িয়া পারগামী হইতে চাও—'পুচ্ছতু অনুত্তর সামী'। সদ্‌গুরুর উপদেশেই (সদ্‌গুরু বোহেঁ) ভাদেপাদের চিত্তবাক্ টলিয়া গগন-সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে—'গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা' (৩৫)। তন্ত্র বলেন, 'ক্ষণাৎ

সর্বে ন বাধন্তে', 'স্বর্গমর্তৈশ্চপাতালৈরেকমূর্তিভবেৎ তৎক্ষণাৎ' (হেবজ্র)। কঙ্কণপাদ বলেন, 'সুনে সুন মিলিআঁ জবেঁ। সকলধাম উইআ তবেঁ ॥'—৪৪*
বীণাপাদও বলেন, যখন প্রভাস্বর বাহুক দ্বারা চাপিত হয়, তখন বত্রিশতন্ত্রীর শূন্যতাধ্বনি সকল ব্যাপ্ত করে—

জবে করহা করহকলে চাপিউ।
বতিস তান্তিধনি সএল ব্যাপিউ ॥—১৭†

প্রভাস্বর সমুদ্রে সাধক চিত্তে দুইটি ব্যাপার ঘটে—অনুস্মৃতি ও সমাধি। অনুস্মৃতিতে প্রভামণ্ডল স্ফুরিত হয়। চিত্ত তেজোময় ভাস্বর হইয়া উঠে, তাহাতে সর্বাঙ্গে উষ্ণতার অনুভব জাগে, দেহ হইতে জ্যোতির স্ফুরণ ঘটিতে থাকে। ১৭ সংখ্যক চর্যাটীকায় ইহাকেই বলা হইয়াছে 'চিত্তৌষ্ণ্য'। ৫০ সংখ্যক গানেও দেখা যায়, 'তইলা' বাড়ীর পাশে 'জোহ্না বাড়ি'। ইহা 'জ্ঞানেন্দুমণ্ডল' বা প্রভামণ্ডল। চতুর্থক্ষণে এই জ্ঞানেন্দুমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া 'আকাশফুল' বা শূন্যতাফুল ফোটে—

তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি তাএলা
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিলা ॥—৫০

বস্তুতঃ বিরমানন্দে বজ্রচিত্ত নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তমধ্যে উৎপলশতপত্র ভেদের ন্যায় অতি দ্রুত পরপর ঘটনাগুলি ঘটিয়া যায়। এযেন ধ্বন্যালোকের রসধ্বনির সংবেদনের মত— বাচ্যার্থ মুহূর্তে ব্যঞ্জনার আভাস বহন করিয়া আনে। ধর্মকায়ে চণ্ডালী প্রজ্জলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিষ্ঠান প্রভাস্বর-স্পৃষ্ট হয়—সঙ্গে সঙ্গে কমল বিকশিত হয়, দগ্ধীভূত বত্রিশ যোগিনীর প্রভায় 'লঙ্ক উহ্নসিউ' (অট্টোহাস ঘটে), কমলিনী পঙ্কনালে ('পঁণালে') চিত্তকে মহাসুখচক্রে বহন করিয়া দ্রবীভূত করে (২০); তখন 'রঅণফু সহজে কহেই' (২৭), ('করুণা ডমরুলি বাজঅ' (৩১)—চিত্তের 'বিকরণে' ('চিঅ বিকরণে' অর্থাৎ 'অমনসিকারে')

* তৃতীয় স্বাধিষ্ঠানশূন্যে বজ্রগুরোরধিষ্ঠানাচ্চতুর্থং পদং শূন্যং যদা মীলতি স্বয়ং তদা তস্মিন্ সময়ে সর্বধর্মাণি যুগনদ্ধফলোদয়ো ভবতি—চর্যাটীকা. ৪৪

† করহমিতি চিত্তযা চিত্তৌষ্ণ্যং বোদ্ধব্যং। করহকলমিতি করুণাবহতঃ কলং প্রভাস্বরং বোদ্ধব্যং। যস্মিন বিলক্ষণ সময়ে তচ্চিত্তৌষ্ণ্যং তেন প্রভাস্বর বাহুকেন চাপিতং আক্রামিতং তস্মিন্ সময়ে দ্বাত্রিংশন্নাড়ী দেবতাবিগ্রহস্থ···অনাহত নৈরাত্মজ্ঞানেন···ভাবাভাব ব্যাপিতমিতি —চর্যাটীকা. ১৭

—চন্দ্রে চন্দ্রকান্তির মত সবই যেন সমরসীভূত হইয়া সহজ মহাসুখে বিহ্বল হয়। সমাধির অবস্থা এই মহাসুখ বিহ্বলতার অবস্থা।

॥ মহাসুখের সংবেদন । মহাসুখের সংবেদন অচিন্ত্য, 'বাকপথাতীত'। তখন চিত্ত সর্বশূন্য, চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত ('চৌকোডিডবিমুকা'—৩৭)। সাধক বলেন, 'পেখমি দহদিহ সর্বই শূন্য' (৩৫), 'ন জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা' (৪৯)। চিত্ত তখন নিরালম্ব বটে, কিন্তু ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত—'ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই' (৪২)। সেখানে অন্ধকার নাই, নিমিত্ত দর্শন নাই, প্রতিভাস নাই, প্রতিসেনা-দর্শন (মায়া-দর্শন) নাই, আছে স্বয়ংপ্রভ প্রভাস্বর জ্যোতির স্বসংবেদন। এই জ্যোতির স্বসংবেদনে নিমীলনই মহাসুখ। লুইপাদ বলেন, এ এক অপূর্ব বিজ্ঞান—দুর্লক্ষ্য অথচ ত্রিলোকব্যাপ্ত, না সত্য না মিথ্যা—'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা' (২৯)। মহাসুখের বর্ণ নাই, চিহ্ন নাই, রূপ নাই—স্বসংবেদন স্বরূপত 'অলকৃখ লকৃখণ ন জাই' (১৫)। স্বসংবেদনের ক্ষেত্রে 'গুরু বোব সে সীসা কাল'—ইহা 'মূকাস্বাদনবৎ'। কাহ্নপাদ প্রশ্নোত্তর ছলে ঠিকই বলিয়াছেন, জিনরত্ন, যাহা অনন্ত রতি সুখ বিস্তার করে, তাহা কেমন ?—না, সঙ্কেতে মূকের সংবোধনের মত।[১]

চতুর্থ স্তর অনির্বচনীয়, বাচ্য-বাচক রহিত। অন্তরে স্ফুরিত তত্ত্বকে বোঝানো যায় না। তবে তাহার কিছুটা আভাস দেওয়া যায় বিকল্পস্তরের অনুভব দিয়া। বচনাতীতের প্রকাশ বচন, অরূপের প্রতিমা রূপ, নির্বিকল্পের ভাষা বিকল্প। Dr. Snellgrove বলেন, 'Fourth is called because a word is understood in relation to the third—চতুর্থের উপলব্ধি তৃতীয়ের মাধ্যমে, তৃতীয়ানন্দ বিরমানন্দেই সহজানন্দের দ্যোতনা।[২]

গুরু প্রসঙ্গ

মানব হৃদয়ে পরমতত্ত্বের প্রকাশ অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্ত, অনেকটা অকস্মাৎ আবির্ভাবের মত। সহসা যেন চোখ খুলিয়া যায়, কুয়াশা মুছিয়া যায়, জীবনে বিপুল রূপান্তর ঘটে। জগৎ ও জীবন অন্য একটি তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে।

১. তত্ত্বস্তু বাগ্‌গোচরাতীতত্বাৎ তত্ত্বস্তু কথিতুং ন পার্যতে, নাপি শ্রোতা প্রতিপদ্যতে—যোগরত্নমালা।

২. 'গুরুসম্প্রদায়াৎ তৃতীয়ানন্দে সহজানন্দস্বরূপং পশ্য জানীহি'—চর্যাটীকা, ৩০

কোথা হইতে আসে অজস্র আলোর বন্যা। মানুষটিকে ডুবাইয়া, মথিয়া, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে অন্য এক রূপ দেয়।

বৌদ্ধ থের ও থেরী গাথায় দেখা যায়, অনেকের মধ্যেই এই রূপান্তর ঘটিয়াছে, কোন একটি ঘটনার সংঘাতে—কোথায়ও ব্যর্থতায় বা নৈরাশ্যে, কোথায়ও শোকে বা গভীর দুঃখে। পটচারা-উৎপলবর্ণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে জীবনের অবস্থা-বিপর্যয়ে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের জীবন-কাহিনী হইতেও দেখা যায়, কোন আকস্মিক ঘটনায় তাঁহারা সহজ-দৃষ্টি লাভ করিতেছেন। কথিত আছে, সরহপাদের পরিবর্তন আসে একটি শরকারের কন্যাকে দেখিয়া।

কিন্তু ধর্মীয় আচার্যগণ মনে করেন, মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অন্তরের প্রেরণায় তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে পারেন বটে, তবু এরূপ ব্যক্তি 'কোটিকে গুটিক হয়'। বৌদ্ধ তন্ত্র-ভাষ্যেও স্বীকার করা হইয়াছে, উত্তপ্ত বীর্য অধিমাত্রতর ব্যক্তি, 'অন্তঃস্ফুরৎ' তত্ত্বকে সেক ব্যতীতও সাক্ষাৎ করিতে পারেন। তবু গূঢ়তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজন সত্তার প্রস্তুতি।[১] গুরু ও অভিষেকের প্রয়োজন এইখানে। ভাবাসক্ত দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানাভিমান এমনভাবে পুদ্গলসত্তাকে মলাবৃত করিয়া রাখে যে, সত্তা যে স্বয়ং বুদ্ধ ('সত্তা বুদ্ধা এব', 'অবুদ্ধো নাস্তি সত্ত্বৈকঃ')—এই সত্য ভুলিয়া যায়। অতএব আচার্য গুরুর উপদেশে তত্ত্বাববোধের পথে অগ্রসর হইতে হয়।

ভারতীয় ধর্মপথে, শুধু ভারতীয় ধর্মে কেন, বিশ্বধর্মরাজ্যে গুরুর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষতঃ যে-সকল ধর্ম ক্রিয়া-প্রধান এবং যাহার তত্ত্ব গভীর রহস্যে আবৃত, সেখানে গুরু ব্যতীত গতি নাই। শ্রুতিপথে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু প্রযুক্তি ব্যতীত প্রয়োগ-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা অসম্ভব। যেমন প্রয়োগ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তেমনই প্রয়োগমূলক ধর্মের ক্ষেত্রে, গুরু হাতে-কলমে শিক্ষা না দিলে শিক্ষা অসমাপ্ত এবং সিদ্ধিও সুদূরপরাহত। এই

১. The core of one being is an inextinguishable light, which can in certain cases shine forth all of a sudden and transform in one instant all our being into a Bodhisattva. But most frequently the way of deliverance is not so easy. The Supreme one who sees our difficulty and is moved to compassion by our deafness reveals himself in the figure of Tathagata and leads men to initiation by means of his gurus. So a spiritual teacher and a religious ceremonial is required.—M. Carelli Intro. Sekoddesh Tika।

বিশেষতঃ যোগ ও তন্ত্রসাধনায় গুরুকরণ ও দীক্ষার প্রসঙ্গ আসিয়াছে সর্বাগ্রে। বৌদ্ধতন্ত্র, তথা সহজসাধন, ভারত-বর্ষের চিরাচরিত যোগ-তন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র নহে। ছন্দ, বন্ধ, করণ, কপাটের যত নিন্দাই তাঁহারা করুন না কেন, বৌদ্ধ তন্ত্রের—তথা সহজসাধনের পথ, 'অভ্যাস প্রকর্ষে'র পথ। আর সে অভ্যাস-প্রকর্ষ শিক্ষা করিতে হয় গুরুর মুখে। সহজমার্গের সাধকেরা বলেন—গুরুক্ত মার্গ 'চিন্তামণিবৎ' :

'তং চিন্তামণিরূঅং পণমহ ইচ্ছাফল দেই'

[জগদর্থাত্মিকা মহাকরুণারূপ বাঞ্ছাফল দাতা, সেই চিন্তামণিকে প্রণাম কর।—সরহপাদ]

সরোজবজ্রের (সরহপাদের) দোহাটীকার সূচনায় অদ্বয় বজ্রপাদ বলিতেছেন, ষড়্দর্শন যে তত্ত্ব জানে না, ব্রাহ্মণ যাহা লাভ করিতে না পারিয়া ষড়্গতিতে (নরক, তির্যক, প্রেত, অসুর, দেব ও মানব) আবর্তিত হয়, যে সম্যগ্ মার্গ না জানায় বাহ্য তীর্থিক যোগীরা পাপমিত্রের সহিত সঙ্গত হয়, সাধু ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ-অনুমানের অতীত সেই তত্ত্ব গুরুকে আরাধনা করিয়া অবগত হইতে পারে। গুরু তুষ্ট হইলেই ইহলোকে ও পরত্র মুক্তি লাভ করা যায়; সমাদৃত হইলে তিনিই 'তথাগতোক্ত সদ্ভাব' দান করেন।[১]

সরহপাদের দোহা এবং অদ্বয় বজ্রপাদীয় টীকা হইতে গুরু সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানা যায়। তাহাতে দুইটি বিষয় প্রধান—

(১) সহজতত্ত্ব বা মহাসুখতত্ত্ব স্বসংবেদ্য; তাহা বাচ্য-বাচক সম্পর্ক রহিত। তাহা 'কহিম্পি ণ জাই', 'বচনগম্যং ন ভবতি'। সংবেদন নিজে নিজেই অনুভব করিতে হয়—'তৎ সর্বম্ আত্মনৈবাত্মনি জানীত'। তবু এই স্বানুভব 'গুরূপদেশাৎ পশ্যতি অনুভবতি'। হেবজ্র বলেন, 'আত্মনা জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্ গুরুপর্বোপসেবয়া।' গুরু কেন? কারণ, শাস্ত্রগ্রন্থে সহজতত্ত্ব সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহা বিতথ, অতথ্য। গুরুবক্ত্র সাক্ষাৎ 'বুদ্ধবক্ত্র'। সহজতত্ত্ব তাঁহার স্বানুভূত এবং হৃদ্গত। অতএব তাঁহার উপদেশ অভ্রান্ত ও অবিতথ।[২]

তস্য তুষ্ট্যা ভবেন্মুক্তিরিহলোকে পরত্র চ।
দদাতি সর্বসদ্ভাবং তথাগতোক্তমাদরাৎ॥
আচার্যঃ পরমদেবাঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
স্বয়ং বজ্রধরো রাজা সাক্ষাদ্রূপেণ সংস্থিতাঃ॥ চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ : আর্যদেব

(২) দ্বিতীয়তঃ এই সহজতত্ত্ব লাভের যে পথ, তাহা দুর্ভেদ্য, দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয়। মরুস্থলে পূর্ব সার্থবাহ পানীয়ের সন্ধান না দিলে, মরুপথিক যেমন মৃগতৃষ্ণিকা দেখিয়া বিভ্রান্ত হয় এবং তৃষ্ণায় মৃত্যু বরণ করে, তেমনই 'গুরুপরম্পরায়ত' (গুরুসম্প্রদায়=গুরুপ্রদত্ত) উপদেশ রহিত হইলে ভাবক যোগীর সর্বসত্ত্ব বিনষ্ট হয়।

আর্যদেব পাদ বলেন, উদকমণি যেমন সমল জলকে শোধন করে, তেমনই গুরূপদেশের প্রতি শ্রদ্ধামণিও অবিশুদ্ধ চিত্তরত্নের মল ক্ষালন করে। কায়শোধন বাক্‌শোধন ও চিত্তশোধনের একমাত্র উপায় গুরুমুখপঙ্কজ গ্রথিত বাক্য।

সরহপাদ বলেন, অজরামর হওয়া সহজসাধনের লক্ষ্য। কিন্তু এই দেহে কে না জরাগ্রস্ত হয়? কে না মরণের কবলগ্রস্ত হয়? গুরুর উপদেশে যিনি 'ধর্ম-সম্ভোগ-নির্মাণ-মহাসুখ'-কায় চতুষ্টয় ভেদে সর্ব আশ্রয়ের নিরোধ করেন, তিনিই সত্যকারের অজরামর। তিনি আরও বলেন, সহজ-প্রবেশের বিষম সন্ধি গুহ্যাতিগুহ্য। সে সন্ধিছেদের কৌশল আগম-তন্ত্রে সন্ধ্যাভাষায় আবৃত। সে সন্ধ্যাভাষার গূঢ়ার্থ 'গুরুসম্প্রদায়াদ্ বোদ্ধব্যঃ'। অতএব 'গুরু বঅণে দিঢ ভক্তি করু'। উপরন্তু অভ্যাস ব্যতীত সহজানন্দ লাভ করা যায় না। স্বাম্ভব সিদ্ধ হয় অভ্যাসে বা আয়াসে। আয়াসে প্রয়োজন ইন্দ্রিয়বিষয়গ্রাম। বিষয়কে শুদ্ধ করিয়া 'পঞ্চকামোপভোগ' গ্রহণ করিতে হয়। ইহা অনেকটা বিষ দ্বারা বিষক্ষয়ের মত, কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার মত। গুরুর উপদেশ সেখানে 'তথত খড়্গ'; 'যো ভব সৈব নির্বাণং'—এই অদ্বয়বোধ বিষয়জ্ঞান-প্রহারী। এই নিষ্কেবল জ্ঞান বরগুরুপ্রবর পাদের উপদেশ সাপেক্ষ। তাই সরহপাদ বলেন,

জই গুরু বুত্তবো হিঅহি পইসই।
নিচ্ছিঅ হত্থ ঠবিঅ উঈসই॥

—যদি গুরুর বচন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে নিশ্চিত সুখমণি হস্তে উদিত হয়।

সহজ সাধনায় যে নানাবিধ সেকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি স্তরে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে। সাধারণতঃ সেক চারিপ্রকার—আচার্য, গুহ্য, প্রজ্ঞা ও চতুর্থ অভিষেক। উৎপত্তি ও উৎপন্নক্রমে ইহা আবার আট প্রকার। উৎপত্তিক্রমে যে সেক, উৎপন্ন ক্রমেও সেই সেক—এইজন্য চারিটি সেকের পরে উৎপন্নক্রমপক্ষে 'তৎপুনস্তথা' বলা হইয়াছে। উৎপত্তিক্রমে আচার্য অভিষেকে গুরু ক্রিয়া-

তন্ত্রাদির উপদেশ প্রদান করেন, উহাতে যোগ-যোগিনী-তন্ত্রাদিতে অধিকার জন্মে। তৎপরে তিনি কর্মমুদ্রা দান করিয়া, কর্মমুদ্রা ভাবনার উপদেশ দেন। গুহ্য অভিষেকে গুরু গুহ্যস্থিত মণির সাহচর্যে আনন্দ চতুষ্টয়ের বেদন উপদেশ করেন এবং সময়-মুদ্রার সহিত অতিগূঢ় যোগের কথা বলেন। প্রপঞ্চভাবনায় অপ্রকাশ্য বলিয়াই উহা গুহ্য। তৎপরে প্রজ্ঞা অভিষেক। প্রকৃষ্ট জ্ঞানই প্রজ্ঞা। সর্বধর্ম স্বচিত্তেরই সৃষ্টি—এই জ্ঞানের প্রতিবেদনই প্রজ্ঞা-অভিষেকের মূল কথা। এই অভিষেকের মুদ্রা জ্ঞানমুদ্রা। চতুর্থ অভিষেকে তথতা উপদেশ করা হয়, এই অভিষেকেই মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার ঘটে। গুরু এখানে উপদেষ্টা মাত্র, স্বানুভব শিষ্যের। যথাক্রমে উষ্ণীষ-ধর্ম-সম্ভোগ কায় অতিক্রম করিয়া এখানে 'বজ্রমণিশিখরশুষিরে' (নাভৌ) অর্থাৎ নির্মাণকায়ের অধোদেশে সংবৃত্তি সুখের অনুভব জাগে। গুরু বলেন, এই সুখ ধারণ কর ('ধারণীয়ং মহাসুখং')। এই পর্যন্তই উৎপত্তি ক্রমপক্ষের চারিটি অভিষেক। উহা চিত্তের অবরোহণক্রম।

উৎপন্ন বা নিষ্পন্ন বা সম্পন্নক্রমে চিত্তের ঊর্ধ্বায়ন বা ক্রমারোহণ। এখানেও ক্রিয়া শিষ্যের, সঙ্কেতোপদেশ গুরুর। নির্মাণকায় হইতে সহজকায়ের দিকে চিত্তের অভিসার। শিষ্যের ক্রিয়া ষড়ঙ্গ যোগ। এই ক্রমেও নির্মাণ-কায়ে প্রত্যাহার ও ধ্যানের উপদেশ। তৎপরে বজ্রোত্থানের নিমিত্ত ললনা-রসনা নাড়ীর গতিরোধের জন্য গুহ্য উপদেশ :—'বজ্রোত্থানং সদা কুর্যাৎ চন্দ্রার্ক-গতি ভঞ্জনাৎ'। এই চন্দ্রার্ক-গতিভঞ্জনের ক্রিয়া প্রপঞ্চভাবনায় অপ্রকাশ্য বলিয়াই অতিশয় গোপনীয়। এই গতি ভঞ্জনের ফলে চিত্তের মধ্যমায় প্রবেশ। তখন গুরু মধ্যমা-নিরোধের প্রক্রিয়া উপদেশ করেন। প্রবাহ-অভ্যাসের ফলে চিত্ত মধ্যমাতেই বিধৃত হয়, ইহাই ধারণা ('দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা')। ধারণায় নিমিত্তোদ্গ্রহ হয়, অর্থাৎ ধূম-মরীচিকাদি জ্যোতি দর্শন ঘটে। এই অভিষেকেই চণ্ডালী জ্বলিয়া উঠে, পঞ্চস্কন্ধাত্মক সৃষ্টি দগ্ধ হইয়া যায়, সাধক-অঙ্গে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে—বিশুদ্ধ নাড়ীগুলি চিত্তামৃত ক্ষরণ করিতে থাকে। এইখানেই অনুস্মৃতির সহিত দর্পণে স্বচক্ষুপ্রতিবিম্বের মত গ্রাহ্য ও গ্রাহক প্রায় এক হইয়া যায়। অধিমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাধক জ্ঞানমুদ্রার সহিত যুক্ত হইয়া মায়োপম সমাধি লাভ করেন। ইহার পরে চতুর্থ স্তরের কথা। উষ্ণীষ কমল তখন বিকশিত, নাড়ীগুলির সহিত সাধক-অঙ্গ 'উহ্লসিত' (উষ্মীভূত)।

এই অবস্থায় উৎপন্নক্রমপক্ষের চতুর্থ উপদেশ—সকল ধর্ম ই ধর্ম ধাতু, সবই অদ্বয়, সবই সমরস ; ভবনির্বাণে ভেদ নাই, সুখ-দুঃখে ভেদ নাই। গুরু উপদেশ করেন, কিন্তু শিষ্য তখন স্বানুভবে বিভোর, সহজানন্দে মুদিত। মহামুদ্রা-সাক্ষাৎকারই চতুর্থ অভিষেকের চরম প্রাপ্তি। ইহাতেই অনুত্তর যোগের সমাপ্তি। সাধকের 'মজ্জন' ও বিশ্রাম মহাসুখে 'আনুত্তু ধামে'। কিন্তু গুরু দেখাইয়া না দিলে এই 'মজ্জন' (emersion) সম্ভব নহে। গুরু প্রদীপ, শিষ্য সেই সেই দীপ হইতে প্রজ্বালিত আর একটি দীপ ('দীপাৎ দীপান্তরমিব')। গুরু যন্ত্রী, শিষ্য যন্ত্র : তাইতো মরমিয়ারা বলেন, 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী বাজাও আমারে' ; আর সহজ সাধক বলেন, 'যথা যুয়ং মহৎমনো মামপি কুরু তদ্‌বিভো।'

(চর্যাগানেও নানা প্রসঙ্গে গুরুর গৌরব ঘোষিত হইয়াছে। চর্যাটীকায় গুরুর প্রসঙ্গ পদে পদে। 'গুরু সম্প্রদায়াৎ বোদ্ধব্যং'—নির্মলগিরা টীকার ইহা যেন একটি ধ্রুবপদ।) যে-সকল স্থলে মূল গানে গুরুর উল্লেখ নাই, সেখানেও টীকাকার মুনিদত্ত 'শ্রীগুরুমুখলব্ধ' উপায় বা উপদেশের কথা বলিয়াছেন। (মূল চর্যাগীতিতে তের বার স্পষ্টভাবে 'গুরু' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। ৪৫ সংখ্যক গানে দুইবার গুরুর উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছাড়া একটি গানে (১২) গুরুকে বলা হইয়াছে 'উআরি' অর্থাৎ উপকারিক। সহজ-স্বানুভবের প্রসঙ্গে কৃষ্ণাচার্য স্বীয় গুরু জালন্ধরী পাদকে সাক্ষ্য মানিয়াছেন, 'শাখি করিব জালন্ধরী পাএ' (৩৬)। দারিকপাদ যে গুরুর কৃপাতেই দ্বাদশভুবনের রাজা (রাআ) হইয়াছেন এবং গম্ভীর ধর্মে পারঙ্গম হইয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন : 'লুই পাঅপএঁ দারিক দ্বাদশভুবণেঁ লধা' (৩৪)। আর একটি গানে পারগামী জনের জন্য স্বাধিষ্ঠান-প্রভাস্বরের সেতু রচনায় সিদ্ধাচার্য চাটিল নিজেকেই অনুত্তর স্বামী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন :—)

জই তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী ।।—৫

প্রথম গানেই আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ অশরণ-জনের উদ্দেশ্যে 'মহাসুখ' পরিমাণের কথা বলিয়া, সদ্‌গুরুর আরাধনার কথা বলিয়াছেন, 'গুরু পুচ্ছিঅ জাণ'।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, চর্যার সাধন উৎপন্নক্রমের সাধন। প্রথম গানে মহাসুখ পরিমাণের নির্দেশটিও উৎপন্ন ক্রমের। চর্যাটীকায় এই অংশের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, যথা পারিপাট্য অভিষিক্ত যোগিবর সদ্‌গুরুকে আরাধনা করিয়া

অর্ধ রাত্রিতে (চতুর্থী সন্ধ্যায়) প্রজ্ঞা জ্ঞানাভিষেক লাভ করিয়া যেমন দৃঢ়চিত্ত হন, সেইরূপ বজ্রদৃঢ় হইয়া চতুর্থানন্দ মহাসুখ পরিমাণ কর। বজ্রপদ্মযোগে অক্ষর সুখ লাভের উপায় শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরমানন্দে সর্বধর্ম অনুপলম্ভরূপ সহজানন্দকে জান।—ইহা সম্পন্নক্রমের 'তৎপুনঃ' চতুর্থ স্তরের কথা।

টীকাকার এই উপলক্ষ্যে শ্রীসমাজ ও হেবজ্র তন্ত্র এবং নাগার্জুনপাদ ও সরহপাদের প্রবন্ধ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া সহজ-সাধনায় বজ্রগুরুর ভূমিকাও নির্দেশ করিয়াছেন :

শ্রীসমাজে বলা হইয়াছে, বজ্রগুরু ব্যতীত সর্বক্লেশপ্রহাণক, শান্ত, অবৈবর্তিক (যাহার বিবর্তন ঘটে না) নির্বাণপদ লাভ করা যায় না।

নাগার্জুনপাদ বলেন, বজ্রগিরি শিখরে (মহাসুখ চক্রে) আরোহণ করিয়া কেহ পতন ইচ্ছা করেন না, তবু কেহ কেহ পতিত হন, কারণ, তাঁহারা বজ্রগুরুর উপদেশ লাভ করেন নাই। আর যিনি বজ্রগুরুর উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তিনি মোক্ষলাভে অনিচ্ছুক হইলেও, গুরুকৃপায় অবলীলাক্রমে মুক্তিলাভ করেন। অচ্যুত মহাসুখ গুরুকৃপাগম্য।

সরহপাদ বলেন, যে যোগিনী সংসারচক্র রচনা করেন, তিনিই আবার বজ্রস্বামীর প্রভাবে সাধককে নিষ্প্রপঞ্চ স্বধাম প্রদর্শন করান। যে সদ্‌গুরুর প্রভাবে স্বসংবেদ্য সুখ উদিত হয়, সবিনয়ে সেই সদ্‌গুরুর চরণ চিরকাল মস্তকে ধারণ করা উচিত।

হেবজ্র তন্ত্রে বলা হইয়াছে, মহাসুখ স্বসংবেদ্য বটে, কিন্তু সদ্‌গুরুকে সেবা করিয়াই সে সুখ নিজে আস্বাদন করা সম্ভব।

(চর্যাগানে—(১) বজ্রযোগে কায়রক্ষা (২) চিত্ত বিশোধন (৩) মধ্যমামার্গে প্রবাহ-অভ্যাস ও চিত্তের বিকরণ (৪) প্রজ্ঞা-অভিষেক এবং (৫) চতুর্থ স্তরে সহজসুখ অনুভবের ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা বিষয়ে গুরুপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে।)

(প্রজ্ঞোপায় যোগ (বজ্র-পদ্ম যোগ) অচ্ছিন্ন রাখিয়া পুনরায় কায়, বাক্, চিত্তকে বজ্রদৃঢ় করা উৎপন্নক্রমের প্রথম ক্রিয়া। কায়-বাক্-চিত্ত এক চিত্তেরই বিভিন্ন অঙ্গ। ভবজলধি মধ্যে এই কায়-রক্ষার প্রসঙ্গে গুরুর উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।) সিদ্ধাচার্য সরহপাদ কায়কে নৌকার সঙ্গে রূপিত করিয়া সাঙ্গরূপকে গুরুর ভূমিকা নির্দেশ করিয়াছেন—

কাঅণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল ॥ ৩৮

—কায় নৌকা, মন কেড়ুয়াল (দাঁড়); সদ্‌গুরুর বাক্য হাল। চিত্তকে দৃঢ় করিয়া সদ্‌গুরুর উপদেশে কায়-নৌকাকে রক্ষা করিতে হয়। ইহা ব্যতীত ভব-সমুদ্র তরণের অন্য উপায় নাই।

সিদ্ধাচার্যদের প্রধান লক্ষ্য চিত্ত। একই চিত্ত সংবৃত ও পরমার্থভেদে দুইপ্রকার। যে সংবৃত চিত্ত বালযোগীকে সংসারে বদ্ধ করে, সেই চিত্তই পরমার্থরূপে প্রৌঢ় যোগীকে সুগত-পথের সন্ধান দেয়।[১] সংবৃত্ত চিত্ত ইন্দ্রিয় বাসনাদি ১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষের আকর। এই চিত্ত বিশোধিত না হইলে, সত্তার ঊর্ধ্বগতি সুদূরপরাহত। চর্যাগীতিতে এসকল ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে সদ্‌গুরুর বচন কোথাও কুঠারস্বরূপ, কোথায়ও বা ধনুক। (কাহ্নপাদ বলেন, মন হইতেছে তরু, পঞ্চইন্দ্রিয় তাহার শাখা, আশা-তাহার পুষ্প-পত্র। বরগুরুর বচন-কুঠারে এই তরুকে সমূলে উৎপাটিত কর।) মনের 'অমনসিকার' (অমনরূপে রূপান্তর) সহজ সাধকদের প্রধান লক্ষ্য। তাই তিনি বলেন,

বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥
বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরমাণী ॥--৪৫

শবরপাদের দৃষ্টিতে গুরুবচন 'পুঙ্খ'। এই পুঙ্খে বাণ যোজনা করিয়া এমনভাবে মনকে বিদ্ধ করিতে হয়, যাহাতে সে পরমনির্বাণ লাভ করে,

গুরুবাক্ পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅমণে বাণেঁ।
একে শর সন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমনিবাণেঁ ॥—২৮

এখানে 'বাণ' বলিতে বুঝাইতেছে সমরস বা একরস ('একরসং বাণমিতি'—টীকা)। বজ্রযোগের প্রারম্ভে গুরু শিষ্যকে এই সমরস উপদেশ করিয়া থাকেন ('কারিতব্যং তু তত্রৈব সমরসং শিষ্যগোচরম্'—হেবজ্র)।

বস্তুতঃ গুরুর বচনামৃত লহরীই কায় বা চিত্তশুদ্ধির উপায়। শুধু শুদ্ধি নহে

১. (ক) যেন চিত্তেন তে বালাঃ সংসারে বিলয়ং গতাঃ।
যোগিনস্তেন চিত্তেন সুগতানাং গতিং গতাঃ ॥ ১২ চর্যাটীকায় উদ্ধৃত বচন।

(খ) চিত্তমেব মহাবীজং ভবনির্বাণয়োরপি।
সংবৃত্তৌ সংবৃতিং যাতি নির্বাণে নিঃস্বভাবতাম্ ॥ ১৮ নং চর্যাটীকায় উদ্ধৃত।

চিত্তের রূপান্তরীকরণেও 'গুরু সম্প্রদায়' (গুরুপরম্পরা প্রদত্ত উপদেশ) সম্বল। ভুসুকুপাদ বলেন, সংবৃত চিত্ত হইতেছে চঞ্চল মূষক, দেহের অমৃত সেই ভক্ষণ করে ; দেহমধ্যে খনন করে সংসার গতিরূপ গর্ত। গুরুবাক্যরূপ যন্ত্র সন্নিধানে এই চঞ্চল মূষক নিশ্চল বা নিঃস্বভাবীকৃত হয়। অতএব ভুসুকুর নির্দেশ—

তব সে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু বোহেঁ করিহ সো নিচ্চল ॥—২১

চঞ্চল চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া বজ্রযোগে কায়বজ্রকে দৃঢ় করিতে হয়। কায়বজ্র স্থির হইলে বজ্রগুরুর উপদেশে বাগ্‌বজ্র দৃঢ়রূপে গঠন করিতে হয়। বাগ্‌বজ্র স্থিরীকৃত হইলে চিত্তবজ্রকে স্থির করিবার উদ্দেশ্যে চিত্তকে মধ্যমা মার্গে চালনা করিতে হয়। বিরমানন্দ-অবধূতী মার্গে প্রবাহ-অভ্যাসেই দৃঢ়স্কন্ধ অর্জিত হয়। সহজ-সাধনায় এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যাস-ক্রিয়া যদিও শিষ্যের, কিন্তু নির্দেশ গুরুর। এখানকার চিত্তকে, বলা হয় স্বাধিষ্ঠান চিত্ত। এ চিত্তেও সাতপ্রকার প্রকৃতিদোষ থাকে। চিত্ত অচিত্তে পরিণত হইবার পূর্বে প্রতিমুহূর্তে সংসার-গতির ভয় থাকে। কাজেই এ স্তরেও চিত্ত-বিশোধনের ক্রিয়া আছে। কাহ্নপাদ দাবাখেলার রূপকে এই স্বাধিষ্ঠান চিত্তের বিশোধনের ক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। করুণা-কায় যেন দাবার ছক ('পিহাড়ি'=পিঁড়ি)। এই কায়েও রহিয়াছে চন্দ্রসূর্যের আভাস দোষ (দুআ), বড়ে রূপে ১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষ, পঞ্চস্কন্ধের পঞ্চবিষয়াত্মক অহংকার-মমকারাদি জ্ঞান ('পঞ্চজনা')—এক কথায় রূপাদি ভববল। চন্দ্রসূর্যের গতি রোধ করিয়া, প্রকৃতিদোষকে নির্জিত করিয়া, পঞ্চস্কন্ধের আবরণকে ধ্বংস করিয়া, প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি দ্বারা ('মতিএঁ') সংক্লেশারাপিত চিত্তকে নির্বাণের উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়। গুরুর উপদেশেই তাহা সম্ভব। কাহ্নপাদও তাহাই করিয়াছেন ; তাই তিনি বলেন,

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন পিঅড় জিনউর ॥—১২

চর্যাগানে মধ্যমামার্গে প্রবাহ-অভ্যাস প্রসঙ্গে বার বার গুরুর কথা বলা হইয়াছে। ১৪ সংখ্যক গানে দেখা যায়, ডোম্বীপাদের চিত্ত-নৌকা গঙ্গাযমুনার

মাঝে (ললনা-রসনার মধ্যবর্তী অবধূতী মার্গে) বহিয়া চলিয়াছে। নৌকার কর্ণধারিণী 'বুড়িলী মাতঙ্গী' (অভিজ্ঞা মতঙ্গকন্যা=সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী জ্ঞানমুদ্রা)। তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া সাধক যোগী বলিতেছেন,

বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা।

মধ্যমামার্গে প্রবাহ-অভ্যাসের কথা কম্বলাম্বরপাদও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার করুণা-নৌকা শূন্যতায় ভরা। এই নৌকাকে গগনপথে বাহিয়া লইতে হইবে। উপায় বলিয়া দিবেন গুরু। তিনি বলেন, 'বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥'—৮

শূন্য পথের আসল কাণ্ডারী গুরু। সে পথ সোজা ('উজুবাট') বটে, কিন্তু তাহাও মায়ামোহের সমুদ্র। মধ্যমা নাড়ী প্রজ্ঞা, কিন্তু তাহাও মায়া ('প্রজ্ঞা মায়া চ ভণ্যতে। তত্রাভিষঙ্গো মোহঃ')। সে সমুদ্রের অন্ত নাই, সে সমুদ্র অথই। সেখানে পার হইবার জন্য অন্য কোন নৌকা বা ভেলাও নাই। সেখানকার একমাত্র ভেলা, একমাত্র কাণ্ডারী গুরু (নাহা=নাথ)। শান্তিপাদ বলেন, শ্রীমুখে চতুর্থানন্দ লাভের উপায় জানিয়া মায়াসমুদ্রের অন্ত বুঝিতে চেষ্টা কর:—

মাআ মোহা সমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥—১৫

চিত্তের বিকরণে গুরু-'সম্প্রদায়' (গুরু পরম্পরাগত উপদেশ) একমাত্র সম্বল। চতুর্থী সন্ধ্যায় গুরু আবার সর্বশূন্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। জগৎ যে মায়া, গন্ধর্বনগরী, মরুমরীচিকা, দর্পণের প্রতিবিম্ব, বন্ধ্যাসুতের খেলা—এই পরমতত্ত্ব উপদেশ করেন। চিত্তের ভ্রান্তি নিরাকরণে বা ভাবপরিশুদ্ধির ব্যাপারে সদ্‌গুরুর বচন অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শন। ভুসুকুপাদ সংবৃত্তির দৃষ্টান্তাদি দিয়া বলেন, 'জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তি পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাঅ' (৪১)।

বস্তুতঃ চিত্তের 'অমনসিকারে' গুরুবাক্যই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। গুরুর বচনেই চিত্ত 'টলিয়া' (সর্বপ্রকার দোষমুক্ত হইয়া) চতুর্থ স্তরের গগনসমুদ্রে—জ্ঞান সমুদ্রে বা শূন্যসমুদ্রে প্রবেশ করে। ভাদেপাদ বলেন, এতকাল আমি মোহগ্রস্ত ছিলাম; এখন সদ্‌গুরুর উপদেশে জ্ঞান লাভ করিলাম। 'বাজুল' বা বজ্রগুরুই আমার মোহ ভাঙিয়া দিলেন। আমার চিত্ত টলিয়া গগন-সমুদ্রে প্রবেশ করিল:

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকু ণঠা।
গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা॥ – ৩৫

(চতুর্থ আনন্দ স্বসংবেদ্য, উহা 'অপরপ্রত্যয়' (অপরোক্ষানুভূতি)। সে অনুভব বা সংবেদনের স্তরে গুরুর বস্তুতঃ কোন ভূমিকা নাই। গুরু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন, স্বানুভব শিষ্যের নিজের। কিন্তু তাই বলিয়া সে ক্ষেত্রে গুরুর কোন প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। সেখানেও গুরু শিরঃসঞ্চালনে বা সঙ্কেতে শিষ্যের ভিতর স্বানুভূত 'রতিস্বপ্রভাব' সঞ্চার করিয়া দেন। এ যেন বধির কর্তৃক মূকের সংবোধন।[১] সহজানন্দ-মুদিত কাহ্নপাদ এই অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস॥
জেতই বোল তেতবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল॥—৪০

কাহ্নপাদের এই চর্যাংশ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক বলেন, সহজ সাধকদের ভিতর নাকি এমন এক সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁহারা সাধনার পথে গুরুকে স্বীকার করিতেন না। এই মত সর্বৈব ভ্রান্ত। (সহজ-সাধনায় কোথায়ও গুরুকে অস্বীকার করা হয় নাই। বজ্রগুরু সহজ সাধকদের নিকট স্বয়ং বুদ্ধ, গুরুর মুখপঙ্কজ সাক্ষাৎ 'বুদ্ধবক্ত্র'।) সহজস্বানুভব গুরুমুখগম্য—'আত্মনা জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্ গুরুপর্বোপসেবয়া'—হেবজ্র)। চর্যাগীতিতেও এই সত্যকে স্বীকার করা হইয়াছে। ('গুরু পুচ্ছিঅ জাণ'—ইহা আদি সিদ্ধাচার্যের প্রথম অনুজ্ঞা, 'গুরু পাঅপএ' ('গুরুপাদপদ্ম প্রসাদাৎ') জিনপুর অতি সন্নিকট—ইহা চর্যাধরদের অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে কোন ফাঁক নাই, দ্বিধা নাই। এমন কি (যে কাহ্নপাদ বচনাতীত তত্ত্বের প্রসঙ্গে বলেন, 'আলে গুরু উএসই সীস' (৪০), তিনিই আবার বলেন, 'উআরি উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড় জিণউর' (১২); বচনাতীত সহজের অনুভবে মুদিত 'সহজনিদালু', সেই কাহ্নই অনির্বাচ্য অনুভবের প্রমাণ স্বরূপ স্বীয়গুরু জালন্ধরী পাদকে সাক্ষ্য মানেন (৩৮))

[১] যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি তদ্বদ্‌গুরো সদ্‌গুরু শিষ্যে রতিস্বপ্রভাবেণ মহাসুখং তনোতি।—চর্যাটীকা ৪০

॥ কায়-সাধন ও দেহসর্বস্ববাদ ॥

তান্ত্রিক বৌদ্ধ, তথা সহজিয়া বৌদ্ধদের কায়া সাধনকে অনেকেই ঘৃণাজনক ভোগের সাধন বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। অনেকে উহাকে দেহগত ব্যভিচার এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার হেতু বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার উহাকে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সমুন্নত নৈতিক আদর্শের পতন ও অবলুপ্তির কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

একথা ঠিক, তন্ত্রের, লোকোত্তর অভিষেকে বারবার যোগী এবং যোগিনীর 'কুন্দুর' যোগ (দ্বি-ইন্দ্রিয় যোগ)-এর কথা বলা হইয়াছে। মণ্ডলে ব্রাহ্মণাদি কুলোৎপন্না মুদ্রা (ডোম্বী, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী ও চণ্ডালী) গ্রহণের অনুজ্ঞাও সেখানে আছে। মহামুদ্রাসিদ্ধির লক্ষ্যে 'পঞ্চবর্ণ বিহার' অবশ্য করণীয়। সাধকদের পক্ষে সপ্রপঞ্চ-চর্যা নিষিদ্ধ নহে, অবশ্যচর্য। তন্ত্রে এমন কথাও আছে, নর-নারীর মিলনে যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাই বোধিচিত্ত। এই বোধিচিত্ত লইয়াই তান্ত্রিক বা সহজসাধকদের সাধন। এই সাধন-মালায় শূন্যতারূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার যে লক্ষ্যই থাকুক না কেন, তান্ত্রিক বা সহজ সাধকদের প্রজ্ঞোপায়-যোগ যে নরনারীর স্থূল রতিযোগ, তন্ত্রবাক্য হইতে তাহা প্রমাণ করা দুরূহ নহে ('যোষিৎ তাবদ্ ভবেৎ প্রজ্ঞা উপায়ঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ')। তন্ত্রেই বলা হইয়াছে, যে মহাসুখ চরম প্রাপ্তি, 'তৎসুখং কামিনী স্মৃতম্'; যে মহারাগনয় প্রধান ক্রিয়া, তাহা 'পরমা রতি'। সেখানে আরও বলা হইয়াছে, 'দেহাভাবে কুতঃ সৌখ্যম্'।

বজ্রযোগের সিদ্ধ আচার্যগণও বলিতেছেন, প্রাণিমাত্রই বজ্রধর, আর জগৎ স্ত্রী-মাত্রই কপালবনিতা ('প্রাণী বজ্রধরঃ কপালবনিতাতুল্যো জগৎস্ত্রীজনঃ'— দউড়ীপাদ)। অনঙ্গবজ্রের প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধিতে বলা হইয়াছে,— প্রজ্ঞাপারমিতা পরমার্থতঃ শুদ্ধা, তিনি সংবৃতিতনু ধারণ করিয়া 'ললনা' রূপে বিরাজ করিতেছেন ; মুক্তিকাঙ্ক্ষী সর্বপ্রকারে ইহার সেবা করিবেন।[১] সরহপাদ তাঁহার দোহায় বলিয়াছেন, বিষয়াসক্তি বন্ধ করিও না—দেখ মীন, পতঙ্গ, করী, ভ্রমর ও হরিণ প্রকৃত রাগভ্রষ্ট হইয়াই প্রলয় (মৃত্যু) বরণ করে।[২] তিনি অন্যত্র

১. প্রজ্ঞাপারমিতা সেব্যা সর্বথা মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ।
পরমার্থে স্থিতা শুদ্ধা সংবৃত্যা রূপধারিণী ॥

২. বিশয়াসত্তি মা বন্ধ করু অরে বট সরহ বুত্ত।
মীণ পঅঙ্গম করি ভমর পেক্খহ হরিণহ জুত্ত ॥

বলিয়াছেন, সূক্ষ্ম চিত্তাঙ্কুরকে যদি বিষয়রস দ্বারা সিক্ত না করা হয়, তবে কিরূপে তাহা গগনব্যাপী ফলদ কল্পতরুত্ব লাভ করিবে? সিদ্ধ যোগী কাহ্নুপাদ বলেন,—মন্ত্রজাপ ও তন্ত্রপাঠে কিছু হইবে না। নিজ গৃহিণীকে লইয়া কেলিসুখ ভোগ কর। নিজ ঘরের গৃহিণীর সহিত যুক্ত হইয়াই পঞ্চবর্ণ বিহার করিতে হয়। জপ, হোম, মণ্ডলকর্ম সবই নিষ্ফল। হে তরুণি, তোমার সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন রতিরাগ ব্যতীত কি এই দেহে বোধি লাভ করা যায়?[১] মেখলা টীকাকার বলেন, 'মনুষ্যদেহং বিহায় দেহান্তরেণ বোধি ন স্যাৎ', আর কাহ্নুপাদ বলেন, নিজ গৃহিণীকে লইয়া যিনি মহাসুখ স্থানে বোধিচিত্তকে নিশ্চল করেন, তিনিই বজ্রী বজ্রধর, তিনিই নাথ অর্থাৎ কায়-বাক্‌চিত্তের প্রভু।[২] চর্যাগীতিতেও এই মিলনের প্রসঙ্গ। এখানেও যোগিনী তিয়ড় চাপিয়া যোগীকে আলিঙ্গন করে। যোগী যোগিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, তোমাকে ছাড়া মুহূর্তও বাঁচি না। তোমার মুখচুম্বনে পদ্মমধু আস্বাদনের সুখ অনুভব করি। গুণ্ডরীপাদ বলেন,

ভণই গুডরী অহ্মে কুন্দুরে বীরা।
নরঅনারী মাঝে উভিল চীরা ॥—৪

কাহ্নুপাদ তো ডোম্বীর জন্য উন্মাদ। ডোম্বী চৌষট্টিদল পদ্মে নৃত্য করে, সাধকের চোখে নেশা লাগে। হউক সে অস্পৃশ্যা, হউক সে ঘৃণ্য বৃত্তিধারী 'ছিণালী'—সাধক বলেন, 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।' (১০) সত্যই তিনি তাহাকে বিবাহ করেন, দেহনগরীতে একাকারে বিহার করেন, অহর্নিশ ভোগ করেন সুরত—

অহনিশি সুরঅ পসংগে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ ॥—১৯

শবরপাদ নিজগৃহিণীকে লইয়াই পাগল। কখনও গুঞ্জামালা, শিখী-পিচ্ছে সাজসজ্জা করিয়া শবরী উঁচু পর্বতে ঘুরিয়া বেড়ায়, শবর তাঁহাকে পরকীয়া বলিয়া ভ্রম করেন। পরে ভ্রম ঘুচিয়া যায়, তিন ধাতুর খাট পাতিয়া তিনি প্রেমে রাত্রি প্রভাত করেন। ভোগ করেন শৃঙ্গার-উপচার তাম্বুল-কর্পূর—

হিএ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুণ নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই ॥—২৮

---

১. এক ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
ণিঅ ঘরণি লই কেলি করন্ত।
ণিঅ ঘর ঘরিণী জাব ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহরিজ্জই ॥ দোহা. ২৮

২. জে কিঅ ণিচ্চল মণরঅণ
ণিঅ ঘরণী লই এথো।
সো বাজির নাহ রে
ময়ি বুত্ত পরমথো ॥ দোহা. ৩১.

শবরপাদের শবরী-বিলাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ। চৌতলা বাড়ীর চতুর্থতল জ্যোৎস্নাবাড়ীতে তিনি নায়িকা-সম্ভোগে বিহ্বল হন। শৃঙ্গারের উদ্দীপন বিভাব রূপে কাপাস ফোটে, কঙ্গুচিনা পাকে, ইন্দুমণ্ডল উছলিয়া পড়ে—'অহ্ণদিন শবরো কিংপি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা।' (৫০)

সহজ মহাসুখের পথে সমাধি, ছন্দ-বন্ধ-করণ-কপাটের প্রয়োজন নাই। তীব্র দুঃখকর দুষ্কর ব্রত মহাসুখের প্রতিবন্ধক। লুইপাদ বলেন, এগুলি পরিহার করিয়া সহজসুন্দরীর পাশে বদ্ধ হও (১)। তৎশিষ্য দারিকপাদ বলেন, ওরে, মন্ত্রে, তন্ত্রে, ধ্যানে, ব্যাখ্যানে কি হইবে? অপ্রতিষ্ঠান মহাসুখ লীলাতেই দুর্লক্ষ্য নির্বাণ সুলভ (৩৪)। সরহপাদ বলেন, মিলনে মিলিত হইয়াই সহজ মহাসুখ লাভ করা যায়, অন্য উপায়ে নহে—'মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণে' (৩৮)—'সহজানন্দোপায়ং গৃহীত্বা…মহাসুখদ্বীপং গচ্ছ' (টীকা)।

বস্তুতঃ সহজ সাধনের সপ্রপঞ্চ বা স্বচ্ছন্দ চর্যা সম্ভোগ ও ভোগের সঙ্কেতে পূর্ণ। তাই প্রাচীন পাশ্চাত্য সমালোচকেরা ইহাকে নিন্দার চোখেই দেখিয়াছেন। প্রাচ্য পণ্ডিতগণও ইহাকে প্রশংসার চোখে দেখেন নাই। দর্শনশাস্ত্রবিদ্ আচার্য সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, কেন বৌদ্ধ ধর্ম ইন্দ্রজাল ও ভোজবিদ্যার অধীন হইল? বজ্রযান ও সহজযান যৌন-উচ্ছলতা ও যথেচ্ছাচারের প্রতীকে আচ্ছন্ন। তিনি আরও বলেন, কেহ কেহ ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, তবুও বাহিরের দিক হইতে ইহা সাধারণের নিকট শুঁটকী মাছের মতই দুর্গন্ধ যুক্ত।[১]

এমন কি, বৌদ্ধ তান্ত্রিক 'সাধনমালা'র সম্পাদক ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও বলিয়াছেন, বজ্রযানীরা নৈতিক শাসন-নীতির সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং অবিবেচকের মত চরম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন।[২]

কিন্তু আধুনিক সমালোচকদের অভিমত এ বিষয়ে ভিন্নতর। পাশ্চাত্য

১. It is a puzzle how and why Buddhism came under the spell of the Tantric cult, which had a dominant share of sorcery and magic…Latterly in its phases of Vajrayana and Sahajayana, it was obscured by symbolism, which apparently smacks of sexual licence and libertinism. The hidden meaning of this symbolism has been shown by some scholars to be purely spiritual. But the external vesture is certainly a caviare to the general mind, if not positively repulsive. Satkari Mukherjee : Cultural Heritage of India. Vol I (Ramakrishna Mission Institue of culture).

২. Vajayanists went beyond due limits in their spite against the strict rules of morality, and they violeted all of them and plunged head long into the worst immorality and sin.—Dr. B. Bhattacharja.

পণ্ডিতগণ তন্ত্র ও সহজ সাধনার যৌন সঙ্কেতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াই, ইহার ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। C. Humphreys বলেন, সমগ্র তন্ত্রযানের পুথি, চর্যা এবং পট ও মূর্তিশিল্প যৌন উপকরণে পূর্ণঃ তবু দর্শন ও ধর্মচর্যা ভালমন্দের অতীত। ধর্মরাজ্যে নর-নারীর যৌন মিলন, অন্যান্য দশটি উপায়ের মতই বন্ধন হইতে মনকে মুক্ত করিবার একটি উপায় বিশেষ। কাম জীবস্বভাবে স্বতঃসিদ্ধ, উহার শক্তিও অপরিসীম এবং এই শক্তিকে চিত্তমুক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উহা বিপজ্জনক ও দুরূহ, কিন্তু তন্ত্রে সাধকেরা কামকে অবলম্বন করিয়াই কামের উন্নয়ন সাধন করেন।[২]

হেবজ্র তন্ত্রের সম্পাদক Dr. Snellgrove, তন্ত্রসাধনায় মিলন-যোগের রূপকতা ও আধ্যাত্মিক অর্থ স্বীকার করিয়াও ইহার স্থূল তাৎপর্যকে অস্বীকার করেন নাই ('It would be absurd to defend it by pretending that the intention was solely symbolical.'), বরং সত্তার পরাবৃত্তি ও ক্রমবিকাশের পথে উহার উপযোগিতা নির্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তিনি যুক্তি সহকারে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিশেষ যোগে, দৈহিক শক্তি—তাহা শ্বাসই হউক বা শুক্র-স্রোতই (Semimal power) হউক—সংযমিত করিতে হয়। শ্বাস নিয়ন্ত্রণে যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, ইহা সর্বজন স্বীকৃত। শুক্রস্রোত নিয়মন (control of the seminal fluid) এই শ্বাস-সংযমনের পর্যায়ে আর একটি বাড়তি স্তর।

বস্তুতঃ বজ্রযোগীরা উচ্ছৃঙ্খল বা লম্পট ছিলেন না। রাজসভায় তাঁহাদের সমাদর ছিল। জনসমাজ তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতায় আনত হইত। তাঁহারা মূর্খও ছিলেন না। বজ্রযোগের পূর্বে তাঁহারা শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়াই গ্রহণ করিতেন। মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র, অধিমাত্রতর ভেদে অভিষেকের নানাপ্রকার

২. The sexual element dominated the entire system of Tantra, including its scriptures, practices and even iconography....Yet the philosophy itself is neither clean nor unclean, but one of thousand methods of enabling mind to break the illusion of its own surroundings. Sex is a fact and a universal fact and its force can be used to the mind's enlightenment. C. Hnmphreys : Buddhism, Chap, XV.

৩. If control of breath was already recognized as a means towards the achieving of a desired mental condition, then to control also the seminal fluid and thereby gain even better results, is but an advance along the same path. Hevajra Tantra : Critical study : D. L. Snellgrove.

বিধান ছিল। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল সত্তার উন্নয়ন। অশরণ দীনজনকে সত্যদ্বয়ের ভ্রান্তি হইতে মুক্ত করা ছিল তাঁহাদের জীবনের ব্রত।

তবে নিম্নস্তর তন্ত্র সাধনায় যে স্থূল মিলন-যোগ না ছিল, তাহা বোধ হয় নহে। ফলে বৌদ্ধসঙ্ঘে যে ব্যভিচারের স্রোত অনাবৃত হইয়াছিল, শঙ্করাচার্যের বৌদ্ধ-দলন তাঁহার কিংবদন্তীমূলক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। বৌদ্ধতন্ত্রে উচ্চতর ভাবও ছিল। বালযোগীরা সে ভাব গ্রহণ করিতে পারিত না, ফলে অঘটনও ঘটিত। সন্ধ্যাভাষার গূঢ় তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া তীর্থিক বা বাল-যোগীরা ভুলপথে পরিচালিত হইত। বৌদ্ধতন্ত্রেও সে ইঙ্গিত আছে।

আমাদের ধারণায়, সহজ-সাধন বা অনুত্তরযোগ—তন্ত্রসাধনায় সত্যই 'অনুত্তর' (যাহার পর নাই)। ইহা হিন্দুতন্ত্রের দিব্যভাবের স্তর। ক্রিয়া-চর্যার স্তর অতিক্রম করিয়া যোগের স্তর, যোগের পরে অনুত্তরযোগের স্তর। যেখানে তন্ত্রের উৎপত্তিক্রম ও মুদ্রা-মন্ত্র মণ্ডল-ক্রমের সমাপ্তি, সেইখানে অনুত্তর যোগের সূচনা। যেখানে নিম্নস্তরের যাত্রা শেষ, সেইখান হইতে উচ্চস্তরের যাত্রা শুরু। ভোগ এখানে অনাভোগ—ধূপ এখানে দগ্ধ হইয়া সৌরভ। এখানে সত্তার পুনরাবৃত্তি নহে, পরাবৃত্তি (Complete Revolution—Dr. Bagchi)—এখানে সত্তার বিভাজন বা বিশ্লেষণ নহে, সংশ্লেষণ ('New re-integration'. Dr. Snellgrove) আচার্য অসঙ্গ ঠিকই বলিয়াছেন, মৈথুনের পরাবৃত্তিতেই পরম বিভুত্ব ('মৈথুনস্য পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরম্।' মহাযান সূত্রালঙ্কার)। এই বিভুত্ব সহজ-সিদ্ধাচার্যের।

কাজেই তন্ত্রের সঙ্কেত এখানে আধ্যাত্মিক অর্থেই ধর্তব্য। যোষিৎ ও পুরুষ এখানে প্রজ্ঞা ও উপায়; পদ্ম (ভগ) ও বজ্র (পুরুষবীর্য) এখানে শূন্যতা ও করুণা; ললনা ও রসনা এখানে সত্যই দেহস্থ নাড়ী। অবধূতিকা ও মুদ্রা এখানে প্রজ্ঞারূপিণী সহজসুন্দরী। মিলনের রূপক নাড়ী-যোগের রূপক। বৌদ্ধতন্ত্রে অভিজ্ঞ ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহাশয়ও বলেন, মিষ্টিসিজমের অনুভব মিষ্টিক শব্দেই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি মিষ্টিক সম্প্রদায়ের গূঢ় বক্তব্য 'গুরু সম্প্রদায়াৎ বোদ্ধব্য'। ইহার আভিপ্রায়িক অর্থ গুরুর অধিকারে।[১] 'গুরু সে অভিপ্রায়

১. Every mysticism is garbed in language which is also mystic...and are unintelligible if interpreted literally, Every mystic school has got its traditions, of which only the teachers (gurus) are in possession of the secret. —Dr. Bagchi : Studies in Tantras. Pt. I.

যোগ্য শিষ্যের কাছেই উদ্ঘাটন করেন। উহার বাহিরের অর্থ বালযোগীদের ও বহিরঙ্গ জনের বুদ্ধির অগম্য।

তিনিও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, 'ললনা' দেহস্থ বামগা নাড়ী, বাহিরের যোষিৎ' নহে, 'রসনা' দেহস্থ দক্ষিণা নাড়ী, 'পুরুষ' নহে। 'অবধূতী' মধ্যমা নাড়ী প্রজ্ঞার প্রতীক। অন্তর্নিহিত রূপকার্থেই এগুলির আভিপ্রায়িক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। দেহস্থ নাড়ীগুলি পঞ্চতথাগতের ও তত্তৎ মুদ্রা বা যোগিনীর প্রতীক। উৎপত্তিক্রমে দেহের মধ্যেই পঞ্চতথাগতের (পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের) অভিব্যক্তি রূপে বোধিচিত্তের উদয় ভাবনা করিতে হয়।

অবশ্য উদিত 'বোধিচিত্ত' সাংবৃত স্পন্দরূপ শুক্রের প্রতীক ('বোধিচিত্তং সাংবৃত স্পন্দরূপং শুক্রং ... বজ্রপদ্ম যোগেন...তত্র বোধিচিত্তং জায়তে শুক্রমুৎপদ্যতে'—মেখলা টীকা)। বাল যোগীর পক্ষে এই বোধিচিত্ত নির্মাণে নরনারী যোগের প্রয়োজন হইতে পারে, অনুত্তর যোগী বা অধিমাত্রতর যোগীর পক্ষে উহা সর্বৈব ভাবনা মাত্র। মৃদু যোগ ও অনুত্তরযোগে পার্থক্য আছে।

মোটের উপর বোধিচিত্ত (শুক্র) লইয়া সাধন হইলেও উহার প্রকার অধিকারী ভেদে ভিন্ন। সহজ যোগীদের প্রপঞ্চসম্ভোগও ভিন্ন প্রকার। সহজ যোগীদের প্রপঞ্চভোগ শূন্য দৃষ্টিতে। তাঁহারা ভোগ করেন বিশুদ্ধ প্রপঞ্চ। আর বিশুদ্ধির সারকথা তথতা-জ্ঞান ('সর্বেষাং খলু বস্তূনাং বিশুদ্ধিস্তথতা স্মৃতা')। তাঁহারা বলেন, সম্ভোগ কায়টিই হইল ষট্‌রসরূপের ভোগস্থান ('সম্ভোগং ভুঞ্জনং প্রোক্তং যস্মাং বৈ রসরূপিণম্')। এই কায়েই প্রপঞ্চভোগ। অবিশুদ্ধ বিষয় বিষ; বিশুদ্ধ বিষয় অমৃত ('অবিশুদ্ধং বিষত্বাং যাতি বিশুদ্ধং পীযূষবদ্ ভবেৎ')। সহজ যোগীরা সম্ভোগচক্রে এই বিশুদ্ধ বিষয় ভোগ করেন। বহ্নি সর্বশুদ্ধ, অগ্নিশুদ্ধ বস্তু নির্দোষ – সহজসাধকদের রাগ সেই অনল। রাগানলে দগ্ধ যে বিষয়, তাহা নিঃস্বভাব। তাই বিষয় ভোগ সম্পর্কেও তাঁহাদের সতর্ক উপদেশ—চর্যা ভোগের জন্য নহে, ভোগ র্যা ভীমরূপিণী, কর্মমুদ্রা বা সময়মুদ্রা-চর্যার উদ্দেশ্য চিত্তের গতিকে বোঝা—চিত্ত স্থির, না চঞ্চল।[১].

প্রত্যুত সহজ সাধনায় বহিরঙ্গ নির্দেশগুলি অত্যন্ত গূঢ়ার্থ বোধক। 'উন্মত্ত ব্রতে'র গুরুনির্দেশ ও শিষ্য-চর্যা বহিরঙ্গজনের দুর্বোধ্য। গুরু তখন বলেন,

১ ন চর্যা ভোগতঃ প্রোক্তা যা খ্যাতা ভীমরূপিণী।
স্বচিত্ত প্রত্যবেক্ষায় স্থিরং কিংবা চলং মনঃ ।।—হেবজ্র দ্বিতীয়কল্প।২।২২.

প্রাণিবধ করিও, মিথ্যা কথা বলিও, অদত্ত গ্রহণ করিও (চুরি করিও), পরদার সেবন করিও, যাহা পাও (ভালমন্দ) তাহাই খাইও, স্নান-শৌচ করিও না, গ্রাম্যধর্ম বর্জন করিও না, নিদ্রাত্যাগ করিও না, ইন্দ্রিয়কেও নিবারণ করিও না, মদ-মাংস খাইও, পঞ্চবর্ণে বিহার করিও, মিত্রকে ঘৃণা করিও ইত্যাদি।[১] বাহিরের দিক হইতে অর্থ করিলে বলিতে হয়, জুগুপ্সিত সমাজ-বিরোধী আচরণ করাই সহজ সাধকদের জীবন-চর্যা।

কিন্তু সহজসাধকদের চর্যা ঘৃণ্য নহে, নির্দেশ বিসদৃশ হইলেও—প্রত্যেকটি নির্দেশ নিহিতার্থ বোধক। সহজ-সাধনা সত্তার পরাবৃত্তির সাধনা, জীবনকে হীনভাব হইতে মুক্ত করিয়া, ভ্রান্তি হইতে মুক্ত করিয়া, এক অভ্রান্ত সত্য বোধে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা। সাধন ফলে যে সত্তা গঠিত হয়, তাহা মুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব —প্রজ্ঞায় দৃঢ়, করুণায় উচ্ছল। সহজ মানুষ 'জ্ঞানানন্দ সুন্দর', অপরদিকে 'পরমকরুণানন্দ মুদিত হৃদয়।'

চর্যাগীতি : বাঙালীর দাবী

চর্যাগীতিগুলি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইবার পরে, এগুলিকে কেহ হিন্দী, কেহ মৈথিলী, কেহ বা ওড়িয়া কিংবা অসমীয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন। বিষয় এক, দাবীদার অনেক। দাবীর মূল কারণ ভাষা। চর্যার ভাষা যে প্রত্ন বাংলা, সে বিচার পরে করা হইবে। অন্যান্য প্রসঙ্গ বিচার করিলেও দেখা যাইবে বাঙালীর দাবীই সর্বাগ্রগণ্য।

(১) এই দাবী বিচারের প্রথমে মনে রাখিতে হইবে, যে যুগে চর্যাগানগুলি রচিত হইয়াছিল, সে যুগে 'বঙ্গাঙ্গমগধ' বলিতে গৌড়বঙ্গকেই বুঝাইত। তখন গৌড়বঙ্গের আয়তন ছিল বৃহৎ, সীমা বহুবিস্তৃত। সে সীমা পশ্চিমোত্তরে দ্বারবঙ্গ মিথিলা হইতে দক্ষিণে অনূপ প্রদেশ বঙ্গ, পশ্চিম-দক্ষিণে কলিঙ্গ হইতে পূর্বোত্তরে কামরূপ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। গৌড়েশ্বর পালরাজগণ ছিলেন তখনকার 'উত্তরাপথের ইতিহাসে প্রধান নায়ক' (রাখালদাস)। তাঁহাদের

প্রাণিনশ্চ ত্বয়া ঘাত্যা বক্তব্যঞ্চ মৃষা বচঃ।
অদত্তঞ্চ ত্বয়া গ্রাহ্যং সেবনং পরযোষিতঃ ॥
খানং পানং যথা প্রাপ্তং গম্যাগম্যং ন বর্জয়েৎ।
স্নানং শৌচং নৈব কুর্বীত গ্রাম্যধর্মং ন বর্জয়েৎ ॥
নিদ্রাত্যাগং ন কুর্বীত নেন্দ্রিয়াণাং নিবারণম্।
ভক্ষণীয়ং বলং সর্বং পঞ্চবর্ণং সমাচরেৎ ॥ হেবজ্র দ্বিতীয়কল্প তৃতীয় পটল.

একনায়কত্বে বর্তমানের খণ্ডিত ভূভাগে এক অখণ্ড সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাস হইতে জানা যায়, সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী মাৎস্য ন্যায়ের অবসানে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে গৌড়বঙ্গে প্রথম গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটে। পালরাজারাই ছিলেন সেই গণতন্ত্রের ধারক। আর এই গণতান্ত্রিক চেতনার ফলস্বরূপ তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় জনাশ্রিত নূতন ভাষা, লোকায়ত সহজধর্ম এবং নূতন জীবন-চেতনা বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। চর্যাগীতি এই নব প্রেরণার সৃষ্টি। পাল রাজারা ছিলেন 'পরম সৌগত'। গৌড়ের 'বজ্রাসন' ছিল মৈত্রী (করুণা) ও সম্যক্ সম্বোধির (প্রজ্ঞা) যুক্তাসন এবং গৌড়েশ্বরগণ ছিলেন 'কারুণ্যরত্ন প্রমুদিত হৃদয়।' চর্যারও মূলতত্ত্ব প্রজ্ঞা ও করুণার যোগ। গৌড়ের বজ্রাসনের সমাশ্রয়েই বজ্রযোগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 'অনুত্তর চর্যা'র বিকাশ ঘটিয়াছিল।

(২) এই সময়ের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারগুলির অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল গৌড়বঙ্গে—বরেন্দ্রভূমিতে, বিক্রমপুর অঞ্চলে ও চট্টগ্রামে। সোমপুর (বর্তমান পাহাড়পুর), দেবীকোট (বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর), বিক্রমপুরী বিহার, জগদ্দল, চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার এবং রাঢ়ের পাণ্ডুবিহার বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আর এই বিহারগুলির পোষ্টা ছিল তৎকালীন গৌড়ের বজ্রাসন। এই সকল কেন্দ্রে বহু তন্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত, সংশোধিত ও পুনর্লিখিত হইয়াছে এবং তাহাদের উপর ভাষ্য-টীকাও রচিত হইয়াছে। সেই সূত্রে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া সঙ্গীতগুলিও এই সকল স্থানে রচিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

(৩) চর্যাগীতির সহজ সিদ্ধাচার্যগণের যে জীবন-তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, সিদ্ধ সাধকগণ যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল গৌড়বঙ্গ। তিব্বতী ইতিহাস মতে আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ ছিলেন রাজা ধর্মপালের করণিক। লুইপাদের শিষ্য ছিলেন সিদ্ধাচার্য দারিকপাদ ('লুই পাঅপএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণে লধা'—৩৪)। তারানাথের মতে শবরী-পাদ ছিলেন বঙ্গের এক নটাচার্য। তিনি আরও বলেন, ডোম্বীপাদ (ডোম্বী হেরুক) ছিলেন ত্রিপুরার রাজা। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, ইনি রাঢ় দেশে বাস করিয়াছিলেন। টীকায় উল্লিখিত 'লাড়ী ডোম্বীপাদ' সম্ভবতঃ এই ডোম্বীপাদ। জালন্ধরীপাদের শিষ্য কাহ্নপাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত গোপীচন্দ্রের গানের বিশিষ্ট যোগী। তাঁহার গানগুলিতে বাংলা দেশে প্রচলিত সিদ্ধাচার্য-গীতিকার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। চর্যাকার ভাদে, ধাম, মহিল প্রভৃতি কাহ্নপাদের

শিষ্য। ভুসুকুপাদ যে অঞ্চলেরই লোক হউন না কেন, 'বঙ্গালী' হইয়া গিয়াছিলেন ('আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী'—৪৯)। তিব্বতী তালিকা অনুসারে শান্তিপাদ ও রত্নাকর শান্তি একই ব্যক্তি; রত্নাকর শান্তি বাঙালী। রাহুলজী মনে করেন, সরহপাদ ছিলেন 'পূর্বদিশা' অর্থাৎ ভাগলপুরের অধিবাসী (দ্রষ্টব্য দোহাকোশ)। তৎকালে এই 'পূর্বদিশা' ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু সরহ 'বঙ্গে জায়া' গ্রহণ করিয়াছিলেন ('বঙ্গে জাআ নিলেসি'—৩৯)। চর্যাগীতির অধিকাংশ সিদ্ধ আচার্য আসিয়া মিলিতেছেন গৌড়বঙ্গে। অতএব সিদ্ধ সাধক সঙ্গীতগুলি যে গৌড়বঙ্গেরই সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

(৪) চর্যাগীতির কতকগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণও সমর্থন করে যে, গানগুলি গৌড়বঙ্গেরই সামগ্রী। চর্যাগানে দেশনাম 'বঙ্গ' (৩৯), জাতি নাম 'বঙ্গাল' (৪৯) এবং নদী নাম 'পউআঁ' (পদ্মা)—৪৯ প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গের পটভূমি ব্যতীত এই নাম ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই দেশেরই অরণ্য-পর্বতবাসী আদি 'জন' শবর-শবরী। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্তও যে শবরকন্যার দেহ-লাবণ্য এদেশের জন সমাজকে, এমন কি রাজাকেও আকৃষ্ট করিত, 'বল্লালচরিত' এবং গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী'র একটি শ্লোক (মা শবরতরুণি পীবরবক্ষোরুহয়োর্ভরেণ ভজ গর্বম্'—আর্যা ৪৪৬) হইতে তাহা সমর্থিত হয়। চর্যার দুইটি গানে (২৮, ৫০) এই শবরীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। অহেরী ব্যাধ), ডোম ও চণ্ডাল এই দেশেরই অন্তেবাসী সমাজ-নিন্দিত জনগোষ্ঠী। বঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রসঙ্গও মিলিতেছে চর্যাগানে। ৫০ সংখ্যক গানে পাওয়া যায় 'কপাস' (কার্পাস) ও 'কঙ্গুচিনার (কাগনি) উল্লেখ। বঙ্গের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র (মসলিন) একদিন বিশ্ববিখ্যাত ছিল। চিনা শস্যের (গ্রাম্য ভাষায় 'চিন্নালী') চাষ এই দেশের।[১] ১৭ সংখ্যক গানে পাওয়া যায় 'সারি' গানের উল্লেখ। এই সারি গান বঙ্গদেশের নিজস্ব। ভাটি অঞ্চলে প্রচলিত 'বাইছার সারি গান'। তাহা ছাড়া চর্যাগীতিতে উল্লিখিত রাগ-রাগিণী গুলির ভিতর 'গউড়া', গৌড়, (গবড়া ২, ,১৯, ৪০) এবং 'বঙ্গাল' (৪৩) অত্যন্ত তাৎপর্য বোধক: এগুলি গৌড় বঙ্গে উদ্ভূত নিজস্ব রাগ-মার্গ।

(৫) চর্যাগীতিতে নদীমাতৃক যে দেশের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা

১ খনার বচনে চিনা-কাউনের উল্লেখ পাওয়া যায়—

যদি বর্ষে কাগুনে। চিনাকাউন দ্বিগুণে।।

চিরকালীন বঙ্গদেশের চিত্র। মহাভারতে তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ প্রভৃতি দেশের অধিবাসীকে বলা হইয়াছে 'সাগরানূপবাসিনঃ' (মহা, সভা, ২৯)। কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গীয়দের বলা হইয়াছে 'বঙ্গান্ নৌসাধনোদ্যতান্' (রঘু, ৪. ৩৬)। বঙ্গদেশ আবহমান কাল হইতে অনূপ (জলবহুল) ভূমি বলিয়া খ্যাত, আর এই দেশের প্রধান অবলম্বন নৌ-বল। 'বার নাও তের পানসী', চৌদ্দডিঙ্গা, ভাওয়ালিয়া, বজরা, ভেলা—এই দেশের নৌকার বিভিন্ন নাম।

অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের তাম্রপট্টলিপিতে অমর অক্ষরে ক্ষোদিত আছে—ভাগীরথী নদীর উপরে নির্মিত নৌ-সেতুবন্ধের কথা ('ভাগীরথী পথ প্রবর্তমান নানাবিধ নৌবাট সম্পাদিত সেতুবন্ধ')। বজরা নৌকার বহর ('বাজণাব পাড়ী'—৪৯) বাংলারই বিশিষ্ট নৌ-বহর। চর্যাগানগুলি এই অনূপ বঙ্গভূমির রসে সিক্ত ও স্নিগ্ধ। বিভিন্ন চর্যায় বর্ণিত হইয়াছে গহন-গম্ভীর নদীর রূপ, নদী পারাপারের সঙ্কেত, নৌবাহনের বিভিন্ন পদ্ধতি; কোথায়ও বা বর্ণিত হইয়াছে 'নাবীর রূপণায় বোধিচিত্তের কথা। সাধনতত্ত্বের জটিলতা ও রহস্যময়তা রসনিবিড় হইয়া উঠিয়াছে নদী ও নৌকার চিত্র-প্রতীকে।

(৬) তাহা ছাড়া একাধিক চর্যায় (৯, ১২, ১৬) আসিয়াছে গজের প্রসঙ্গ। হস্তীবল গৌড়বঙ্গেরই একটি বিশিষ্ট বল (দ্রষ্টব্য 'প্রাচীন বাংলার গৌরব'—শাস্ত্রী)। কামরূপ, উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের হস্তী ভারতীয় যুদ্ধের চতুরঙ্গ বলের একটি প্রধান অঙ্গ। এদেশের তাম্রপটে হস্তীবলাধ্যক্ষেরও একটি বিশিষ্ট পদের গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। খালিমপুর তাম্রপট্টে 'করিণী-নিবন্ধন-মহাস্তম্ভ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৬ সংখ্যক চর্যায় এই হস্তীবন্ধন-স্তম্ভ—'খম্ভাঠাণা'র উল্লেখ অতি স্পষ্ট। 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' শাস্ত্রও প্রণীত হইয়াছিল এই অঞ্চলে। চর্যাগানে বোধিচিত্তের সাধারণ নাম 'গঅরাঅ' (গজরাজ)। আর এই গজের প্রসঙ্গে আসিয়াছে 'বাখোড়' (দোখোট =স্তম্ভদ্বয়), মঅগল (মদকল ৯), 'তিনি পাট' (তে-পাটা), 'খম্ভা' (খাম্বা =স্তম্ভ, ১৬) প্রভৃতি শব্দ। গানগুলি গৌড়বঙ্গে রচিত বলিয়াই চর্যাগীতিতে হস্তী-প্রতীকের এত প্রাধান্য।

(৭) সর্বোপরি সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়া থাকে একটি দেশের চিরাচরিত ভাব। এই বিশিষ্ট ভাবমুদ্রা দ্বারা একটি বিশেষ অঞ্চলের ধর্ম ও সাহিত্যকে সহজেই অপর অঞ্চলের সাহিত্য হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রাচীনকাল হইতেই গৌড়বঙ্গ ছিল, তন্ত্র ও যোগ সাধনার বিশিষ্ট কেন্দ্র। কিন্তু বিহার-মিথিলাদি অঞ্চল ছিল আর্যধারার বাহক। প্রাচীন মিথিলা ছিল ব্রহ্মজ্ঞানচর্যার কেন্দ্র, পরবর্তীকালে সেখানে ন্যায়চর্চা প্রাধান্য পায়। কিন্তু গৌড়বঙ্গ চিরকালই তন্ত্রের দেশ। রত্নাকরশান্তি, প্রজ্ঞাকরমতি, অতীশ প্রভৃতি তন্ত্রাচার্য বাঙালী। চিরকালীন লোকায়ত যোগতন্ত্রের যে বীজ বঙ্গদেশের মাটিতে ছড়ানো ছিল, এদেশের প্রায় প্রতিটি ধর্ম সেই বীজের মিশ্রণে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত। আর এই মিশ্রণের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায় বাঙালীর নিজস্ব ধর্মীয় ও লোকায়ত সাহিত্যে। বঙ্গীয় ভাবমুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য—তান্ত্রিকতা শাস্ত্র-বিধির বিরোধিতা, প্রাণধর্মের সহজ প্রকাশ, কায়সাধন, রাগতত্ত্ব ও বস্তুনিষ্ঠা। বাঙালীর প্রায় প্রতিটি ধর্ম ও জাতীয় সাহিত্য এই লক্ষণে লক্ষণান্বিত। এদেশে সহজ-সাধনার বিবর্তন-ইতিহাস ইতিহাসের এই মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। বিচ্ছিন্ন নহে বলিয়াই, যে মূল ভাববস্তু লইয়া চর্যাগানগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহার অবিচ্ছিন্ন যোগ লক্ষ্য করা যায় পূর্বপর বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর ধর্মচেতনায়। বাংলা সাহিত্যের সেই গোত্রচিহ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চর্যাগীতি গৌড়বঙ্গের সামগ্রী।

'পরম সৌগত' পাল রাজারাই ছিলেন মহাযান, তথা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজ-ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বর্ম ও সেন রাজাদের আমলে শৈব, সৌর ও বৈষ্ণবাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। ফলে বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার ধারা মন্দীভূত হইয়া গেলেও এই সকল ধর্মে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, ভৈরবী চক্রানুষ্ঠান ও হঠযোগাদি হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। দ্বাদশ শতকেও বৌদ্ধতন্ত্রের তারাদেবীর প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে।[১] হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানে প্রথমত বৌদ্ধ সহজ মত ও পথ আশ্রয় লাভ করে শৈব চন্দ্রসূর্য মিলন-যোগ এবং শাক্ত চক্রানুষ্ঠানের ভিতর। ক্রমে অবস্থা বিপর্যয়ে বৌদ্ধশাক্তাচার স্থান করিয়া লয় সমাজের নিম্নস্তরের লৌকিক সমাজের মধ্যে। দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে এদেশে তুর্ক-আফগান অভিযানে ক্ষীণপ্রভ বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি ধূলিসাৎ হইতে থাকে। প্রাণভয়ে 'বৌদ্ধেরা নেপাল-

---

১ অতিপূজিত তারেয়ং দৃষ্টি শ্রুতিলঙ্ঘনক্ষমা সুতনু।
জিনসিদ্ধান্ত স্থিতিরিব সবাসনা কং ন মোহয়তি। আর্যা ২১

তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষ মিশিয়া যান অপাংক্তেয় হিন্দু ও বৈষ্ণ সমাজে ('বৈশ্যান্ত বৌদ্ধ ইব'—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক) ও আরও নিম্নস্তরে। অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতেও বাধ্য হন। একদিকে যোগ-তন্ত্র সাধন ধারার সঙ্গে বৌদ্ধ সহজসাধনার ধারা বাঙালীর লোকায়ত শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সংরক্ষিত হইতে থাকে, অপরদিকে বঙ্গদেশীয় পীর-ফকীরী সাধন এবং সুফী মতবাদের ভিতরেও সহজ যোগের ধারা মিশিয়া যায়। বাংলার নাথপন্থ, শৈব যোগী শাক্তাচার, মঙ্গলকাব্য, সহজিয়া বৈষ্ণব, ফকীরীসাধন এবং বাউল পদ্ধতির ভিতর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সহজসাধন পদ্ধতির চিহ্ন দুর্লক্ষ্য নহে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে—কায়া সাধন ও রাগতন্ত্রের সাধন মূলত হিন্দুরও নহে, বৌদ্ধেরও নহে, মুসলমানেও নহে; উহা এদেশের মৃত্তিকা-সম্ভব একটি অতি আদিম লৌকিক ধারা; এদেশের যাবতীয় সাধনপদ্ধতি সেই ধারার অধমর্ণ বলিয়াই প্রায় সমগোত্রজ এবং অন্যোন্য সম্পর্কযুক্ত। বাঙালী ও বাংলার ধর্ম চির সহজিয়া। চর্যাগীতিগুলিও সেই সহজমতের বাহক। এই সূত্রেই চর্যাগানের ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ও বাংলার ধর্মে।

বাঙালীর ধর্মে ও সাহিত্যে চর্যাগীতির উত্তরাধিকার

নাথধর্ম ও বৌদ্ধসহজ-সাধন : চর্যার ভাবানুষঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে গৌড়বঙ্গে প্রচলিত নাথধর্ম ও নাথসাহিত্যের কথা। নাথধর্ম বৌদ্ধ সহজধর্মের সহযোগী। নাথ সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বাংলা নাথসাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে সমীভূত হইয়া গিয়াছেন। ডঃ প্রবোধ বাগচী মনে করেন, লুইপাদ ও মীননাথ অভিন্ন। তারানাথ বলেন, গোরক্ষনাথ আদৌ ছিলেন বৌদ্ধ, নাম ছিল অনঙ্গবজ্র। পরে তিনি নাথধর্ম গ্রহণ করেন। পরমতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও চরম প্রাপ্তির দিক হইতে নাথধর্মে ও সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মে মিল ছিল; অবশ্য বৈশাদৃশ্যও ছিল। মনে হয়, জৈনধর্ম কালক্রমে প্রাচীন সিদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত হইয়া নাথধর্মে পরিণত হয়। জৈনধর্মের আচার্যগণ 'নাথ' উপাধিতে ভূষিত —যথা আদিনাথ ঋষভ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য পালন ও অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা জৈনধর্মের প্রধান লক্ষ্য। পরবর্তীকালে ইহার

এক শাখা রসসিদ্ধি, আসনবন্ধ, মুদ্রাদি করণ প্রভৃতি যোগচর্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শৈব ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া নাথধর্মে রূপান্তরিত হয়।)

নাথধর্মকে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন 'নিরীশ্বর', কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ইহাকে 'সেশ্বর' শৈব বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। নাথদের আদি 'আদিনাথ'; তিনি নৈরাকার নিরঞ্জন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব আদিনাথ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু নাথসাহিত্যে আবার আদিনাথ ও শম্ভুকে এক করিয়াও দেখানো হইয়াছে ('ইতি মুদ্রা দশ প্রোক্তা আদিনাথেন শম্ভুনা')। বস্তুতঃ তত্ত্বদৃষ্টিতে আদ্যে ও অনাদ্যে কোন ভেদ নাই। একটি নৈরাকার, অপরটি সাকার। এইখানেই বৌদ্ধ সহজিয়া পরমতত্ত্বের সঙ্গে নাথ-তত্ত্বের সাদৃশ্য। সহজতত্ত্বও শূন্য নিরঞ্জন। আবার তাহারই বিবর্ত কিংবা পরিণাম পঞ্চতথাগত ও তথাগতাত্মক সংসার। সহজিয়াদের লক্ষ্য যেমন নিরঞ্জনতত্ত্বে পৌঁছানো, নাথ যোগীদেরও লক্ষ্য যোগদ্বারা এই নিরঞ্জনতত্ত্বে বিলীন হওয়া। যোগপ্রক্রিয়ায় ঈশ্বরতত্ত্ব গৌণ, ক্রিয়াংশই মুখ্য।

ঈশ্বরপ্রসঙ্গ গৌণ হইলেও যে-কোন যোগ-ক্রিয়ায় গুরুর ভূমিকা অপরিহার্য। গুরুই এখানে প্রকারান্তরে ঈশ্বর বা পরমতত্ত্ব। সহজিয়া বৌদ্ধেরা বলেন, মর্ত্যের গুরু স্বয়ং বুদ্ধ, গুরুবক্ত্র সাক্ষাৎ বুদ্ধবক্ত্র; সহজ সিদ্ধ সঙ্গীতেও পদে পদে গুরুর প্রসঙ্গ—'গুরু পুচ্ছিঅ জাণ', 'সদ্গুরু পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা'। নাথশাস্ত্রও বলে, 'গুরূপদিষ্ট মার্গেণ যোগমেব সমভ্যসেৎ'। নাথেরা বলেন, 'গুরু সাচা পিণ্ডি কাচা', 'সদ্গুরু ভজিলে তবে আত্মা পরিচয়'। গুরুবাক্য ভুলিয়াই মীননাথের পতন—'ভুলিলা গুরুর বাক্য কামে হইলা ভুলা'। শিষ্য গোর্খনাথ গুরুর চৈতন্য সম্পাদনে এই 'গুরুবচন'ই নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন,—

> মীনের কানে কহিলেক গুরুর বচন।
> ভ্রম দূর হইয়া মীন হইল চেতন॥

নাথধর্মে শিবই আদিগুরু—'সন্তানের গুরু শিব'। শিবই নাথধর্মের প্রবক্তা, যেমন সহজধর্মের প্রবক্তা বজ্রধর। চর্যাগীতিতে একস্থলে গুরুকে 'নাহা' (নাথ) বলা হইয়াছে—'ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহা' (১৫)। ইহাও সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নাথধর্মের ঐক্যের একটি দিক।

নাথধর্মের মূল লক্ষ্য মরদেহকে 'অজরামর' করা। বাংলা নাথ সাহিত্যের সূচনাই শিবের প্রতি পার্বতীর এই প্রশ্ন লইয়া—

তুমি কেনে তর গোসাই আমি কেন মরি।
সেই তত্ত্ব কহ গোসাই যুগে যুগে তরি॥

চর্যাসাধকদেরও লক্ষ্য মরদেহের ভিতর সেই 'অজরামর' দেহকে লাভ করা। বৌদ্ধ সহজসাধকেরা যে 'বারুণী বান্ধে', তাহারও উদ্দেশ্য অজরামর দৃঢ়স্কন্ধ লাভ করা (চর্যা. ৩)। এই উদ্দেশ্যে যে সাধন-পদ্ধতি, তাহারও মূল ক্রিয়া উভয় ধর্মে এক—কায় সাধন, বিন্দু ধারণ এবং উল্টা যোগ। নাথযোগীদের সাধন-পদ্ধতির একটি অতি পরিচিত নির্দেশ, 'মন বান্ধ তন চিন্ত'; সহজ সাধকেরাও বলেন, 'চীঅ থির করি ধরহুরে নাই' (এখানে নাই=নৌকা=স্বকায়)।

দেহতত্ত্ব বিচারে নাথযোগীরা হিন্দুতন্ত্রের অনুসারী। নাড়ী ও চক্র নামগুলিও হিন্দুতন্ত্রোক্ত নাম। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের ললনা-রসনা-অবধূতী নাথপন্থে ইড়া-পিঙ্গলা ('ইঙ্গলা পিঙ্গলা') ও সুষুম্না। তবে বামা ও দক্ষিণা নাড়ীর প্রতীক হিসাবে 'চন্দ্র-সূর্য', 'গঙ্গা-যমুনা' নামগুলি নাথপন্থে ও বৌদ্ধতন্ত্রে এক। সহজ সাধকগণ চন্দ্রসূর্য নাড়ীদ্বয়কে রাত্রি ও দিবারূপ কালজ্ঞানের প্রতীক বলিয়া মনে করেন; চিত্ত মধ্যমা অবধূতী মার্গে বাহিত হইলে এই কালজ্ঞান বিনষ্ট হয়। তাই তাঁহারা বলেন 'চান্দসুজ বেণি পথা ফাল' (৪)। নাথমতে সহস্রারস্থ শুক্লবর্ণ শুক্রই চন্দ্র এবং নাভিস্থিত রক্তবর্ণ রজঃ সূর্য। তাঁহারা বলেন, সূর্য ও চন্দ্র কালপ্রবাহকে ধারণ করিয়া আছে; সুষুম্না এই কালজ্ঞানকে গ্রাস করে।[১]

বৌদ্ধ সহজ ধর্মে ও নাথধর্মে অবধূতী বা সুষুম্না মার্গের গুরুত্ব সমভাবে স্বীকৃত। মধ্যমা মার্গে পবনকে নিশ্চল করিয়া মনকে 'অমন' করা উভয়েরই লক্ষ্য। চর্যাসাধক মন-মূসার রূপকে বলেন, 'মাররে জোইআ মূসা পবণা' (২১), নাথসাধকেরা নির্দেশ দেন,—

আমনেতে মন কর চিন একাদশী।
পবন নিচল কর চিন রবি-শশী॥

চর্যাগানে আসনবন্ধ, মুদ্রাকরণ ও রস-রসায়ণ সাধনের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে (চর্যা. ১,২২)। নাথপন্থে আসন-প্রাণায়াম ও রসসিদ্ধির গুরুত্ব

১. সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধত্তঃ কালং রাত্রিন্দিবাত্মকম্।
ভোক্ত্রী সুষুম্না কালস্য গুহ্যমেতদুদাহৃতম্॥ (হঠযোগ প্রদীপিকা. ৪।১৭)

স্বীকৃত হইয়াছে। রস (পারদ) ও মন নাথ-সাধনায় একার্থক।[১] নাথপন্থে কঠোর ব্রহ্মচর্য বিহিত; নারীসঙ্গ পরিত্যাজ্য এবং কঠোরভাবে সংযমিত। তবে নাথপন্থের বজ্রোলী ও সহজোলী মুদ্রাকরণ ও সহজিয়া বৌদ্ধদের মুদ্রা-গ্রহণ ভিন্ন নহে। মুদ্রাসাধন উভয়ত্রই গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক। সহজযোগীরা যেমন সহজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 'ভুঞ্জই ইন্দিজানী' বা 'কুল লই খর সোন্তে উজাঅ', নাথযোগীরাও ভোগে অনাভোগের কথা স্বীকার করেন। গোরক্ষনাথ বলিয়াছিলেন, শিব 'নারী লয়া করে কেলি', 'সর্বভোগী নিরন্তর'—কিন্তু কখনও 'তত্ত্বেতে না রহে ভুলি'—'সর্বভোগে না করে আহার।'

মহারস পানের পদ্ধতি উভয়ধর্মে পৃথক হইলেও[২] সমাধির অবস্থা নাথ-পন্থে ও সহজপন্থে এক। সহজিয়াদের মহাসুখের অবস্থা সহজ, নিরালম্ব অদ্বয়; সেখানে মন 'অমন', সাধক মহারসপানে বিহ্বল: সে অবস্থায় 'জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিসেসো' (২২, ৪৯)। নাথপন্থ যোগীরাও সিদ্ধির অবস্থাকে বলেন 'উন্মনী' 'অমনস্ক', 'সহজ'। চরম অবস্থায় সহজিয়াদের 'চিঅ শূণ সম্পূন্না' (৪২); নাথেরাও বলেন, লয় যোগে মন একাধারে শূন্য অথচ পূর্ণ (আকাশে কুম্ভ শূন্য, সাগরে কুম্ভ পূর্ণ)।[৩] সহজমতে সে মন 'নৌ দাটই নৌ তিমই ন চ্ছিজ্জই' (চর্যা. ৪৬): নাথযোগীরাও অনুরূপ সুরে বলেন,

অগ্নিয়ে না যাবে পোড়া পানিতে না হয় তল।
লোহার অস্ত্র না ফুটিব শরীর কুশল। (গোপীচন্দ্রের গান)

ভুসুকুপাদের একটি চর্যাংশ (চর্যা ২১) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার মুনিদত্ত পরদর্শনকার মীননাথের 'কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট' প্রমুখ পংক্তি চতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ নাথশাস্ত্রে ও সাহিত্যে সহজসাধকদের পারি-ভাষিক শব্দ ও ভাবের সমাবেশ প্রচুর। চর্যার 'রবিশশী' (চন্দ্রসূর্য),

১. রসস্য মনসশ্চৈব চঞ্চলত্বং স্বভাবতঃ।
রসো বদ্ধো মনো বদ্ধং কিন্ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ (তত্রৈব. ৪।১২)

২. নাথযোগীরা সূর্যের গতি নিয়মিত করিয়া জিহ্বাকে উলটাইয়া তালুমূলে সংলগ্ন করিয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় সহস্রার-ক্ষরিত চন্দ্র-সুধা পান করিয়া থাকেন. সহজিয়া বৌদ্ধেরা উষ্ণীষ-কমলস্থ রস (কমলরস) দ্বারা দেহকে আপ্লাবিত করেন।

৩. অন্তঃ শূন্যো বহিঃ শূন্যঃ শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে ॥ (হঠযোগ. প্র. ৪।১৯)

'গঙ্গাযমুনা', 'দশমীদুআর', 'মহারস' 'অমন'—মনের বিপরীত করণ ('চিত্ত বিকরণ'-৩১) প্রভৃতি শব্দ নাথ সাহিত্যে ছড়ানো। চর্যার 'অনাহত' নাথদের নাদ বা 'সহজসঙ্গীত'—চর্যার 'জোহ্না' (সহজ জ্ঞানেন্দু মণ্ডল) নাথদের 'যুতি' (জ্যোতি)। চর্যাকার বলেন 'তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী' (৪), নাথ সিদ্ধা বলেন 'চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া যাউক ধূয়া'; চর্যাকার বলেন, 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই' (২) কিংবা 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী' (৩৩)— 'নাথ গোরেক' বলেন, 'পথরীতে পানি নাই পাড় কোন বোড়ে'।

(বাংলা মঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধভাব : মঙ্গল দেব-দেবীর পরিকল্পনার ভিতর অনেকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব-দেবীর প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন। বাংলার মঙ্গল দেব-দেবী লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের মিশ্ররূপ, মূল ভিত্তি লৌকিক। বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতাও একদিন হিন্দু লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। সেই সূত্রে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ক্ষীণ চিহ্ন মঙ্গল দেব-দেবতাদের ভিতর থাকা অসম্ভব নহে। মঙ্গল দেবদেবীর মন্ত্রসাধনে পৌরাণিক পূজা-অর্চনার অংশ প্রাধান্য পাইলেও, যোগ-তন্ত্রের সঙ্গে দূরান্বয় আবিষ্কার করা দুরূহ নহে। দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে শিব নীলাম্বরকে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানশিক্ষা দিয়াছেন। এই 'অমর শিক্ষা'র মূল কথা কায়সাধনের উল্টা যোগ, ('ভাটি বন্দি করিয়া জোয়ারে দিবে টান'), উদ্দেশ্য অটল শরীর গঠন।)

(মনসা-মন্ত্র সাধনে নাথপন্থ, তথা বৌদ্ধ সহজযোগের সঙ্কেতটি বেশ স্পষ্ট। বাংলার মনসা ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথপন্থের কোথায় যেন যোগ আছে। গোরখপন্থী যোগীদের ছড়ায়—চন্দ্র, সূর্য, ত্রিবেণী, নেত ধুবনী প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।[১] মনসা-মঙ্গল কাব্যের চন্দ্রধর, ত্রিবেণী ও নেতধুবনী যেন সেই যোগতন্ত্রেরই রূপক। 'ধুবনী' নিশ্চিত বৌদ্ধ সহজিয়াদের 'অবধূতী'। সহজিয়াদের মধ্যা নাড়ী অবধূতী অবহেলায় মল ধৌত করে, ধুবনীও বস্ত্রমল ধৌত করে। সঙ্কেতটি ইঙ্গিতগর্ভ। (বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে পদ্মার বিষ-ঝাড়নের প্রক্রিয়ায় সহজ-যোগের স্বাক্ষর আছে। 'ধোপাঝির মহাজ্ঞান চারি যুগে জাগে', 'ক্ষীরসিন্ধুজলে আছে ডোমনীর ঘর'; ধোপাঝি কাপড় কাচে গাঙ্গে ভাটা থাকে'; 'গাঙ্গের কিনারা দিয়া বহিয়া গেছে লতা।

১. চন্দা করিলৈ খুটা সুরিজ করিলৈ পাট।
নিত ধোবী ধুবই ত্রিবেণীকে ঘাট।। (গোরখপন্থী ছড়া)

পদ্মাবতী মৎস্ত মারে বাজে ধরে নেতা॥[১]— প্রভৃতি উক্তি, চর্যার কায়-তত্ত্ব, অবধূতী মার্গ ও কায়-যোগের কথা মনে করাইয়া দেয়। বিপ্রদাসের মনসা বিজয়ের মন্ত্র-সাধন সহজ যোগেরই বিকল্প :

খড্গা ভেদি উঠে তার গগন উপরে।
কামরূপা চন্দ্র সূর্য সমুদ্র ভিতরে॥
কেন ত্রিভুবন নাথ আপনা পাসর।
মন-পবনেতে জীব পরিচয় কর॥
চিন্ত সূক্ষ্ম মুখ্য সেই অচিন্তা অমল।
নহে ছোট বড় দৃঢ় নির্মল কোমল॥
অহর্নিশ খসে রস কিছু নাহি টুটে।
কোমল নবনী হেন বজ্র নাহি ফুটে॥
দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট।
আসুক পবনহংস ভ্রমুক স্ববাট॥
পুনরপি নেউটিয়া জাউক স্বস্থান।
জথায়ে কমলে ভৃঙ্গ করে মধুপান॥
উজানে উপান্তে বায়ু বুলো অকুঞ্চনে।
চন্দ্রসূর্য সমরস হউক এখনে॥

এখানে 'ধোপাঝি' (অবধূতী), 'ডোমনী', 'গগন', 'সমুদ্র' 'বড়দৃঢ়' (বজ্র), 'কমল-মধু' (কমল-রস), 'সমরস' প্রভৃতি শব্দ সহজপন্থীদেরই পারিভাষিক শব্দ। বেহুলা স্বর্গে গমনকালে জননীর সঙ্গে দেখা করিবার সময় 'জোগীভেস' (যোগী বা যুগীর বেশ) ধারণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ দেবের বর্ণনায় এই 'জুগি' নাথ যোগীরই প্রতিরূপ; শৃঙ্গনাদে 'জাতিগোর্খ' ফুকারও নাথপন্থ যোগীর ধ্বনি। কিন্তু নাথযোগীর বেশ ও বৌদ্ধ কাপালী যোগীর বেশ প্রায় একই প্রকার। নাথযোগীর চন্দ্রসূর্য-রূপ কর্ণকুণ্ডল, বিভূতি-ভূষণ[৪] প্রভৃতি ১১ সংখ্যক চর্যাগীতির 'নিরংশু চর্যা'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিপ্রদাসের বর্ণনাতেও বেহুলা-লখাইর জুগিবেশে কপাল-চর্যার সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

১. 'মৎস্ত' এখানে পরমতত্ত্ব, 'বাজ' বা চিল সেই মৎস্তের ভোক্তা বলিয়া নেতা (ধুবনী বা অবধূতী) 'বাজ' বা সেই যোগবিঘ্নকে অপসারণ করেন।

লাউয়া লাঠি থাল ঝুলি দোয়াদশ[১] করে।
শ্রবণেতে কুণ্ডল বিভূতি কলেবরে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সঙ্গেই সহজিয়া বৌদ্ধদের যোগ সমধিক। ধর্ম ঠাকুরের স্বরূপ এবং ধর্মপূজাপদ্ধতি বিষয়ে পণ্ডিত মহলে বাদানুবাদের অন্ত নাই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরের ভিতর বৌদ্ধধর্মের প্রতিফলনকে অস্বীকার করেন। কিন্তু ধর্ম ঠাকুরের পরিকল্পনায় কোথায় যেন নাথ ও বৌদ্ধ মতের সাযুজ্য রহিয়াছে। সহদেব চক্রবর্তী ও লক্ষ্মণের 'অনিলপুরাণ' ধর্মমঙ্গলকাব্য. এখানে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সেই সূত্রে চর্যাগীতির রহস্যময় দেহতত্ত্বের অনুরূপ কথাও সেখানে পাওয়া যায়। নাথ-সাহিত্যের তুলনায় অনিলপুরাণোক্ত গোরক্ষ ছড়ার সঙ্গে চর্যাগীতির মিল বেশি। চর্যাগীতির 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই'-এর অবিকল প্রতিরূপ অনিল পুরাণের 'পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়'। চর্যাগানের 'বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে'-এর প্রতিধ্বনি 'গাই বুড়াইল বলদ বিআইল এ বড় বচন অদ্ভুত।' অনিলপুরাণের 'তাল গাছে শোলের পোনা শিয়াল ধরিয়া খায়' (শিয়াল চর্যাটীকামতে সংবৃত্তি বোধিচিত্ত বা সংসারচিত্ত) চর্যাগীতির 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ' উক্তির রূপান্তর।

ধর্মঠাকুর 'সঙ্কর' দেবতা। তাঁহার সহিত মহাযানী শূন্যবাদ বা সহজিয়া শূন্যতত্ত্বের কোন সংস্রব নাই—এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বর্ণনায় ধর্মমঙ্গলে ও ধর্মপূজাপদ্ধতিগুলিতে বহু নঞর্থ-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ধর্মঠাকুর 'নৈরাকার নিরঞ্জন', 'শূন্যরূপ', 'নিরালম্ব' ও 'নির্বিকল্প'—'শূন্যনাথ শূন্য মধ্যে জন্মাইল কায়া', তাঁহার প্রণাম মন্ত্র—

নাস্তি রূপং নাস্তি দেহং নাস্তি কায়ো নিনাদং।
নাস্তি জন্ম নাস্তি মৃতিস্তস্মৈ শ্রীধর্মায় নমঃ ।। (ধর্মপূজা বিধান)

এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বশূন্য 'নিরাল' সহজেরই স্বরূপ। ডঃ শশিভূষণ

১. দোয়াদশ জপমালা, পীর-ফকিরের তসবী।

দাশগুপ্ত ইহাকে বৌদ্ধ-প্রভাবজাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[১] ডঃ দাশগুপ্ত ধর্মপূজা বিধানে পঞ্চ পণ্ডিত, পঞ্চ কোটাল, আমিনী (ঘটদাসী) প্রভৃতির ভিতরও অবরকালীন বৌদ্ধ পঞ্চতথাগতের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মপূজায় পৌরাণিক পূজাপদ্ধতির অন্তরালে এই যোগ নিতান্ত অস্পষ্ট। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল যাদুনাথের ধর্মপুরাণ গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন এবং 'প্রবেশক' ও 'ভূমিকা' অংশে ধর্মপূজা পদ্ধতিকে 'বৈদিক ও তান্ত্রিক কায়সাধনা'র রূপক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ধর্মঠাকুরের ভিতর বৌদ্ধ প্রভাব অস্বীকার করিলেও, ধর্মপূজা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদের কায়সাধনার সাধর্ম্যসূচক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছেন এবং নবাবিষ্কৃত ধর্ম পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, "কাহ্নপাদের অন্ত্যজ 'ডোম্বীচর্যা', দারকের 'বিপরীতকরণ' ইত্যাদি বিভিন্ন চর্যাগীতের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে।" বস্তুতঃ ধর্মপূজাপদ্ধতি যে আকারে বর্তমানে আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাতে উহার উপর বৌদ্ধ সহজতন্ত্রের যোগকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(ধর্মপূজার টীকা-পাবন, পুষ্প-পাবন, চনাপাবনাদির অংশ লৌকিক, কৃচ্ছ্র সাধনার অংশ (ধর্মসন্ন্যাস, বাণফোড়া, পাট-ভাঙা, শালেভর) জৈন, বাহ্য পূজার অংশ (সূর্যার্ঘ্য, দেব-দেবীর পূজা) পৌরাণিক। কিন্তু 'ঘর ভর, গাজনে'র—সংযাত্রা, বৈতরণীপার, ঘরদেখা, দ্বারভাঙা প্রভৃতি অংশ গূঢ় যোগ-তন্ত্রাচারের রূপক। এইখানেই সহজ যোগের সঙ্গে ধর্মপন্থদের দূরাগত যোগ।) ধর্মের একঘর বল্লুকা হিমসাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপে, যেখানে সাকার ধর্ম উলূকবাহনে বিগ্রহবান্। ইহা সাধকের দেহস্থ হৃৎপদ্ম। ধর্মের 'নীত' মানিয়া কৃচ্ছ্রসাধনা করিয়া ধর্মসন্ন্যাসী সে ঘরে পৌছিয়া লৌকিক সিদ্ধি অর্জন করিতে পারেন। কিন্তু ধর্মের আর এক ঘর 'হাকন্দ'। ডঃ সেন ইহাকে 'আক্রন্দ' শব্দের অপভ্রংশ মনে করিয়াছেন, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ইহাকে বলিয়াছেন 'আনন্দস্কন্ধ'। মনে হয়, হাকন্দ শব্দের অর্থ অ-মূল (অনাদি) বা শূন্য। ইহার

---

১. It is, however, noticeable that in the description of Dharma the negative tendency outweighs the positive. This dominance of the negative tendency even in the most popular religion can not but be recognised as the dwindling influence of Buddhism with its emphasis on the negative aspect of the reality.—Obscure Religious Cults.

স্থান উষ্ণীষ। হাকন্দ-সেবন শূন্যতত্ত্বে যুক্ত হইবার রূপক। হাকন্দে পশ্চিমোদয় সম্ভব হয়; ইহা সূর্যের বিপরীত উদয়। যে সূর্যজ্ঞান (বৌদ্ধমতে দিবাজ্ঞান) মূল তত্ত্বাববোধের পক্ষে বাধা, হাকন্দে তাহা হয় বিপরীত মুখী। এই মরদেহ মরিয়া না গেলে (বৌদ্ধ সহজমতে মন 'অমন' না হইলে) বিপরীতকরণ ('বিকরণ') সম্ভবপর নহে। লাউসেন ধর্মের উদ্দেশ্যে যে পদ্ম উৎসর্গ করিয়া পশ্চিমোদয় সম্ভব করিয়াছিলেন, তাহা দেহপদ্ম—মর ইন্দ্রিয়াধীন দেহ। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে সামুল্যার বাক্যে এই গূঢ়ার্থ পরিস্ফুট:

এক পদ্ম গগনে উদয় নিতি নিতি।
আর পদ্মে সমুদ্রে আছেন অম্বুবতী ॥
ধরায় তৃতীয় পদ্ম ধর্ম অবিসার।
আদি পদ্ম তুমি যে অপর নাই আর ॥

এই স্কন্ধ-দেহের বিয়োগ বা ধ্বংস অজ্ঞানীর পক্ষে ক্লেশকর। লাউসেনও তাই এই দেহ উৎসর্গ করার প্রস্তাবে প্রথমে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কাঁদিয়াছিলেন 'ভকিতা-আমিনী'; কিন্তু ধর্মের চিরব্রতদাসী সামুল্যা ছিলেন স্থির, আর বেট্রা বলিয়াছিলেন, 'তুমি মর নবখণ্ডে এই আমি চাই।' 'চন্দ্রসূর্য' বন্দী করিয়া শূন্যতত্ত্বে বিলীন হওয়ার দিক হইতে ধর্মসাধনার সহিত সহজসাধনার মিল পরিলক্ষিত হয় এবং সেই সঙ্গে ধর্মমঙ্গলেও চর্যার 'কাহ্ন বিয়োগে মা হোহি বিসন্না,' 'চিঅ বিকরণ' প্রভৃতি উক্তির প্রতিধ্বনি মিলে। ধর্মপূজাবিধানের দ্বারভেট প্রসঙ্গে 'সাংসুব ভক্ত্যা' ও ধর্মাধিকারীর উত্তর-প্রত্যুত্তরে শুধু বৈদিক ব্রহ্মোদ্যের নহে, চর্যার প্রতিধ্বনিও শোনা যায়। ধর্মপন্থীর দেউল্যার বাটের 'সোল সন্ধি দশ কপাট', ভক্ত্যার 'আমিষ' (চর্যামতে মাংস) ভক্ষণ (সহজ সাধকদের মতে তত্ত্বশুদ্ধ আমিষও নিরামিষ), 'সমুদ্র উছলিল পৃথ্বী ভাসিল' (তত্ত্বতঃ 'সমুদ্র নাঞি উছাল পৃথ্বী নাঞি ভাসে') প্রভৃতি সহজ-পন্থীদেরও সিদ্ধান্ত। সহজ সাধকেরা যেখানে বলেন, 'চীঅ সহজে শূন', কিন্তু এই শূন্য হইতেই সংবৃত্তি সৃষ্টির উদ্ভব, ধর্মপন্থীরা সেখানে বলেন,

আন্ধের পুষ্প গাছি নাঞি তার পাত।
আপনি নিরঞ্জন দিলেন পদ্মহাত ॥
সহস্র বাখড়ি পদ্ম হইল্য সতদল।
আপনি রহিল্য প্রভু কমল ভিতর ॥ (ধর্মপূজা বিধান)

তবে সহজ সাধনার রাগতত্ত্ব ধর্মসাধনে নাই ; ধর্মপূজায় 'শরীর বিচার' ও 'কায়সাধনে'র যে কথা পাওয়া যায়, তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে পৌরাণিক ও হিন্দুতান্ত্রিক যোগ-তন্ত্রের ভাব।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও বৌদ্ধ সহজিয়া : সহজ সাধনের ধারা যে অন্তঃসলিলা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এ দেশের ধর্ম-কর্মকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম। ডঃ সুকুমার সেন সহজিয়া বৈষ্ণবদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধদের 'উত্তরাধিকারী' বলিয়াছেন ; ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 'The Vaisnnva Sahajiya movement of Bengal marks the evolution of the Buddhist Sahajiya in a different channel' (O. R. C. Chap. V).

বৈষ্ণব সহজিয়াদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত ও পরিভাষা পৃথক। কাজেই প্রত্যক্ষ বৌদ্ধ ঋণ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সংশয় জাগিতে পারে। বরং এইরূপ বলাই সঙ্গত যে, সহজিয়া পদ্ধতি এদেশের ধর্মের একটি সাধারণ পদ্ধতি। বৌদ্ধই হউন, বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন বা মুসলমানই হউন, যাঁহারাই এদেশে লালিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ধর্মেই সহজরাগের স্পর্শ লাগিয়াছে। সমদেশজ বলিয়াই এই সাদৃশ্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের সিদ্ধান্তেও কেহ কেহ বৌদ্ধ প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, 'পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক' কৃষ্ণ-চৈতন্যের কল্পনায় পঞ্চতথাগতাত্মক বুদ্ধের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক। চরিতামৃত-ধৃত 'পঞ্চতত্ত্ব' ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতারাদির প্রতীক। কাজেই উভয়ের সাদৃশ্য কষ্টকল্পনা প্রসূত। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের, তথা কবিরাজ গোস্বামীর শক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণ-তত্ত্ব এবং কামবীজ, কামগায়ত্রী দ্বারা কৃষ্ণের উপাসনা যে তন্ত্রস্পৃষ্ট, তাহা ডঃ সুশীল কুমার দে এবং নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ আচার্যগণ স্বীকার করেন। তন্ত্রের ভূমিতে সকল ধর্মই 'সতান্ত্রিক'। রূপগোস্বামী বলেন হ্লাদিনী মহাশক্তির তত্ত্বটি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত।[১] বিবর্ত-বিলাসকারও বলেন, 'গোস্বামীর ধর্ম কিন্তু সতান্ত্রিক হয়।'

এই সূত্রেই বৌদ্ধ সহজ সাধকদের সঙ্গে সহজিয়াদের মিল। চর্যাধরদের সহজ

হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তি বরীয়সী।
তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ।। (উজ্জ্বল নীলমণি, রাধাপ্রকরণ)

তত্ত্ব, শাস্ত্র-বিরোধিতা, গুরুবাদ, দেহ-সাধন, রাগ-সাধন এবং গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশের রহস্যময় প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধদের পরমতত্ত্ব 'সহজ', সহজিয়া বৈষ্ণবদেরও পরমতত্ত্ব 'সহজমানুষ'। এই সহজ 'নিত্যস্বরূপ' ('জন্মমৃত্যু নাই তাঁর অক্ষয় অব্যয়'—আগমসার) এবং 'নিত্যানন্দ' (বৌদ্ধমতে 'মহাসুখ')। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধের চারিটি কায় (নির্মাণ, সম্ভোগ, ধর্ম ও সহজ) কল্পনা করেন, বৈষ্ণবগণও সহজমানুষের তিনটি দেহ স্বীকার করেন, 'সহজ মানুষ অযোনিমানুষ সংস্কারা মানুষ দেহ'। সহজ মানুষ নিত্যধামের কৃষ্ণ। অযোনি মানুষ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবতা এবং সংস্কারা মানুষ মর্ত্যের মানব। বৌদ্ধমতে সহজ একটি যামলতত্ত্ব; প্রজ্ঞোপায়ের যুগনদ্ধ বজ্রধর হেরুক। বৈষ্ণবমতেও সহজ একটি 'মধুর যুগল'—('রাধাকৃষ্ণ এক দেহ'); তাহা রূপ-রসের যুগল (রূপ=রাধা, রস=কৃষ্ণ)।

বৌদ্ধেরা মনে করেন, জগতের যাবতীয় নর-নারী বুদ্ধত্বের সম্ভাবনাযুক্ত। নর বজ্রধর, নারী নৈরাত্মা ('প্রাণী বজ্রধরঃ কপালবনিতাতুল্যো জগৎ-স্ত্রীজনঃ'—দউড়পাদ)। জীবসত্তা এবং ভগবান হেরুক অভিন্ন। সহজিয়া বৈষ্ণবমতেও জগতের নরনারীমাত্র স্বরূপতঃ নিত্য, 'আরোপ' পদ্ধতিতে রূপজগতের নারীপুরুষ (সংস্কারা মানুষ) স্বরূপ (সহজ মানুষ) হইতে পারে।

আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের জীবতত্ত্ব হইতে সহজিয়া বৈষ্ণবদের জীব চেতনার প্রভেদও এইখানে। মহাপ্রভু বলেন, 'জীবে কৃষ্ণে প্রভেদ আছয়ে বিস্তর'; জীব চিৎকণ, কৃষ্ণ চিদ্ঘন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণকোটিতে প্রবেশ করা অসম্ভব। জীবের পক্ষে রাগাত্মিক ভজনও সম্ভব নহে ('জীবে সম্ভব না হয়')। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ সেখানে জীবের অনন্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া বলেন, জীবের পক্ষে রাগাত্মিক ভজন সম্ভব, অন্যথা স্বয়ং মহাপ্রভু এই পদ্ধতি লোকমাঝে প্রকট করিবেন কেন? তাঁহারা আরও বলেন, কাম সৃষ্টির মূল ('কামেতে সবার জন্ম')। জীব কামসম্ভব ও কামস্বভাব; অতএব যে 'কাম উপাসনা হয়'[১] ('হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং'), তাহা জীবের স্বভাব-সঙ্গত। এই কাম সাধন করিয়া জীব কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণস্বরূপ ('নরবপু যাঁহার স্বরূপ') হইতে পারে। কৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধমানুষ। সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

---

১ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮)

দীপ্ত ভাষায় ঘোষিত। চণ্ডীদাস বলেন, 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' লোচন বলেন, 'মানুষ দেবের সার। যার প্রেম জগতে প্রচার।'

সহজ-সাধনে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রের স্থান তুচ্ছ। বাহ্য মালা-মুদ্রা ধারণ বৃথা, বৃথা কুলের অভিমান। বৌদ্ধেরা বলেন, 'আগম বেঅ পুরাণে পণ্ডিআ মাণ বহন্তি', বৈষ্ণবেরাও বলেন, 'কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান'। অতএব 'জাতি বিদ্যা ভয় থাকিতে ভক্তি নয়।' বৈষ্ণবদের গুরু-নিষ্ঠাও বৌদ্ধদের মত। তাঁহারা বলেন, 'গুরু অনুগত হয়ে সাধন করিয়ে ব্রজেতে করহ বাস' (তু: 'গুরুপাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা'—চর্যা. ১৪)।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সহজিয়া বৈষ্ণবদের 'রাগমতে সাধন'। বৌদ্ধ সহজিয়াদেরও সাধনপদ্ধতি 'মহারাগনয়'। এই নয়ের মূল কথা 'কমলকুলিশ'-যোগ (দ্বীন্দ্রিয় যোগ)। এই যোগই তাঁহাদের আসন, এই যোগেই তাঁহাদের প্রাণায়াম, অবধূতী মার্গে প্রবেশ, চণ্ডালী প্রজ্বলন, কালকে বিকালি করার ক্রিয়া ('কমলকুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী'---৪) এবং মহামুদ্রা সিদ্ধিতে মহাসুখে স্থিতি। যোগী ও যোগিনী এই যোগের মূল আশ্রয়। সহজিয়া বৈষ্ণবেরাও বলেন, 'রাগমতে সাধন সাধিবে রূপরতি' (ভৃঙ্গ রত্নাবলী)। এই সাধনের বিভাব মর্ত্যের পুরুষ-প্রকৃতি, প্রধান আশ্রয় প্রকৃতি ও বস্তু শক্তি ('সাধন কারণ সাধক মানি প্রকৃতিরে'—বিবর্তলাস)। রাগসাধনের রাগ স্থূলতঃ সামান্য রতি বা কাম, যাহাকে বলা হয় জীব-রতি বা অঙ্গরতি। কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব সহজিয়া কামপন্থ নহেন, তাঁহারা প্রেমপন্থ। তাঁহাদের সাধন 'পিরীতি' তিন আখর লইয়া ('পিরীতি তিনটি আখর এই মূল হয়')। বৌদ্ধদের সাধনীয় বস্তু চিত্ত বা শুক্র, বৈষ্ণবদের সাধনীয় পিরীতি বা প্রেম। সাধারণতঃ প্রেম ও কাম একার্থক। কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন, কামে ও প্রেমে প্রভেদ আছে। জীবের অঙ্গরতিকে বলে কাম, কিন্তু গোপীদের কৃষ্ণসেবা ইন্দ্রিয়দ্বারে হইলেও, তাহা প্রেম ('কামৈব গোপরামাণাং প্রেম ইত্যগমৎ প্রথা')। তাই তাঁহারা বলেন, কাম প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে দুই প্রকার। অপ্রাকৃত কামই প্রেম। কামের প্রকৃতি দেহ-ভোগ, আত্মসুখ ও খণ্ডরতি, প্রেমের প্রকৃতি অকাম, অথচ অখণ্ড রতি। প্রেমকে বলা যায় 'মহাকাম' ('কাম অকাম হইলে মহাকাম নাম'—বিবর্তবিলাস)। সামান্য কাম বা রতি সাধনক্রমে—রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। জীবের যে সাহজিক

বা স্বাভাবিক রতি, তাহাই সহজপ্রেম বা সহজ রাগ। এই সহজপ্রেম রূপ কামই সর্বার্থ-সাধক—'কাম সে কল্পতরু'—আর সেই কামেই 'হয় উপাসন'।[১]

বৌদ্ধ সহজিয়াদের 'মহারাগনয়ে'র সাধন সর্বথা যোগপন্থ, উহাতে যোগের ভূমিকাই মুখ্য। বৈষ্ণবগণ সেখানে 'প্রেমপন্থ' বলিয়াই, তাঁহাদের সাধন-প্রণালী সর্বৈব প্রেমভূমক। লক্ষ্যের এই পার্থক্য হেতু, উভয় সম্প্রদায়ের কায়-বিচারও পৃথক। বৌদ্ধ সহজিয়াদের শাস্ত্রে ও গানে দেহস্থ নাড়ী ও পবনের গতির বিচার; তাঁহাদের ক্রিয়া নাড়ী-শোধন, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি (তুঃ 'মাররে জোইআ মুসা পবণা'—চর্যা. ২১)। প্রেমপথের পথিক বৈষ্ণবসহজিয়ারাও বলেন, 'জগতের তত্ত্ব কর আপন কায়াতে'—

সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজদেহ জানিতে আপনি হবে স্থির॥ (অমৃতরত্নাবলী)

কিন্তু তাঁহাদের কায়ার চন্দ্র, পদ্ম, সরোবর—দেহের বাহিরের ও ভিতরের রূপ-রতির উদ্দীপন কেন্দ্র। তাঁহাদের চন্দ্র—নখচন্দ্র, মুখচন্দ্র, গণ্ডচন্দ্র, গুপ্তচন্দ্র ('অবলার অর্ধ অঙ্গ গুপ্তচন্দ্র দেশ')। তাঁহাদের মতে পদ্ম—নাভিপদ্ম, উরুপদ্ম, আঁখিপদ্ম প্রভৃতি। দেহের অভ্যন্তরস্থ সরোবরগুলির কল্পনায় বৌদ্ধতান্ত্রিক চক্র কল্পনার মিল থাকিলেও, নামে ও স্বরূপে তাহা স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব সহজিয়ারা ইহাদিগকে বলেন অক্ষয় সরোবর, প্রেম সরোবর ও কামসরোবর। (দ্রষ্টব্য অমৃতরসাবলী ও অমৃতরত্নাবলী)। তাঁহারা বলেন, যে দেহ কামকুণ্ড, তাহাতেই আছে প্রেমসরোবর, তাহাতেই রূপের কমল ফোটে, রসের মধু ক্ষরিত হয়—সেই রূপ-রসে আকৃষ্ট হয় রসিক ভ্রমর। কিন্তু দেহের রূপান্তর না ঘটিলে, সে প্রেম, সে রূপ, সে রসের সন্ধান মিলে না।

এই লক্ষ্যেই সহজিয়া বৈষ্ণবদের সাধন। দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহারা বলেন, সর্পের মাথায় যে মণি আছে, গরুর অঙ্গে আছে গো-রোচনা ও মৃগে মৃগনাভি—তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। মানুষের দেহেও তেমনই কাষ্ঠে অগ্নির মত, পুষ্পমধ্যে গন্ধের মত আছে 'মহাধন' প্রেম। কামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহা একত্র বাস করে, 'বিষ ও অমৃত দোহে রহে এক ঠাই।' বিশেষ 'আরোপ'

---

[১] প্রাকৃত অপ্রাকৃত দুই হয় কাম। অপ্রাকৃত কাম ধরে প্রেম নাম॥
প্রাকৃত কহিয়ে কাম হয় দেহরতি। জন্মে জন্মে ভোগভুঞ্জয়ে যায় অধোগতি।
অপ্রাকৃত কাম হয় উপাসন। প্রকৃতি পুরুষ দোঁহার হরে মন॥ (আনন্দভৈরব)

পদ্ধতিতে বিষকে অমৃতে পরিণত করিতে হয়: 'বিষেতে অমৃতে একুই হয়, বিষ জারি করে অমৃতময়॥' বৈষ্ণব মতে 'আরোপ' সেই করণ। সংস্কার। দেহেই এই করণ করিতে হয়। দেহ পক্ক ও অপক্ক ভেদে দুই প্রকার। 'অপক্ক-দেহেতে এ কাম সাধিলে ইকুল উকুল যায়।' তাহা বামন হইয়া চাঁদ ধরার মত বা নড়িহীন অন্ধের পথ চলার মত। যে-'কামের চরিতি অকৈতব রীতি', তাহার সাধন-পীঠ প্রেমদেহ বা সিদ্ধ দেহ। সামান্য করণই সিদ্ধদেহে বিশিষ্ট হয় গুণ ভেদে—'সামান্য করণ বটে বিশেষ হয় গুণে'। ইহা বিষাক্ত সর্প লইয়া খেলার মত। এ সাধনের পাঁচটি আশ্রয় বা স্তর—নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়। নামাশ্রয়ে গোত্রান্তর ঘটে, মন্ত্রাশ্রয়ে ঘটে দেহান্তর। বৌদ্ধেরা বলেন, সিদ্ধ অবস্থায় 'জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিসেসো।' বৈষ্ণবেরা বলেন, মন্ত্রাশ্রয়ে দেহান্তর ঘটিলে বা প্রাকৃত দেহ মরিলেই প্রেমের সাধন।[১] চণ্ডীদাস বলেন, 'মরা তনু যদি কটয়ে রা। তবে সে নাগরে প্রেমের বা॥' নরহরি বলেন,

সহজ মরণে মরিল যারা।
পিরীত ভজন পাইল তারা॥

প্রেমধর্ম সহজিয়ার সহজসিদ্ধি সহজরতি বা প্রেমের প্রতিষ্ঠায়। 'সহজ বস্তু জগতের সার', তাহার সাধন-পদ্ধতি গুহ্য 'গোপনীয়তত্ত্ব'। সে তত্ত্ব প্রকাশের ব্যাপারে সহজিয়ামাত্রই কূটার্থভাষী। বৌদ্ধেরা বলেন, সহজতত্ত্বের অববোধ—'কালেঁ বোব সম্বোহিঅ জইসা' (৪০)। বৈষ্ণবেরাও বলেন, 'হাবার কথা কালা বুঝে' (চণ্ডীদাস)। বৌদ্ধেরা সন্ধ্যাভাষার আঁড়ালে সে তত্ত্ব গোপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব সহজিয়াদেরও—'গাছ যে নাহিক, ফল সে ধরয়ে, বুঝিতে বিষম ভায়' প্রভৃতি উক্তি সন্ধ্যাভাষার মতই সঙ্কেতময়।

বঙ্গে ইসলামী ধারা ও সহজমত: সহজ ধর্ম প্রাণের ধর্ম। তাহা শাস্ত্রভারমুক্ত ও নিয়মতন্ত্রের বিরোধী। বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করার দিকেই তাহার ঝোঁক। মূল ইসলাম সংরক্ষণশীল, নিয়মতান্ত্রিক ও আচার-বিচারের কঠিন নিগড়ে বাঁধা। কাজেই তাহাতে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের কোন চিহ্ন না থাকাই স্বাভাবিক।

১. স্বাভাবিকী রতিধর্মঃ সাহজিকঃ স্বভাবতঃ।
রতিরাগ রসে যুক্তঃ কামানুগা স্বরূপয়ঃ॥ (মুক্তাচরিত)

কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র, লোকাচার ও দেশাচারকে কোন ধর্মই উপেক্ষা করিতে পারে না। পরিবেশ অনুযায়ী সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কোন রন্ধ্রপথে অন্য ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। বাহিরের আচার-আচরণে, ধর্মতত্ত্বে ও সাধন-পদ্ধতিতে তখন রক্ষণশীলতার ভিতরেও কিছুটা রূপান্তর দেখা দেয়। বঙ্গদেশে প্রচলিত মুস্লিম মতবাদ এই রূপান্তরের স্বাক্ষর বহন করে। ভারতীয়, তথা বঙ্গীয় ইস্লামী ধারা বেদান্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও যোগতন্ত্রের প্রভাব যুক্ত।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ইসলামের যোগ যে সুদুর অতীতের, তাহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য 'ভারত ও মধ্যএশিয়া': ডঃ প্রবোধ বাগচী)। ডঃ তারাচাঁদ বলেন, পূর্ব এশিয়ায় পারসিক, হিন্দু ও মহাযানের প্রভাব ছিল। অতএব এই অঞ্চলের মুস্লিম চিন্তাধারায় হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।[১] বঙ্গের ইসলামী ধারাও এই সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

বঙ্গে যখন তুর্ক-আফগানদের আবির্ভাব ঘটে, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রায় ভগ্নদশা। হিন্দু সমাজে তাঁহারা পাংক্তেয় ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য অহমিকা ও অবহেলার প্রতি একটি ধূমায়িত বিদ্বেষ তাঁহাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বিহার-বঙ্গের বহু সঙ্ঘারাম নবাগত তুর্ক-আফগান কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ফলে অনেক বৌদ্ধ নেপাল-তিব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন, অনেকে হিন্দুধর্মের নিম্নস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন কবির সাহেবের মতে বঙ্গের বহু মুসলমান ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ।[২] বঙ্গের সাহিত্য ও ইতিহাসও এই মতের পরিপোষক। রাঢ় অঞ্চলের 'সদ্ধর্মী' সম্প্রদায় মূলে ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁহাদের ধর্মতত্ত্বে ও সাধন-পদ্ধতিতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব ছিল। অবস্থা বিপর্যয়ে তাঁহারা হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ স্তরে অবস্থান করিয়া ধর্মঠাকুরের সেবকরূপে পরিগণিত হন। বঙ্গে তুর্ক-বিজয়ে তাঁহারা খুসীই হইয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য 'নিরঞ্জনের রুষ্মা':

১. 'It was inevitable that Muslim speculation should have been influenced by the thought of...Mahayana and Vedanta. (Growth of Islamic thought in India: Dr. Tarachand : phil. Estern & Western Vol. I)

২. Some Buddhists preferred Hinduism to Islam and found some sort of a place within the Hindu social system, but there are indications that large number accepted the new faith...These Neo-Muslims gave to Indian Islam an indigenous temper.—Islam in India : Humayun Kabir (The Cultural Heritage of India).

ধর্মপূজা পদ্ধতি)। তাঁহারা ধর্মঠাকুরের যবনরূপ কল্পনা করিয়াছেন ('হইয় জবনরূপী সিরে নিল কাল টুপি')। অতএব ইঁহাদের এক অংশ যে মুসলমান ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। আরাকান-চট্টগ্রামেও বৌদ্ধ-মুসলমানযোগ দৃঢ়তর হইয়াছিল। আরাকানের রোসাঙ্গরাজগণ বুদ্ধাচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ('তাহাতে মগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার॥'—দৌলতকাজী)। আর এই রোসাঙ্গ রাজদরবারের প্রধান লস্কর ও পাত্রগণ ছিলেন মুসলমান। উভয়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব এই অঞ্চলে যে অবরকালীন বৌদ্ধ মতের সঙ্গে মুসলমান ধর্মের মিশ্রণ ঘটিবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত। চাটিগাঁ একদিকে 'পীরের মোকাম' ('চাটিগাঁ পীরের মোকাম'—পল্লীগীতি) অপরদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম চর্চার কেন্দ্র। চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহারে একদিন তিলোপা ও নারোপার মত সিদ্ধাচার্য বর্তমান ছিলেন। ত্রিপুরার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ডোম্বীপাদ। এই অঞ্চলের দরিয়ার পাঁচপীরের অন্যতম 'বদর'-এর উপর মুসলমান ও বৌদ্ধদের সমান দাবী: বৌদ্ধ মতে 'বদর' বজ্র>বজর-এর রূপান্তর, মুসলমান মতে 'বদর' বিখ্যাত ওলী শাহ্ বদর বা 'খাজাখিজির'। উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড়ে, দেবীকোটে ও পাহাড়পুরে (সোমপুর বিহার) একদিন তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বিখ্যাত কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপের উপর 'মাহীসওয়ার' প্রমুখ পীরের দরগা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ-মুসলমান যোগের আর এক নিদর্শন মধ্যযুগের বাংলার যোগসিদ্ধ কাহিনী। এই কাহিনী রচনায় সমভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন হিন্দু ও মুসলমান। উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত যোগীর গানে ইসলামী চিহ্ন সুস্পষ্ট। একটি গানে মুরিদ-মুর্শীদ সংবাদে 'দমের সুমার' করা হইয়াছে।[১] ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া-সপ্তগ্রামেও বৌদ্ধ-মুসলমান যোগ সম্ভব হইয়াছিল। এককালে এই অঞ্চল ছিল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র এবং ইহা ছিল বঙ্গীয় বৈশ্যদের বাসভূমি। চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের সাক্ষ্য মতে বৈশ্যেরা ছিলেন বৌদ্ধ—'বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব'। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ইহাদিগকে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করেন। তৎপূর্বে এই ত্রিবেণী-পেঁড়ো ছিল

১ মুরিদ আরজ করে শাহজি আমার। রাত্রি দিনে দম বহে কত যে বান্দার
ইহার সুমার মোরে বতাইবে আপ। তবেত দেলের যায় সব মনস্তাপ॥

দরাপ খাঁ বা জাফর খাঁ প্রভৃতি গাজী-পীরদের আস্তানা। এই সূত্রে এইসকল স্থানে ইসলামী ধারার সঙ্গে বৌদ্ধ ধারার যোগ সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিক্রমপুর, ভাওয়াল ও বঙ্গের 'আঠারো ভাটি' অঞ্চলেও একদিন 'বজ্জাল' ধর্মী বৌদ্ধ সহজমত ছড়ানো ছিল। কালক্রমে এই সমস্ত অঞ্চল শাহ্ আলি প্রমুখ গাজী-পীরদের বিখ্যাত আস্তানায় পরিণত হয়। এই ভাবেই বঙ্গের সর্বত্র অবরকালীন বৌদ্ধধর্ম মিশ্রিত হইয়া যায় পীর-ফকীরদের ধর্ম পদ্ধতির সঙ্গে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত এদেশের ইসলামী ধারার এক অংশকে স্পর্শ করিয়া আছে সহজ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধারা।

বঙ্গে প্রচলিত ইসলামী ধারার তিনটি রূপ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে: (১) শরীয়ত-শাসিত গোঁড়া মুসলিম ধারা, (২) সুফী মতাবলম্বীদের ধারা এবং (৩) বেসর ফকিরী ধারা।

শরীয়তী ধারার ধারক মস্‌জিদের মোল্লা-মৌলানা, মাদ্রাসার মৌলভী এবং মধ্যযুগের বিচারালয়ের কাজী। তাঁহাদের কঠিন নিয়মতান্ত্রিকতা, পরমত অসহিষ্ণুতা এবং বিধর্মীর প্রতি জেহাদী ও জিম্মী মনোভাব চিরকালই হিন্দু-বৌদ্ধদের ভীতি সঞ্চার করিয়াছে। হিন্দু বা বৌদ্ধ উভয়েই তাঁহাদের দৃষ্টিতে কাফের। অপর ধর্মের প্রতি ইঁহাদের বিদ্বেষ ও জবরদস্তি বাংলাসাহিত্যে কলঙ্ক-রেখায় চিত্রিত রহিয়াছে (দ্রষ্টব্য বিপ্রদাস-বিজয়-গুপ্তের মনসা মঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)। ইসলামের প্রীতি-মন্ত্রবলে তাঁহারা পরধর্মীকে নিকটে টানিতে পারেন নাই।

সুফী ধারা অনেকটাই ইহার বিপরীত। সুফীদের উদার দার্শনিক মত, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবপ্রেমের বাণী সহজেই মননশীল সমাজকে আকর্ষণ করিয়াছে। সুফীদের একদল ছিলেন চিন্তানায়ক জ্ঞানী, দার্শনিক, মরমী কবি ও সভাপণ্ডিত —আর একদল অলৌকিক সিদ্ধিসম্পন্ন পীর, গাজী, অলী ও ফকীর। এই প্রকার 'বসর' ফকীর; তাঁহাদের অনেকেই চিস্তী, সুরাবর্দী, কাদেরী ও মাদারী সুফী খান্‌দানের অন্তর্গত। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার অধীন না হইলেও মূল মুসলমানী কলেমা, নামাজ, রোজা জাকাত ও জেকের প্রভৃতি মানিয়া চলেন। পণ্ডিতগণ বলেন, হিন্দু-বৌদ্ধের অন্তরকে জয় করিয়াছেন ইঁহারাই।[১] পণ্ডিত গবেষক আহমদ শরীফ বলেন, "বাংলাদেশে ইসলাম

[১] In fact, it was through Sufism that Islam really found a point of contact with Himduism and an effective 'entrance to Hindu hearts' : (Islam in India & Pakistan. Chap. viii : M. T. Titus)

প্রচারিত হয়েছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সুফী সাধকদের মাধ্যমে। (আলাওল বিরচিত 'তোহ্‌ফা'র ভূমিকা—সাহিত্যপত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

এই সুফী বা ফকীরদের লোকায়ত প্রতীক 'বেসর' ফকীরসম্প্রদায় তাঁহারাই এদেশে তৃতীয় ধারার ইসলামের বাহক। বেসর ফকীরগণ খানদানী সুফী নহেন। তাঁহাদের ভিতর নিয়ম অত্যন্ত শিথিল। তাঁহাদের অনেকেরই শাস্ত্রজ্ঞান অধ্যয়ন-প্রসূত নহে, লোকশ্রুত। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন, কোন আস্তানায় থাকেন, অলৌকিক সিদ্ধির নামে 'ঝাড়া ফুয়া' দেন, পানপড়া তেলপড়া-জলপড়া দেন, তাবিজ-তাগা-শিকড় বাঁধেন (দ্রষ্টব্য 'নছুর মালুম' —পূর্ববঙ্গগীতিকা)। লোকের বিশ্বাস—বনের বাঘ তাঁহাদের বশ মানে, সাগরের দুর্দৈব তাঁহাদের নামে কাটিয়া যায় (দ্রষ্টব্য 'রায় মঙ্গল'—কৃষ্ণরাম; 'মুকুটরায়' পালা—পূর্ববঙ্গ গীতিকা)। তাঁহারা আরও নানাপ্রকার কেরামতী দেখাইয়া থাকেন। আবার এই ফকীরদের ভিতর উচ্চস্তরের সাধকেরও অভাব ছিল না। Murray T. Titus বলেন, 'This group influences a very large multitude.'; পণ্ডিতপ্রবর আহমদ শরীফও বলেন, 'দেশীয় প্রাকৃত জন শরীয়তী ইসলামের শিক্ষা-সৌন্দর্য-মুগ্ধতায় নয়, কেরামতীর আকর্ষণে ও প্রভাবেই প্রধানতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।"

এই ত্রিধারার ভিতর সুফী এবং 'বেসর' ফকীরদের ধর্মমত ও সাধন পদ্ধতির সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ, তথা সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অবশ্য মূল বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে মূল ইসলামের কয়েকটি দিক হইতে সাদৃশ্য পূর্বেই ছিল। থেরবাদী বৌদ্ধদের 'তিসরণ' (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ) এবং আদর্শ ইসলামের আল্লাহ্, রসুল এবং কোরাণের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা প্রায় এক বৌদ্ধধর্ম যেমন জোর দিয়াছে নৈতিক জীবনগঠনের উপর, ইসলামেরও লক্ষ্য মানব-জীবনবাদ।[১] তবে পার্থক্যও ছিল গুরুতর: বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর, ইসলাম সেশ্বর বৌদ্ধগণ কর্মের জন্মান্তরে বিশ্বাসী, মুসলমানগণ জন্মান্তরে অবিশ্বাসী।

হৃদয়-ধর্ম, গুরুবাদ এবং সাধন পদ্ধতির দিক হইতে সুফীমতের সঙ্গে অনেকাংশে মহাযান বৌদ্ধমতের মিল আছে। কতকগুলি বিশ্বাস ও কৃত্যের দিক হইতে সুফীগণ মূল ইসলামকে স্বীকার করিলেও, হৃদয়-ধর্মের দিক হইতে তাঁহা

১. 'Islam is essentially a humanistic force'—Syed Ali Ashraf Muslim Traditions in Bengali Literature.

ছিলেন নিয়ম-তান্ত্রিকতার বিরোধী ['It (Sufism) is rather a natural revolt of the human heart against the cold formalism of a ritualistic religion.'—M. T. Titus]—মহাযান তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মও হৃদ্-বৃত্তি প্রধান ('Religion of the heart'—C. Humphreys); তাঁহারা হীনযানী জীবন-বিবিক্ততা ও কঠোর নিয়ম-শাসনের প্রতিবাদী। মিষ্টিক উপলব্ধি সহজিয়া ও স্থফী—উভয় ধর্মের প্রাণ।

দৌলতকাজী, আলাওল, সৈয়দ স্থলতান প্রমুখ স্থফী কবি এবং প্রেমপন্থ ও যোগপন্থ মুসলমান কবিদের রচনা হইতে বঙ্গে প্রচলিত স্থফীমতের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গের মুসলমান কবিগণ আল্লার বন্দনায় পরমতত্ত্বকে বলিয়াছেন 'আল্লা নিরঞ্জন'। আলাওল বলেন, তিনি 'রূপরেখা বহির্ভূত'। দৌলত কাজী বলেন,

অনুপাম নীরূপ নীরেখ নিরাকার।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ সমান তাহার ॥ (লোর-চন্দ্রানী)

মূল ইসলামের ঈশ্বর-কল্পনার সঙ্গে এই স্থফী-কল্পনার কোন পার্থক্য নাই। মহাযান শূন্যবাদী বৌদ্ধদের শূন্যতত্ত্বের কল্পনাও ইহা হইতে পৃথক নহে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সহজতত্ত্বও বর্ণচিহ্নরূপ বিবর্জিত, 'জাহের বাণ-চিহ্ন-রূব ণ জাণী' (চর্যা ২৯); তাহা 'অলক্‌খ লক্‌খণ ণ জাই' (চর্যা ১৫)।

স্থফী মুসলমানগণ অদ্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে অপর যে মতটি পোষণ করেন, তাহা মূল ইসলামে নাই। কুরাণের আল্লাহ্ সর্বস্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, সর্বপ্রভু—তিনি নিরাকার, নিরঞ্জন—তিনি সর্বব্যাপক। সর্বব্যাপক হইলেও সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নহেন। স্থফীগণ কিন্তু মনে করেন, আল্লাহ্ 'বিশ্বলীন'। মূল ইসলামে কোন অবতারবাদ নাই, বঙ্গের স্থফী কবিগণ রসুল মহম্মদকে মনে করেন 'পূর্ণ অবতার'। দৌলত কাজী বলেন, যিনি 'আহাদ', তিনিই 'মিম' যোগে অবতার 'আহামদ' (মহম্মদরূপী সখা') :[১]

আহাদ আছিল এক মিম হস্তে পরতেক
যে মিমেতে জগৎ মোহন।
নিজ সখা অবতার মহম্মদ অলঙ্কার
মিমে কৈল প্রকটি ভুবন ॥ (লোর চন্দ্রানী)

১. "হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর অন্য নাম 'আহমদ'। খোদার নিরানব্বই নাম মধ্যে 'আহাদ' একটি। আরবীতে আহমদ লিখিতে আলিফ, হে, মিম ও দাল অক্ষর লাগে। আহমদ হইতে মিম অক্ষর বাদ দিলে আহাদ হয়।" পাদটীকা হারামণি, প্রথম সংস্করণ : মহম্মদ মনসুর উদ্দীন।

একেশ্বরের এই যে বিশ্বলীনতা, ইহা ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল কথা। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরও মূল তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিশ্বাত্মকতা।[১] চর্যাতেও এই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়:

লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ন জাণা॥ চর্যা ২৯.

সুফী গুরুবাদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধদের গুরুবাদের আশ্চর্য মিল। সহজ বৌদ্ধেরা বলেন, গুরু হইলেন 'চিন্তামণি', তিনি ইচ্ছাফল প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রণাম কর ('তং চিন্তামণিং পণমহ ইচ্ছাফল দেই'—সরহপাদের দোহা)। বৌদ্ধ সহজিয়াদের গানেও পদে পদে নির্দেশ 'গুরু পুচ্ছিঅ জাণ'। সুফীদেরও প্রধান নির্ভর শেখ, পীর বা মুর্শীদ।[২] দৌলত কাজি বলেন,

গুরুভক্ত হয় যে সাধক শুদ্ধমতি।
তাহাকে দেয়ন্ত স্বর্গ কৃপাময় পতি॥ (লোরচন্দ্রানী)

আল্লার সহিত মিলনের পথে পীর-মুর্শিদই একমাত্র পথ-প্রদর্শক। গুরুর প্রতি প্রেম-নিষ্ঠাতেই মুরিদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রেমের ঝলক জাগে। সুফীগণ মনে করেন, গুরুপ্রেমলীনতা ('ফানাফিশ্বেখ') ঈশ্বরপ্রেম-লীনতার ('ফানা ফিল্লা') সোপান। পল্লীকবিরা এমন কথাও বলেন, 'যেহি মোরশেদ সেহি খোদা'—অতএব তাঁহাদের নির্দেশ—'দিন থাকিতে ধর ভাইরে মুর্শিদের চরণ।' বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, সুফীধর্মে পীরের প্রতি এই আনুগত্য, পীরের দরগায় সিন্নী মানা ও প্রদীপ দেওয়া প্রভৃতি কৃত্য হিন্দু-বৌদ্ধদের অনুকরণজাত—মুর্শিদ-মুরিদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটিও ভারতীয় 'গুরুচেলা'র অনুকরণে গঠিত।

সুফীদের প্রেমতত্ত্ব আর এক ভাবের সামগ্রী। তাঁহারা মনে করেন, খোদা 'নূর' (জ্যোতি বা রূপ) হইতে রূপময় নর সৃষ্টি করিয়াছেন। খোদাদোস্ত মহম্মদ নুর-নবী—'আদি অন্ত রূপে ভোর, রূপে রূপে নবীর বড়াই' (দৌলত কাজী)। রূপের প্রতি রূপের আকর্ষণই প্রেম। সুফীগণ এই রূপ ও প্রেমে

১. নিষ্প্রপঞ্চো নিরাভাসো ধর্মকায়ো মহামুনেঃ।
রূপকায়ো তদুদ্ভূতো পৃষ্ঠে মায়ৈব তিষ্ঠতে॥ (তত্ত্বরত্নাবলী : অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ)

২. The first requirement for one desiring to follow the life of a Sufi is to place himself under a guide, who is called a Shaykh, or Pir, both words mean an 'elder' or a Murshid i.e leader.—Sufism : Its saints and shrines : John A. Subhan.

উন্মাদ। পরম রূপ ও প্রেমের সঙ্গে মিলিত হওয়াই তাঁহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। তাঁহারা প্রেমপন্থ। আলাওল বলেন,

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ॥
যাঁর হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তি পদ পাইল সে সবার ঠাকুর॥

পার্থিব প্রেম হইতে প্রেমের দীপ জ্বালাইয়া লইয়া তাই সুফীগণ পরম প্রেমের অভিসারে যাত্রা করেন। তাঁহাদের মতে প্রেম দুই প্রকার—ইস্‌কে মজাজী (পার্থিব প্রেম) ও ইস্‌কে হকিকী (ঐশ্বরিক প্রেম)। আল্লা তাঁহাদের দৃষ্টিতে 'মাশুক' (Beloved), মানুষ 'আসিক' (প্রেমিক)। ইস্‌কে মজাজী ইস্‌কে হকিকী লাভের সোপান।[১] এইজন্য দেখা যায়, অধিকাংশ সুফী কাব্য পার্থিব প্রেমের কাব্য। বঙ্গের মুসলমান কবিগণ যে রাধাকৃষ্ণ প্রেম কথা, বিদ্যাসুন্দর কাহিনী ও পল্লী-প্রেম-গীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ 'ইস্‌কে মজাজী'—পশ্চাতে রহিয়াছে সুফী সংস্কার—'রূপ দেখি রূপের স্মরণ' (দৌলত কাজী)। ঐশ্বরিক প্রেমলাভে পার্থিব প্রেমের এই ভূমিকা আপাততঃ বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, কিন্তু ইহার পূর্বপট বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মহারাগনয় বা কর্মমুদ্রাসহ কমল-কুলিশ যোগ। যোগিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া বৌদ্ধ সহজিয়াও বলেন,—'তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি' (চর্যা: ৪)।

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, দেহ-সাধন ব্যাপারে ভারতীয় সুফীবাদ যোগপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত—'In India the Sufi orders approximated to the Hindu practices of yoga' (Dr. Tarachand): দৌলতকাজী ও আলাওলের রচনা পাঠ করিলেও দেখা যায়, তাঁহারা হিন্দু যোগপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ফয়জুল্লা, সুকুর মামুদ প্রভৃতি মুসলমান কবিগণ 'যোগাস্ত পুথি' ও যোগীর গান রচনা করিয়াছেন। তাহাতে 'অনাহত', 'অধোমুখে চন্দ্র তথা

১. Sufis consider themselves ashiq and God mashuq. Ishiqu or love is said to be of two kinds, the one is called ishqe haqiqi and the other ishqe majazi. Haq means God, hence ishqe haqiqi is love of God. ...Ishqe majazi is love of wordly thengs or men. ...ishqe majazi is is a stepping stone to ishqe haqiqi.—Persian Influence on Hindi: Ambika Prasad Bajpeyi (C. U.)

অমিয়া যরষে', 'কঠিন সূর্য সাধন' প্রভৃতি প্রসঙ্গ বৌদ্ধ সহজিয়াদের যোগের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়। মূল ইসলামে 'যিকির জপের' বিধান আছে—'কোরাণে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম' (তোহ্‌ফা, আলাওল): দেহের শ্বাসের সঙ্গে সুস্বরে 'যিকির' (আল্লার নাম স্মরণ) করিতে হয়। সুফী সাধকগণ বলেন, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ঈশ্বরের নাম জপ হইতেছে ('প্রতি প্রশ্বাসে 'লা ইলাহা' এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে 'ইল্লাল্লা' জপ চলে'—বাংলার বাউল: উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)। ইহা অনেকটা হিন্দুতান্ত্রিক 'অজপা' জপের অনুরূপ। সুফীদের 'যিকির' সত্যই বহুবিচিত্র। তাঁহারা সুস্বরকে 'প্রাণের আহার' বলিয়া মনে করেন। বৌদ্ধ বজ্রগীতি মণ্ডল-উদ্বোধনের কাজ করে, আর সুফীদের 'সামা' (গান) ঈশ্বর-প্রেমের আবেগ সৃষ্টি করে। সুফীদেরও দেহ-বিচার আছে, আত্মোন্নতির বিভিন্ন স্তর আছে। তাহাতে কোন কোন স্থলে সহজযোগের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুফীগণ দেহের ভিতর 'ছয় লতিফা'র কল্পনা করেন: নফ্‌ (জৈববুদ্ধি), কল্‌ব (heart], রুহ্‌ (soul), ছের (আত্মজ্ঞান), খফী (গুহ্যজ্ঞান) এবং আখ্‌ফা (পরমজ্ঞান)। নাভির নিম্নে নফ্‌, নাভির ঊর্ধ্বে বামে কল্‌ব, দক্ষিণে রুহ্‌ এবং এতদুভয়ের মধ্যে ছের। খফীর স্থান ভ্রূমধ্যে, আখ্‌ফার শীর্ষদেশে। (দ্রষ্টব্য Sufi Saints and Shrines in India : A Subhan)। সুফীরা মনে করেন, জীবসত্তায় রহিয়াছে ৭০,০০০ আবরণ। দেহের চারিটি মোকামে আবরণ-মুক্তির চারিটি স্তর—নাছুত, মালকুত, জাবরুত ও লাহুত; নাছুত মানব-স্তর (humanity), মালকুত দেবদূতের স্তর (Nature of angels), জাবরুত ঐশ্বরিক শক্তির স্তর (Possession of power) এবং লাহুত ঈশ্বরত্বের স্তর (Divinity)। আবরণ মোচন করিতে করিতে সাধক এই চারি স্তরের অনুভূতি লাভ করেন। ঐশ্বরিক ভূমিতে যাত্রার পথ চারিটি—শরীয়ত (কোরাণ-হাদিসের পথ), তরিকত (সুফী-নির্দেশিত পথ), মারফত (ধ্যান), হকীকত (সমাধি)। সহজিয়াদেরও কায়ভেদের চারিটি স্তর; চারিপ্রকার অনুভূতি। বৌদ্ধ সহজিয়ারা বলেন, পুদ্গল সত্তা একশত যাট প্রকার প্রকৃতিদোষের আকর। আবরণগুলি মুক্ত হইলে ক্রমে মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার ঘটে—তাহা একপ্রকার মত্তদশা। উহাই সুফী, সাধকদের 'হাল'।

এদেশে খান্দানী সুফী অপেক্ষা বেসর সুফীদের প্রভাব অধিক। আদর্শ সুফীবাদের সঙ্গে সহজধর্মের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বেসরা ফকীরদের উপর

সহজ ধর্মের প্রভাব বর্তিয়াছে। বেসর সুফী আদর্শ সুফীর লৌকিক সংস্করণ এদেশের ফকীর, সাঁই, দরবেশ তাঁহাদের প্রতিনিধি। মনীষী অক্ষয় কুমার দ তাঁহার বিখ্যাত 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' গ্রন্থে ইঁহাদের কিছু পরিচ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ইঁহারা প্রাণের সহজ ধর্মে অবলীলাক্রমে এদেশে নিম্নস্তরের হিন্দুধারার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। এদেশে প্রচলিত সহজমত ব সহজ সাধন-পদ্ধতিও সেই সূত্রে সাঁই-ফকীর-দরবেশী ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। বন্ধুবর ডঃ চোপরা সাহেব এই সম্প্রদায়কে বলিয়াছেন 'Th popular school of the sufis'. 'তিনি আরও বলেন, The sufis of thi school had little or no education. They collected the belief and superstitions of different faiths and preached and practised them'. (Sufism . Dr. Hiralal Chopra—The Cultural Heritage of India. vol IV).

কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রজ্ঞান অধ্যয়ন প্রসূত না হইলেও গুরুপরম্পরায় লোকশ্রুতির মাধ্যমে তাঁহারা যে জ্ঞানের পরিচয় দেন, তাহার মূল্য অল্প নহে। তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূতি-লব্ধ। তাঁহারা অনেকে স্বভাব কবিত্বেরও উত্তরাধিকারী। বাংলা সাহিত্যে যে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাদের অধিকাংশই সাঁই-ফকীরদের মুরিদ, অনেকে নিজেরাও ফকীর অভিধায় অভিহিত। ইঁহাদের ভিতর অনেকে নাথপন্থী 'যোগান্তপুথি' রচনা করিয়াছেন। অনেকে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-লীলাত্মক গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কারে মুস্লিম সুফীধারার সঙ্গে এদেশে প্রচলিত সহজিয়া বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি ধারার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বঙ্গের মুসলমান পল্লী কবিরাও অধিকাংশ এই মিশ্র-সংস্কারে লালিত। ইঁহাদের মাধ্যমেই এদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান যোগ সার্থক হইয়াছে। প্রাণের সহজ ধর্মের প্রেরণায় ইঁহারাই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ঘোষণা করিয়া বলিতে পারিয়াছেন,

হেঁদু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি।
কেহ বলে আল্লারসুল কেহ বলে হরি॥

বাংলা সাহিত্যে ফকীরী-দরবেশী সাধন সংক্রান্ত পুথি নাই বলিলেও চলে। এ বিষয়ে আলীরাজা-কৃত 'জ্ঞানসাগর' গ্রন্থখানি একটি অনন্য নিদর্শন।

সম্পাদক আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবও বলেন, 'ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ।···বঙ্গ সাহিত্যে এ শ্রেণীর গ্রন্থ আর নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না।' (ভূমিকা, জ্ঞানসাগর)। লেখক আলীরাজা নিজেও 'কানু ফকীর' নামে পরিচিত। গ্রন্থমধ্যে তিনি ফকীরের আচার-আচরণ ও ধর্মকৃত্যের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে লৌকিক সুফী মতের সহিত বৈষ্ণব মত, যোগ-তন্ত্রাচার এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ফকীর একদিকে প্রেমপন্থ অন্যদিকে যোগপন্থ। তিনি ফকীরকে প্রেমরসে পূর্ণ 'যোগী' বলিয়াছেন। গ্রন্থের ভিতর বৌদ্ধ সহজিয়াদের শূন্যতত্ত্ব, সমরস, গুরুবাদ, কায়সাধন ও রাগতত্ত্বের প্রতিফলন সহজ-লক্ষ্য। তিনি বলেন, শূন্যতার সঙ্গেই ফকীরের পিরীতি :

নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি।
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকীর পিরীতি ॥

এই শূন্যতত্ত্ব হইতেই রূপজগতের উৎপত্তি : 'শূন্য সিন্ধু হস্তে ব্যক্ত রূপের সাগর'। এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ সহজিয়াদের শূন্য-বিজ্ঞানবাদ হইতে ভিন্ন নহে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, শূন্যতারূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হইতে রূপ-কায়ের আবির্ভাব। রূপকায়ের মধ্যেও গুপ্ত রহিয়েছে শূন্য বিজ্ঞান। আলীরাজাও বলেন 'সূক্ষ্ম তনু গোপ্ত কায়ারূপের বেকতে'—

মৃত্তিকার ঘটরূপে জগতে প্রচার।
মৃত্তিকার ভাণ্ডমূলে শূন্য তনু সার ॥

এই যে 'তনু' -ইহাতেই রহিয়াছে ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু। এই দেহ-মধ্যেই ষট্‌চক্র, ষট্‌পদ্ম, ষষ্ঠ ঋতুর গতি : সপ্তম পুরী মহাসরোবর সদৃশ,— 'শত দল পদ্ম তথা কমল-ভ্রমর'। হিন্দুতন্ত্রের কল্পনার সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের তত্ত্বও ইহাতে জড়ানো রহিয়াছে। সহজিয়া বৌদ্ধদের 'জিনপুর'—গগন-সরোবর ; সেইখানেই উষ্ণীষ কমল, সেইখানেই 'কমল-ভ্রমর' স্বয়ং বজ্রধর।

সহজিয়া বৌদ্ধদের সমগ্র কায়সাধনের মূলে রহিয়াছে বজ্র-পদ্ম বা কমল-কুলিশ যোগ। আলীরাজাও বলেন, ফকীরের একমাত্র সাধন যুগল যোগ— 'যুগ ভিনে কোন কর্ম সিদ্ধিপন্থ নাই।' সৃষ্টি যুগলেরই লীলা। এক নিরঞ্জন প্রেমরসে যুগল হইয়াছেন। আল্লা-রসুল সেই যুগলেরই প্রতিরূপ। স্বর্গ-মর্ত্য, বহ্নি-পবন, জল-মাটি, তন্-মন্—সবই যুগল। যুগ ছাড়া সৃষ্টি অচল।

'প্রেমপন্থ যোগী' ফকীরেরও সাধ্য ও সাধন এই যুগল। যুগল-ভাবনা করেন বলিয়াই ফকীরের নাম যোগী :

এ যুগল হৈতে নাম ধরে যোগীকুল।
প্রেমপন্থ যোগীর প্রধান তত্ত্ব মূল ॥

ফকীরী মতে এই যোগকে বলা হয় 'কাকর-মকর' যোগ। কাকরের (কর্কট) 'কা' এবং মকর-এর 'ম'—অর্থাৎ 'কাম' এই যোগের গুহ্য রহস্য। গুহ্য অর্থে কাকর ও মকর যথাক্রমে সূর্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের প্রতীক। দক্ষিণায়নে চন্দ্রের আধিপত্য, উত্তরায়ণে সূর্যের—দক্ষিণায়নের ঋতুরাণী হেমন্ত, উত্তরায়ণের ঋতুরাজ বসন্ত। হেমন্ত স্থূল কামলোক বা কামিনী-তত্ত্ব, বসন্ত ঋতুরাজ পুরুষ তত্ত্ব ('বসন্ত পুরুষ হএ হেমন্ত কামিনী। বসন্ত ভাবক হএ হেমন্ত ভাবিনী ॥') দেহমধ্যে এই দুয়ের লীলা চলিতেছে বারমাস, ছয় ঋতু। এই দুইয়ের সুসমঞ্জস যোগ সাধন করিয়া ঋতুরাজকে দেহমধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই এই যোগের লক্ষ্য। ঋতুর স্বাভাবিক গতিভঞ্জন করিয়া বিপরীত ঋতুগতি আনয়ন করাও ইহার উদ্দেশ্যে। ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত পূরক-রেচক-কুম্ভকাদি প্রাণায়াম—উদ্দেশ্য তনের সহিত মনকে যুক্ত করা, চন্দ্রকে (মহারস) শোষণ করা এবং সর্বতোভাবে সাধকদেহের স্থিরত্ব আনয়ন করা। এই যোগেই ফকীরের সিদ্ধি। একটু মিলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, এদেশের চিরাগত সহজ সাধনার ধারা কেমন সহজে ফকিরী ধারার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ফকীরের 'কাকর মকর' যোগ প্রকারান্তরে বৌদ্ধদের 'কমল কুলিশ' বা চন্দ্র-সূর্য-মেলন, লক্ষ্য 'চন্দ্রার্ক গতি ভঞ্জন'।

এই সাধনে ফকীরদের যে আচার-আচরণ, তাহা বৌদ্ধ 'উন্মত্ত' যোগীদের 'বিসদৃশ নয়' হইতে পৃথক নহে। সহজিয়া বৌদ্ধদের উন্মত্ত আচরণে যে বিপরীত ধারার নির্দেশ রহিয়াছে ফকীরের জীবন-যাপনেও সেই বৈপরীত্য। 'উলটা রীতি' বা পলট যোগই ফকীরের চর্যা। ফকীরের ভাষাও তাই উলটা : তাঁহারা সুখকে বলেন দুঃখ, দুঃখকে সুখ—'মরারে অমরা বলি অমরা মরন্ত।' সম্মুখ তাঁহাদের কাছে বিমুখ, বিমুখ সম্মুখ ; তাঁহাদের ভোগও সংসারীর ভোগপথ হইতে ভিন্ন। তাঁহারা বলেন,

সমুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া।
পলটি বিমুখ পন্থে জাইব চলিয়া ॥

তাই শাস্ত্রপথ, পাণ্ডিত্য তাঁহাদের দৃষ্টিতে অসার—'শাস্ত্রমূলে কদাচিত না হয় ফকিরী।' পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া যায়, সিদ্ধ হওয়া যায় না। সিদ্ধির পথ ব্যক্ত ('বেকত') নহে, গুপ্ত ('গোপত')। সে পথের সন্ধান জানেন গুরু। তাই ফকীরের একমাত্র অবলম্বন গুরু—'গুরু সম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে।' 'উল্‌টা যোগ', শুষ্ক পাণ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ, গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, কায়-সাধন ও রাগতত্ত্বের দিক হইতে ফকিরী সাধনের সঙ্গে সহজযোগের এই মিল অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বৌদ্ধ সহজিয়া ভাবের কথাই মনে করাইয়া দেয়। এই ধারা মিশিয়া গিয়াছে বাংলার বাউল সম্প্রদায়ে।

বাংলার বাউল ও সহজিয়া ধারা: সহজ মত ও সহজ সাধন পদ্ধতির সার্থক দায়ভাগী বাংলার বাউল। প্রচলিত বাউল গানগুলিতে প্রেমপন্থ সুফী ও সহজিয়া বৈষ্ণব ভাবধারার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাংলার বাউল ফকীর-বৈষ্ণবের মিলিত রূপ। সত্য বটে, ইঁহাদের কেহ ফকীর, সাঁই, দরবেশ—কেহ বা সহজিয়া বৈষ্ণবদের অপভ্রংশ সহজী, ন্যাড়া, কর্তাভজা প্রভৃতি। কিন্তু বাউল সাধন পদ্ধতির সহিত তান্ত্রিক যোগ অবিনাভাবে যুক্ত। বাউল যেমন প্রেমপন্থ, তেমনই যোগপন্থ—বাউল প্রেমপন্থ যোগী। যে লোকায়ত যোগ এদেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত, বাউল সাধনায় তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইদিক হইতে বাউল ভ্রাম্যমান নাথযোগী, শৈবযোগী ও ভৈরবীচক্রের সাধক তান্ত্রিকদেরও সগোত্র। বাউল গানে সহজিয়া বৌদ্ধমতের প্রতিফলনকেও অস্বীকার করা যায় না। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলার লোকায়ত সকল ধর্মেই অন্তঃসলিলা বৌদ্ধধারার মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন বাউলের উৎপত্তি বৌদ্ধ সহজযানে (বাউলের ধর্ম : ডঃ বাগচী)। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও বলেন, "এই সহজিয়াদের (বৌদ্ধ সহজিয়া) একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বাউল সম্প্রদায়" (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : ডঃ মজুমদার)।

আসল কথা, বাউলের স্বতন্ত্র কোন জাতি নাই, সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্র কোন ধর্মও নাই। মানবধর্মই তাঁহাদের ধর্ম। এই সহজ মানবধর্মের প্রেরণায় পরিচালিত বলিয়াই বাউলমাত্রই একজাতি, একবর্ণ, একাভিপ্রায়ী। হিন্দু হউন, বৌদ্ধ হউন, মুসলমান হউন কিংবা শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-রামায়ত হউন—

যিনি সহজ প্রাণের সহজ ধর্মকে জীবনে স্বীকার করেন, তিনিই বাউল। সংস্কারবশে তাঁহাদের গানে জাতিগত ধর্মসংস্কারের কিছু চিহ্ন থাকিতে পারে, তাহা বহিরাগত কোন রঙ্ মাত্র ; আসলে তাঁহারা শুদ্ধস্ফটিকরূপী ঈশ্বর-প্রেমী মানব। লালন বলেন,

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই ॥

বাউলিয়া মত আধুনিকও নহে। শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, বাউলিয়া সহজমত অনাদিকালের—'যতকাল মানব. ততকাল এই বাউল সহজিয়া মত।' (বাংলার বাউল, 'লীলা' বক্তৃতা, ১৯৫৪, কঃ বিশ্ববিদ্যালয়)। তিনি আরও বলেন, বাউলের 'মনের মানুষ', তাঁহার 'শাস্ত্রভারমুক্ত' জীবনবাদ, 'রাগতত্ত্ব' 'দেহতত্ত্ব', 'আভাস রহস্য' (Mystery), 'ভাবের ইঙ্গিতময়তা '(Symbolism) এবং 'মরমী সংকেত' (Mystic message) প্রভৃতির ছায়া বেদে-উপনিষদেও আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গানে ইহারই প্রতিবিম্ব। এই সূত্রেই বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল সগোত্র।

'বাউল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'বায়ুগ্রস্ত', বাতুল বা পাগল (তুঃ হিন্দী বাউরা)।* সুরী হেমচন্দ্র দেশী নামমালায় 'বাউল' শব্দটির অর্থ করিয়াছেন 'প্রলপনশীল' (বাউল্লো 'পলবিরএ' ৭,৫৬) ইহার সহিত 'আউল' কথাটিও সমার্থে ব্যবহৃত হয়। পরমতত্ত্বের জন্য যাঁহারা আকুল, ব্যাকুল, পাগল (প্রলপনশীল) এবং সংসারে উদাসীন—তাঁহারাই বাউল। কাজেই অনেকের যে ধারণা, বাংলায় সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে মুসলমান সুফী-ফকীরদের মিশ্রণে বঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। কারণ, চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে একাধিকবার বাউল শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গানে একই অর্থে 'বায়ুড়া' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে :

পহিল বিআণ মোর বাসনা পূড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সে ব বাযুড়া ॥ (চর্যা.২০)

এখানে 'বায়ুড়া' শব্দটি বাসনাহীন, উদাসীন শূন্যতার প্রতীক রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে (তুঃ 'বাসনাবরাকী ন বিদ্যতে'—টীকা)। অন্য একটি গানে (চর্যা. ১০) এই অর্থেই ডোম্বীকে বলা হইয়াছে 'বাপুড়ী' (=বাউলী ?)। 'বাপুড়ী'

নৈরাত্মা (শূন্য), ঘৃণা-লজ্জাদি দোষরহিতা—নগর-বাহিরে তাহার বাস। এগুলি বাউলেরই ধর্ম। এই দিক হইতে স্মরণীয়কালে বৌদ্ধ সহজ সাধকেরাই বাংলার আদি বাউল। পরবর্তীকালের বাংলার বাউল ইঁহাদেরই সজাতি।

অবশ্য প্রচলিত বাউলগানে 'সহজ', 'স্বভাব', 'স্বরূপ', 'চন্দ্র-সূর্য', 'ত্রিবেণী' (তিরপিণী), 'উজান বাওয়া' প্রভৃতি শব্দ বাদে বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দাবলী পাওয়া যায় না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের বিরোধিতা, জীবন-চেতনা, 'স্বচ্ছন্দ চর্যা', গুরুবাদ, কায়-সাধন এবং রহস্যময় প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে বাউলগানে ও চর্যাগানে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। এই মিল অন্তরের, বাহিরের নহে। এ যেন 'জননান্তর সৌহৃদ'।

বাউলের সাধ্যবস্তু 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ'—তিনি 'কামধেনু', 'কল্পতরু' 'অমূল্য রতন'—তিনি 'নিত্য', রূপের ঘরে 'স্বরূপ'।[১] জীব সত্তায় এই নিত্য স্বরূপকে উপলব্ধি করা সহজধর্ম ও বাউল সাধনার মর্মকথা। বাউলেরা বলেন, এই মানুষ 'অধরা', 'আলেক মানুষ'—বৌদ্ধেরা বলেন, স্বরূপতঃ সহজ— 'অলকৃখ লকৃখণ ণ জাই।' কিন্তু অধরা, অলক্ষ্য হইলেও বৌদ্ধদের মত বাউলেরাও বলেন, তিনি আছেন এই দেহেই—'সকল জীবের ঘটে আছে মানুষ বস্তু একজনা' (হারামণি. ১ম।৪)। উভয় মতেই দেহেই সাধন, কায়ই 'ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড'। এই লক্ষ্যেই তাঁহাদের কায়-বিচার।) তবে দেহস্থ চক্র-পদ্মের কল্পনায় বাউলেরা হিন্দুতন্ত্রের অনুসারী। বাউল ও বৌদ্ধ সহজিয়া উভয়েই জানেন, বেদ-পুরাণ-পাঠে অধরাকে ধরা যায় না, ধরা যায় গুহ্য ক্রিয়াযোগে। দেহই সাধ্যপীঠ। এই সাধনে প্রয়োজন প্রকৃতি-পুরুষ, নর ও নারী। এই উদ্দেশ্যে সহজিয়া বৌদ্ধদের মুদ্রা-গ্রহণ, বাউলদের প্রকৃতি-সাধন। উভয়ের সংযোগে যে বিন্দুর উৎপত্তি, তাহাকে ধারণ করা এবং গুহ্য যৌন-যোগ-প্রক্রিয়ায় তাহাকে দেহের উজানে লইয়া যাওয়াই মূল ক্রিয়া। বৌদ্ধেরা ইহাকে বলেন, কমলকুলিশযোগ,—বাউলেরা বলেন রস-রতি যোগ। এই যোগ অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়াই উভয়েরই পথের দিশারু গুরু—'সমর্থ বাউল' বা 'বজ্রধর সদৃশ নাথ'। বাউল কমল বলেন, 'আগে মুর্শিদ ধররে জেনে শুনে'। লালন বলেন, 'গুরুরূপে নিরূপ মানুষ ফেরে।'

১. দ্রষ্টব্য এই লেখকের 'প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার' (প্রথমখণ্ড, 'তন্ত্র') এবং 'বাংলার বাউল ও বাউলগান'—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

রহস্যময় প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতেও বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল সমধর্মী। বৌদ্ধদের সময়-সঙ্কেতের ভাষা 'সন্ধ্যাভাষা', তন্ত্রের ভাষাও আভিপ্রায়িক। সহজিয়া বৌদ্ধদের 'মদন', 'কর্পূর', 'নৌকা' প্রভৃতি শব্দ গূঢ়ার্থ বোধক, তেমনই বাউলদের 'মণি', 'রস' (=শুক্র), অজর (=মল), রামরস (=মূত্র) প্রভৃতি শব্দ। বাউলদের 'অমাবস্যা', 'জোয়ার', 'মীন' প্রভৃতি শব্দও সাঙ্কেতিক। চর্যার বিপরীত-ভাষণ বা হেঁয়ালী ভাষার সঙ্গেও বাউল-বাণীর মিল লক্ষণীয়—

১. গাই বিয়াল মধ্য গাঙ্গে কুমীর বিয়াল চরে।
দাঁরকার পোনা মাছ সেই কুমীর ধরে॥

২. একটা কথা শুন্যা আইলাম তিরপিরনীর ঘাটে।
একটা ছেলে জন্ম নিল তিন পোয়াতির প্যাটে॥

এইভাবেই দেখা যায়, বঙ্গের একটি চিরকালীন সাধনার ধারা সকল ধারার সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। একই মৃত্তিকার রসে সঞ্জীবিত বলিয়াই এই মিল। বৌদ্ধ চর্যাগানগুলি বাংলার চিরকালীন সেই বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়া আছে। উহা বাঙালীর নিজস্ব সামগ্রী।

চর্যাগীতির ভাষা: প্রত্ন বাংলা

চর্যাগানের ভাষা প্রাচীন বা মধ্যভারতীয় কোন আর্য ভাষা নহে। উহা ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার কঞ্চুকমুক্ত একটি নব্য ভারতীয় ভাষা; যেন প্রাচ্য অপভ্রংশবৃন্তে সদ্য স্ফুটনোন্মুখ ভাষার একটি কুসুম-কোরক। এইজন্য পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ইহাকে স্ব-স্ব ভাষার আদি রূপ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়, চর্যার ভাষায় প্রচুর অপভ্রংশ উপাদান থাকিলেও, উহা বাংলা ভাষারই আদি রূপ বা প্রত্নবাংলা।

আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার আবিষ্কৃত দোহা, গান এবং ডাকার্ণবের দুর্বোধ্য গাথা—সবগুলিকেই 'বাঙ্গালা' বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালী ও তন্নিকটবর্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু-একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়।" কীর্তনের গানগুলি যে বাংলা, তাহা তিনি গানের শব্দ-সম্ভার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কেবল ২ সংখ্যক চর্যার পদকর্তা কুক্কুরীপাদ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, 'একজন পদকর্তার বাড়ী উড়িষ্যা দেশে।

তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গালায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে 'ল' থাকে, তাহাতে সেখানে 'ড়' আছে ; যেমন 'গাহিল' 'গাহিড়'। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি"।

বস্তুতঃ গানগুলি প্রকাশিত হইবার পরে, উহাদের ভাষা লইয়া পণ্ডিতমহলে বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদার মনে করেন, চর্যার ভাষায় বাংলা, ওড়িয়া ও মৈথিলী ভাষার প্রভাব থাকিলেও উহা মূলতঃ হিন্দী ভাষা। পণ্ডিত-প্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়নও অনুরূপ মত পোষণ করেন (পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী)। আবার কেহ কেহ ওই ভাষাকে ওড়িয়া, অসমীয় ও মৈথিলী ভাষার প্রাচীনতম রূপ বলিয়া দাবী করেন। চর্যাগীতিতে বাংলাভাষার লক্ষণই সুস্পষ্ট।

(১) ওড়িয়া ভাষার প্রধান বিশেষত্ব মূর্ধন্য ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণে। এখানে 'ণ' ড়ঁ-এর মত উচ্চারিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপ উচ্চারণের প্রভাব দ্বিতীয় গানটির 'গাইড়', 'সমাইড়' পদগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিয়া উহাকে 'উড়িয়া ভাষা'র পদই বলিয়াছেন। কিন্তু ডঃ সেনের মতে বিশুদ্ধ পাঠ হইবে যথাক্রমে 'গাইউ', 'সমাইউ'। কাজেই ধ্বনিবিচারের দিক হইতে ওড়িয়ার দাবী টিঁকে না। শব্দগঠনের দিক হইতে 'র' বিভক্তি দ্বারা ষষ্ঠীর পদগঠন এবং-ইল, -ইব-প্রত্যয় দ্বারা যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রিয়া-গঠন ওড়িয়া ও বাংলা ভাষার সাধারণ বিশেষত্ব। কিন্তু অ-কারান্ত শব্দে বাংলায় 'র' 'এর' হইয়া যায়। চর্যায় তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ওড়িয়া ভাষায় 'র' 'এর'-হয়না, যথা, শ্রাবণ মাসর কৃষ্ণা চৌথি'—এখানে অ-কারান্ত পদের পরে 'র' র-ই রহিয়াছে। ওড়িয়া ভাষা বহুল পরিমাণে সংস্কৃতের অনুগামী, ফলে বর্তমানের ক্রিয়াপদের 'অন্তি' বিভক্তিচিহ্ন ওড়িয়া ভাষায় সুরক্ষিত, যথা, 'সুলক্ষণে বরকন্যা করুছন্তি ভাব। শোভা পাউছন্তি তুঁহে রতি কামদেব ॥' চর্যায় কদাচিত্‌ ক্রিয়ার এই রূপটি রক্ষিত (যথা, 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী'—১৭ ; 'ভণন্তি মহিণ্ডা'—১৬)। -রু চিহ্ন দিয়া অপাদানের পদ গঠন,-মানে পরসর্গ যোগে বহুবচনের পদ গঠন বাংলা ভাষায় নাই, চর্যাগানেও নাই। অথচ ওড়িয়া ভাষার উহা বিশিষ্ট লক্ষণ। ভাষাবিদ্ পণ্ডিত বলেন, 'In its phonetics and its forms Oriya is the most conservative of Magadhan languages and Bengali is the most advanced or farthest removed.' (O.D.B.L). চর্যার ভাষাপ্রকৃতি বিচারে দেখা যায়, এই ভাষা যথাসম্ভব সংস্কৃতের বন্ধন-

মুক্ত। সংস্কৃত উপাদানকে তদ্ভব উপাদানের সহিত মিশাইয়া গুরুচণ্ডালী ভাষা সৃষ্টির দুঃসাহস বাঙালীর। এইদিক হইতে ওড়িয়া অপেক্ষা বাংলাভাষার সঙ্গেই চর্যাভাষার মিল অধিক।

(২) (চর্যার ভাষাকে অসমীয় ভাষার আদি রূপ বলিয়াও দাবী করা হয়। যদিও অসমীয় পণ্ডিতগণ অসমীয় ভাষাকে পৃথক ভাষা বলিয়াই গণ্য করেন, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে দেখা যায়, এই ভাষা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষার সহিত এক হইয়াই ছিল। তাহারপর দুই শাখা পৃথক হইয়া যায়। অবশ্য প্রাচীনকাল হইতেই কামরূপে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাতৃতান্ত্রিকতা, শাক্তাচার ও স্ত্রীজাতির প্রাধান্য ছিল এই অঞ্চলের প্রধান বিশেষত্ব। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা ধরিয়া এই অঞ্চলে ভোট-চীন বা তিব্বতী-ব্রহ্ম গোষ্ঠী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার ফলে ভাষাতেও অনেকটা স্বাতন্ত্র্য আসিয়া গিয়াছিল। এখনও আসামে গারো, নাগা, ভুটিয়া, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতি বসবাস করিতেছে। অহোম গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের ফলে কামরূপের পরিবর্তে 'আসাম' দেশনাম প্রচলিত হইয়াছে এবং অসমীয় ভাষাও পৃথক লক্ষণে চিহ্নিত হইয়াছে। তবু পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আসামের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। বাংলার সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ এখনও আসামে 'সুকনানী পদ্মাবতী' নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের ভাষা-প্রকৃতির সঙ্গে আসামের ভাষার মিলও প্রচুর। ভাষাগত এই মিলের সূত্রেই চর্যার উপর অসমীয়দের দাবী।—র প্রত্যয় দ্বারা ষষ্ঠী বিভক্তির, —ত প্রত্যয় দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির এবং—ইল, —ইব প্রত্যয় দ্বারা যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ গঠনে আসামী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিল আছে। চর্যার ভাষাতেও এই লক্ষণ আছে (যথা, 'হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জানী"—৬, 'বাটত মিলিল মহাসুখ সঙ্গা'—৮)। কিন্তু —র, বা -ত বিভক্তির এই যোগ বাংলা শব্দে যে রূপান্তর ঘটায়, অসমীয় ভাষায় তাহার অভাব। স্বরান্ত শব্দে বাংলার প্রবণতা -এর বিভক্তির দিকে ; এমন কি ই-ঈ কারান্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদ গঠনেও -এর দিকে ঝোঁক। চর্যাগানেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান। যথা—রুখের তেন্তলি-২, ভোম্বীএর সঙ্গে=১৯, মুষাএর চার প্রভৃতি। অসমীয় ভাষায় -এর বিভক্তির এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতের -ইব প্রত্যয়ের ব্যাপারে অসমীয় ভাষায় উত্তম পুরুষে -ইম,—ম হয়। চর্যাতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত

আছে, যথা, মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ—১০। কিন্তু ভবিষ্যৎ বুঝাইতে উত্তম পুরুষে -মি, -মু প্রত্যয়ের প্রয়োগ পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় দুর্লভ নহে, এমন কি পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষাতেও। যেমন, এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ। জগতে দোসর নাম না লইমু আন॥ (দৌলত কাজী) কিংবা, শুনিয়া অদ্বৈত হয় ক্রোধ অবতার। সংহারিমু সব বলি করয়ে হুঙ্কার॥ (বৃন্দাবন দাস)। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। অসমীয় ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ বেজবরুয়া বলেন,' 'ন' অক্ষরটি অসমীয়া ভাষাতে ক্রিয়া-পদের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, বাংলায় পরে।[১] চর্যাগানে ন-এর ক্রিয়াপূর্ব নিপাত বহুস্থলে আছে, যেমন, ন জীবমি—৪, ণ জাণী—৬, ন বুঝসি—১৫ প্রভৃতি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে; বাংলায় গদ্যেই শুধু ক্রিয়ার পরে 'না' বসে। 'কবিতায় ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে' (ডঃ চাটার্জী)। চর্যাগান কবিতা। কাজেই কবিতায় ন জীবমি, ণ জাণী প্রয়োগগুলি যে সর্বথা অসমীয়, একথা বলা নাও চলিতে পারে। বাংলায় 'না' অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বেই বসে, যেমন, না গিয়া কি করিবে। বিশেষতঃ সম্ভাবনা-সূচক বাক্যে পূর্বকালীন ক্রিয়াংশে 'না' সব সময়েই পূর্বে বসে, যেমন, যদি সে না যায়, তবে তুমি যাইও। চর্যায় ন-এর পূর্বনিপাত কবিতার ভাষার দিক হইতেই বিচার্য। তাহা ছাড়া, —বিলাক পরসর্গ যোগে বহুবচনের পদ গঠন অসমীয় ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। চর্যাগীতিতে ইহার চিহ্নমাত্র নাই। মহাপ্রাণ বর্ণের যে দুর্বল উচ্চারণ—খ-ঘ স্থলে ক-গ, ছ-ঝ স্থলে চ-জ অসমীয়া ভাষায় লক্ষ্য করা যায় ('জলচর স্থলচর জাকে জাকে পক্ষী' —মাধবকন্দলী, বন্দুলী<বন্ধুলী, চকু<চক্ষু), চর্যার ভাষায় তাহা একেবারেই নাই। কাজেই দুই-একটি বিষয়ে চর্যাভাষার সঙ্গে অসমীয় ভাষার মিল থাকিলেও সামগ্রিক ভাবে ইহা বাংলাভাষার লক্ষণেই লক্ষণান্বিত।

(৩) চর্যার ভাষা মৈথিলী, এ দাবীও অনেকে করিয়া থাকেন। মিথিলার দাবী হিন্দীর সঙ্গে যুক্তভাবে বিচার্য। কারণ, পূর্বী হিন্দীর সঙ্গে মৈথিলী ভাষার কোন-কোন দিক হইতে মিল আছে। বিশেষতঃ সর্বনাম পদগুলির রূপে এবং ক্রিয়াপদের স্ত্রীলিঙ্গীকরণে পূর্বী হিন্দীর সঙ্গে মৈথিলী ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া -অল, -অব প্রত্যয় দিয়া যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ

১. 'ন' আখরটো অসমীয়াই আগত বহুৱায়। কিন্তু বঙ্গালীত হলে পাছ ভহে রহে।' (অসমীয়া ভাষা আরু সাহিত্যর বুরঞ্জী)

কালের ক্রিয়াপদগঠনেও মিল দেখা যায়। চর্যার ভাষায় জো, সো, তো, মই প্রভৃতি সর্বনাম—অইছন, জইসন, ঐছে, তৈছে প্রভৃতি সর্বনামীয় ক্রিয়া-বিশেষণ—ক্রিয়ার স্ত্রীলিঙ্গীকরণ (ভরিতী করুণা-নাবী—৮, রাতি পোহাইলী—২৮) প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। মৈথিলা ভাষায় পাই 'কুলস্ত্রী সলজ্জ ভেলী,' 'কইছনি নায়িকা' (বর্ণরত্নাকর)। মৈথিলীতে নিত্য বর্তমানের প্রথম পুরুষের ক্রিয়ায় করই, ধরই, সম্রমে প্রথম পুরুষে অছথি, হোথি রূপগুলি পাওয়া যায়। চর্যাতেও অনুরূপ প্রয়োগ আছে, যথা, ভণই লুই—১, চাটিল গঢ়ই—৫, ভণথি কুক্কুরীপা—২০ ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া চর্যার ভাষাকে সামগ্রিকভাবে মৈথিলী বলা অনুচিত। ইহাকে হিন্দী বলাও সঙ্গত নহে। -ক, -কো বিভক্তি যোগে ষষ্ঠীর পদ গঠন, —অল,—অব যোগে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সাধন চর্যার ভাষাতে নাই। অথচ হিন্দী ও মৈথিলী ভাষার এগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ। তবে চর্যার ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব আছে। বস্তুতঃ শৌরসেনী অপভ্রংশ হিন্দীভাষার জননী এবং প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের প্রাচ্য অঞ্চলের নব্য ভাষা-বর্গেরও ধাত্রী। এককালে উহা সমগ্র উত্তরাপথের সাহিত্যিক ভাষা ছিল। সেই সূত্রে প্রাচীনতম বাংলা-ভাষায় উহার চিহ্ন থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ধাত্রীর প্রভাব মাতৃ-প্রভাবের মতই অনপনেয়। তাই অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট প্রভাব শুধু প্রত্ন বাংলাভাষায় নহে, পরবর্তী বাংলা ভাষাতেও অবিচ্ছিন্ন ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। ('চর্যার ভাষায় অপভ্রংশ উপাদান' আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

চর্যায় বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ

যেমন মানুষের, তেমনই ভাষার সঠিক পরিচয় শুধু আকৃতিতে নহে, প্রকৃতিতে। চর্যার ভাষায় বাংলার সমজাতীয় মৈথিলী, ওড়িয়া ও অসমীয় ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন থাকিলেও, উহার মূল কাঠামো তৎকালীন গৌড়বঙ্গের সদ্য নির্মীয়মাণ ভাষা। শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সকল বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'The language of the Caryas is the genuine Vernacular of Bengal at its basis'; এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচ্য অঞ্চলের ভাষাবর্গের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ধ্বনি, পদগঠনপ্রণালী এবং বাক্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া শুদ্ধ নৈয়ায়িক যুক্তিবলে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন,

'The dialect of the Caryas is old Bengali' (O. D. B. L. Vol I) : তিনি দেখাইয়াছেন, চর্যাগানে ব্যবহৃত সম্বন্ধ পদের বিভক্তি—এর,—অর; সম্প্রদানের বিভক্তি -রে, অধিকরণের বিভক্তি—ত,—তে; মাঝ, অন্তর, সাঙ্গ প্রভৃতি অনুসর্গ; অতীতের ক্রিয়াবিভক্তি—ইল; ভবিষ্যতের—ইব; নিত্যবর্তমানের শতৃ প্রত্যয়—অন্ত; অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি—ইআ,—ইলে; কর্মবাচ্যের—ইঅ; মৌলিক অস্ত্যর্থক ধাতু আছ্, থাক্ এবং কতিপয় বাগ্‌বিধির বিশিষ্ট প্রয়োগ বাংলাভাষার একান্ত নিজস্ব।

এগুলি ছাড়াও ধ্বনির উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ও অপর কতকগুলি পদগঠনগত বিধি এবং বাগ্‌ভঙ্গী প্রমাণ করে যে, চর্যাগীতির ভাষা নিঃসংশয়ে বাংলাভাষা। চর্যায় প্রাপ্ত বাংলাভাষার সেই লক্ষণ সূত্রাকারে দেখানো যাইতেছে—

১. (ক) বাংলাভাষায় স্বরধ্বনির উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্য রক্ষিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই।' অর্থের দিক হইতেও তাহাতে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। চর্যাগানেও নির্বিচারে ই (ি)-ঈ (ী) এবং উ (ু)-ঊ (ূ) স্থান বিনিময় করিয়াছে। যেমন, চীএ (১), চিঅ (৪০); হোহী (৫), হোহি (৪২); বোহি বোহী (৫), (৫), বোহী (৪৪); লুই (১), লুই (২৯); কুলে কুল (১৪), কূলেঁ কূল (১৫)।

এই ভাষায় জ-য, ণ-ন, শ-ষ-স এবং র-ড়-এর উচ্চারণে উচ্চারণ-স্থানগত বিশেষত্ব নাই।* চর্যায় এই সকল বর্ণের লিপি-বিপর্যয় সহজলক্ষ্য। যথা, জোইণি (৪), যোইণী (২৭); যাই (১০), জাই (৪২); নাবী (৮) ণাবী (১৩); ণ ভুলহ, ন দিসই (১৫); শবর; সবর (২৮); দশবল, দসদিসেঁ (৯); শূন, সুণ (১৩), ষিআলা (৩৩), শিআলী (৫০), চউশঠী (৩), চৌসঠী (১০), চউষঠ্‌ঠী (১২); ষহজে (২৭), সহজে (৪২); ঘরে (=ঘড়ে=ঘটে), ঘড়িয়ে (৩) প্রভৃতি।

চর্যালিপি বিচারে এই ধরনের বর্ণ-বিনিময়কে লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া

* (i) 'বাংলা বর্ণ মালায় আর একটি বিভীষিকা আছে, মূর্ধন্য ও দন্ত্য ন'এ ভেদাভেদ তত্ত্ব। বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। মূর্ধন্য এর আসল উচ্চারণ বাঙালীর জানা নেই।'

(ii) 'বাংলা বর্ণ-মালায় সংস্কৃতের তিনটে বর্ণ আছে, শ, ষ, স। কিন্তু সবকটির অস্তিত্বের পরিচয় উচ্চারণে পাই নে।' (বাংলাভাষা পরিচয়: রবীন্দ্রনাথ)

(ii) 'ভাষাতে ণ ও ন এ দুইয়ের সমান উচ্চারণ।...শ, ষ, স এই তিন বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃতে তিন পৃথক স্থানে হয়, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায়ই তিনের এক উচ্চারণ হইয়া থাকে।'

(গৌড়ীয় ব্যাকরণ: রামমোহন)

ব্যাখ্যা করা হয়। আসলে উহা বাঙালীর উচ্চারণেরই বৈশিষ্ট্য। এই উচ্চারণ-সাম্য বাঙালীর শ্রুত্যনুপ্রাসজনিত অন্ত্য মিল সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, কোথাও বা শ্লেষ সৃষ্টিতেও। চর্যাগীতিতেও তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। যথা, শঙ্কা/কঙ্ক্ষা ৩৭); অপা/কুণ্ডবা (৩৯)।

(খ) ব্যঞ্জন ধ্বনির দ্বিত্বকরণ বাংলা উচ্চারণের আর এক বৈশিষ্ট্য। আচার্য্য সুনীতিকুমার বলেন, 'বাঙ্গালায় ব্যঞ্জন বর্ণের দৈর্ঘ্যের স্বতন্ত্রতা আছে'। ব্যঞ্জন ধ্বনির হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণে অর্থের পার্থক্য ঘটে, কোথায়ও বা বাহুল্য বা আদর বুঝাইতে ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করা হয়। যথা, একেবারে—এক্কেবারে, বড় —বড্ড, সবাই—সব্বাই, মালা—মাল্লা (মাঝী), মুলুক—মুল্লুক। চর্যাগানেও ব্যঞ্জনের এই দ্বিত্বকরণ দেখা যায়। যেমন, ফাড্ডিঅ=ফাড়িঅ, নিঅড্ডী= নিঅডী (৫); রত্তো (রতিভোগযুক্ত)=রত—১৯; চ্ছাড়ী=ছাড়ী (১৭), চ্ছিণালী=ছিনালী (১৮)।

(গ) সংস্কৃতের মত সন্ধি বাংলাভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ বলেন, 'চলিত বাঙলায় সন্ধি প্রায় নাই।' (ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ)। চর্যার ভাষাতেও সন্ধি পাওয়া যাইতেছে তৎসম শব্দে, যথা, অজরামর (৩), ভাবাভাব (৯), বিরমানন্দ (২৭)। কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার বলেন, 'সকল ভাষাতেই সন্ধি আছে, তবে সে সন্ধির নিয়ম ভাষাভেদে পৃথক হইয়া থাকে।' (ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ)। বাংলা ভাষায় আছে আভ্যন্তর সন্ধি। চর্যায় এই আভ্যন্তর সন্ধির দৃষ্টান্ত মিলে। উপরে উদাহৃত ব্যঞ্জনের দ্বিত্বকরণে—ফাড্ডিঅ, নিঅড্ডী, চৌকোট্টি প্রভৃতি শব্দে। বিশেষতঃ প্রত্যয় যুক্ত পদগুলিতে খাঁটি বাংলা সন্ধির দৃষ্টান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যবোধক, যথা, চোরে= (চোর্+এ)—২, ঘরে (=ঘর্+এ)—৩, ঘড়্লী (ঘড়্+উলী—৩), গঅণন্ত (গগণ্+অন্ত)—১৬।

[পদান্তের 'অ' যে তৎকালে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বোঝা যায়; পদান্তের স্বরলোপ বাংলাভাষার একটি বিশেষত্ব।]

২ (ক) পদ গঠনে বাংলা ভাষার নিজস্ব বিভক্তির কথা আচার্য চট্টোপাধ্যায় যুক্তি সহকারে বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। সম্বন্ধপদের-এর এবং অধিকরণের -তে বিভক্তি বাংলার নিজস্ব।

বাংলাভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য সকল কারকে—এ (এঁ) বিভক্তির

প্রয়োগ। চর্যাগানেও এই বিশেষত্ব মিলিতেছে। যেমন, কর্তায়—চোরে নিল—২, কুম্ভীরে খাঅ—২, কাহ্নে গাইউ—১৮। কর্মে—সহজে থির করী ৩, গঅবরে তোলিআ—১২। করণে—কুঠারে ছিজঅ-৪৫, সমতা জোএ জলিঅ চণ্ডালী—৪৭। সম্প্রদানে—ধামার্থে—৫, কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিলা—১৯। অপাদানে—দশবল রঅণ হরিঅ দসদিসেঁ—৯, জামে কাম কি কামে জাম—২২। অধিকরণে—ঘরে সান্ধঅ—৩, ওড়িআণে সমাঅ—৪, কুন্দুরে ধীরা—৪। সকল কারকে—এ বিভক্তির এই সম্প্রসারণ অন্য কোন ভাষায় দেখা যায় না।

(খ) চর্যায় ব্যবহৃত সর্বনামগুলির অধিকাংশ অপভ্রংশ হইতে সংগৃহীত। 'সে' সর্বনাম বাংলায় সুপ্রচলিত: 'সো' রূপটি অপভ্রংশ। অন্যান্য ভাষাতে এই সর্বনাম দুইটি কখনও সর্বনামরূপে, কখনও বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'সে', 'সো' সর্বনামের বাক্যালঙ্কার অব্যয়রূপে প্রয়োগ বাংলাভাষাতেই সীমাবদ্ধ, যেমন, 'বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ' 'বনিতার স্বামী সে বিধাতা', 'সে তখন ছেলেবেলা'। ঠিক এই ধরনের প্রয়োগ মিলিতেছে চর্যাগীতে, যথা, 'এক সে শুণ্ডিনী' ৩, 'এক সো পদুমা'—১০, 'গুরু বোব সে সীসা কাল'—৪০ (এ সকল স্থলে 'সো' বা 'সে'-এর কোন অর্থ নাই)।

(গ) স্বাধীন অব্যয়রূপে উপসর্গের প্রয়োগেও বাংলার স্বাতন্ত্র্য আছে। সংস্কৃতে উপসর্গ শুধু ক্রিয়ার পূর্বগামী এবং ক্রিয়াযোগেই উপসর্গের কর্মক্ষমতা। কিন্তু বাংলায় এই উপসর্গের অনেকগুলিই অব্যয় পদরূপে নাম-পদের পূর্বে বসিয়া বিচিত্র অর্থ প্রকাশ করে। চর্যাগীতিতেও বিশেষ্যের পূর্বে উপসর্গের এই প্রাক্-সংসর্গ লক্ষ্য করা যায়, যথা, 'নিসারা'—৩, 'বিআলী' (বিকালী)—৪, সুচ্ছড়ে —১৪, বিমনা—৭, বিখলা—৩৯।

(ঘ) বাংলাভাষার বিশেষত্ব রহিয়াছে যৌগিক বা সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ গঠনে। অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সমাপিকা ক্রিয়া যোগে অথবা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়াযোগে এই প্রকারের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। আচার্য চট্টোপাধ্যায় বলেন, নব্য ভারতীয় সকল ভাষাতেই এই প্রকার যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকিলেও, মৌলিক সিদ্ধ ধাতুর সংখ্যাল্পতা হেতু হিন্দী প্রভৃতি ভাষার তুলনায় বাংলাভাষাতেই সংযোগমূলক ক্রিয়ার বাহুল্য বেশী। তাঁহার মতে, ইহা ভাষার 'একটি দৌর্বল্যের নিদর্শন।' কিন্তু এই দুর্বলতাই বাংলা-

ভাষার বিশেষত্ব।] বৈশেষিক মতে দোষকেও গুণপক্ষে ধরা হয়। দোষই হউক, গুণই হউক, সংযোগমূলক ধাতু প্রয়োগে বাংলাভাষা যে কত বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে, 'শব্দতত্ত্ব' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখাইয়াছেন। [এই সংযোগমূলক ক্রিয়ার প্রচুর প্রয়োগ চর্যার ভাষাকে নিশ্চিতরূপে বাংলা বলিয়া চিনাইয়া দেয়।] যথা - ছুই ছোই যাই—১০, গুণিআ লেহুঁ—১২, টলি পইসই—৩১, টুটি গেল প্রভৃতি। অপিচ—ধরণ ন জাই—২, নিদ গেল —২, দায় দেহুঁ—১২, কহণ ন জাই—২০, ভান্তি ন বাসসি—১৫ প্রভৃতি।

[বাংলায় কর্ম ও ভাববাচ্য গঠনে এই সংযোগমূলক ক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে।] আচার্য চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কর্মবাচ্যের (ও ভাববাচ্যের) বিশ্লেষণাত্মক রূপ বাঙ্গালা ভাষায় স্বভাবসিদ্ধ'। এখানে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে 'হ' বা 'যা' ধাতু যোগে ক্রিয়ার বাচ্য প্রকাশিত হয়। আমরা কথায় বলি, চোর ধরা যায় নাই—আর চর্যাকার বলেন 'পিটা ধরণ ন জাই'—২; আমরা বলি, বল কেমন করিয়া বলা যায়—চর্যাকার বলেন, 'ভণ কইসে সহজ বোলবা (বলা) জাঅ'—৪০।

৩. 'বাংলা চলে তাহার নিজস্ব পন্থায়' (শ্যামাপদ চক্রবর্তী: বাঙলা ব্যাকরণ)। বাংলাভাষার বাক্যগঠনপ্রণালী ও বাগ্‌ভঙ্গী সম্পর্কেও এই উক্তি সত্য। সরল-জটিল-যৌগিক ভেদে, অস্ত্যর্থক-নাস্ত্যর্থক ভেদে, ক্রিয়ার বাচ্যভেদে বা প্রকারভেদে এবং পরোক্ষ-অপরোক্ষ উক্তিভেদে বাংলাভাষার বাক্যরীতি ও বাগ্‌বিধি বিচিত্র, তেমনই বিচিত্র বাগর্থগত ভাষাভঙ্গী। অবশ্য কবিতার সীমিত গণ্ডীর ভিতর ভাষার সকল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না, কারণ, কবিতার 'চলন-বলন' গদ্য হইতে পৃথক। চর্যাগীতিও কবিতা। তবু অক্ষর ও ছন্দের বন্ধনের মধ্যেও চর্যাগানে বাংলার নিজস্ব বাক্যরীতি ও বাগ্‌ভঙ্গী বিধৃত রহিয়াছে। বাংলায় 'যবে.. তবে' প্রভৃতি সাপেক্ষ শব্দাবলী এবং বিপ্রকর্ষ-জাত অর্ধতৎসম শব্দ শুধু কাব্য-ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। চর্যাতেও তাহাই হইয়াছে।

(ক) প্রথমেই ধরা যায় এই ছোট সরল বাক্যগুলি, চোরে নিল—২, নাহি নিসারা—৩, থির করি চাল—৩, চলিল কাহ্ন—১৩, পার করেই—১৪, মার রে জোইআ ২১, কণ্ঠে লইআ রাতি পোহাঅ—২৮, হাড়ীত ভাত নাহি—৩৩, ভর নিদ গেলা, শাখি করিব জালন্ধরি পাএ—৩৬, নাহি অবকাস—৩৭, ধর পতবাল, সোঁতে উজাঅ—৩৮, পঙ্কনালেঁ উঠি গেল পাণী—৪৭ প্রভৃতি। এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, আমরা যেন প্রচলিত বাংলাই শুনিতেছি।

(খ) রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে, সে হচ্ছে ক্রিয়া ব্যবহারের সঙ্কোচ।' তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব কড়চা হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন—'প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ—এই পঞ্চগুণ'—বাক্যগুলিতে ক্রিয়া নাই। ইহা ঠিক ভাষার কাঁচা অবস্থার ব্যাপার নহে, ভঙ্গীওয়ালা ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গী। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য হইতে এরূপ প্রচুর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। যথা,—

(i) কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুললিত গান।
অমৃত সমান সগরের উপাখ্যান॥

(ii) নদীয়া নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।

(iii) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

বাক্যের এই ক্রিয়াহীনতা চর্যাগীতিতেও প্রচুর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন, কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল—১, ছড়গই সঅল সহাবে সুধ—৯,

গন্ধ পরস রস জইসো তইসো।
নিন্দ বিহুণে সুইণা জইসো॥—১৩
মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাতফল বাহা॥—৪৫.

(গ) আধুনিক বাংলার কর্ম-কর্তৃবাচ্যের অবিকল প্রতিরূপ চর্যাগানগুলিতে রক্ষিত হইয়াছে। কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মই কর্তা, মনে হয়—কর্মটিই যেন কর্মকর্তা। কর্মের এই কর্তৃত্ব প্রাপ্তিতে এবং অপ্রাণিবাচক কর্ম কর্তারূপে প্রতীত হওয়ায় এসকল ক্ষেত্রে বাক্যমধ্যে ক্রিয়ার অধ্যারোপ জনিত একটি সৌন্দর্যও প্রকট হয়। আমরা বাংলা কবিতায় শুনি, 'রাতি পোহাইল', 'মন্দিরেতে কাসর ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং'—আর চর্যাগানে পাওয়া যায়—ডমরু বাজএ বীর নাদেঁ—১১, অধরাতি ভর কমল বিকসিউ—২৭, নানা তরুবর মৌলিল রে—২৮।

বাংলার ভাষা-প্রকৃতির সহিত চর্যাগীতির এই সকল মিল প্রমাণ করে যে, চর্যার ভাষা বাংলা ভাষা। তাহা ছাড়া, যখন দেখা যায়, চর্যার বাচন-ভঙ্গী ও বিশিষ্টার্থক বাক্যরীতি কালবাহিত হইয়া পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন সংশয় থাকে না যে, চর্যার ভাষা 'বঙ্গালবাণী'র সমগোত্রজা। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

(i) অপণা মাংসে হরিণা বৈরী —চর্যা. ৬
আপনার মাংসে হরিণী জগতের বৈরী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

(ii) হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ—চর্যা ৩২
হাতক কঙ্কণ কিএ দরপণে হেরিয়ে—গোবিন্দ দাস
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি।—ঘনরাম

(iii) ভান্তি ন বাসসি জাংতে—চর্যা ১৫
ভাঙ্গা নাএ পার হৈতে না বাসসি লাজ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
সভে বোলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস—চৈতন্যভাগবত

(iv) খেলই বহুবিহ খেড়া—চর্যা ৪১
চোর রাজা খেড়ি খেলে দেব বনমালী—শ্রীকৃষ্ণবিজয়
খেড়ি খেলাইএ আক্ষে নান্দের ঘরে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

(v) তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী—চর্যা ১০
হাঁম চাতক ধনি তুহুঁ নব মেহ—দীনবন্ধু দাস

(vi) হাড়ীত ভাত নাহিঁ নিতি আবেশী।—চর্যা ৩৩
পুকুরেতে পাণী নাই পার কেন বুড়ে—অনিলপুরাণ

(vii) জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ্ উছলিলা।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিলা— ৯
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্বদিকে উঠিল মঙ্গল জঅ জঅ।।—বৃন্দাবনদাস

চর্যাগীতির ভাষা : শব্দ-সম্ভার

চর্যাগীতির শব্দ-সম্ভার ও ভাষা-উপাদান বিচার করিলেও দেখা যাইবে, চর্যাভাষা 'বঙ্গাল বাণী'রই প্রতিরূপ। ভাব বিনিময় করিবার তাগিদে মানুষের ভাষা গড়িয়া উঠে। এই ভাষার প্রধান উপকরণ অর্থময় শব্দ। এই শব্দগুলিই বিভক্তি-প্রত্যয়ের যোগে পূর্ণাঙ্গ ভাষা গড়িয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কোঠা বাড়ীর প্রধান মশলা ইঁট, তারপরে চুন-সুরকির নানা বাঁধন।' (বাংলাভাষা পরিচয়)। ইঁট ভাষার শব্দ, চুন-সুরকির বাঁধন বিভক্তি-প্রত্যয়।

একটি দেশ বা জাতির শব্দ-উপকরণাদি দেখিয়া সেই জাতির বংশগত পরিচয় লাভ করা যায়। উহাদ্বারা সেই দেশের ভাষা-প্রকৃতি এবং আগন্তুক অতিথিদের প্রভাব নিরূপণ করাও সম্ভব। একটি প্রগতিশীল ভাষার স্তরে স্তরে বহু মানুষের ধারা আসিয়া মিলিত হয়। ভাষার শব্দ সম্পদ সেই ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে। শব্দাবলীর ইতিহাস দেশের সংস্কৃতিরও ইতিহাস।

চর্যার সাড়ে ছয়চল্লিশটি গানে বিভক্তি-প্রত্যয়াদি যুক্ত শব্দসমেত প্রায় দেড়হাজার শব্দের সমাবেশ। তন্মধ্যে তৎসম-অর্ধতৎসম শব্দ প্রায় সাড়ে তিনশত। দেশীশব্দের সংখ্যা দেড়শতাবধি। অপভ্রংশ উপাদান তিনশতের উপরে। বাদ-বাকী সবই তদ্ভব উপাদান। তদ্ভব উপাদানই খাঁটি বাংলা, অর্ধতৎসম ও দেশী শব্দগুলিও এদেশের নিজস্ব সম্পদ। সংস্কৃত ও অপভ্রংশ উপাদানগুলির সঙ্গে বাংলার জনিত-জনিতা সম্পর্ক, এই উপাদানগুলির মধ্যে বাংলার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব বিভক্তি-প্রত্যয় এমন ভাবে যুক্ত হইয়াছে যে, সেগুলিকে বাংলাই বলিতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পরবর্তীকালেও সেগুলি বাংলাভাষায় স্থান পাইয়াছে। মোটের উপর চর্যা-ভাষায় ব্যবহৃত এই উপাদানগুলি আলোচনা করিলে, এই সত্যই পরিস্ফুট হইবে, যে উৎস হইতেই উপকরণ গৃহীত হউক না কেন, প্রয়োগে ও আকৃতিতে তাহা বাংলারূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চর্যার ভাষায় প্রধানতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে সদ্য বিকাশোন্মুখ বাংলাভাষার আদল।

দেশী-শব্দ

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ভাণ্ডারে দেশী শব্দের উপাদান উপেক্ষনীয় নহে। শুধু নব্য ভারতীয় কেন, আদিপর্বের আর্য ভাষাতেও দেশজ শব্দের সমাবেশ দেখা যায়। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা তো দেশী শব্দ ও দেশীয় উচ্চারণ রীতিরই বাক্-প্রতিমা।

এই দেশী শব্দ কি? সূরী হেমচন্দ্র দেশীনামমালার সূচনায় বলিয়াছেন, যে সমস্ত শব্দ লক্ষণের দ্বারা সিদ্ধ নহে, সংস্কৃত অভিধানে যেগুলি প্রসিদ্ধ নহে এবং গৌণ লক্ষণাশক্তিতেও যেগুলির অর্থ বোধ হয় না, সেইগুলিই দেশী শব্দ।[১] তিনি আরও বলিয়াছেন, দেশভেদে কথ্যভাষার ভেদ অনন্ত, তবু অনাদি প্রাকৃত প্রবিষ্ট ভাষাকেই দেশী ভাষা বলা যায় ('অণাই-পাইঅ-পইট্‌ঠ-ভাসা বিসেসো দেশী'- প্রথমবর্গ/৪)। ফলে হেমচন্দ্রের গ্রন্থে বহু প্রাকৃতজ শব্দও দেশী শব্দের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। আধুনিক ভাষাবিদ্‌গণ হেমচন্দ্রের এই 'দেশী' সংজ্ঞার্থকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন না। তাঁহারা মনে করেন, দেশজ শব্দ আর্যেতর ভাষার দান। যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, যে-সকল শব্দ অন্-আর্য কোল-মুণ্ডা-দ্রাবিড় ভাষার সম্পদ্, সেইগুলিই দেশী

১. জে লক্খণে ণ সিদ্ধা ণ পসিদ্ধা সক্কয়াহিহাণেসু।
ণ য গউণ্ণ লক্খণা সত্তিসংভবা তে ইহ নিবদ্ধা।। দেশী নামমালা ১।৩

শব্দ।[১] সূরী হেমচন্দ্রের বক্তব্যে কিন্তু ইহার ইঙ্গিত আছে। 'অণাই-পাইয়-পইট্‌ঠ' বাক্যাংশে 'অণাই' শব্দটি লক্ষণীয়। যে শব্দ অনাদিকাল হইতে প্রচলিত থাকিয়া প্রাকৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই দেশী শব্দ। কেহ কেহ মনে করেন, দেশী ভাষাই প্রাকৃত ভাষা—'পাউঅ দেসীভাস', আবার কেহ বলেন, প্রাকৃত ভাষা দেশীশব্দে পরিকীর্ণ—'দেসীঅসদ্দপলোথং'। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতজন বলিতে মূলতঃ দেশের আদিমতম অধিবাসীদেরই বোঝায়। তাঁহাদের ভাষাই অনাদি প্রকৃতির মত এদেশের দেশজ ও প্রাকৃত ভাষার প্রসূতি। ভারতীয় যে-কোন স্তরের ভাষাতেই দেশী শব্দাবলী, দেশী উচ্চারণ প্রণালী ও দেশীয় বাগ্‌ভঙ্গীর সমাবেশ দেখা যায়। এমন কি ঋগ্বেদেও 'অনবগত সংস্কার' এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় (যেমন, বকুর=ভাস্বর ; বেকনাট = সুদখোর) সেগুলিকে দেশী বলিয়াই মনে হয়। মহর্ষি যাস্ক দেশী শব্দের সমানতা ধরিয়াই এমন অনেকগুলি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব্য ভারতীয় ভাষার বহু উপকরণ দেশীয়। শুধু তাহাই নহে, অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ দেশী শব্দেরই সংস্কৃতায়িত (Sanskritised) রূপ।

গৌড়া (গৌড়ী) বা 'বঙ্গালবাণীও দেশজ শব্দে পরিকীর্ণ। আর্য-অভ্যাগমের পূর্বে এদেশ ছিল অন্‌-আর্যভূমি। সংস্কারে, ধর্মবিশ্বাসে ও ভাষায় এদেশ ছিল স্বতন্ত্র। আর্য্যের দৃষ্টিতে এদেশের মানুষ ছিল বায়স্‌ ('বয়াংসি') বা দস্যু জাতীয়। আর্য সমাজে যাঁহারা সংস্কারহীন ব্রাত্য, তাঁহারাই এদেশে আসিতেন। উপরন্তু আর্যসঙ্ঘের অপরাধীদের নির্বাসনস্থান ছিল বঙ্গদেশ। ঋগ্বেদের ঋষি দীর্ঘতমা এবং পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনকারী বৈশ্বামিত্রগণ এই দেশেই নির্বাসিত হইয়াছিলেন। বর্ণধ্বনির উচ্চারণ-বিকৃতি বঙ্গীয়দের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া আর্যেরা এদেশের লোকের নিকট আশীর্বাদও প্রার্থনা করিতেন না। এদেশের লোকেরা ছিলেন 'মৃধ্রবাচঃ'—যাঁহাদের ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির প্রাধান্য এবং যাঁহারা আর্য-শত্রু (বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি—ঋ ১০।১৫২)। উপরন্তু তাঁহারা কোন কোন শব্দ-প্রকৃতিকে ভিন্নার্থে ব্যবহার করিতেন। যাস্ক প্রাচ্য ভাষার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এই ভাষায় 'দা' ধাতুটি ছেদনার্থে ব্যবহৃত হয় ('দাতির্লবনার্থে প্রাচ্যেষু'—নিরুক্ত

---

১. The term Desi in its present-day application, embraces numerous class of words which can not be traced to Aryan-roots and which obviously were derived from the Pre-Aryan languages of the country, Dravidian and Kol. (O. D. B. L : Dr Chatterjee)

২,১,২,১২)।* এই সকল দেশীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া এদেশ আর্য-সংস্কৃতি হইতে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ভাষারীতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। বাংলার মঙ্গলকাব্য, শাক্তগীতি ও বাউল গানের ভাষা এই সত্যের স্বাক্ষর বহন করে। চর্যার ভাষাতেও নানাদিক হইতে দেশজ ভাষারীতি ও দেশীশব্দের সমাবেশ দেখা যায়।

কিন্তু দেশী শব্দ নির্বাচনে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দেশীনামমালার 'রত্নাবলী' টীকার সূচনায় হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'দেশী দুঃসন্দর্ভপ্রায়াঃ সন্দৰ্ভিতাপি দুর্বোধাঃ'—দেশী শব্দের সঙ্কলন করা কঠিন, সঙ্কলিত হইলেও অর্থবোধ করা দুষ্কর। তিনি বহু তদ্ভব বা সংস্কৃতজ শব্দকে দেশী বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আধুনিক ভাষাবিদ্‌গণের কটাক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। বস্তুতঃ যে কোন শব্দের মূল অর্বাচীন সংস্কৃতে পাইলেই, তাহাকে সংস্কৃতজ বলা সঙ্গত নহে। যেমন, চর্যাগানের 'দুলি' (২) শব্দটি। মহাভাষ্যকার শব্দটি ধরিয়াছেন বলিয়াই উহা সংস্কৃত, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। শব্দটির প্রকৃতি গ্রাম্য, উহার প্রয়োগও গ্রাম্য ভাষায় সীমাবদ্ধ। হেমচন্দ্র 'দুলীঅ কুম্মম্মি' (দুলী কূর্মঃ) বলিয়া শব্দটিকে দেশী নামের পর্যায়ে ধরিয়া ভুল করেন নাই। তেমনই চর্যার 'থাহী'—৫, 'থাহা'—১৫ শব্দ। হেমচন্দ্র অথই অর্থে 'অস্তাঘ' শব্দটি ব্যবহার করিলেও, স্থান-গভীরজল-বিস্তীর্ণ অর্থে 'থাহ, থাহী' শব্দকে দেশী নামের মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন ('ঠাণোণ্ডপিহুস্থ থাহো'—পঞ্চমবর্গ)। আমরাও গ্রাম্য কথায় থাই, থই ব্যবহার করিয়া থাকি। সংস্কৃতে 'স্তাঘ' শব্দের প্রয়োগ ব্যাপক নহে। কাজেই কোন শব্দ সংস্কৃতে পাইলেই, শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত এরূপ মনে করা অনুচিত। এই প্রসঙ্গে দেবীভাগবতের একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। বাগ্‌ভব বীজ 'ঐং' প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, অস্পষ্টভাবেও কেহ যদি এই বীজ উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও ফল পায়। ব্যাঘ্রভয়ে ভীত হইয়া 'ঐ-ঐ' বলিয়া চিৎকার করিলেও বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।[১] এখন সংস্কৃত শ্লোকে 'ঐ-ঐ' শব্দ আছে, অতএব শব্দটি সংস্কৃত —এরূপ বিবেচনা করা হাস্যকর। বহু দেশী শব্দ কালক্রমে সংস্কৃতে, এমন কি বৈদিক ভাষাতেও গৃহীত হইয়াছে। নিঋর্তি দেবতার স্তুতিপ্রসঙ্গে ঋগ্বেদে 'কাণ', 'বিকট' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যাস্ক যেভাবে এই শব্দগুলির

* এখনও 'দা' কাটারি অর্থে ই এদেশে ব্যবহার করা হয়।

১. ঐ-ঐ ইতি ভয়ার্তেন দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রাদিকং বনে।
বিন্দুহীনমপীত্যুক্তং বাঞ্ছিতং প্রদদাতি চ॥ দেবী. ভা. ৩. ৯. ৮৩

নির্বচন করিয়াছেন, তাহাতে কষ্টকল্পনা আছে (নিরু ৬, ৩০, ২)। বস্তুতঃ শব্দগুলি অনার্যগোষ্ঠীর। পণ্ডিতগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, বৈদিক অণু, কাল (time), কুট (hut), পুষ্প, পূজন, ফল, তাম্বুল, বিল (hole), বীজ ময়ূর, রূপ, কম্বল, তিল, শব প্রভৃতি শব্দ দেশজ। বিকট, দণ্ড (stick), কট (depth) শব্দ এবং √পঠ ধাতুও দেশী। আচার্য সুনীতিকুমার দেখাইয়াছেন, ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অটবী, তণ্ডুল, মর্কট, বল্লী (creeper) প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় বা কোল ভাষাজাত। তিনি বলেন, ভাষা যত অগ্রসর হইয়াছে, তত তাহাতে নূতন দেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপিতে প্রাপ্ত খাঁটি বাংলা শব্দ ও স্থান-নামের (place names) রূপ বিচার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—খাড়ী, পাড়া, পাটক, ঘাট, বাকী, তটী, বুড়ি, হাড়ি, বাড়ী, কুটী, খাম্বা, কোঠা, সোঁত (সোন্তে) প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে দেশজ উপাদান; কিন্তু তাম্রপট্টে দেখা যায় 'Sanskritising tendency'—'But it is pity that generally there was an attempt to give these names a Sanskrit look' (O. D. B. L); চণ্ডাল, ডোম্বী, হড্ডি ('হড্ডি-ডোম্বৌ'—বৃহদ্ধর্ম পুরাণ), বঙ্গ প্রভৃতি শব্দও দেশজ। আচার্য চট্টোপাধ্যায় আরও মনে করেন, মূর্ধন্যধ্বনি-প্রধান শব্দাবলীতে এবং ড়, ড়া, ড়ি, ড়ী প্রত্যয়ে (যথা, বাপুড়া, বাপুড়ী, বহুড়ী, চাঙ্গড়া, পেড়) কোল ও দ্রাবিড় প্রভাব আছে—ওগুলি—Non Aryan Origin, Kol or Dravidian; ধাতুর ব্যাপারেও তিনি দেখাইয়াছেন, এড় (give up), নড়্ (move), কুদ (leap), মুড় (fold) প্রভৃতি ধাতুর মূল 'Dravidian' এবং তামিল ভাষায় মিলিতেছে এই সকল ধাতু—আঁচ (guess), আঁট (tighten), কাচ (dress), কুঁদ (carve), খস (slip), খাট (work), খুঁট (scratch), খুল (open), ঘির (surround), ঘুচ (come at an end), চাহ (look at), চাপ (press), ছাক, ছাট, ছুট, ঝুল (hang), ডাক (call, shout), ডুব, বুড় (sink down), তাড় (pursue), পুড় (burn), ফিরা (turn), বাঁচ (live), বিহা, বিআ (give birth), রড় (run), লড় (fight) প্রভৃতি।

চর্যাগীতির দেশী শব্দাবলী সঙ্কলনে এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। চর্যাটীকায় কতকগুলি শব্দের কৃত্রিম সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা, খাল-বিখাল=খল্লবিখল্ল, খদ=খট্ট, ঘাট+ঘট্ট; এগুলির প্রকৃতি বিচার

করিয়া দেশী শব্দের পর্যায়েই ধরিতে হইবে। টীকায় আবার কতকগুলি শব্দের যথাযথ প্রতিশব্দ না দিয়া, বিশ্লেষণ মূলক একাধিক শব্দে অর্থ করা হইয়াছে, যথা, বুড়িলা=প্রমত্তাঙ্গী, বাখোড়=স্তম্ভদ্বয়ং, উজাঅ=উর্দ্ধংগচ্ছতি ; এগুলিকে বিচার করিয়া দেশী শব্দের পর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। দেশজ ধাতু কোন উপসর্গ গ্রহণ করে না, ধাতু বিচারে এই নিয়মটির কথাও মনে রাখিতে হইবে।

এই সকল দিক বিচার করিয়া চর্যাগীতিতে প্রাপ্ত দেশী শব্দ ও দেশী ধাতুর তালিকা প্রস্তুত করা গেল।[১]

দেশী শব্দসম্ভার : ডাল—(দ্বিদল)—১, ৪৫ ; বেণি (১৭), পাণ্ডি (=পাডি =পাটি)—১ ; দুলি, তেন্তলি, কাছ (দেহছায়া), বহুডী (=বধুটী), বিয়াতী, ডর—২ ; চীঅণ (চিকন), ঘরে (=ঘড়ে=ঘটে), ঘডিয়ে, ঘড়ুলী, নিসারা (=নিসাড়া), সরু, নাল—৩ ; কোঞ্চা-তাল (=কুঁজি-তালা), কুন্দুর—৪ ; চিখিল, থাহী, থাহা (১৬), পটি (=পাটক), টাঙ্গী, নিয়ড্ডি—৫ ; ডাক—৬ ; নিয়ড়ী (=নিকটে) —৭ ; খুন্টি (=খুন্টিকা), কাচ্ছি (=কচ্ছিকা ১৪) কেড়ুআল (=কেনিপাত ১৩, ১৪)—৮ ; বাখোড় (=দোখোট=স্তম্ভদ্বয়) —৯, ডোম্বী, কুড়িআ (=কুটীর), বডিআ (=বড়ু=বটু), পাখুড়ী, বাপুডা, চঙ্গড়া, পেড়া (=পেটক), কপালী, হাড—১০ ; খদে (=খডে=খট্টে)—১১; কোঠা (=কোষ্ঠক), বাড়আ (=বটিকা)—১২ ; বুড়িলী (=প্রমত্তাঙ্গী), উছারা, দুখোল (=উখোল<'দুখোলাকং'=উদ্‌খল), পুলিংদা (কাপড়ের পোটলা), কবড়ী (=কড়ি=কপর্দিকা), বোডি (=বুড়ি)—১৪ ; তিল, বাঙ্গ (=বাঁক <বঙ্ক), ঘাট (='ঘট্টকুটি'), খড (=খল্ল, তুঃ খাড়ি). তড়ি (তট)—১৫ ; পাট, কসণ (='ভয়ানক'), খন্তা (=স্তম্ভ), টাকলী (=টক=শব্দ)—১৯ ; দাণ্ডী (='দণ্ডিকা'), সারি—১৭ ; কাবালী, ভাভরিআলী (='ভর্ভরি আলিকা'), ছিণালী (='ছিন্ন নাসিকা')—১৮ ; পড়হ-মাদলা (='পটহাদি ভাণ্ডং'), জাল—১৯ ; বায়ুড়া (=বাউল), উড়ি (=কুটী), বিআণ (=প্রসব), পহিল (=আদি—২০) ; উঞ্চল-পাঞ্চল (=উঁচপিচ)—২১ ; বিহণি (=বিহান =প্রভাত)— ২৩ ; সবর-সবরী, মোর (=ময়ূর), গুঞ্জরী (=গুঞ্জা), গুহাড়া, গুলী, খাট, তাবোলা (=তাম্বুল)—২৮, অকট (বিস্ময় বোধক অব্যয়)—৩১ ;

---

১. O. D. B. L (Chatterji) ; হেমচন্দ্রের 'দেশী নামমালা' এবং ভোলাশঙ্কর ব্যাস সম্পাদিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গলম্‌' (২য় ভাগ) মিলাইয়া চর্যাগীতিতে দেশী শব্দের এই তালিকা প্রস্তুত করা হইল।

বঙ্ক (=বক্র), খাল-বিখলা, বপা—৩২ ; হাড়ী, বেন্ট (=বাঁট), পিটা—৩৩ ; গল, বাণ্ড-কুরণ্ড (=বটুয়া-কটুয়া)—৩৭ ; ণাবড়িখণ্ডী (নৌকাখানি), পতবাল, খর সোন্তে (প্রবল স্রোতে)—৩৮ ; আলা-জালা (সঙ্কল্প-বিকল্প জাল), টাল (অসদ্রূপ'), বোব (বচন-দরিদ্র), কাল (বধির)--৪০ ; বোড়ো (সর্প-বিশেষ), খেড়া (খেলা), কট (অবধারণাত্মক অব্যয়)—৪১ ; নড় (ননী) —৪২ ; কলৈএল (কলকল, ধ্বন্যাত্মক শব্দ)—৪৪ ; চণ্ডালী, পড়া (=পাটা) —৪৭ ; ণাবপাড়ী ('নৌপাটক'), বঙ্গাল, চণ্ডাল, পাটন, ভাণ্ডার (ভঁাড়ার) —৪৯ ; বাড়্হী (=বাড়ী), কুরাঢ়ী (কুঠারি), ডুম্বোলী, চণ্ডালী, শবরা-শবরী, কপাস্থ (=কার্পাস), কঙ্গুচিনা—৫০ ।

দেশী ধাতুমালাঃ এড় (এড়িএউ=বিহায়)—১ ; চুম্ব্, খেপ, ঘাল্ (ঘালি=নীত্বা), ফাল্ (ফাল=খণ্ডয়িত্বা)—৪ ; ফাড়্, জুড়্ (জোড়িঅ=একীকৃত্য), চড়্—৫ ; মিল্ (মিলি=মুক্ত্বা, তুঃ মেলই=পরিত্যজন্তি—১৮), ছাড়্, থ্, বহুড়্ (বহুড়ই=ব্যাঘুটতি), চাপ্—৮ ; ঘল্ (ঘলিলি=বিধ্বস্ত) —১০ ; খেল্, ফিট্ (ফিটউ=নিকুস্তিতং), তোল্, ঘোল্ (ঘলিউ=নির্মদঃ কৃত্বা)—১২ ; রেব্ (রেবই=অনুপশ্যন্তি), বুড়্—১৪ ; বাস্, বুজ্ (বুজিঅ=শুদ্ধোন্মীলিত)—১৫ ; বুড়্ (বুড়ন্তে=মগ্নে সতি)—১৬ ; চিপ্ (চাঁপিউ=চাপিতং)—১৭ ; টাল্ (টালিউ=বিনষ্টীকৃতং)—১৮ ; চাহ্, নখ্ (নখলি=নিকৃন্তি)—২০ ; চটায়—২৬ ; হিণ্ড্ (হিণ্ডই=ক্রীড়তি), লোড়্ (লোড়িব=অন্বেষয়িতব্য)—২৮ ; বিয়া (বিয়াএল=প্রসব করিল)—৩৩ ; চেব (চেবই=পশ্যতি)—৩৪ ; ঘুম—৩৬ ; উজা (উজাঅ=ঊর্ধ্বং গচ্ছতি), টান্—৩৮ ; চমক্ (চমকই)—৪১ ; লুড়্ (লুড়িউ=অভিন্নত্বং কৃতং)- ৪৯ ।

তৎসমশব্দ

(i) চঞ্চল, পঞ্চ, কাল, গুরু, করণ, (১) ; ভো, চর্যা, (২) ; এক, শুণ্ডিণী, বারুণি, দশমি, চিহ্ন (৩) ; ধীর, চীর, নারী (৩) ; গম্ভীর ; বাম (৫) ; মাংস, হরিণা, হরিণী, বৈরী, (৬) ; নিবাস, তে (তাহারা), ভিন্না, ভব, পরিচ্ছিন্না (৭) ; করুণা, মহাসুখ (৮) ; আসব, করিণী, তথতা, দশ (৯) ; নগর, সম (১০) ; ডমরু, যোগী, দেহ, চরণ, রাগ, পরম (১১) ; নয়বল, দায় (১২) ; কুমারী, দেহ, তরঙ্গ (১৩) ; গঙ্গা, মাতঙ্গি, সংহার ; (১৪) ; সংসার, বাল, অন্ত (১৫) ; ভয়ঙ্কর, মণ্ডল, নিরন্তর, চিত্ত, বিষয়, নায়ক (১৬) ; অবধূতী, বীণা, দেবী (১৭),

অন্ত, কণ্ঠ (১৮) ; ভব, করণ্ডক, উন্মত্ত (১৯) ; নাড়ি, মূল, বীর (২০) ; নাশ, (২১) ; তে, অচিন্ত, মরণ, রস, ধাম (২২), বহুল, বাল, কারণ ২৬) ; কমল, মুষা, উহ, অঙ্গ, কর্ম্মলিনি, বুধ, বিলক্ষণ (২৭), বালী, ভুজঙ্গ, পরম, সন্ধি (২৮) ; ভাব, অভাব, ন, আগম, উদক (২৯) ; নিরন্তর, বিশুদ্ধি, অন্ধকার (৩০), করুণা, কান্তি, আচার, ভয়, দুর (দুঃ) (৩১), নাদ, ন, বিন্দু, রবি (৩২) ; সংসার, চৌর, গীত, বিরল (৩৩) ; কিং, বাক্, অলক্ষ, পরম, দ্বাদশ (৩৪) ; মোহ, সর্ব, পাপ (৩৫) ; তথতা, সহজ (৩৬), অনুভব, মা (নঞর্থক), অবকাশ (৩৭) ; নৌ, কূল, (৩৮) ; জায়া, সহজ (৩৯) ; আগম, বাক্, গুরু (৪০), মা, মূঢ়া (৪১), সহজ, ভাব (৪২), সমরস (৪৩) ; সর্ব, ধাম (৪৪), তরু, মূঢ, মূল (৪৫) ; স্বভাব (৪৬), সমতা, পঞ্চ (৪৭), দেশ, পঞ্চ, পরিবার, বিশেষ (৪৯), খ-সম, আকাশ (৫০)।

(ii) এগুলি বাদে আছে কতকগুলি তৎসম সমাসবদ্ধ পদ। যথা, কমল-কুলিশ (৪, ৪৭) ; কমল-রস, (৪) ; পারগামী, মোহতরু (৫), বিমন, ভব-পরিচ্ছিন্না (৭), সদ্‌গুরু (৮) ভাবাভাব, অবিদ্যাকরি (৯), নাড়িশক্তি, বীরনাদ, রবিশশী-কুণ্ডল (১১), ভবজলধি (১৩), রাজপথ, মহাসিদ্ধি (১৫), পাপপুণ্য, মহারস (১৬) ; বুদ্ধনাটক (১৭), সহজ-উন্মত্ত (১৯), সচরাচর (২২), পদ্মবন (২৩), বিরমানন্দ, সহজানন্দ (২৭), কর্ণকুণ্ডল-বজ্রধারী, গিরিবর (২৮) স্বপরাপর, অন্তর (৩৪) ; বাক্‌পথাতীত (৩৭, ৪০), ক্ষ-ভব, ভবমোহ (৩৯), অহুদিন (৪২), সহজমহাতরু, মরণ-ভব, ভাবাভাব (৪৩) ; তরুমূল (৪৫) ; তথতা-স্বভাব (৪৬), মেরুশিখর (৪৭) ; ভবমত্তা (৫০) প্রভৃতি।

(iii) অনেকগুলি তৎসম শব্দ বাংলা বিভক্তি বা অনুসর্গ যুক্ত হইয়া পদাধিকার লাভ করিয়াছে। এগুলির ভিতর সমাসবদ্ধ পদও আছে, বানান বিপর্যয় তো আছেই। যথা—কপাটের (কপাট+এর)—১ ; কুম্ভীরে, দিবসই (দিবস+ই)—২ ; সহজে—৩ ; মণিকুলে, নারীমঝেঁ—৪ ; বেগেঁ—৫ ; হরিণির, মাংসেঁ—৬ ; আলিএ, কালিএ—৭ ; করিণিরে ;—৯, নগরবাহিরে, সদ্‌ভাবে —১০ ; বীরনাদে, চরণে, আভরণে—১১ ; লীলে, রথে—১৪ ; মহারসপানে, পঞ্চবিষয়ের—১৬, হেলেঁ, অন্তে, কণ্ঠে—১৮ ; বিবাহে—১৯, নাশক, মুষা-এর —২১ ; কণ্ঠে, শরসন্ধানে, রোষে—২৮, আনন্দে—৩০ ; উপায়ে—৩৮ ; বিহারেঁ, জলবিম্বাকারে, সহজেঁ—৩৯ ; আকাশে—৪১ ; তথতানাদেঁ—৪৪ ; অন্তরালে—৪৬ ; কমলকুলিশ মাঝে—৪৭ পরিবারে—৪৯ ; কণ্ঠে, খসমে—৫০।

(iv) ভণতি (২২), ভণন্তি (৩, ১৬, ৩৯), বিলসন্তি (৫০) বাদে চর্যাগীতিতে অবিকৃত তৎসম ক্রিয়াপদ নাই। একটি গানে (১২) ভমন্তি (<ভ্রমন্তি) আছে। জীবমি, পীবমি (৪), জানমি (৩১), জাণমি প্রভৃতি ক্রিয়াপদের বিভক্তি সংস্কৃত হইলেও, ক্রিয়ারূপ তৎসম নহে ; উহাদের খাঁটি তৎসম রূপ যথাক্রমে জীবামি, পিবামি, জানামি। অনেকগুলি ধাতুতে এই ভাবেই তৎসম ক্রিয়া-বিভক্তি— লটের সি, মি এবং লোটের হি যুক্ত হইয়াছে। 'যা' ধাতুর বানান অধিকাংশ স্থলে 'জা'—এই ধাতুটির রূপে তৎসম অনুবর্তন লক্ষণীয়, যথা—জাসি (যাসি) —১০, জাহী (যাহি—অনুজ্ঞা, লোট)—৫। বিভক্তি বাদ দিলে চর্যাগানে নিম্নলিখিত সংস্কৃত ধাতুর সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—খা (খাঅ—২, খাই—২৮, খাইব—৩৯) ; দুহ্ (দুহি—২, দুহিএ—৩৩), বহ্ (বহিআ—৩ বহই—১৪,২৭), তৃ (তরই)—৫, পা (পিবই)—৬, বস্ (বসই)—৭, ২৮, ; সিচ্>সিঞ্চ (সিংচহু—১৪, ষিঞ্চই—৪৭), চল্ (চলিল—১৩), ধাব্ (ধাবই)—১৬, গৈ গাইউ—১, ২৮), খন্ (খনই)—২১, রচ (রচি রচি—২২), ধূ (ধুনিধুনি— ২৬), বিন্ধ্ (বিন্ধ)—২৮, রাজ্ (রাজই)—৩১ ; মিল্ (মিলিআ—৪৪)। ইহা ছাড়াও আছে কতকগুলি উপসর্গ যুক্ত সংস্কৃত ধাতু, যথা, বি-লস্ (বিলসই —১৭, ২৯, ৩৪), পরি-মা (পরিমাণ—১), বি-হৃ (বিহরএ—১১), অনু—ভূ অনুভব—৩৭)। নামধাতুও আছে—বিবাহ (বিবাহিয়া—১৯)। ণিচ্-প্রত্যয়ান্ত কয়েকটী রূপও আছে, যেমন, বহ্+ণিচ=বাহ্—৮, ১৩, ১৪।

[রূপের দিক হইতে ক্রিয়ার রূপগুলি অপভ্রংশ, তথা তদ্ভব পর্যায়ের]

অর্ধতৎসম শব্দ

বিকৃত উচ্চারণের তৎসম শব্দই অর্ধতৎসম। চর্যাগানে এরূপ শব্দের অসদ্ভাব নাই। যথা, নিচিত (নিশ্চিত)—১, সুসুরা (শ্বশুর)—২, গরাহক (গ্রাহক)—৩, বিআপক (ব্যাপক), বরিসঅ, অহিলেসে (অক্লেশে)—৯ ; পরাণ—১০, পরস—১৩, চন্দসুজ্জ—১৫, পান্তর (প্রান্তর, তুঃ তেপান্তর)—১৫, নিবাণ (নির্বাণ)—২৮, পিরিচ্ছা (পৃচ্ছা)—২৯, স্বপনে—৩৬, মুদেরী (মুদ্রা) ৩৭, সুইনা—৩৯, সুঅণ (স্বপ্ন)—৪৬, নিয়েবণ (নির্বিণ্ন)—৫০।

অর্ধতৎসম শব্দগুলি কবিতার ভাষারূপেই ব্যবহৃত হয়।

॥ অপভ্রংশ উপাদান ॥

দেশী-ভাষা এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশের দায়ভাগ লইয়াই বাংলাভাষা উৎপত্তি। প্রত্যক্ষভাবে মাগধী অপভ্রংশই বঙ্গভাষার জননী। কিন্তু তৎকাে শৌরসেনী অপভ্রংশের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ফলে মাগধী অপভ্রংশ ছিল শৌরসেনীর প্রভাবপুষ্ট। চর্যার ভাষাতেও তাই প্রচুর পরিমাে অপভ্রংশের চিহ্ন রহিয়াছে। ফলে চর্যার ভাষাকে হিন্দী বা মৈথিলী বলিয় দাবী করিবার পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক, ভাষার মূল কাঠামো আদৌ ছিল এক সকল অপভ্রংশই কতকগুলি সামান্য লক্ষণে লক্ষণান্বিত। আঞ্চলিক ভেদগুি পরবর্তীকালের। অঞ্চলভেদে ধ্বনির উচ্চারণ-রীতি ও দেশভেদে দেশীভাষা প্রয়োগ ছিল ভাষা-বৈষম্যের প্রধান কারণ। পতঞ্জলির মতে অপভ্রংশ অশিষ্টজনে ভাষা। উহা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত ভাষারই আর এক গ্রাম্য (অপভ্রষ্ট) রূপ উহা যে-কোন নব্য ভারতীয় ভাষার সাধারণ সম্পত্তি। চর্যার ভাষা অচ্ বিধান, হল্ বিধান, বর্ণাগম, বর্ণলোপ, যুক্তব্যঞ্জনবিধান, সুবন্ত ও তিঙন্ত বিধান এবং ধাত্বাদেশেও এই অপভ্রংশের উপাদান শব্দ বা পদাকারে রক্ষি হইয়াছে। উহাদিগকে হিন্দী বা মৈথিলী না বলিয়া অপভ্রংশ বলাই সঙ্গত চর্যার ভাষায় এই অপভ্রংশ উপদানগুলি পৃথকভাবে দেখানো যাইতেছে।

চর্যার ভাষায় তৎসম শব্দের আকারগুলি যে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে তাহার প্রধান কারণ ধ্বনির পরিবর্তন। এই পরিবর্তনগুলির ভিতর উ>এ (নূপু >নেউর), ঋ>উ (যথা ঋজু>উজু , মৃণাল>মোলাণ, বৃক্ষ>রুকৃখ), ন> (মণ, ণ, ণানা, পবণ), শ-ষ-স-এর স্থানবিনিময় (দেষ>দেশ, মুষা>মুসা, শশ >সসি, বাসনা>বাষণা), মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের (ঘ, ধ) স্থলে 'হ' (সুখ>সুহ, মেঘ> মেহ, সমাধি>সমাহি), অঘোষ বা ঘোষ অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের স্থলে 'অ' (গজ>গঅ বিচার>বিআর, স্বরূপ>সরুঅ, গগন>গঅণ), য়>অ (কায়া>কাআ, ছায় >ছাআ, মায়>মাঅ), র-ফলার লোপ (গ্রীব>গীব, প্রণাল>পণাল, ভ্রান্তি> ভাস্তি, প্রসঙ্গ>পসংগ্, ত্রিদশ>তিঅস, বত্রিশ>বতিস, ত্রিভুবন>ত্রিহুঅণ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চর্যায় এইরূপ ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে রূপান্তরিত বা প্রাকৃত-অপভ্রংশ শব্দাবলীর সমাবেশ দেখা যায়। যথা,—

বিশেষ্য : কাআ, চীঅ, সুহ, সমাহি, পাস, ঝাণ (ধ্যান)—১ ;

(বৃক্ষ), হিঅ (হৃদয়)—২ ; তিঅড্ডা, জোইণি, পাণী (পানী), সাস্থ (শ্বশ্রূ)—৪ ; বোহি—৫ ; মঅগল (মদকল)—৯ ; নেউর, নঅরী, মুত্তি (মুক্তি)—১১ ; উআরি (উপকারিকা), উএসঁ (উপদেশ), গঅ (গজ)—১২ ; সুইনা (স্বপ্ন), চিঅ, মাজে (মার্গে)—১৩ ; জউনা—১৪ ; সরুঅ (স্বরূপ), বিআর (বিচার), ভান্তি (ভ্রান্তি), নাহ (নাথ)—১৫ ; গঅন্দা (গজেন্দ্র), ঘণ (ঘন), তুঁস (তৃষ্ণা), তিহুঅণ (ত্রিভুবন)—১৬ ; সুজ, সহি (সখী)—১৭ ; জণ, সসহর—১৮, নিব্বাণ, সুরঅ (সুরত), পসংগ (প্রসঙ্গ), রএণি (রজনী)—১৯ ; মুসা (মুষ), বোহ (বোধ)—২১ ; তিঅস (ত্রিদশ), সংবেঅণ—২৬ ; পণাল (প্রণাল)—২৭ ; গীব (গ্রীব), সিহর (শিখর)—২৮ ; বিণানা (বিজ্ঞান), রূব (রূপ), বেএঁ (বেদে)—২৯ ; মেহ (মেঘ), তৈলোএ (ত্রৈলোক্যে)—৩০ ; ইন্দি (ইন্দ্রিয়), লোআচার, ঘিণ (ঘৃণা)—৩১ ; সহাব (স্বভাব), সসি (শশী)—৩২ ; সিহ (সিংহ)—৩৩ ; পারিম, রাআ (রাজা), লখ (লক্ষ্য), গঅণ, মস্ত, তন্ত, বখান (ব্যাখ্যান)—৩৪ ; সমুদ (সমুদ্র), দহদিহ—৩৫ ; চেঅণ (চেতন), বেঅণ (বেদন), সাখি (সাক্ষী)—৩৬ ; সন্তার—৩৭ ; বঅণ, নাহী (নাই=নৌকা), বিস (বিষ), জগ, বলদ্দ—৩৯ ; হথা (হস্ত), নইরী (নগরী), সস (শশ), পতিবিম্বু, সুঅ (সুত), সিংগ (শৃঙ্গ)—৪১ ; সাঅর (সাগর), লোঅ—৪২ ; বঅণ, ছেব-ভেব (ছেদ-ভেদ)—৪৫ ; সুঅণ (স্বপ্ন), অদশ (আদর্শ), ছাঅ, মাআ, কাঅ—৪৬ ; ডাহ (দাহ), বাম্ম—৪৭ ; পঁউআ, রুঅ (রূপা), নেহ (স্নেহ)—৪৯ ; দহদিহ—৫০ ।

বিশেষণ ঃ অধ (অর্ধ), কোড়ি—২ ; দিঢ়, চউশঠী—৩ আদঅ ; (অদ্বয়), দাহিণ (দক্ষিণ)—৫ ; উআস (উদাস)—৭ ; বিবিহ—৯ ; ণিঅড়—১২ ; মঝ (মধ্য)—১৩ ; উজু (১৫) ; অণহ (অনাহত), সএল (সকল)—১৬ ; বতিস—১৭ ; তিণি (তিন)—১৮ ; অন্ধারী, নিচ্চল—২১ ; সুধ (শুদ্ধ)—২৭ ; উমত (উন্মত্ত), তিঅ (ত্রি)—২৮ ; মিচ্ছা—২৯ ; সুণ (শূন্য)—৩১ ; দুজ্জন—৩২ ; পিথক (পৃথক)—৩৭ ; থির—৩৮ ; অদভুঅ—৩৯ ; আইএ (আদৌ)—৪১ ; কাঅর—৪২ ; অণ—৪৪ ; বিমুক্কা—৪৬ ।

[এই শব্দগুলির ভিতর, কাআ, মাআ, ছাআ প্রকৃতপক্ষে কায়া, মায়া, ছায়ার রূপান্তর । সঅল, বঅণ, সাঅর, পঁউআ, গীব, নেউর, নেহ, দাহিণ, অধ, থির, দিঢ়, অণ, সুজ, সুণ, কোড়ি, পুর, উআস প্রভৃতি শুধু ব্রজবুলিতে নহে, গ্রামবাংলার ভাষায় বহুকাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে]

সর্বনাম ঃ হাঁউ—১৮, ৩৫ ; আমৃহে—১, আহ্মে—১২ ; অম্হে—৪, অম্ভে—২২ , মোএ—১০, মই, মঁই—১৮, ৩৫, ৩৬ ; মোহোর—২০ ।

তুম্হে—৫, তই—৩৯, তঁই—৪, ১৮, তোহোর—১০, ৩৯, তোহোরি—১০ ১৮, তোহরে (তোমার)—৩৯ ।

সো (সে)—৭, ১০, ২১, ২৭, ২৯, ৩৩, ৪১ ; সোই (ঐ)—১৫, ৩২, ৪৬ ।

তা (সে)—৪৫, তস্থ—৪৫, তাস্থ (তাহার)—৪৩, তস্থ (তস্মিন্)—২ , তহি, তঁহি (তাহাতে)—১০, ২৮, ৩১, ৪৩, ৫০ ।

জো (যে)—১৪, ১৯, ৩২ , জাস্থ—৩০, জাহের—২৯, জস্থ (যস্মিন্ ৪০) ।

কো (কঃ+অপি=কোবি) ১৬, কা—৩৯, কাহেরে (কাহারে)—৫, ২৯ , কহিঁ—৩১, ৪৯ ।

আত্মবাচক—অপা (অপ্পা)—৩১, ৩২ ; অপণে—৩২, ৩৭ ।

সাপেক্ষ—জো...সো—৭, ২০, ২৭, ২৩ ; জাস্থ...তাস্থ—৪৫ ।

সর্বনামীয় ক্রিয়া-বিশেষণ ঃ কইসেঁ—৮, ২৮, ২৯, ৪০ ; কইসন—২২, কইসনি—১৮, কইসা—৪০ ; জইসা—৪০, ৪১ ; জিম—১৩, ৩০ ; আইস—২৯, অইস—৪১, কিণ (কেমন করিয়া)—২৬ ; কীস (কিং কৃত্বা)—৪০, কীষ—২৯, কিম—৩৯ ; কিম্পি (কিমপি)—৪৯, এথু (এখানে)—১৬, এন্থ—২৬, এস্থ—৪২ । সাপেক্ষ ক্রিয়া-বিশেষণ—জইসো....তইসো—১৩, ২২ , জইসা...তইসা—৪৬, জইসনে .. তইসনে—৩৭ ।

বিশিষ্ট অব্যয় বি (অপি), ই (টি)—১, ১৬, ২২, ৩৮,

[এই সর্বনাম ও ক্রিয়া-বিশেষণগুলির ভিতর অনেকগুলিই বাংলা ব্রজবুলিতে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের ভাষাকে অনেকস্থলে চর্যার ভাষার সঙ্গে বিনিময় করা যায়। বাংলার কাব্যভাষায় অপভ্রংশ সর্বনামের প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাহা ছাড়া আহ্মে তোহ্মে, মোহর, তোহোর, এথু প্রভৃতি শব্দ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে পরবর্তীকালে বাংলায় যথাক্রমে আমি, তুমি, মোর, তোর, এথা প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। অপভ্রংশের দায়াদ নব্য ভারতীয় ভাষায় সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন, বাঙালীও। কাজেই চার্যাগানে অপভ্রংশ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া উহাকে হিন্দী বা মৈথিলী বলা সঙ্গত নহে]

ধাতু ও ক্রিয়াপদ ঃ চর্যার ধাতু ও ক্রিয়াপদ অধিকাংশ প্রাকৃত-

অপভ্রংশজ। সেগুলি তদ্ভব পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি ধাতু ও ক্রিয়াপদ খাঁটি প্রাকৃত-অপভ্রংশ। সেগুলি হিন্দী, মৈথিলী ও বাংলা—সকল-ভাষাতেই গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সূত্র স্মরণীয় :

(i) অপভ্রংশস্তরের ধাত্বাদেশ সংস্কৃত হইতে পৃথক। পৃচ্ছ এখানে হয় 'পুচ্ছ'; স্পৃশ্ > ছুপ্, লভ্ > লে, ক্রী (ক্র্যাদীগণীয়) > কিন ইত্যাদি।

(ii) ক্রিয়ার রূপগুলি প্রায় এক প্রকার, অর্থাৎ ভ্বাদিগণীয় ধাতুর মত।

(iii) ধাতুরূপ সাধনে মূলের সহিত বিভিন্ন কালে ও পুরুষে এই বিভক্তিগুলি যুক্ত হয় :—বর্তমানকালে—প্রথমপুরুষ একবচনে—অই (> অ, ই) : ভনই, ছুপই—৬, পেখই—৪২, ছাড়অ—৬ ; বহুবচনে সম্ভ্রমে—অন্তি (নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী—১৭)। মধ্যম পুরুষে একবচনে—সি,—হি (আইসসি যাসি ডোম্বী —১০, দাহিণ বাম মা হোহী—৫)। উত্তমপুরুষ একবচনে—ম্বি (মারম্বি ডোম্বী লেমি পরাণ—১০), বহুবচনে —হুঁ (আহ্মে ভাল দায় দেহুঁ—১২) ; অনুজ্ঞায় বর্তমান প্রথম পুরুষে—উ (সো করউ—২২), মধ্যম পুরুষে—হি,—হু (করহুঁ বিআলী—৪, হোহু ভান্তো —৬) ; অতীতে তিঙন্ত রূপ লুপ্ত হওয়ায় নিষ্ঠা প্রত্যয়—ইঅ, ইআ, -উ,—ল দ্বারা ক্রিয়ারূপ গঠন (বাটত ভইল উছারা—১৪, ভইঅ মিঅলী—৪৭, ভাগেল তোহর বিণাণা—৩৯) ; বর্তমান অসমাপিকায় শত্রন্ত—অন্ত (অণ চাহন্তে আণ বিণঠা—৪৪) ; অতীত অসমাপিকায় নিষ্ঠান্ত —ইঅ,—ইআ : পাণ্ডি বইঠা (উপবিষ্ট সন্)—১, কহি গই পইঠা—৩১) .

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ধাতু এবং পদরূপে এই প্রয়োগগুলি দ্রষ্টব্য :—

পুচ্ছ < পৃচ্ছ : পুচ্ছ—১৪, পুচ্ছসি -১৫, পুছমি—১০, পুচ্ছী—৮, পুচ্ছিঅ—১

লে < লভ্ : লেম—৪৯, লেহুঁ (মধ্যমপুঃ)—১, ৩২, ৪৭ ; লেহুঁ (উ পু) ১২ ; লেমি —১০.

হো < ভূ : হোই—১৫ হোহু—৬, হোহী—৫

ভ < ভূ : ভইল—১৪, ভইলা—৭, ভইঅ ( )—১১, ৪৭, ভইলেসি—২০.

পইঠ < প্র-বিশ্ : পইঠো (প্রবিষ্ট) —১, পইঠ (গত্বা মিলিতঃ)—১৬ পইঠেল —৩, পইঠঅ (প্রবিশ্য)—১১

পইস < প্র-বিশ্ : পইসই—৬, ৭, ১৪, ৩১, ৪৭ ; পইসি—৯, পইসন্তে (নিমগ্নে সতি)—২৩, ২৮.

দিস < দৃশ্ : দিস (পশ্যামি)—২৯, দিসঅ (দৃশ্যতে)—১৫ দিসই (দৃশ্যতে)—২৬, ৪০.

সিঝ < সিধ্ : সিঝএ (সিদ্ধির্ভবতি) —১৫.

ছুপ্, ছো < স্পৃশ্ : ছুপই—৬, ছোই-ছোই—১০

গ < গম্ : গই (গত্বা)—২, ৭, ১৬, ৩১, ('কা গই মাগই')—২ গই পইঠা (গত্বা মিলিতঃ)— ৬

বইঠ < বিশ্+ক্ত=বিষ্ট : বইঠা ('উপবিষ্ট : সন্)—১

বোল < বদ : বোলঅ—৬, বোলই (বদন্তি)—১৮, বোলথি (বদন্তি)—২৬. বোল (বদসি)—৩৭, বোলবা (বলা) —৪০, বোলিআ (বোলিতং)—৩৮.

অচ্ছ < অস্ : অচ্ছই—৪১, অচ্ছ —৩৭, অচ্ছসি—৪১, অচ্ছত—২৯, অচ্ছিলেসু (?)—৩৫. অচ্ছন্তে—৪২

পেখ < প্র-ঈক্ষ : পেখ—৩৫, ৪৬, পেখমি—৩৮, পেখই— ৪৬

ছিজ্জ < ছিদ : ছিজ্জঅ ৪৫, ছিজ্জই —(ছেত্তু পার্যতে)—৫৬

ছেব < ছেদ : ছেবহ— ৪৫.

ভাগ<ভঞ্জ্ : ভাগেল—৩৯ আব্ <আ-ই : আবই, আবয়ি—৪২, ৪৩।

॥ তদ্ভব উপাদান ॥

তদ্ভব শব্দ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা-বৃক্ষের বহুবিস্তৃত ডাল-পালা, ফুল-ফল। এগুলি ভাষার নিজস্ব সম্পদ। স্বকীয় উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়া এই শব্দসম্পদ্ গড়িয়া উঠে. গড়িয়া উঠে ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মিত সূত্র ধরিয়া। পণ্ডিতগণ বলেন, নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষার তদ্ভব উপকরণের মূল উৎস প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা অর্থাৎ বৈদিক ভাষা।* সেই ভাষা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া নিয়মসঙ্গত পরিবর্তনের সূত্রে তদ্ভব পর্যায়ের শব্দ ও পদ নির্মিত হইয়াছে। নির্মাণের এই ধারা শুদ্ধ হইয়া থাকে না, কালক্রমে তাহারও রূপান্তর ঘটিতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানী বলেন, 'It forms the living and ever moving stream of speech.'; অঞ্চলভেদে তাই তদ্ভব শব্দের রূপান্তর ঘটে, কালক্রমে তাহা পরিবর্তিতও হয়। তদ্ভব উপকরণ দ্বারাই একটি ভাষার গোত্র ও প্রবর চিহ্নিত হয়। শব্দে, ধ্বনিতে, পদপ্রকরণে ও বাক্যরীতিতে সেই গোত্রচিহ্ন বিধৃত থাকে।

চর্যার ভাষাতেও এই তদ্ভব উপকরণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। চর্যার অর্ধেকের মত শব্দ ও পদ তদ্ভব। শুধু শব্দ ও পদ নহে, শব্দ-বিভক্তি, ক্রিয়া-বিভক্তি ও প্রত্যয়-গুলিও তদ্ভব। নিম্নে এই উপাদানের তালিকা দেওয়া গেল। এইগুলিই খাটি বাংলা। চর্যার ভাষা বাংলা উপাদানে ভরা।

---

* This element represents the oldest basis of the Aryan speech at its normal transformation—O. D. B. L : Dr Chatterjee.

বিশেষ্য : সুখে, দুখেতে, ছান্দ (ছাঁদ), বান্ধ (বাঁধ), পাস (পাশ), পাখ —১ ; পিটা, ধরণ, আঙ্গণ, ঘর, কানেট, চোর, রাতি, পাএ (পাদে)—২ ; ঘরে, বাকল, দুয়ার,—৩ ; লেপন, ওড়িআণ, কামরু, চান্দ—৪ ; ধাম (ধর্ম), সাঙ্কম (সাঁকো)—৫ ; পানী, খুর—৬ ; অবণাগমণ—৭, ২১, ৪৬, বাট (বর্ত্ম), সোণে, নাবী (নাই=নৌকা), রুপা, জাম (জন্ম)—৮, মাতা (মত্ত), বাহ্মণ, আগ (অগ্র)—৯ ; কুড়িআ—১০ ; ছার (ক্ষার=ভস্ম), হার, ঘরে, সালী (শ্যালিকা), মাঅ (মায়)—১১ ; ঠাকুর—১২ ; নিন্দ নিদ্রা), কণ্ডহার, (কাণ্ডার), সুইনা (স্বপ্ন)—১৩ ; নাই (নৌকা), জোইআ (যোগিয়া), পিটত (পিঠে)—১৪ ; লকৃখণ (লক্ষণ), বাঙ্গ (বাঙ্ক=বাঁক), পথ, গুমা (গুল্ম), আখি (অক্ষি), বাট—১৫ ; সিকল (শিকল), পানে (পান করিয়া)—১৬ ; লাউ, করহা (করশাখা), করহকলে (করস্থ করে অর্থাৎ অঙ্গুলিদ্বারা)—১৭ , কাজ—১৮ ; মাদলা (মর্দল), জাম (জন্ম) —১৯ ; বাপ—২০ ; মূসা (মূষা), অমিঅ, জোইআ (যোগিয়া), বাহ্মন—২১ ; রস রসানেরে (রস-রসায়নের জন্য), কাম (কর্ম), জাম (জন্ম)—২২ ; তুলা, আঁস (আঁশ, অংশু), বাট—২৬ ; রাতি, মেলেঁ (মেলায়, মিলনে)—২৭ ; মালী (মালা), ঘরণী, সেজ্জী (সেজ, শয্যা)—২৮ , বান (বর্ণ), চান্দ, সাচ —২৯ ; চান্দে—৩০ ; চান্দের, সুণ (শূন্য)—৩১ ; দাপণ (দর্পণ)—৩২ ; ভাত, ঘর, পড়বেষী (প্রতিবেশ্মিক, পড়শী), দুধু, যিয়ালা (শিয়াল), সাঁঝে —৩৩ ; দুঃখেসুখে, বাধা—৩৪ ; অভাগ—৩৫ ; স্বপণে স্বপ্নে), শাখি (সাক্ষী) —৩৬ ; গলপাস (গলবন্ধ=গলার ফাঁস)—৩৭ ; নাবড়ি (ছোট-নৌকা), গুণে (নৌকাটানার রশি), সোন্তে (স্রোতে)—৩৮ ; গোহালী—৩৯ ; সাপ, বাংঝি (বন্ধ্যা), তেলেঁ, সিংগে (শৃঙ্গে)—৪১ ; কান্ধ (স্কন্ধ), দুধ—৪২ ; হিএ (হৃদয়ে), বিন্দুনাদ (বিন্দুনাদ), সাঁদে (শব্দে)—৪৪, বিদুজন (বিদ্বজ্জন) —৪৫ , পাখে (পক্ষে)—৪৬ ; ঘরে, আগি (অগ্নি), জালা (জ্বালা), ধুম—৪৭ ; পঁউআ (পদ্মা), বাজণাব (বজরা নৌকা), ঘরিণী, সোণ (সোণা), নেহে (স্নেহে)—৪৯ ; বাড়ী, যগুণ (শকুন), শিয়ালি, সবরালী—৫০

সমাসবদ্ধ পদ : সুখে-দুঃখে, বান্ধ-করণ-কপাট, সুণ্ণপাখ, ধমণ-চমণ—১ ; অধরাতী—২ ; অক্কবালী, কমল-কুলিশ-ঘাণ্টে, কোঞ্চা-তালে—৪ ; দুআন্তে, ধামার্থে, অনুত্তরসামী—৫ ; মণগোঅর ; অবণাগমণ, জিনউর—৭ ; করুণা-

নাবী—৮ ; এবংকার, আসবমাতা (মদমত্ত), ছড়গই, বলাগ—৯ ; নড়পেড়া (নট-পেটক) —১০ ; দেহ-নঅরী, আলিকালি, ঘণ্টা-নেউর, রাগদেশ (রাগদ্বেষ) —১১ ; করুণা-পিহাড়ি, পাঞ্চজণা—১২ ; তিশরণ, অঠকুমারী, করুণা-শূন-মেহেলা, মঝবেণী. মায়াজাল, চিঅ-কণ্ডহার, মহাসুহসাঙ্গ—১৩ : গঙ্গা-জউনা-মাঝেঁ, গঅণ-দুখোল, চন্দ-সুজ্জ, সিঠি-সংহার-পুলিন্দা—১৪ ; উজুবাট, অনাবাটা, মাআমোহাসমুদা, খড়তড়ি—১৫ ; গঅণাঙ্গণ, বিপথ—১৬ ; সুজলাউ, অণহাদাণ্ডী, হেরুঅবীণা, সুন-তান্তি-ধানি, আলি-কালি, বতিস-তান্তি-ধনি—১৭ , কামচণ্ডালী—১৮ ; ভব-নিব্বাণ, পড়হ-মাদলা, জোইনিজাল—১৯ ; উঞ্চল-পাঞ্চল—২১ , জাম-মরণ-ভব, জীবন্তে-মঅলে, রস-রসান ২২ ; বালাগ—২৬ , অধরাতি—২৭ ; গিরিবর-সিহর—২৮ ; বাণ-চিহ্ন-রূপ, উদক-চান্দ—২৯ : করুণ-মেহ, সহজসরুআ—৩০ ; ইন্দিপবণ, চান্দকান্তি, ভয়-ঘিণ—৩১ ; চিঅরাঙ্গ, উজুবাট—৩২ , পারিমকুল, কাঅবাকচিঅ, ঝাণ-বখান—৩৪ ; সদগুরুবোহেঁ—৩৫ ; মহামুদেরী, বাণ্ডকুরণ্ড—৩৭ ; কাঅণাবড়িখণ্ডী, সদ্গুরুবঅণে, নৌবাহী—৩৮ ; জিণ-রঅণ—৪০ ; অণুঅনা (অন্+উৎপন্না). রাজসাপ দাপণপতিবিম্ব, বাংধিসুআ, বালুআতেলে—৪১ ; কাহ্ন-বিয়োএ, দিঠ-নাঠ ; ভাগতরঙ্গ—৪২, বিহুনাদ—৪৪ : গঅণ-কুঠার—৪৫ ; ডোম্বী-ঘরে, হরি-হর-বাহ্ম, শাসন-পড়া, পঞ্চনালেঁ—৪৭ ; সোণ-রুঅ, মহানেহে, চৌকোড়ি-ভাণ্ডার—৪৯ ।

[একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে. চর্যাকারেরা বিনাদ্বিধায় দেশী, তৎসম, অপভ্রংশ ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে সমস্তপদ গঠন করিয়াছেন । দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ উপস্থিত থাকিলে সহজিয়া সাধকদের 'শবপোড়া মরাদাহে'র দলভুক্ত করিতেন। কিন্তু আদি বাংলাভাষার ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ভাবাভাব যাঁহাদের চোখে একাকার—তাঁহাদের দৃষ্টিতে শব্দাবলীও গোত্রহীন। কৌলীন্যবোধে শব্দে শব্দে ভেদজ্ঞান তাঁহাদের নাই]

বিশেষণ : ভরিতী—৫, দাহিণ (ডাহিন=দক্ষিণ)—৫, ৮, ১৪, ৩২ ; মাতা (মত্ত) ৭ ; বুড়িলী—১৪, অলকৃথ, সুনা (শূন্য)—১৫ ; মাতেল, বিপথ—১৬ ; জঅ জঅ (জঅ জঅ…সাদু=জয়জয় শব্দ), আহুতু (অনুত্তর)—১৯ ; নিরাসী (নিরাশী), ভতারি, বাপুড়া (বাপুড়া), পূরা—২০ ; কাল—২১ , উঞ্চা উঞ্চা, সুন (সুন নিরামণি=শূন্য নৈরাত্মা), উমত (উন্মত্ত)—২৮ ; দুলকৃথ , সাচ (সত্য), মিচ্ছা—২৯ ; অদভুআ—৩০ ; বেঙ্গ (বি-অঙ্গ), দুহিল

(**দুহিল দুধু=দোহা দুধ**), চোর, নিবুধী—৩৩ ; অভিন—৩৪ ; শূন—৩৫ ; ভর (**ভর নিদ=ভরা নিদ্রা**), নিদালু, লাঙ্গা (নেংটা)—৩৬ ; বিমুকা (**বিমুক্ত**), **পিথক** (**পৃথক**)—৩৯ ; তুঠ্য (**তুষ্ট**), শূণ (শূণ গোহালী)—৩৯ ; বোব, **কাল**—৪০ ; লোন্হা (লোনা)—৪১ ; অদয় (=নির্দয়)—৪২।

সংখ্যাবাচক বিশেষণঃ এক—২, ১০, একেলী—২৮ ; দুই—২, ১৪, ২৬ ; তিনি (তিন)—৭, ১৬ ; তইলা (ত্রিতলা)—৫০, চউ, চউকোড্ডি—৫০, **পাঞ্চ (পাঁচ)**—১৪, ষঠ্‌ঠি—১২, বত্তিস—১৭, ২৭ ; চউষঠ্‌ঠি—১২, কোড়ি—২ ; **সকল**—১, ণাণা—২৮।

ক্রিয়া-বিশেষণ ঃ বেগেঁ—৫ ; সুচ্ছড়ে—১৪ ; নিরালেঁ ৩১ ; **জবেঁ** (যবে) —১৭, জবেঁ...তবেঁ—২১, ৪৪ ; আগেঁ—৩৮ ; আজি—৪৯ ; ভর (**অধরাতি** ভর)—২৭, থন—৪, ৬, ১৯ ; নিতিনিতি—৩৩, এতকাল—৩১, এবেঁ—৩৬, অহণিসি—১৯।

সর্বনাম ঃ—উত্তমপুরুষ ঃ মই (পরবর্তীকালে 'আমি' অর্থে কর্তায় ব্যবহৃত হইলেও, চর্যায় 'ময়া' অর্থে অনুক্ত কর্তায় ব্যবহৃত)—১৬, ১৮, ২৭, ২৯, ৩৬ ; মোক (দিল মোক লকৃখু ভণিআ—৩৫), মোর (=আমার)—২০, ৩৩, ৪৯। মধ্যমপুরুষ—সামান্য ঃ তু (=তুমি)—১০, (অন্যত্র প্রায়ই সম্বোধনার্থে—যথা, বাহ্ তু ডোম্বী—১৩) ; তোরেঁ—১৮, তোহ্মা (=তোমার)—৪১। **আত্মবাচক ঃ** অপণা (নিজেকে)—২৬ ; অপণা (আপনার)—অপণা মাংসে হরিণা বৈরী —৫। প্রথম পুরুষ—সে—৩, ২৩, ৫০ ; তা (তাহা)—৭, ১৬। **নিশ্চয়াত্মক ঃ** এ (এ বণ—৬, এ ভব—২০) ; এ—২৮, ৩০, ৩৯, ৪১। **অনিশ্চায়াত্মক ঃ** কেহো কোহো—১৮। সংযোগবাচক ঃ জে (যাহারা)—২২, জে জে—৭, ১৫ **প্রশ্নসূচক**—কি—৮, ৪১.

বিভক্তি চিহ্ন ঃ

কর্তা—শূন্য বিভক্তি—লুই ভণই—১, শুণ্ডিণী—২, ভণই কাহ্ন—৭ ইত্যাদি।

এ—কুম্ভীরে খাঅ—২, চোরে নিল—২, কাহ্নে গাইউ—১৮, বঙ্গালে দেশ লুড়িউ—৫০ প্রভৃতি।

আ—(বিশেষার্থে)—হরিণা—৬, করিণা—৯, গঅন্দা (গজেন্দ্র)—১৬, বিয়ালা (শিয়াল)—৩৩, শবরা—৫০ ইত্যাদি।

কর্ম—শূন্য বিভক্তি—গুরু পুচ্ছিঅ জান—১, ২, বারুণি, বান্ধঅ—৩ ইত্যাদি।

এ—সহজে থির করি—৩, গঅবরেঁ তোলিআ—১২, বিহুহ পরম নিবাণেঁ—২৮, অভাগে লইআ—৩৫।

ক—ঠাকুরক—১২, মোক—৩৫।

রে—তোরে—১৮, কাহেরে—২৯।

করণ—এ—সহাবে সুধ—৯, দুখোলে সিংচহু—১৪, করহকলে চিপিউ—১৭, কুঠারেঁ ছিজঅ—৪৫।

সম্প্রদান—এ—ধামার্থে—৫, অপণা মাংসে হরিণা বৈরী (মাংসের জন্ত)—৬, বিবাহে (বাহব ভঙ্গার্থং) চলিলা—১৯।

রে—করিণা করিণিরেঁ রিসঅ—৯, রস-রসানেরে কংখা—২২।

অপাদান—এ—মণিমূলে বহিআ (মণিমূল হইতে)—৪, দসদিসেঁ (দশদিক হইতে)—৯, কণ্ঠে ন মেলঙ্গ (কণ্ঠ হইতে পরিত্যাগ করে না)—১৮, মরণে বি সঙ্কা—২২, জামে কাম কি কামে জাম—২২।

সম্বন্ধ—র—হরিণির—৬, মুসার—২১, বাড়ির—৫০

এর—কপাটের ১, রুখের—২, বিষয়ের—১৬, ডোম্বী-এর—১৯।

ক—ছান্দক বান্ধ—১

অধিকরণ—ত—সাঙ্কমত—৫, বাটত—৮, পিটত—১৪, হাড়ীত—৩৩

এ—ঘরে—৩, ওড়িআণে—৪, রথে—১৪, কণ্ঠে লইআ—২৮, হাথে—৩২, বেণ্টে—৩৩, সমুদে (সমুদ্রে)—৩৫; জলে—৪৩,

অনুসর্গ—যে সকল অব্যয়-ধর্মী পদ পূর্বপদের পরে বসিয়া সংখ্যা-কারক বোঝায়, তাহাদিগকে অনুসর্গ বা পরসর্গ বলে। ইংরাজীতে উহাদিগকে Preposition বলে, কারণ, ইংরাজীতে উহা পদের পূর্বে বসে। কিন্তু বাংলায় উহা পদের পরে বসে বলিয়া Postposition বা পরসর্গ। সাধারণতঃ অনুসর্গ ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হয়, কখনও বা সমাসের পর পদরূপে। বাংলায় অনুসর্গগুলিও অনেক সময় বিভক্তি যুক্ত হয় (যেমন, মাঝেঁ, অন্তরে)। স্বতন্ত্র পদরূপেও অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়, যথা, আগে নাব ন ভেলা দীসঅ—১৫; অন্তে কুলীণজন মাঝেঁ কাবালী—১৮। চর্যাগীতিতে নিম্নলিখিত বিভক্তিতে অনুসর্গের প্রয়োগ দেখা যায়—

প্রথমা—নামে—'ণিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী'—২৮।

[ছন্দের অনুরোধে অনুসর্গ এখানে পদের পূর্বে বসিয়াছে]

দ্বিতীয়া—বিনু (বিনা)—তঁই বিণু—৪.

বিহুনে (বিনা)—নিন্দ বিহুনেঁ—১৩, চিঅ বিহুন্নেঁ—৩৫

পাখে (পক্ষে)—সুণুপাখ—১, বেণি পাখেঁ (দুইপক্ষে)—৪৬

ভর (ব্যাপিয়া)—অধ রাতি ভর—২৭

তৃতীয়া—সম (সহার্থে)—তোত্র সম করিব মো সাঙ্গ—১০, যিহেঁ সম বুঝই—৩৩

সাঙ্গ (সঙ্গে)—ডোম্বী এর সঙ্গে -১৯, দুজ্জন সাঙ্গে—৩২

দিঅাঁ (দিয়া)—চরিবাসে গড়িল রে দিঅাঁ চণ্ডালী—৫০

চতুর্থী—অর্থে—ধামার্থে—৫

উবেসেঁ (উদ্দেশ্যে) - গঅণ উবেসেঁ –৮

অন্তরে (তরে)—তোহোর অন্তরে—১০

লাগি (তরে) টাকলী লাগি—১৬

পঞ্চমী—আগলি (অগ্রে, চেয়ে)—ডোম্বীত আগলি নাহি ছিণালী—১৮

ষষ্ঠী—বাহিরে—নগর বাহিরে—১০

[বহিঃ শব্দ যোগে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী উভয়ই হয়. [এখানে টীকামতে 'ভঙ্গ বাহে'—ষষ্ঠী]

পাসেঁ (পার্শ্বে)—তইলা বাড়ির পাসেঁ—৫০

অন্তে—দুআন্তে চিখিল—৫

সপ্তমী—অন্ত (মধ্য)—গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই—১৬

মাঝেঁ (মধ্যে)—গঙ্গাজউণা মাঝে ১৪, কমলকুলিশ মাঝে—৪৭

ধাতু ও ক্রিয়াপদ : ক্রিয়াপদের মূলকে বলা হয় ধাতু। ধাতুর সঙ্গে কাল ও প্রকার-বোধক বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। ক্রিয়াপদগুলিই কাজ চালায়। পূর্বেই দেখা গিয়াছে, চর্যার অনেকগুলি ক্রিয়ার মূল সংস্কৃত, দেশী বা অপভ্রংশ। প্রকৃতিতে সেগুলি সংস্কৃত-দেশী-অপভ্রংশ হইলেও, আকৃতিতে তদ্ভব বাংলা। তদ্ভব ক্রিয়াবিভক্তি যোগেই তাহাদের সক্রিয় ভূমিকা।

কতকগুলি সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ধাতু বাংলা 'আদেশ' মানিয়া রূপান্তরিত হইয়া বাংলায় আসিয়াছে। এইগুলিকে খাঁটি তদ্ভব বাংলা ধাতু বলা যায়। এইগুলি সিদ্ধ ও সাধিতভেদে দুই প্রকার।

(i) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু অবিভাজ্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ। তবে সেগুলি উপসর্গ যুক্ত হইয়া নূতন অর্থের দ্যোতনা করিতে পারে। যথা—

কর (কৃ), কহ (কথ), গড় (গঠ্), গজ (গর্জ : গজিই—৩২), গাজ (গর্জ : গাজই—১৬), গা (গৈ), গুণ (গণ্ : গুণিঅ—১২), ছা (ছদ্ : ছাইলী—২৮), জল্ (জ্বল্ : জলিঅ—৪৭), জাগ (জাগৃ : জাগঅ—২), জান (জ্ঞা : জাণ—১, জানই—৪১), তুট (ত্রুট্), থাক (অপভ্রঃ থক্ক)—৩৯, ৪৪, ৪৯, ধুন (ধূ : তুলা ধুণি ধুণি- ২৬), নাচ (নৃত্), নে (নী), পড় (পত্), ভাজ (ভঞ্জ : ভাজই—১৬), ভুঞ্জ (ভুজ্), বাধ (বন্ধ), বাড় (বর্ধ), বুঝ (বুধ্), মুন (মন্ : মুণিআ—১৩), রিস (ঈর্ষ : রিসঅ—৯), লভ্ : লইআ—২৮, ৩৫, ৪৯, ৫০, লই—২৯, ৩৫)=প্রভৃতি।

উপসর্গ যুক্ত ধাতু : আইস (আ-বিশ্), উঠ (উৎ-স্থা), উপাড় (উৎ-পাট : উপাড়ী—৮), উজা (উৎ-যা : উজাঅ—৩৮), পইস (প্র-বিশ্), পসর (প্র-সৃ), পোহা (প্র-ভা : পোহাঅ—১৯), বিচুর (বি-চূর্ণ- বিচুরিল—৪৪), সমায় (সম্-আ-ই : সমাঅ ৪০) প্রভৃতি।

(ii) বাংলায় ণিজন্ত ধাতু, নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়াগুলি সাধিত ধাতুর পর্যায়ভুক্ত। মূল ধাতুকে বৃদ্ধি করিয়া বা মূল ধাতুর সঙ্গে -আ বিভক্তি যোগ করিয়া বা মূল ধাতু হইতে গঠিত কোন শব্দকে ক্রিয়ামূলের মত ব্যবহার করিয়া এইরূপ ধাতু গঠন করা হয়। চর্যাতেও এইরূপ প্রয়োগ মিলে। যথা—

ণিজন্ত : চাল্, তোল্, বাহ্, মার, সান্ধ, সোস (শোষ) ইত্যাদি।

[বাংলায় অনেক স্থলে ণিজন্ত ক্রিয়া প্রযোজক কর্তার নহে, সাধারণ কর্তার ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। চর্যাগানেও এই প্রয়োগ লক্ষণীয়, যেমন, বাহলো ডোম্বী—১৪, মারমি ডোম্বী—১০, থির করি চাল—৩]

নামধাতু : অহার (আহার : অহারিল—১৫), উজোল (উজ্জ্বল : উজোলি চান্দে—৩০), উহ্ (উষ্ম : উহ্‌সিউ—২৭), পাক (পক্ব : পাকেল—৫০), ফুল (ফুলিলা), বিবাহ (বিবাহিআ—১৯), মাত (মত্ত : মাতেল —৫০), মৌল (মুকুল : মৌলিল—২৮)

ধ্বন্যাত্মক : এই ধাতুর প্রয়োগ চর্যাভাষায় অল্প। তবু, উচ্ছল (উচ্ছলিআ —১৯), গাজ (গর্জ : গাজই—১৬), চটার (চটারিউ—২৬) প্রয়োগ লক্ষণীয়।

[নাম ও ধ্বন্যাত্মক ধাতুর প্রয়োগ প্রায়শঃ কবিতার ভাষাতেই সীমাবদ্ধ]

(iii) সিদ্ধ ও সাধিত ধাতু বাদে বাংলাভাষায় কতকগুলি সংযোগমূলক ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ

করিয়া বা বিশেষ্য-বিশেষণ পদের সঙ্গে কর্, হু প্রভৃতি ধাতু যোগ করিয়া এইরূপ মিশ্র ক্রিয়া গঠন করা হয়। চর্যাগীতে এই ধরনের বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যথা—ছই ছোই যাই—১০, গুণিআ, লেহুঁ—১২, টলি পইসই—৩১, টুটি গেল—৩৭, ধরণ ন জাই—২, কহণ ন জাই—২০, নাহি নিসারা—৩।

(iv) সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ : ধাতু নিজে নিষ্ক্রিয়, বিভক্তি যোগে তাহার ক্রিয়া। পুরুষ, বচন, কাল, ভাব ও বাচ্য ভেদে বিভক্তি-চিহ্ন পৃথক, ধাতুরূপও বিচিত্র। তবে বৈদিক ভাষায় ও সংস্কৃতে ক্রিয়া-বিভক্তির যে বাহুল্য ছিল, প্রাকৃত-অপভ্রংশে তাহা সরলীকৃত হইয়া যায়। নব্য ভারতীয় ভাষায় তাহা আরও সরল হয়। দ্বিবচন পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল, নব্য স্তরে একবচন ও বহুবচনের পার্থক্যও প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। কাল ও ভাবগুলির ভিতর রহিল ও নিত্য বর্তমান, বর্তমান অনুজ্ঞা, নিত্য অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা। অতীতের প্রাচীন তিঙন্ত রূপগুলি লুপ্ত হওয়ায় অতীত ক্রিয়ার স্থান অধিকার করিল তদ্ভব নিষ্ঠা-প্রত্যয়ান্ত রূপ। চর্যাগান হইতে তদ্ভব এই ক্রিয়ারূপগুলি প্রদর্শিত হইল—

বর্তমান কাল—প্রথম পুরুষ -ই বিভক্তির প্রয়োগ : যথা, ভনই, পড়ই বোলই, বহই ইত্যাদি। চর্যাগানেই এই প্রয়োগ। পরবর্তী বাংলায়—অই, ই—অ (য়) এবং—এ বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই দুইটিই বাংলায় বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের খাঁটি তদ্ভব ক্রিয়া-বিভক্তি, যেমন, বহুড়ী জাগঅ, ভুসুকু ন ছাডঅ—৬, তাস্তি বিকনঅ ডোম্বি—১০, করিণা করিণিরে রিসঅ (ঈর্ষ্যা করে)—৯, কাহ্ন বিলসঅ—৯, কুম্ভীরে খাঅ—২। কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য—সব বাচ্যেই এই ক্রিয়া-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।

[পরবর্তী কালের বাংলাতেও এইরূপ প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, কভু শুস্ত কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুষ্ক কাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয়॥ (চৈ: চ:); দৌলত ভনয় মালিনী শুণয় ময়নার মনের সাধ। (দৌলত কাজী); তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রময়॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)]

বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের অতি প্রচলিত বিভক্তি—এ: যেমন কর্তৃবাচ্যে বারুণী সান্ধে (সন্ধয়তি)—৩, বিহরএ ('বিহরতি')—১১; মিছে লোঅ বন্ধাবএ (বদ্ধো ভবতি')—২২; কর্ম-ভাব বাচ্যে—ডমরু বাজএ—১১, মহাসিদ্ধি সিজ্ঝএ (সিদ্ধির্ভবতি)—১৫।

মধ্যম পুরুষ—(অনুজ্ঞায়) -অ বিভক্তি : জান, পরিমাণ—১ ; চাল—৩, সুন (শোন)—৬, বাহ—১৪, মার—২১, বুঝ—৩২, বিন্ধ—২৮, ধর—৩৮, কর—৪১। —হ বিভক্তি : বিন্ধহ—২৮, ভূলহ—১৫, ছেবহ—৪৫।

অতীত কাল :—ইল প্রত্যয় : প্রথমপুরুষ কর্তৃবাচ্যে—চোরে নিল—আইল গরাহক—৩, জে জে আইলা তে তে গেলা—৭, চলিল কাহ্ন—১৩, কর্ম-ভাববাচ্যে—বাটত মিলিল—৮, তরু মৌলিল—২৮, সর্ব বিচুরিল তথতা নাদে—৪৪, উঠি গেল পানী—৪৮, কঙ্গুচিনা পাকেল—৫০।

উত্তম পুরুষ—কর্ম-ভাববাচ্য—মই দেখিল—৩৬, মই বুঝিল ...অহারিল—৩৫।

ভবিষ্যৎ কাল : সকল পুরুষে—ইব (চর্যায় প্রয়োগ কর্ম-ভাববাচ্যে) : জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী—৫, করিব ম সাঙ্গ—১০ জাইব... জিনউরা ১৪, লোড়িব কইসে—২৮, শাখী করিব—৩৬, খাইব মই দুঠ কুণ্ডবা—৩৯। অনুজ্ঞায়—করিহ।

(v) **অসমাপিকা ক্রিয়া** : অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়—ইআ (—ইঅ —ই),—ইলে এবং —অন্তে যোগে। যেমন,

(ক —ইআ যোগে :—মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী—১১, গঅবরে তোলিআ পাঞ্চজণা ঘোলিউ—১২, কণ্ঠে লইআ—২৮, ভাবাভাব বংদল দলিআ—৩০, দুঃখেঁসুখেঁ একু করিআ—৩৪, টলিআ পইঠা—৩৫, ভাদে ভণই অভাগে লইআ—৩৫, জিম জলে পানি টলিআ ভেডন জাঅ—৪৩, সড়ি পড়িআঁ—৪৫।

ই যোগে—তুলি ধুহি—২, থির করি—৩, সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চাতাল—৪, ঘিনি মেলি—৬, তা দেখি—৭, উপাড়ী ('উৎপাট্য')—৮, চাপি, মিলি-মিলি—৮, পইসি—৯, ছই-ছোই—১০, বাটা চ্ছাড়ি—১৫, গঅণে উঠি—২১, রচি-রচি—২২, ধুনি-ধুনি—২৬, টলি পইসঅ—৩১, টুটি গেলি—৩৭।

(খ)—ইলে যোগে :—সাঙ্কমত চড়িলে—৫, মাঙ্গত চড়িলে—৮।

(গ) শত্রর্থ—অন্তে যোগে :—ভরংগন্তে (সহজজ্ঞানের বোধ লাভ করিতে) —৬, ভান্তি ন বাসসি জাংন্তে (যাইতে)—১৫, এথু বুড়ন্তে—১৬, নাড়ি বিআরন্তে—২০, সন্ধি পইসন্তে—২৮, জাহ্ন মুনন্তে—৩০, চাহন্তে চাহন্তে —৩১, অমিয়া আচ্ছন্তে—৩৯।

—ইআ, ই এবং ইলে প্রত্যায়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বগামিত্ব সূচনা করে ; কিন্তু শত্রন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার

সমকালীনত্ব বুঝাইয়া থাকে। সমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বারণের অনুরোধে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, ফলে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগে একটি বাক্য দীর্ঘায়ত হইতে পারে। চর্যায় এমন দৃষ্টান্ত আছে, যেথানে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য দুই-এর অধিক চরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। যথা—

১. নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে। অনহা ডমরু বাজএ বীর নাদেঁ॥
কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠঅ চারে। দেহনঅরী বিহরএ একারেঁ॥—১১

—নাড়ি শক্তিকে খাটে ধরিয়া (ধরিঅ = বিধৃত্য), অনাহত ডমরু বাজিতে থাকিলে (বাজএ = নদিতঃ সন্), কপালী যোগী কাহ্ন আচারে প্রবেশ করিয়া (পইঠঅ = প্রবিশ্য) একাকারে দেহ নগরীতে বিহার করিতে লাগিলেন।

উপসর্গ : 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে'—সূত্রটি পাণিনির। যে অব্যয় ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্তন সাধন করে, তাহাই উপসর্গ। সংস্কৃত মতে প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—এই কুড়িটি উপসর্গ। ইহাদের যোগে ধাতুর অর্থ পরিবর্তিত হয়—'উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে'। যেমন একই হৃ ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যোগে হয়—প্রহার, আহার, বিহার, সংহার ইত্যাদি। চর্যাগানেও এই ধরনের প্রয়োগ দুর্লভ নহে, যথা—বিহরএ একারেঁ (বি-হৃ)—১১ ; অহার কএলা (আহার করিল—আ-হৃ)—৩৫ ; বাপ সংঘারা (বাপ সংহারিত—সম্-হৃ')—২০ ; তেমনই—প্র-ঈক্ষ্ = প্রেক্ষ > পেখ—৩০, উপ-ঈক্ষ > উপেখ : উএখী—১৬।

কেহ বলেন, উপসর্গ হইল 'প্রদীপবৎ'—উহা ধাতুর অর্থকে প্রদীপের মত আলোকিত করে, কিন্তু প্রদীপের মত নিজে অনালোকিত। অর্থাৎ উপসর্গের দ্যোতকত্ব আছে, বাচকত্ব নাই। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, উপসর্গ নিরর্থক নহে, তাহারও বাচকত্ব বা স্বতন্ত্র অর্থ আছে : 'উচ্চাবচাঃ পদার্থাঃ' (যাস্ক)—উপসর্গের বহুপ্রকার অর্থ। উপসর্গের স্বতন্ত্র অর্থ আছে বলিয়াই, তাহারা পৃথক পদরূপে গণ্য হয়। অব্যয়ীভাব সমাসে উপসর্গ অর্থবান্। চর্যাতেও উদাহরণ পাই, অনুদিন (দিনদিন)—৪২, ৫০ ; দুলক্খ (দুর্লক্ষ্য—২৯), দুজ্জন (দুর্জন)—৩২।

বাংলা উপসর্গের অন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, উপসর্গ শুধু ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় না, নামপদের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যাস্কাচার্যের আমলে উপসর্গের এই ব্যাপক প্রয়োগই প্রচলিত ছিল। যাস্কের অভিপ্রায়

ব্যক্ত করিতে গিয়া স্কন্দস্বামী বলিয়াছেন—'উপেত্য নামাখ্যাতয়োরর্থস্য বিশেষং সৃজন্ত্যুৎপাদয়ন্তীত্যুপসর্গাঃ'। চর্যাগানেও নাম ও ক্রিয়া- উভয়ের যোগেই উপসর্গের এই বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাহাই নহে, চর্যায় মিলে উপসর্গের কতকগুলি খাঁটি বাংলা প্রয়োগ। দেখিতে সংস্কৃত উপসর্গের মত হইলেও অর্থের দিক হইতে পৃথক, যেমন, 'বিমনা ভইলা'—৭, বিসমা হোই—১৭। এ সকল ক্ষেত্রে বি বলিতে বিশিষ্টমনা, বিশিষ্টাধিমাত্রদিগের সম প্রভৃতি অর্থ সংস্কৃতে মিলে না। নিম্নে চর্যাগীতির উপসর্গের এই বঙ্গাল প্রয়োগ গুলি দেখানো হইল :—

অ—'না' অর্থে—অচুধ (অশুদ্ধ)—৯, অভিনচারে—৩৪, অমণ—২১ ;'অনুৎপাদ' অর্থে—অভাগে (অনুৎপাদভাগ) লইআ ; নিঃশেষ অর্থে=অহারিউ জাম —১৯, মুসা করঅ অহারা—২১।

অন্, অনা'—উত্তম অর্থে—অনুত্তর সামী—৫, আনুতু (অনুত্তর)—১৯। না অর্থে —অণহা (অনাহত)—১১, অনুঅণা (অনুৎপন্ন)—৪১, অলখ—৩৪। পরাবৃত্ত অর্থে—অনাবাটা—১৫

দু—দুর্লভ অর্থে—দুলকৃখ—২৯। নিন্দা অর্থে—দুজ্জন—৩২।

নি-নির—না অর্থে—নিসারা (=নিসাড়া)—৩, নিভর—(নির্ভর)—৫ নিঘিণ —১০, নিরাসী—২০, নিরাল (নিরালম্ব)—৩১। মূলক্রিয়ার অনুবর্তনার্থে—নিরোহে (নিরোধে)—৪৪

বি—বিশিষ্ট অর্থে=বিমনা—৭, বিসমা—১৭, বিয়োগা (বিশিষ্ট সংযোগ)—২০ ; মূল ক্রিয়ার অনুবর্তনে—বিহারে—৩৯, বিমুকা (বিমুক্ত)—৩৬, বিআর (বিচার)—৩০, বিভাগ—৩৬।

'না' অর্থে—বিলক্ষণ (লক্ষণহীন)—২৭, বিআলী (কালরহিত)—৪ ;

'নিন্দা' অর্থে—বিরুআ (বিরূপা)—১৮, বিথলা (বিখাল)—৩২। 'ভঙ্গ' অর্থে—বিবাহ (বাহব ভঙ্গার্থং)—১৯।

ভর—পূর্ণ অর্থে—ভর নিদ গেলা—৩৬।

সু—'অনায়াস' অর্থে—সুচ্ছড়ে—(স্বচ্ছন্দে)—১৪।

অন্যান্য অব্যয় : সম্বোধনে—হে—৫ ; রে—১৫, ২২ ; লো—১৪, ১৮ ; অলো—১৭, আলো—১০ ; তো ৬, ১০।

শব্দার্থ বিচার : সন্ধ্যাভাষা

প্রাচীনতম বাংলাভাষায় লেখা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের চর্যাগান ও তাহার টীকা আবিষ্কৃত হইবার পরে 'সন্ধ্যা' শব্দের বানান, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লইয়া বিস্তর বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও মহাযান শাস্ত্রে ও ভাষ্যে উহা সর্বত্রই 'সন্ধ্যা' বানানে লিখিত, তথাপি শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, ওই বানানটি লিপিকর-প্রমাদ-জাত। তিনি 'সম্-ধ্যৈ' ধাতুর পরিবর্তে, 'সম্-ধা' হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করেন। ফলে, তাঁহার মতে শব্দটি 'সন্ধ্যা' নহে, 'সন্ধা'। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু শব্দটির সঙ্গে যে 'ধ্যৈ' বা ধ্যানের একটি সম্পর্ক আছে, তাহাও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। 'সন্ধ্যা' বানানটি লিখিতে সকল লিপিকরই প্রমাদগ্রস্ত হইবেন বা অন্ধভাবে গড্ডলিকাপ্রবাহে একে অন্যের অনুসরণ করিবেন, তাহাও বিচারসহ নহে। কাজেই অনেকে আবার 'সন্ধ্যা' রূপটি রক্ষা করারই পক্ষপাতী।

অর্থের দিক হইতেও সন্ধ্যার্থ বিতর্কিত। সন্ধ্যা শব্দের বাচ্যার্থ বাচ্য নহে। গ্রাহ্য অর্থ কোথায়ও পরোক্ষ, কোথায়ও বা অতিপরোক্ষ। কাজেই অনেকেই মনে করেন, সন্ধ্যাভাষা রহস্যময় হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর Burnouf সাহেব তাই সন্ধ্যাভাষাকে বলিয়াছেন, 'Language Enigmatique'—ভাষা প্রহেলী।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থের আবিষ্কারক আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও প্রায় অনুরূপ অর্থেই এই ভাষাকে বলিয়াছেন, 'আলোআঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' 'আলোআঁধারি' কথাটি ব্যবহার করায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতকে উপেক্ষা করিবার হেতু নাই। তিনি সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে শব্দটির অর্থ বিচার করিয়াছেন। সন্ধ্যাভাষায় যে 'অন্যভাবের কথাও আছে', 'যাঁহারা সাধন-ভজন করেন তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন'—ইহা তিনি জানিতেন।

'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক H. Kern তাঁহার অনুবাদের পাদটীকায় 'সন্ধ্যাভাষিত'কে মন্ত্রের সগোত্র মনে করিয়াছেন। মন্ত্র যেমন গূঢ়ভাবের ব্যঞ্জনা বহন করে, সন্ধ্যাভাষাতেও তেমনই 'Secrecy is implied though not expressed',—কিন্তু এইপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য, গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনার দিক হইতে মন্ত্রের সঙ্গে সন্ধ্যাভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও, 'সন্ধ্যা ভাষা' মন্ত্র নহে। মন্ত্রের মোহময় আবেশ ও 'অপূর্ব' উৎপাদনের ক্ষমতা সন্ধ্যাভাষার নাই।

আচার্য Kern-এর ওই পাদটীকা হইতেই জানা যায়, হাজার বছর পূর্বেকার জ্ঞানতাপস হিউয়েন-সাঙ্ও সন্ধ্যাভাষার ভিতর একটি প্রচ্ছন্ন অর্থ ('Hidden sense') লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাভাষা নিঃসন্দেহে নিহিতার্থক ভাষা। এই নিহিতার্থ বিশেষ অভিপ্রায়প্রসূত। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী এই নিহিতার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন, সন্ধ্যাভাষা আভিপ্রায়িক ভাষা): 'Abhiprayika means that it is intended to imply or suggest something different from what is expressed by the words',

চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদের আবিষ্কারক ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীও জানাইয়াছেন, 'The Tibetan translation.. now amply confirms that the meaning of the term is *intentional speech*', তিনি আরও বলিয়াছেন, 'The term Sandha here stands for *abhisandhi* 'implied sense' or simple *Sandhi* 'Union', because it points out the meaning intended or it is an union of two meanings, ordinary as well as intended in one word', (Studies in Tantras. part I)

(সন্ধ্যা বা সন্ধ্যা ভাষায় যে একটি অর্থসন্ধি আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সংস্কৃত অভিধানে (শব্দকল্পদ্রুম) 'সন্ধ্যা' ও 'সন্ধা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ভিন্ন দেখানো হইলেও, একটি আর একটির প্রতিশব্দ রূপেই গৃহীত হইয়াছে। 'সন্ধি' শব্দের সঙ্গে উভয়েরই যোগ। 'সন্ধি' মানে শ্লেষ বা মিলন। 'সন্ধ্যা' বা 'সন্ধা' ভাষার ভিতরেও তেমনই তন্ত্রের যামল বা যুগনদ্ধ তত্ত্বের মত দুইটি অর্থের শ্লেষ আছে। তাহাদের একটি অর্থ আভিধানিক, আর একটি আভিপ্রায়িক।) (বাহিরের দিক হইতে শব্দগুলি আভিধানিক অর্থই প্রকাশ করে, কিন্তু লক্ষ্যার্থে উহা প্রকাশ করে আভিপ্রায়িক কোন অর্থ। সে অর্থ 'বিরলে বুঝই'—অল্প লোকেই বোঝে ; সে অর্থ 'কোডি মাঝেঁ একু হিঅহি সমাইউ'—কোটির মধ্যে গুটিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে ; আর সে অর্থ গুরুবচনপ্রসাদে ('গুরুসম্প্রদায়াৎ') স্ফুরিত হয়। কাজেই উহার গূঢ়ার্থটি গুরুর উপদেশে অনুসন্ধান করিয়া ('অভিসন্ধ্য') বুঝিতে হয়। ('সন্ধ্যা' বা 'সন্ধা' শব্দের অপর অর্থ 'সন্ধানম্'। অতএব যে শব্দ শ্লিষ্ট এবং যাহার এক অর্থ 'গুরুসম্প্রদায়াৎ' সন্ধান করিয়া বুঝিতে হয়, তাহাই সন্ধ্যা শব্দ। কিন্তু সন্ধ্যাভাষা ও সন্ধ্যা শব্দ সম্পর্কে এই সংজ্ঞার্থও চূড়ান্ত নহে)

সন্ধি, আভিপ্রায়িক, অভিসন্ধি—কোনটিই সন্ধ্যা ভাষার সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে না। ডঃ বাগচী জানাইয়াছেন, তিব্বতী অনুবাদে 'ব্যাজ' ও 'উৎপ্রেক্ষা'কেও 'Intentional Language' বলা হইয়াছে। 'ব্যাজ' ও 'উৎপ্রেক্ষা'র মধ্যে ভাবগোপনের সঙ্কেত থাকিলেও, উহারা সন্ধ্যা শব্দ নহে, শব্দ-শক্ত্যাশ্রিত অলঙ্কার। ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা যে সন্ধ্যা শব্দের প্রতিশব্দ নহে, একটি চর্যাটীকাতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 'সোনে ভরিতী করুণা নাবী' (৮) গানটির টীকায় টীকাকার বলিতেছেন, 'করুণা ব্যাজেন তমেবার্থং দ্যোতয়ন্ত আহুঃ সোণেত্যাদি। করুণেতি সন্ধ্যাভাষয়া তমেব বোধিচিত্তং নাবীতি উৎপ্রেক্ষালঙ্কারপরং বোদ্ধব্যং'।

এখানে একই সঙ্গে 'ব্যাজ', 'সন্ধ্যাভাষা' ও 'উৎপ্রেক্ষা' শব্দ তিনটির উল্লেখ আছে। কিন্তু অর্থ কি এক? স্পষ্টই বলা হইয়াছে সন্ধ্যা 'ভাষা'-বিশেষ, আর উৎপ্রেক্ষা 'অলঙ্কার' এবং ব্যাজ ভিন্নার্থ দ্যোতনার একটি কৌশল।

আভিপ্রায়িক শব্দ ও সন্ধ্যাভাষা

আভিপ্রায়িক অর্থবিশিষ্ট শব্দমাত্রই সন্ধ্যা শব্দ বা সন্ধ্যাভাষা নহে। বাংলা চর্যাগীতি গূঢ়ার্থবোধক। এখানে সন্ধ্যাজাতীয় বহু কূটার্থভাষিত স্থান লাভ করিয়াছে। সেগুলি সিঁদুরে মেঘের মত বজ্রের সঙ্কেতবহ। গানগুলির তত্ত্ব 'মহাসুখ' বা সহজানন্দ। সে তত্ত্ব 'স্বসংবেদ্য', 'অচিন্ত্য' ও 'বাক্‌পথাতীত।' সে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় 'মহারাগ-নয়' বা 'অনুত্তর যোগ'। তাহা বহিরঙ্গ জনের নিকট 'বিসরিঅ' (বিসদৃশ) এবং 'দুল্লব্‌ভ' (দুর্লভ্য)। কাজেই যোগিগণ এই সকল তত্ত্বকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্কেতময় শব্দে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু কুক্কুরীপাদ, ঢেণ্টণপাদ নহেন, সকল সিদ্ধাচার্যেরই এক চেষ্টা —ভাব-উপগূহন। তাই চর্যাগীতিতে পদে পদে বক্রভাষণ, ব্যাজ, রূপক, উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি। এই বাগ্‌বিন্যাসে প্রধান উপকরণ দ্ব্যর্থক বা উভয়ার্থ-প্রতিপাদক অভিপ্রায়িক শব্দরত্নাবলী।

কিন্তু চর্যাগীতির টীকাকার এই দ্ব্যর্থক আভিপ্রায়িক শব্দের সবগুলিকেই 'সন্ধ্যা' নামে চিহ্নিত করেন নাই। উৎস, বিষয়, ব্যুৎপত্তি ও অর্থসংক্রান্তির দিক হইতে এই উভয়ার্থক-প্রতিপাদ শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া দেখানো যাইতেছে এবং কোন্ শব্দগুলিকে আচার্য মুনিদত্ত সন্ধ্যা নামে মুদ্রিত

করিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা দ্বারা সন্ধ্যাভাষার আসল প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হইবে।

॥ এক ॥ চর্যাগীতির কতকগুলি শব্দ প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু তাহাদের অর্থ চর্যায় পরিবর্তিত। যথা—

বোধি (৫)—প্রাচীন অর্থ জ্ঞান, চর্যার্থ 'মহামুদ্রাসিদ্ধি'। **জিনপুর** (৭)—পালিসাহিত্যে জিন বুদ্ধদেব, অতএব জিনপুর বলিতে বুঝাইত বুদ্ধপুর, চর্যায় উহার অর্থ 'মহাসুখপুর'; তেমনই **জিনরঅণ** (৪০)—প্রাচীন অর্থ বুদ্ধরত্ন বা নির্বাণ, কিন্তু চর্যার্থ 'চতুর্থানন্দং বা সহজানন্দ ('জিনরত্নং রতিমনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং 'চতুর্থানন্দ' বোদ্ধব্যং'—টীকা)। **মাজ** (৮)—প্রাচীন অর্থ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চর্যার্থ 'বিরমানন্দ অবধূতী মার্গ'। **নিবাণ** (৫, ২৭)—দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ, চর্যার্থ 'প্রভাস্বর'। **দশবল** (৯)—প্রাচীন অর্থে স্বয়ং বুদ্ধ, চর্যায় উহার অর্থ বুদ্ধের বৈশারদ্যাদি গুণ; (গুণ-গুণী সম্পর্কে) লক্ষণায় অর্থ পরিবর্তিত। **তিশরণ** (১৩)—বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ, চর্যার্থ 'কায়-বাক্-চিত্ত'। **তথাগত** (১৩)—প্রাচীন অর্থে বুদ্ধ, চর্যায় অংশ-অংশী সম্পর্কে অর্থ পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ। **বুদ্ধ**—(১৭)—চর্যার্থ 'ভগবান্ বজ্রধরঃ'।

॥ দুই ॥ চর্যাগানের অনেকগুলি শব্দ হিন্দু যোগতন্ত্র এবং বৌদ্ধ মহাযানের অন্তর্গত মাধ্যমিক দর্শন, যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ), বজ্রযান বা তন্ত্রযান শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। প্রাচীন অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি থাকিলেও চর্যাগীতিতে উহারা আভিপ্রায়িক অর্থেই প্রযুক্ত। যথা—

(i) **হিন্দু যোগ-তন্ত্রের শব্দ :—চন্দ্র সূর্য** (৩)—হঠযোগ প্রদীপিকা মতে 'কালং রাত্রিদিবাত্মকম্' এবং উহা যথাক্রমে বামগা ও দক্ষিণা নাড়ীর প্রতীক, চর্যায় এই অর্থ রক্ষিত হইলেও আভিপ্রায়িক অর্থ 'গ্রাহ্য-গ্রাহক বিকল্প'। **নাদ-বিন্দু** (৩২, ৪৪)—হিন্দুতন্ত্র অনুসারে 'নাদবিন্দু' শক্তিস্পন্দনের প্রকারভেদ (তুলনীয়—'সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দুঃ সমুদ্ভবঃ—' শারদাতিলক); চর্যায় উহা প্রজ্ঞা-উপায় বা গ্রাহ্য-গ্রাহক বিকল্প জ্ঞানের প্রতীক (উপায় গ্রাহকজ্ঞানবিকল্পং বিন্দুরিতি, প্রজ্ঞা গ্রাহ্যজ্ঞান বিকল্পং নাদঃ' ৪৪ নং চর্যাটীকা)। **দশমি দুয়ার** (৩)—পায়ুদ্বার, চর্যার্থ 'বৈরোচনদ্বার'। **মণিমূল** (৩) তন্ত্রার্থ নাভিস্থিত কমল মণিপুর, চর্যার্থ 'বজ্রমণি-শিখর-শুষির'। **ওড়িয়ান** (৩) < উড্ডিয়ান—হঠযোগমতে 'বন্ধবিশেষ',

বৌদ্ধতন্ত্রমতে কামরূপাদি চারিটি মহাপীঠের একটি, কিন্তু চর্যাটীকা মতে 'মহাসুখচক্র'। **বীর** (৩)—হিন্দুতন্ত্রমতে বীরাচারী সাধক, চর্যামতে 'ক্লেশারিমর্দনাদ্ বীরঃ।' **অণহা** (১১, ১৬)—হিন্দুতন্ত্রমতে মাধ্যমা নাদ অনাহত, চর্যামতে 'প্রভাস্বর শূন্যতা ধ্বনি'।

(ii) **মাধ্যমিক ও যোগাচার শাস্ত্রের শব্দ :—গগণ** (১৬, ২১)—মাধ্যমিক শাস্ত্রমতে গগন শূন্যতার প্রতীক, চর্যায় এই শূন্যতার চারিটি প্রকারভেদ —শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য ; সর্বশূন্যই সহজশূন্য বা প্রভাস্বরশূন্য বা 'মহাসুখচক্র কমলবন'। **দ্বাদশ ভুঅণ** (৩৪)—যোগাচার মতে বোধিসত্ত্বের প্রমুদিতা প্রমুখ দশটি ভূমি ; তন্ত্রমতে পীঠ-উপপীঠ, ক্ষেত্র-উপক্ষেত্র, ছন্দোহ-উপছন্দোহ, মেলাপক-উপমেলাপক, পীলব-উপপীলব এবং শ্মশান-উপশ্মশান—এই ারটি মেলাপক ক্ষেত্র ; চর্যাটীকার সঙ্কেত বোধিসত্ত্বের দ্বাদশভূমির প্রতি—'দ্বাদশভূমিনো জিনসম্মাঃ'। **বিণানা** (৩৯)—বিজ্ঞান ; প্রাচীন বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধের একটি স্কন্ধ—C. Humphreys-এর মতে 'consciousness', H. B. Bhattacharya-এর মতে 'discrimination, intellection or reason'; বিজ্ঞানবাদে এই 'বিজ্ঞান' বিশিষ্ট তত্ত্ব—উহার তিনটি অবস্থা—আলয় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তি মাত্রা (pure consciousness); পরতন্ত্র জ্ঞান এবং পরিকল্পিত জ্ঞান ; সহজমতে শেষের দুইটি জ্ঞান ভ্রান্ত—প্রভাস্বরে প্রবিষ্ট চিত্তে অবিদ্যাদোষদুষ্ট বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। **অন্তরাল** (৪৬)—এই শব্দটিও যোগাচারের 'অন্তরাভব বিজ্ঞান'-এর প্রতীক, সহজমতে উহা স্বপ্নে প্রতিভাস ও দর্পণে প্রতিবিম্ব তুল্য।

(iii) **তথতাবাদের শব্দ :—তথতা** (৩৬, ৪৪, ৪৬)—শব্দটি প্রাচীন হইলেও আচার্য অশ্বঘোষ হইতে 'তথতা'-বাদের প্রবর্তন। ধর্মশূন্যতা ও তথতা একার্থক ; কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থ দাঁড়ায় অদ্বয়জ্ঞান বা সমতাজ্ঞান ('Thatness', 'Sameness') : তন্ত্রমতে তথতাজ্ঞান চিত্তবিশোধনের হেতু—'সর্বেষাং খলু বস্তুনাং বিশুদ্ধিস্তথতা মতঃ'—হেবজ্র ১।৯ বিশুদ্ধিপটল ; চর্যাতেও এই অর্থ গৃহীত।

(iv) **বৌদ্ধতন্ত্রের শব্দ :—কমলকুলিশ** (৪, ৪৬)—তন্ত্রার্থ পদ্ম-বজ্র, চর্যার্থ প্রজ্ঞোপায়। **জোইনি** (৪, ১৮)—তন্ত্রমতে যোগিনী, চর্যামতে 'নৈরাত্মা বা 'জ্ঞানমুদ্রা'। **ধমণ-চমণ** (১)—প্রাচীনমতে শ্বাস-প্রশ্বাস, চর্যামতে আলিকালি। **কামরু** (২)—তন্ত্রমতে পীঠস্থান ('পীঠং। পূর্ণগিরিশ্চৈব কামরূপং তথৈব চ' —হেবজ্র ১।৭), চর্যার্থ 'মহাসুখচক্র'। **সসহর** (১৮, ৩৭)—তন্ত্রমতে উষ্ণীষ

কমলস্থ চন্দ্র, চর্যার্থ বোধিচিত্তচন্দ্র 'প্রভাস্বর হেতুভূতং'—চর্যাটীকা ১৮। **এবংকার** (৯)—তন্ত্রমতে ভগ-লিঙ্গ ('একারং ভগমিত্যুক্তং বংকারং কুলিশং স্মৃতং'—হেবজ্র ১।১); চর্যাটীকামতে এ চন্দ্রাভাস বং সূর্যাভাস অর্থাৎ দিবারাত্রি-জ্ঞান। **আলিকালি** (৭, ১১)—যোগরত্নমালামতে 'অকারাদি ষোড়শ স্বরা আলিঃ। ককারাদি চতুস্ত্রিংশদ্ ব্যঞ্জনানি কালিঃ'; চর্যায় আলিকালি যথাক্রমে আলোকজ্ঞান ও আলোকভাস অথবা চন্দ্রসূর্য। **হুঁ-ভব** (৩৯)—তন্ত্রমতে প্রজ্ঞোপায়যোগে উৎপন্ন বোধিচিত্ত, চর্যার্থও প্রায় একরূপ—'হুঙ্কার বীজোদ্ভব চিত্তরাজ' অর্থাৎ সংবৃত্তি বোধিচিত্ত। **মহামুদ্রা** (৩৭)—সর্বধর্মশূন্যা প্রজ্ঞা, চর্যায় ইনি নৈরামণি, সহজসুন্দরী। **মহারস** (১৬)—উষ্ণীষ কমলক্ষরিত রস, চর্যায় ভাবাভাবের ঐক্য।

[এক, দুই সংখ্যক তালিকায় ধৃত শব্দগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন 'পারিভাষিক শব্দ'। গূঢ়ার্থ বিচারে শব্দগুলি দ্ব্যর্থক ও আভিপ্রায়িক। চর্যাটীকায় এগুলিকে সন্ধ্যা শব্দ বলা হয় নাই]

॥ তিন ॥ চর্যাগীতিতে আর এক শ্রেণীর দ্ব্যর্থক শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি পরিচিত সংসার ও লৌকিক জীবনের পরিবেশ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু লোকার্থ হইতে তাহাদের অভিপ্রায়গত অর্থ ভিন্ন। টীকাকার এগুলিকেও সন্ধ্যাশব্দ বলেন নাই। অথচ চর্যাকার যে নিহিতার্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, চর্যাটীকা হইতে তাহা বোঝা যায়। নিম্নে লৌকিক বাগর্থের পাশে সঙ্কেতিত অর্থসহ তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল—

শুণ্ডিনি (৩)—মদ্য ব্যবসায়িনী শুঁড়িনী: অবধূতিকা। **গ্রাহক** (৩)—ক্রেতা: গন্ধর্বসত্ত্ব। **ঘড়ুলী** (৩)—সরুমুখা ঘট: সূক্ষ্মরূপা শুক্রনাড়িকা। **তি অড্ডা** (৪)—ত্রিবৃৎ: ললনা-রসনা-অবধূতী নাড়ী। **বিআলী** (৪)—ত্রৈকালিক ক্রিয়া: কালরহিতা। **কমলরস** (৪)—পদ্মমধু: পরমার্থ বোধিচিত্ত। **কোঞ্চাতাল** (৪)—চাবীতালা: মণিমূলদ্বারের সম্পুটীকরণ। **সাঙ্কম** (৫)—সাঁকো: সংবৃত্তি-পরমার্থ বা স্বাধিষ্ঠান-প্রভাস্বরের ঐক্য। **রূপা** (৮)—রৌপ্য: রূপাদি বিষয়। **খুণ্টি** (৮)—খুঁটি: আভাষদোষ। **কাচ্ছি** (৮)—রজ্জু: অবিদ্যাসূত্র। **কেড়ুয়াল** (৮)—নৌকার হাল বা দাঁড়: সদ্গুরু-বচন। **বাখোড়** (৯)—বন্ধনস্তম্ভ: দিবারাত্রি বিকল্প জ্ঞান। **আসব** (৯)—মদ্য: আত্মদোষ। **নগর** (১০)—পুরী: রূপাদি বিষয়সমূহ। **ব্রাহ্ম** (১০)—ব্রাহ্মণ: 'চঞ্চল চিত্তবটু'।

তান্তি (১০)—বাঁশের তন্ত্রী : ভগ বা পদ্মস্থান বা অবিদ্যা। **চঙ্গড়া** (১০)—চাঙ্গাড়ি : 'বিষয়াভাস'। **নড়পেড়া** (১০—বাগচীর পাঠ)—নটপেটক : 'সংসার পেটক'। **শাসু** (১১)—শ্বশুর বা শাশুড়ী : 'শ্বাস'। **মাআ** (১১)—মাতা : 'মায়ারূপা অবিদ্যা'। **নঅবল** (১২)—দাবা : 'মন্ত্রনয় রহস্য'। **গঅবর** (১২)—দাবাখেলার গজ : তথতাচিত্ত। **মন্তি** (১২) দাবার মন্ত্রী : 'প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি'। **ঠাকুর** (১২)—দাবার রাজা : 'অবিদ্যা চিত্ত'। **কন্নহার** (১৩)—কাণ্ডার : 'প্রভাস্বর চিত্ত'। **বুড়িলী মাতঙ্গী** (১৪)–বুড়ী মতঙ্গকন্যা : 'সহজযান প্রমত্তাঙ্গী নৈরাত্মা'। **পঞ্চ কেড়ুআল** (১৪)—পাঁচ দাঁড় : 'পঞ্চক্রমোপদেশ'। **দুখোল** (১৪)—জল সেঁচিবার ডুখী (ডোঙ্গা) : 'অভিষেক' (সেক)। **সিকল** (১৬) শৃঙ্খল : 'সংসারপাশ'। **খম্ভা** (১৬)—থাম বা স্তম্ভ : 'অবিদ্যা'। **খর-রবিকিরণ** (১৬)—প্রচণ্ড সূর্যতাপ : মহাসুখরাগানল। **বিসমা** (১৭)—বিষম : বিশিষ্টাধিমাত্র সত্ত্বের 'সম' বা নির্বাণ। **কণ্ঠ** (১৮) গ্রীবাদেশ : 'সম্ভোগচক্র'। **বিবাহ** (১৯)—পরিণয় : বায়ুরূপ গমনদ্বারের বাহবভঙ্গ ('বাধাভঙ্গ')। **রঅণি** (১৯)—রাত্রি : 'ক্লেশান্ধকার'। **নিরাসী** (২০)—নিরাশ : 'আসঙ্গরহিতা'। **বাপুড়া** (২০)—হতভাগ্য : 'বাসনাহীন'। **তুলা**(২৬)—কার্পাস : 'তুলনযোগ্য ত্রৈলোক্য'। **কমলিনী** (২৭)—পদ্মিনী : 'পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা'। **সবর-সবরী** (২৮)—সবরজাতীয় নরনারী : 'বজ্রধর ও জ্ঞানমুদ্রা'। **গুঞ্জামালী** (১৮)—গুঞ্জামালা : 'গুহ্যমন্ত্র'। **দারী** (২৮)—পত্নী : ক্লেশহরণ করে যে এমন 'নইরামণি'। **তিঅধাউ** (২৮)—ত্রিধাতু স্বর্ণরৌপ্যতাম্র : ত্রৈধাতুক কায়বাক্‌চিত্ত। **বঙ্গ** (৩৯)—বঙ্গদেশ : অদ্বয়জ্ঞান। **গোহাল** (৩৯)-গোশালা : ইন্দ্রিয়ের আলম্বন স্বকায় ('গো ইতি ইন্দ্রিয়ং। তস্য আলম্বনং স্বকায়ং—টীকা)। **বঙ্গাল** (৩৯)—বঙ্গদেশবাসী : অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানী। **পঞ্চপাটন** (৪৯)—পঞ্চপত্তন : 'পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত 'অহংকার-মম-কারাদি'। **চৌকড়ি ভণ্ডার** (৪৯)—চারকোটি মুদ্রার ভাণ্ডার : 'সন্নাসন্ন সদসদ্ ন ন চাপি উভয়াত্মকং' এইরূপ চতুষ্কোটি বিচার। **জোহ্নবাটিকা** (৫০)—জ্যোৎস্নাবাড়ী : 'জ্ঞানেন্দুমণ্ডল'।

॥ চার ॥ চর্যাগীতিতে আর একধরনের দ্ব্যর্থবোধক শব্দ আছে, যেগুলির নিহিতার্থ কোন একটি বিশেষ বর্ণের বিশেষ অর্থকে আশ্রয় করিয়া গঠিত। হিন্দুতন্ত্রে প্রত্যেকটি বর্ণ বিশেষার্থবোধক। কামধেনু তন্ত্রে তাহাদের আকৃতিসহ অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। তান্ত্রিক বীজমন্ত্রগুলি যে সেই বর্ণার্থেই বিশেষ অর্থবহ,

'বীজনিঘণ্টু' হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, বৌদ্ধতন্ত্রেও প্রত্যেকটি বর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ বহন করিত। ডাকার্ণবে বলা হইয়াছে—'একৈকস্য তু মাহাত্ম্যমক্ষরস্য হি ভূরয়ঃ' (দ্বিতিয় পটল)। হেবজ্রতন্ত্রের 'এবং ময়া শ্রুতম্' মহাবাক্যটির অন্তর্গত প্রত্যেকটি বর্ণের অর্থ যোগরত্নমালায় করা হইয়াছে, তাহাতে এ = পৃথিবী, কর্মমুদ্রা লোচনা ; বং = জল, ধর্মমুদ্রা মামকী ; ম = বহ্নি, মহামুদ্রা পাণ্ডরা ; য়া = মারুত, সময়মুদ্রা তারিণী। যোগরত্নমালায় এ = ভগ, বং = বজ্র অর্থও ধরা হইয়াছে। চর্যাগানেও এইরূপ সঙ্কেতিত বর্ণার্থমূলক যে শব্দগুলি পাওয়া যায়, চর্যাটীকায় তাহাদের আভিপ্রায়িক অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার সেগুলিকে সন্ধ্যা শব্দ বলেন নাই। যথা,—

আলি (৭, ১১)—অকারাদি স্বরবর্ণমালা, চর্যার্থ 'আলোকজ্ঞান' (৭), কিংবা 'চন্দ্র' (১১)।

কালি (৭, ১১)—ক-কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণমালা, চর্যার্থ 'আলোকভাস' (৭), কিংবা 'সূর্য' (১১)।

সারি (১৭)—বাহ্যার্থ গীতবিশেষ ; নিহিতার্থ অ-অক্ষরের স্বরূপবোধক গান। আলি-কালি বর্ণমালার ভিতর সার অক্ষর অ-কার ('আলি-কালি বর্ণাক্ষরাণাং মধ্যে সারাক্ষরমকারং' টীকা)। কারণ, সকল ধর্ম যে আদৌ অনুৎপন্ন নঞর্থক আদিবর্ণ অ-কার তাহারই দ্যোতক ('অ-কারো মুখঃ সর্বধর্মাণাম্ আদ্যনুৎপন্নত্বাৎ'— ৪১ নং চর্যাটীকায় উদ্ধৃত আগমবচন)। কাজেই 'সারি' গান হইল অ-কার বা শূন্যতার স্বরূপবোধক গান।

এবংকার (৯)—এ চন্দ্রাভাস, বং সূর্য অর্থাৎ বৈকল্পিক 'দিবারাত্রি জ্ঞান।

কপাস (৫০)—বাহ্যার্থ কার্পাস, চর্যার্থ 'ক-কারস্য পার্শ্ববর্তী খ-কারঃ চতুর্থ শূন্যং' (টীকা) ; সরহ-পাদের দোহাটীকা হইতে জানা যায় 'ক' সংবৃতিসুখ, 'খ' পারমার্থিক শূন্যতা-সুখ। অতএব 'কপাস'—খ অর্থাৎ শূন্যতা সুখ।

কপালী (১০) বা **কবালী** (১০)—সাধারণ অর্থ কাপালিক, চর্যার্থ 'কং সুখং পালয়িতুং সমর্থঃ'—অর্থাৎ ক-রূপ সংবৃতিসুখ পালনে সমর্থ চর্যাধর।

কঙ্গুচিনা (৫০)—অক্ষরার্থ চিনা-শস্য কাউন, নিহিতার্থ ক-রূপ সুখ যাহার অঙ্গচিহ্ন অর্থাৎ সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।

কুল (১৪, ১৫, ৩৮)—বাহ্যার্থ বংশ, চর্যাটীকায় 'কু'-এর অর্থ কোথাও

ধরা হইয়াছে শরীর, কোথাও কুমার্গ। ৩৮ সংখ্যক গানে 'কুল' অর্থ প্রকৃতি-পরিশুদ্ধা অবধূতিকা, যেখানে কুমার্গ চন্দ্রসূর্যাদি লয়-প্রাপ্ত—'কুমার্গ চন্দ্রাদিকং যস্মিন্ অবধূত্যাং লয় গচ্ছতি সা প্রকৃতি পরিশুদ্ধাবধূতিকা কুলশব্দেন বোদ্ধব্যা'।

কুলীন (১৮)—বংশমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ; চর্যার্থ কু=শরীর, অতএব কুলীন= 'কৌ শরীরে লীনং যৎ প্রভাস্বরং' (টীকা)

খ-মণভতারী (২০)—সাধারণ অর্থ খ্যামনা বা ঢ্যামনা স্বামী যাহার ; চর্যার্থ খ=সর্বশূন্য, অতএব খমণভতারী='সর্বশূন্যং মনঃস্বামী' যাহার।

খট্ট (১১), **খাট** (২৮)—বাহ্যার্থ খাট, চর্যার্থ খ শূন্যতা, ট টালিত অর্থাৎ নাড়ীশক্তি যথায় প্রভাস্বর কর্তৃক স্পৃষ্ট (১১) অথবা ত্রৈধাতুক কায়বাক্‌চিত্ত যথায় খ অর্থাৎ শূন্যতা সুখপ্রভাস্বরে বিনষ্ট ('টালিত')।

টাল (৩৩)—ট=অসদ্রূপ অর্থাৎ কায়বাক্‌চিত্তের ১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষ। সেই 'টমালমসদ্রূপং' যেখানে লয়প্রাপ্ত, অর্থাৎ মহাসুখচক্র। এই অর্থেই ৩৫ সংখ্যক গানের 'টলিয়া' শব্দটিও বিচার্য।

সবর (২৮)—শবর, কিন্তু চর্যার্থ স-পর>সবর=হ অর্থাৎ স-কারের পরবর্তী বর্ণ হ-কার ('সকার পরো হ')। হ=বজ্রধর ('স এব পবিধরঃ')। কাহ্নপাদের ২৪ নং দোহাটীকা হইতে জানা যায়, সবর=প্রাণবায়ু। ব্যাকরণমতে হ প্রাণবর্ণ। অতএব, সবর=হ=মহাসুখাধারের প্রাণবায়ু=বজ্রধর।

সবরী (২৮)—শবরী ; চর্যার্থ শবরের গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা। নৈরাত্মা অঁকারজা ('তস্য গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা অঁকারজা'—টীকা)। অ-কার সর্বশূন্যতার প্রতীক, অতএব অ-কারজা সবরী নৈরাত্মা।

কাজেই দেখা যাইতেছে, আলি-কালি বর্ণমালার প্রায় প্রতিটি বর্ণই অভিপ্রায়িক অর্থবোধক। অ=আদৌ অনুৎপন্নতার প্রতীক, এ=চন্দ্রাভাস, ক=সংবৃতিসুখ, খ=সর্বশূন্য পারমার্থিক সুখ, ট=অসদ্রূপ, বং=সূর্য, র=রতি=অনন্তঅনুত্তর-সুখ। টীকাকার এগুলিকে সন্ধ্যাশব্দ বলেন নাই বটে, কিন্তু শব্দ-প্রকৃতিতে ও গূঢ়ার্থ দ্যোতনায় এগুলি আভিপ্রায়িক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

।। পাঁচ ।। টীকাকার মুনিদত্ত 'সন্ধ্যা' শব্দটির উল্লেখে অত্যন্ত সতর্ক। কারণ, চর্যাগানে আরও কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি হেবজ্রতন্ত্র যোগরত্নমালা, বা সরহপাদের দোহাটীকা মতে সন্ধ্যাশব্দ। কিন্তু চর্যার টীকাকার তাহাদিগকে সন্ধ্যা শব্দ বলেন নাই। চর্যাগানে কোথায়ও মূল সন্ধ্যাশব্দ, কোথায়ও বা অর্থটিই মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। যথা—

কুন্দুরু (৪)—দ্বীন্দ্রিয় যোগ ; চর্যাটীকাতেও উহাকে বলা হইয়াছে 'দ্বীন্দ্রিয় সমাপত্তি যোগ'। তুঃ 'মলয়জ কুন্দুরু বটই'—হেবজ্রতন্ত্র ২।৪।

হাড়েরি মালী (১০)—টীকামতে 'নিরংশুচর্যা' ; 'নিরংশু' সন্ধ্যাশব্দ, অর্থ অস্থি-আভরণ ('অস্থ্যাভরণং নিরংশুকম্'-হেবজ্র)। এখানে অর্থই মূল শব্দ।

ডমরু (১১)—'কৃপীটং ডমরুকং মতং'—হেবজ্র। এখানেও মূল শব্দের পরিবর্তে অর্থটিকেই মূল শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

কুল (১৪, ১৫)—হেবজ্রতন্ত্রের সন্ধ্যাশব্দের তালিকায় 'কুলং পঞ্চবিধং খ্যাতং বর্ণভেদেন ভেদিতং।' বজ্র, পদ্ম, কর্ম, তথাগত, রত্ন—এই পঞ্চকুল। পঞ্চ স্কন্ধরূপ পঞ্চভূতের কুলকে যাহা দ্বারা গণনা করা হয়, তাহাই কুল—কুল্যতে গণ্যতেঽনেন কুলমিত্যভিধীয়তে।' কিন্তু ৩৮নং চর্যায় কুলমুদ্রাকেই 'কুল' বলা হইয়াছে ; সেখানে কুল=পরিশুদ্ধা অবধূতিকা।

কুলিণ-(১৮)—যে প্রভাস্বর কৌ (শরীরে) লীন, তিনিই কুলীন অর্থাৎ কৌলিক ; হেবজ্রতন্ত্রমতে পঞ্চ তথাগত বুদ্ধই পঞ্চ কৌলিক—'বুদ্ধাশ্চ পঞ্চ কৌলিকাঃ'।

মন-পবন (১৯)—বিকল্পজ্ঞান ; সরহ দোহাটীকামতে 'মন-পবন' সন্ধ্যাশব্দ। পবন=চঞ্চল সংবৃতি বোধিচিত্ত, মন সেই সংবৃতিচিত্তের সুখরূপ অমৃত।

কর্ণকুণ্ডল বজ্র (২৮)—কুণ্ডলাদি পঞ্চমুদ্রা নিরংশুকালঙ্কার (টীকা) ; এখানে সন্ধ্যা অর্থই মূল শব্দরূপে গৃহীত।

কাপুর (২৮)—কর্পূর ; 'শুক্রং কর্পূরকং মতং'—হেবজ্র ; চর্যাটীকায় উহাকে বলা হইয়াছে যুগনদ্ধ হেতুফল।

হরিণী (৬)—জ্ঞানমুদ্রা, দোহাটীকামতে সন্ধ্যাশব্দ।

ডমরুলি (৩১)—পূর্বোক্ত 'ডমরু' শব্দ দ্রষ্টব্য।

রবিশশী (৩২)—অদ্বয়বজ্রের টীকা মতে রবি ও শশী সন্ধ্যাভাষা, অর্থ রাগ-বিরাগাদি কল্পিত সহজ।

বলদ (৩৩)—হেবজ্রমতে 'বল' মাংস অর্থে সন্ধ্যাশব্দ—'বলং মাংসং' ; চর্যাটীকামতে বলদ=বলং মাংসাদ্ দেহবিগ্রহং দদাতীতি বলদঃ, অর্থ বোধিচিত্ত। ৩৯ নং চর্যাটীকায় বলদ শব্দের নির্বচন—'দুষ্টবিষয়ং বলং দদাতি ইতি দুষ্টবলদ চিত্তরাজো বোদ্ধব্যঃ'।

বাজুল(৩৫)—বজ্রকুল ; হেবজ্রতন্ত্র মতে বজ্রকুল সন্ধ্যাভাষা।

চণ্ডালী (৪৭)—হেবজ্রতন্ত্রমতে চণ্ডালী রত্নকুলের মুদ্রা, শ্বপচীর সমার্থক। অন্যত্র 'চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় যোগরত্নমালাকার বলেন, 'চণ্ডা প্রজ্ঞা অংকারঃ। আলির্বজ্রসত্ত্বো হুঙ্কারঃ। অঙ্কার-হুঙ্কারৌ চণ্ডালী।' ৪৭ নং চর্যায় এই শেষোক্ত ভাবটিকেই রূপক আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাজ (৪৯)—বজ্র ; হেবজ্রমতে 'বোল' সন্ধ্যাশব্দের অর্থ 'বজ্র'—'বজ্রং বোলম্ ইতি খ্যাতম্।'

পউমা (৪৯)—পদ্ম ; হেবজ্রমতে সন্ধ্যাশব্দ কক্কোল-এর অর্থ পদ্ম—'পদ্মং কক্কোলকং মতম্'।

সবর সবরী (২৮, ৫০)—দোহাটীকা মতে সন্ধ্যাশব্দ, অর্থ যথাক্রমে পবিধর ও নৈরাত্মা।

।। ছয় ।। চর্যাগীতিতে মুনিদত্ত-চিহ্নিত সন্ধ্যাশব্দাবলীর তালিকা প্রকাশের পূর্বে এই গীতিকোষের অন্তর্গত ২নং ও ৩৩নং গানের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই দুইটি চর্যা দ্ব্যর্থক শব্দে ভরা। এই দুইটি গানের টীকার সূচনায় টীকাকার গান দুইটি যে সন্ধ্যাভাষায় রচিত তাহা উল্লেখ করিয়াছেন—

'তমেব মহাসুখরাজানং....স্বানন্দাসবপানপ্রমোদমনসা কুক্কুরীপাদাঃ **সন্ধ্যাভাষয়া** প্রকটয়িতুমাহুঃ' (২নং চর্যাটীকা)

'তমেবার্থং পরমানন্দসন্দোহমুদিত ঢেণ্টণো হি সিদ্ধাচার্যঃ **সন্ধ্যাভাষয়া** প্রতিপাদয়তি' (৩৩ নং চর্যাটীকা)

২ সংখ্যক গানের টীকায় এইরূপ সন্ধ্যাভাষায় বর্ণনার কথা বলিয়াও মুনিদত্ত 'দুলি' ও 'বহুড়ী' শব্দ দুইটিকে পৃথকভাবে সন্ধ্যাশব্দ বলিয়াছেন। কিন্তু ৩৩ সংখ্যক গানের টীকায় কোন বিশেষ শব্দকে সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। টীকাকারের উদ্দেশ্য কি? তিনি কি বলিতে চান, এই দুইটি গানে সমগ্র গানই সন্ধ্যা অর্থে গ্রহণ-যোগ্য? তাহা হইলে 'দুলি' ও 'বহুড়ী' শব্দ দুইটিকে পৃথকভাবে সন্ধ্যাশব্দে চিহ্নিত করিবার তাৎপর্য কি? দুইটি গানেই স্বরূপার্থকে গোপন করিয়া বাহিরে অন্য একটি অর্থকে প্রকাশ করা হইয়াছে। গান দুইটির অপর বিশেষত্ব—বক্রভাষণ দ্বারা বিরোধাভাস সৃষ্টি। বিসদৃশ উক্তি দ্বারা বিরোধ সৃষ্টি করাই কি সন্ধ্যাভাষার লক্ষণ? তাহা হইলে—

মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥ (১১)

নব জোবণ মোর ভইলেসি পুরা।
মূল নখলি বাপ সংঘারা॥ (২০)

—প্রভৃতি উক্তিকেও সন্ধ্যাভাষা বলা উচিত ছিল। কারণ যাহাই হউক, ২ ও ৩৩ সংখ্যক গান সন্ধ্যাভাষায় রচিত বলা হইলেও তদন্তর্গত এই গূঢ়ার্থবোধক শব্দগুলিকে সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। অথচ শব্দগুলি দ্ব্যর্থক।

২নং চর্যা :—**পিঠা**—পাত্র, বজ্রমণি, **রুখ**—বৃক্ষ, যোগীন্দ্রের কায়, **তেন্তুলি** চিঞ্চাফল, সংবৃত্তি বোধিচিত্ত, **কুম্ভীর**—জলজন্তু, কুম্ভক সমাধি, **ঘর**—গৃহ, অবধূতী-গৃহ, **অঙ্গন**—আঙ্গিনা, ব্যুত্থানবাত, **বিয়াতী**—দুশ্চরিত্রা নারী, পরিশুদ্ধাবধূতী; **কানেট**—কর্ণভূষা, প্রবেশাদিবাত, **চৌর**—অপহরণকারী, সহজানন্দ, **অধরাতি**—মধ্যরাত্রি, চতুর্থী সন্ধ্যা, **সসুর**—শ্বশুর, শ্বরিতাদিশ্বাস, কামরু—কামসঙ্কেত স্থান, নির্বিকল্প মহাসুখচক্র।

৩৩নং চর্যা :—**টাল**—টিলা, মহাসুখচক্র, **পড়বেষী**—প্রতিবেশী, পার্শ্বস্থ চন্দ্রসূর্য, **হাড়ী**—ভাণ্ড, স্বকায়াধার, **ভাত**—ভক্ত, সংবৃত্তিবোধিচিত্ত; **বাঙ্গ**—অঙ্গহীন, প্রভাস্বর, **দুহিল দুধু**—দোহাদুধ, কর্মমুদ্রাপ্রসঙ্গে বজ্রাগার হইতে উৎপন্ন বোধিচিত্ত, **বেণ্ট**—বাঁট, মূলমহাসুখচক্র, **বলদ**—বৃষ, সংবৃত্তি বোধিচিত্ত, **গাবী**—গাভী, নৈরাত্মা, **চোর**—সংবৃত্তি চিত্তরাজ, **দুঃসাধী**—রাত্রির প্রহরী, পরমার্থচিত্ত, **শৃগাল**—শিয়াল, সংসারচিত্ত, **সিংহ**—যুগনদ্ধ পরমার্থচিত্ত।

॥ সাত ॥ 'নির্মলগিরা' টীকায় চর্যার গুহ্য সাধনার অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া টীকাকার মুনিদত্ত অতি অল্পসংখ্যক শব্দকেই স্পষ্টতঃ সন্ধ্যাশব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দটি উল্লেখ করিয়া অমুক শব্দ 'সন্ধ্যাভাষয়া' (৮) বা 'সন্ধ্যাজ্ঞানেন' (৩৬) বা 'সন্ধ্যয়া' (৫, ১৪) অমক অর্থে বোদ্ধব্য—এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। যথা, 'বারুণীতি সন্ধ্যাবচনেন তদেব সংবৃত্তি বোধিচিত্তং বোদ্ধব্যং' (৩), 'করুণেতি সন্ধ্যাভাষয়া তমেব বোধিচিত্তং' (৮), 'গঙ্গাযমুনেতি সন্ধ্যয়া চন্দ্রাভাসসূর্যাভাসৌ গ্রাহ্যগ্রাহকৌ' (১৪), 'মূষকঃ সন্ধ্যাবচনেন চিত্তপবনঃ বোদ্ধব্যঃ' ইত্যাদি। টীকাকারের নির্দেশ অনুসারে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পার্শ্বলিখিত দ্বিতীয় অর্থে সন্ধ্যাশব্দ, প্রথম অর্থটি বাহ্য:

দুলি (২)—দুরা (কমঠ), 'মহাসুখকমল'; **বহুড়ী** (২)—বউড়ী, অবধূতী>(অ) বধূতী> বধূটী>বহুড়ী='পরিশুদ্ধাবধূতী'; **বারুণী** (৩)—মদ্য,

সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।' **গই** (৫)—নদী, 'ললনারসনাদিআভাসত্রয়'; **হরিণা** ৬)—মৃগ, 'চিত্ত'; **হরিণী** (৬)—মৃগী, 'জ্ঞানমুদ্রা'; **করুণা** (৮)—মৈত্রী, বোধিচিত্ত'; **গজেন্দ্র** (৯)—গজবর, 'চিত্ত'; **ডোম্বী** (১০)—ডোম্‌নী, পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা'; **বড়িকা** (১২)—দাবাখেলার গুটি বড়ে, 'ষষ্ট্যুত্তরশত প্রকৃতি দোষ'; **ণাবী** (১৩)—নৌকা, 'মহাসুখকায়; **গঙ্গাযমুনা** (১৪)—স্বনামখ্যাত নদীদ্বয়, 'চন্দ্রাভাস সূর্যাভাস গ্রাহ্যগ্রাহক'; **নাঙ্গ** (১৫)—নৌ, শুক্রনাড়িকার মধ্যে অবস্থিত 'বোধিচিত্ত', **পুলিন্দা** (১৪)—কাপড়ের পোটলা বা পাল, 'নপুংসক'; **গঅন্দা** (১৬)—গজেন্দ্র, 'চিত্ত'; **সুণতান্তি ধনি** (১৭)—শূন্যতা ধ্বনি, 'প্রভাস্বর অনাহত', **ডোম্বী** (১৮)—ডোমনারী, 'পরিশুদ্ধাবধূতিকা'; **মুসা** (২১)—মূষক, 'চিত্তপবন', **বেমকটবণা** (২৫)—মূল গানটি পাতা না থাকায় লুপ্ত, তবে টীকার শেষাংশ হইতে জানা যায়, উহা সন্ধ্যাশব্দ; শব্দটির বাহ্য অর্থ অস্পষ্ট, সন্ধ্যার্থ 'প্রাণাপান প্রজ্ঞোপায়াত্মক বাতদ্বয়'; **সুণ** (৩৬)—শূন্যম্, 'বাসনাগার'; **বাহ্ম** (৪৭)—ব্রহ্মা, 'বিটনাড়িকা'; **হরি** (৪৭)—বিষ্ণু, 'মূত্র নাড়ী'; **হর** (৪৭)—শিব, 'শুক্রনাড়ী'; **তইলা বাড়ী** (৫০)—তৃতীয় বাটিকা, 'তৃতীয় মহাশূন্য', **চারি** (৫০)—চতুর্থ, 'চতুরানন্দ'।

লুপ্তাংশ বাদে চর্যাটীকায় মোট ২৫টি সন্ধ্যাশব্দ রহিয়াছে। তন্মধ্যে নাঙ্গ—২ বার এবং ডোম্বী ২ বার এবং গজেন্দ্র (গঅন্দা) দুইবার সন্ধ্যা শব্দরূপে পুনরুক্ত হইয়াছে। এই দ্বিরুক্তি বাদ দিলে মোট ২২টি শব্দকে টীকাকার স্পষ্টভাবে সন্ধ্যাশব্দ বলিয়াছেন।

চর্যাধৃত বিভিন্ন পর্যায়ের দ্ব্যর্থক আভিপ্রায়িক শব্দগুলি বিচার করিলে সন্ধ্যাভাষা' 'আভিপ্রায়িক ভাষা' বা 'Intentional Speech'—এই নির্বচন অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ সন্ধ্যাশব্দগুলি কেবল দ্ব্যর্থক আভিপ্রায়িক শব্দ নহে, উহাতে নিশ্চয় অন্য একটি লক্ষণ আছে, যাহার ফলে সন্ধ্যাভাষা অন্যান্য দ্ব্যর্থক শব্দ হইতে স্বতন্ত্র। সে লক্ষণটি কি ?

সন্ধ্যাভাষা সময়-সঙ্কেতের ভাষা

মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে এবং তাহাদের টীকা-ভাষ্যে 'সন্ধ্যাভাষা', সন্ধ্যাভাষিত' বা 'সন্ধ্যাবচন' প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও কোথাও স্পষ্টভাবে সন্ধ্যাশব্দের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করা হয় নাই। কেবল হেবজ্রতন্ত্রের দ্বিতীয় কল্প

'সন্ধ্যাভাষা নাম' তৃতীয় পটলে স্পর্শগ্রহণের মত দিঙ্মাত্র স্পর্শ করিয়া সন্ধ্যাভাষার মর্মার্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে, 'সন্ধ্যাভাষং মহৎ ভাষং সময়সঙ্কেত বিস্তরম্' : সন্ধ্যাভাষা মহাভাষা, উহা 'সময়সঙ্কেত'-প্রকাশের ভাষা।

সময়-সঙ্কেত বলিতে কি বোঝায়? (মহাযান শাস্ত্রে 'সময়' প্রাচীন 'ধর্ম' শব্দটির সমার্থক। কিন্তু পারমিতাযানে এই শব্দটি আরও বিশেষার্থবোধক হইয়া উঠে। পারমিতানয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে উহা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন-বাচক শব্দে পরিণত হয়।) এই প্রজ্ঞা 'বুদ্ধ ধর্মকরণ্ডক', ইহাই 'তথাগতগর্ভ'—ইঁহার সহিত 'অভিষঙ্গে'ই সাধকের সর্বার্থসিদ্ধি। এই 'অভিষঙ্গ'ই 'সময়'। (ক্রমে) কালক্রমে নর-নারীর মিলনের সহিত যুক্ত হওয়ায় বৌদ্ধতন্ত্রে 'সময়' যোগী ও যোগিনীর মিলনের রহস্যময় প্রতীক হইয়া উঠে। এই মিলনের বাহ্য ও অধ্যাত্ম দুই প্রকার অর্থ থাকিলেও, নির্মাণকায়ে কর্মমুদ্রার সহিত মিলন এবং সম্ভোগকায়ে সময়মুদ্রার সহিত সম্ভোগের ইঙ্গিত অস্পষ্ট নহে। এইজন্যই এই গুহ্য সাধনপ্রণালী সঙ্কেতিত শব্দে অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষায় আবৃত। উদ্দেশ্য ভব্য সত্ত্বের নিকট সময়ের সুগুপ্ত তত্ত্বকে প্রকাশ করা এবং অভব্য সত্ত্বের নিকট হইতে উহাকে কৌশলক্রমে গুপ্ত রাখা—'ভব্য সত্ত্বেষু ব্যক্তং অভব্য সত্ত্বেষু গুপ্তমিতি' - (সরহপাদের দোহাটীকা)।

হেবজ্রতন্ত্রে গূঢ়ার্থসহ সন্ধ্যাশব্দাবলীর একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে :

মদন—মদ্য, **বল**—মাংস, **মলয়জ**—মীলন, **খেট**-গতি, **নিরংশুক**—অস্থ্যাভরণ, **প্রেঙ্খণ**—আগতি, **কৃপীট**—ডমরুক, **দুন্দুর**—অভব্য, **কালিঞ্জর**—ভব্য, **পদ্মভাজন** (Lotus vase—Dr Bagchi)—কপাল, **তৃপ্তিকর**—ভক্ত (শাল্যন্ন), **গালভীষ্ক্ষন**—ব্যঞ্জন, **চতুঃসম**—গূথ (বিষ্ঠা), **কস্তুরিকা**—মূত্র, **সিহ্লক**—স্বয়ম্ভু (স্ত্রীরজঃ), **কর্পূরক**—শুক্র, **আলিজ**—মহামাংস (নরমাংস), **কুন্দুরু**—দ্বীন্দ্রিয়যোগ, **বোল**—বজ্র, **কক্কোল**—পদ্ম, **পঞ্চকুল**—পঞ্চবর্ণ (Five classes differentiated by colour'—Dr. Bagchi), (এই পঞ্চকুলের মুদ্রা যথাক্রমে)—**ডোম্বী**—বজ্রকুলী, **নটী**—পদ্মকুলী, **শ্বপচী** (চণ্ডালী)—রত্নকুলী, **দ্বিজা** (ব্রাহ্মণী)—তাথাগতী, **রজকী**—কর্মকুলী।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সন্ধ্যা শব্দগুলির গূঢ়ার্থ বা সঙ্কেতিত অর্থ নরনারীর বাহ্য মিলন-সম্ভোগেরই সঙ্কেতবহ। সহজসাধনার সাধনপদ্ধতি 'মহারাগনয়'। এই মহারাগেরই অন্য পারিভাষিক নাম 'সময়'। সময়াচারের

ক্রিয়াগুলি নরনারীর মিলনক্রিয়া। কোন মেলাপক স্থানে যোগী ও যোগিনীর সাক্ষাৎ, সঙ্কেতময় বাচনিক সংলাপ ('ছোমা'), গুরুর উপদেশে মুদ্রাগ্রহণ, প্রজ্ঞোপায় যোগ, অভ্যাসপ্রকর্ষ প্রভৃতি বাহ্য মিলনেরই কথা। বিশেষতঃ গুহ্য অভিষেক এবং এই অভিষেকের সময়, সময়মুদ্রা ও সময়াভিষেক প্রভৃতিও রহস্যঘন। কণ্ঠ বা সম্ভোগচক্রে সময়মুদ্রার সহিত সাধকের পরমানন্দ সম্ভোগ। এই প্রসঙ্গগুলি বিসদৃশ এবং একান্ত গুহ্য। তাই প্রকাশের দিক হইতে ইহার ভাষাও স্বতন্ত্র। সময়-সঙ্কেতের বিশিষ্ট ভাষা তাই অভিসন্ধিমূলক সন্ধ্যাভাষা। সে ভাষা বাহিরের দিক হইতে এক অর্থ বহন করে, কিন্তু সঙ্কেতিত অর্থ ভিন্ন। সে অর্থ 'গুরুসম্প্রদায়'—অর্থাৎ গুরুপরম্পরা প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে বুঝিতে হয়। তাই হেবজ্রতন্ত্রে অতি সংক্ষেপে এই মূল রহস্যটির ইঙ্গিত দিয়া বলা হইয়াছে, 'সন্ধ্যাভাষং মহৎভাষং সময়সঙ্কেত বিস্তরম্।'

হেবজ্রতন্ত্রের দ্বিতীয় কল্প তৃতীয় পটলে সম্বর ও অভিষেক প্রসঙ্গেই সন্ধ্যাভাষার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই কল্পেরই চতুর্থ পটলে যোগী ও যোগিনীর গীত-নাট্য কি, তাহার উত্তরে সন্ধ্যাভাষায় যে চিত্রটি অঙ্কন করা হইয়াছে, সন্ধ্যার্থে তাহা নরনারীর মিলনচিত্র :

কোল্লই রে ঠিঅ বোলা মুম্মুনিরে কক্কোলা।
ঘন কিবিড হো বাজই করুণে কি অইন রোলা ॥
তহি বল খজ্জই গাঢ়ে মঅণা পিজ্জিঅই।
হলে কালিঞ্জর পণিঅই দুন্দুরু বজ্জিঅই ॥
চউসম কস্তুরি সিহলা কপ্পুর লাইঅই।
মালই ইন্ধন সালিতহি ভরু খাইঅই ॥
প্রেঙ্খণ খেট করন্তে শুদ্ধাশুদ্ধ ণ মানিঅই।
মলয়জ কুন্দুরু বটই ডিণ্ডিম তহি ণ বজ্জিঅই ॥

বাহিরের দিক হইতে ইহার অভিধেয় অর্থ একপ্রকার, কিন্তু সন্ধ্যাভাষার অর্থ অনুসারে উহার গূঢ়ার্থ বা সম্প্রদায়ার্থ এইরূপ—

কোল্লগিরিত আছে বজ্র (লিঙ্গ) এবং মুম্মুনি ক্ষেত্রে পদ্ম (ভগ)। উচ্চরবে বাজে ডমরু, সংবৃত বোধিচিত্তের (শুক্ররূপী) এইরূপ কোলাহল। সেখানে মাংস খাওয়া হয়, মদ্য পান করা হয়, ভব্য জনকে প্রবেশ করানো হয়, অভব্য জনকে বর্জন করা হয়। বিষ্ঠা, মূত্র, রক্তঃ ও শুক্র লইয়া অন্নব্যঞ্জনসহ ভোজন

করা হয়। গতাগতিতে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বিচার করা হয় না; মিলন ও দ্বি-ইন্দ্রিয় যোগে অস্পৃশ্যকেও দূরে বর্জন করা হয় না।

ঠিক এই ভাবেরই একটি আগম-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ১৮ নং চর্যাটীকায়—

কক্কোল প্রিয় বোল মেলকতয়া আনন্দস্ফুরৎ কুন্দুরাঃ।
সদ্যঃ শোধিত শালি লালিতকরাঃ কালিঞ্জরশ্চক্রিণঃ॥
ভ্রম্যদ্ দিব্যসরোজ পাত্র মদনব্যালুপ্ত দন্তচ্ছদাঃ।
প্রেতাবাসনিবাস নিত্যরসিকাঃ কেচিৎ কচিৎ যোগিনঃ॥

এখানেও সন্ধ্যাবচনের সঙ্কেতে ভগলিঙ্গ যোগে রসিক যোগীর মিলনের আনন্দ-স্ফূর্তি, শাল্যন্ন ভক্ষণ, পদ্মপাত্রে মদ্যপান ও শ্মশানচারিতার কথা বলা হইয়াছে। চর্যাগীতিতেও একাধিক স্থলে সন্ধ্যাশব্দে নরনারীর মিলনযোগের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

(i) ৪ সংখ্যক গানে 'শ্রীহেরুকচর্যা'য় 'কুন্দুরু' বা দ্বি-ইন্দ্রিয় যোগের চিত্র। ভাবক ও যোগিনীর 'কুলিশাব্জ সংযোগ' এখানে সন্ধ্যা ভাষাতেই বর্ণিত। সন্ধ্যার্থে উহা যৌন-যোগ হইতে ভিন্ন নহে:

তিয়ড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘান্টে করহুঁ বিআলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি॥

—ত্রিবৃৎ (ত্রিভুজাকৃতি ভগ) চাপিয়া আলিঙ্গনপটু যোগিনী আলিঙ্গন দেয়। ভাবককে বলে, ভগলিঙ্গ যোগে বৈকালিক ক্রিয়া কর। ভাবক বলে, যোগিনি, তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচি না, তোমার মুখচুম্বন করিয়া আমি পদ্মমধু পান করি।

(ii) ১৯ সংখ্যক গান ডোম্বী-বিবাহ ও মিলনের চিত্র। এখানে 'বিবাহ' শব্দটিই গূঢ় তাৎপর্যবোধক, সঙ্কেতার্থে বিবাহ গমনদ্বারের বাহবভঙ্গ। উপরন্তু এখানে রহিয়াছে রাত্রিব্যাপী সুরতাভিষঙ্গের তৃপ্তি:

অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ।

(iii) ২৮ সংখ্যক গানেও রতিক্রীড়াসুখ প্রবাহের চিত্র:

তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী॥

হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই ॥

—(সোনারূপা-তামায় গড়া) তিন ধাতুর খাট পাতা হইল। সবর মহানন্দে শয্যা বিছাইল। সবর কামকুশল নায়ক, সবরী কামনায়িকা। সবর মনের সুখে তাম্বুল-কর্পূর ভক্ষণ করিয়া, সোনার নৈরামণিকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া পরমানন্দে রাত্রি ভোর করিল।

এ সকল স্থানে সন্ধ্যার্থ যৌনবাসনা, দেহসম্ভোগ ও ভোগবিলাসের সঙ্কেতবহ। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, প্রাচীন তন্ত্রাদিতে সন্ধ্যা শব্দগুলিকেই ব্যবহার করা হইয়াছে, সন্ধ্যা অর্থটি গোপন রাখা হইয়াছে। চর্যাগানে সন্ধ্যা শব্দের পরিবর্তে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সঙ্কেতিত অর্থটি গ্রহণ করায় বাহ্য সুরতলীলার ব্যাপারটি বাহিরে সুপ্রকট হইয়াছে। সন্ধ্যাভাষা যে সময়-সঙ্কেতরই ভাষা, বিষয়ানুসারে চর্যাগীতির বিন্যাসপ্রণালীও সে সাক্ষ্য বহন করে। আবিষ্কৃত চর্যাগীতিতে ৫০টি গীতের সংখ্যা থাকিলেও কয়েকটি পাতা না থাকায় উহাতে মোট পূর্ণাঙ্গ গীতের সংখ্যা ৪৬। তন্মধ্যে প্রথম ২১টি গানে টীকাকার যে পরিমাণ সন্ধ্যাশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, শেষাংশে সে পরিমাণে সন্ধ্যা শব্দের উল্লেখ অনেক কম। এ সম্পর্কে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় *The old Bengali Language and Text* গ্রন্থে কয়েকটি সংশয়িত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি: 'It may be possible that a historical stage is marked by the absence of *Sandhya-Sabda* and the preponderance of simple statements......Does it imply that the authors whose songs fall in the latter half of of the Text are comparatively younger?

কালানুক্রমিকতার দিক হইতে শেষের গানগুলি পরবর্তীকালের লেখকদের রচনা এই মন্তব্যের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। প্রথম গানের আদি সিদ্ধাচার্য্য লুই শেষাংশেও আছেন (২৯)। প্রাচীন সাধক সরহপাদকে শেষের দিকেই (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ সংখ্যক গানে) বিশেষ করিয়া পাওয়া যাইতেছে। ২ ও ২০ সংখ্যক গীতের রচয়িতা কুকুরীপাদ যে ৪৮ সংখ্যক গানের প্রণেতা (পাতা না থাকায় মূল গানটি লুপ্ত), তাহা মুনিদত্তের টীকা হইতেই জানা যাইতেছে। ১৫ সংখ্যক গানের শান্তিপাদ (ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'প্রাচীনতর পদকর্তা'

২৬ সংখ্যক গানেরও রচয়িতা। শবরপাদও প্রাচীন কবি, তিনি ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানের কবি। কাহ্নপাদের ভনিতায় অনেকগুলি গান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৩৬ সংখ্যক গানের রচয়িতা কাহ্নপাদ জালন্ধরীপাদের শিষ্য। তিনিও অপ্রাচীন নহেন। ৩৪ সংখ্যক গানের কবি দারিক আদি সিদ্ধাচার্য লুইয়ের শিষ্য। কাজেই চর্যাগীতিকোষের শেষার্ধের গানগুলি অবরকালের রচনা, একথা বলা চলে না। বরং চর্যাগীতির শেষার্ধে সন্ধ্যাশব্দের স্বল্পপ্রয়োগ সম্পর্কে ডঃ মুখোপাধ্যায় যে অপর কারণটি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য: 'It is possible that the latter part of the text contained those songs which do not jusify the inclusion of *Sandhya-sabda.*'

চর্যাগীতির সঙ্কলনে একটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকের গানগুলিতে পাওয়া যায়, চর্যা, ক্রিয়া অর্থাৎ মহারাগনয়ের পদ্ধতি। শেষাংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে সহজতত্ত্বমূলক বা সহজপ্রাপ্তির আনন্দানুভবমূলক গান। অবশ্য এই ভাগ সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। অনেক গানেই সাধন ও সাধ্য একাধারে মিশ্রিত হইয়া আছে। তবু শেষাংশের গানগুলিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আনন্দই বিশেষভাবে প্রকাশিত। সেখানে লুই 'জ্ঞানানন্দ সুন্দর' (২৯), শান্তি 'জ্ঞানানন্দ প্রমোদভরস্তিমিত হৃদয়' (২৬), ঢেণ্ঢণপাদ 'পরমানন্দসন্দোহমুদিত' ৩৩), ভদ্রপাদ 'জ্ঞানানন্দপ্রমোদযুক্ত' (৩৫), কৃষ্ণাচার্য 'সহজানন্দ সুন্দর' (৩৬) বা বা 'জ্ঞানামৃত পরিতুষ্ট' (৪২)। আর ভুসুকু?—বিচিত্র তাঁহার সহজানন্দের অনুভব। তাই কখনও তিনি 'সহজানন্দ রসপূর্ণ' (২৭), কখনও বা 'অমৃত পরিস্নপিত' (৪৯)। এই সহজানন্দ 'স্বসংবেদ্য' এবং সে সংবেদন 'বাক্‌পথাতীত'। সেইজন্যই হয়তো ডঃ মুখোপাধ্যায় মনে করিয়াছেন, চর্যাগীতিশেষে সন্ধ্যাশব্দ প্রয়োগের সুযোগ অল্প। কিন্তু দ্ব্যর্থক শব্দ সর্বত্র ব্যবহার্য।

কিন্তু বিষয়টি অন্য ভাবেও বিচার করা যাইতে পারে। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আনন্দ প্রকাশে আভিপ্রায়িক ভাষা প্রয়োগের সুযোগ অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাতে সন্ধ্যাশব্দ ব্যবহৃত নাও হইতে পারে। সন্ধ্যাভাষা সময়-সঙ্কেতমূলক আভিপ্রায়িক ভাষা। তাহার প্রকাশের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ।

মিষ্টিক তত্ত্ব অনুভবের প্রকাশে যে সঙ্কেত, রূপক, বিপরীতভাষণ বা পল্লবিত ভাষণের প্রয়োজন আছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহা স্বীকার করেন। 'Underhill বলেন, 'Under a variety of images, by a deliberate exploitation

of the musical and suggestive qualities of words—often too, by the help of desparate paradoxes, those unfailing stimulants of man's intuitive power—he tries to tell others somewhat of that veritable country which 'eye hath not seen', (Mysticism). সহজানন্দ 'অবাচকত্বাৎ' অনির্বচনীয় হইলেও, সাধকগণ তাহাকে বাকৃপ্রতীতির নানা কৌশল অবলম্বনে প্রকাশ করিয়া থাকেন। চর্যাগানেও সহজতত্ত্ব প্রকাশের ব্যাপারে আভিপ্রায়িক দ্ব্যর্থক শব্দের প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। কমলিনী, শশধর (২০), গুঞ্জা (২৮), নিরাল=নিরাবলম্বন (৩১), কুঁভব, গোহাল (৩৯), বঙ্গাল, পঞ্চপাটন, সোণরুঅ (৪৯) এবং কপাস, কঙ্গুচিনা, জাহ্নবাটি (৫০) প্রভৃতি সন্ধ্যাশব্দ না হইলেও দ্ব্যর্থক ও আভিপ্রায়িক।

তবু শেষের দিকের গানগুলিতে যে সন্ধ্যাশব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই, তাহা বলা চলে না। কারণ চর্যাগানে অবিমিশ্র সহজতত্ত্বের অনুভবের কথা অল্প গানেই আছে। সর্বত্রই সাধনতত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আনন্দ মিশ্রিত হইয়া আছে। কাজেই যে-সকল স্থলে সাধন-প্রসঙ্গে গুহ্যমেলন প্রক্রিয়ার কথা আছে, সেখানে সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগ আছেই। যেমন ৪৭ সংখ্যক গীত 'কমলকুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী'। এই গানটি 'হেবজ্রতন্ত্রের 'চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ' শ্লোকটির ভাবছায়ায় রচিত। উহাতে সন্ধ্যাভাষার উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ রহিয়াছে।

এইপ্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। সাধন-সংক্রান্ত কতকগুলি গানে পরিচিত ও প্রচলিত সন্ধ্যাশব্দ বা সন্ধ্যার্থবাচক শব্দের প্রয়োগ করা হইলেও, মুনিদত্ত তাহাদিগকে সন্ধ্যাশব্দে চিহ্নিত করেন নাই। ২৮ সংখ্যক গানের 'সবর-সবরী', 'কর্ণকুণ্ডল বজ্র' (নিরংশুক), 'কাপুর' (কর্পূর), ৩১ সংখ্যক গানের 'মনপবন', 'ডমরু', ৩২ সংখ্যক গানের 'রবি-শশি', ৩৫ সংখ্যক গানের 'বাজুল' (বজ্রকুল), ৩৭ সংখ্যক গানের 'কুল', ৩৯ সংখ্যক গানের 'বলদ', ৪৯ সংখ্যক গানের 'ঘরণী' ও 'চণ্ডালী' এবং ৫০ সংখ্যক গানের 'শবরা-শবরী' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত মতে সন্ধ্যাশব্দ। কিন্তু আচার্য মুনিদত্তের টীকায়, উহাদিগকে সন্ধ্যাভাষা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। উপরন্তু প্রথমদিকের গানগুলির টীকায় যেগুলিকে সন্ধ্যাশব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, শেষের দিকের গানে সেই একই অর্থে প্রয়োগ করা হইলেও, মুনিদত্ত সেগুলিকে সন্ধ্যা

শব্দ বলেন নাই। যথা ৮ সংখ্যক গানে 'করুণা' সন্ধ্যাশব্দ, কিন্তু ৩০, ৩১ সংখ্যক গীতে একই অর্থে প্রযুক্ত হইলেও সেখানে 'করুণা'কে সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। ১০ সংখ্যক গানের 'ডোম্বী' সন্ধ্যাশব্দ, কিন্তু ১৪ নং গানের 'সহজযান প্রমত্তাঙ্গী' ডোম্বী, বা ১৯ সংখ্যক গানের 'ডোম্বী' সন্ধ্যাশব্দ নহে। ৪৭ সংখ্যক গানের 'ডোম্বী' পরিশুদ্ধাবধূতী'—অথচ তাহাকে সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। ১৩ সংখ্যক গানের 'নৌ' কায় অর্থে সন্ধ্যাশব্দ, কিন্তু ৩৮ সংখ্যক গানের 'নাব' একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও সন্ধ্যাশব্দে চিহ্নিত নহে। মনে হয়, টীকাকার পূর্বে যে শব্দটিকে একবার সন্ধ্যাশব্দ বলিয়াছেন, পুনরুল্লেখ হইবে মনে করিয়া শেষের দিকে সেটিকে আর সন্ধ্যাশব্দ বলেন নাই। এমন কি তন্ত্রে বা দোহাটীকায় যে শব্দগুলিকে সন্ধ্যাবচন বলা হইয়াছে, সে শব্দগুলিকেও টীকামধ্যে পুনরায় সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। এসকল ক্ষেত্রে দ্বিরুক্তি বা পুনরুক্তি পরিহার করাই সম্ভবতঃ আচার্য মুনিদত্তের উদ্দেশ্য।

মোটের উপর সন্ধ্যাভাষা গুহ্যসাধনসংক্রান্ত আভিপ্রায়িক ভাষা গুহ্যসাধনের ক্ষেত্রেই উহার প্রয়োজন। সহজানন্দ বাক্‌পথাতীত হইলেও গুহ্য বা গোপ্য নহে। কিন্তু সহজে প্রতিষ্ঠার উপায় যে বজ্রজাপ, তাহা সর্বথা গুহ্য ও গোপনীয়। তাহার চর্যা ও ক্রিয়াও বিসদৃশ ও রহস্যময়। সহজ সাধনার পঞ্চক্রম, পঞ্চবর্ণবিহার, সপ্রপঞ্চ চর্যা, কপালচর্যা প্রভৃতি শুধু দুরবগাহ নহে বিষম। আর এই চর্যা ও ক্রিয়াগুলিই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে চর্যাগীতি-কোষের প্রথমাংশের গানগুলিতে। ২ নং চর্যায় 'নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা', ১০ নং গানে 'সপ্রপঞ্চ চর্যা', ১১ নং গানে 'কপাল চর্যা', ১২ সংখ্যক গীতিতে 'মন্ত্রনয়রহস্য', ১৪ নং গীতিতে 'অভ্যাসপ্রকর্ষ', ১৭ নং গানে বিষম 'বজ্রপদ নৃত্য' ও 'সঙ্গায়ন মঙ্গল' প্রভৃতির নির্দেশ রহিয়াছে। ওই সকল গানেই সন্ধ্যাসঙ্কেত প্রয়োগের উপযোগিতা অধিক এবং করাও হইয়াছে তাহাই। সাধন-সংক্রান্ত গানগুলিতে একদিকে রহিয়াছে ভাবগোপনের তাগিদ, অপরদিকে ভাবপ্রকাশের দায়িত্ব। কারণ, বৌদ্ধসঙ্ঘের বাহিরে ও ভিতরে রহিয়াছে সম্প্রদায়-বাহ্য বুদ্ধতীর্থিক, আছে মৃদুইন্দ্রিয় 'বিতথ জ্ঞানাভিনিবিষ্ট' বালযোগী। তাহারা এক বুঝিতে আর বুঝিতে পারে। আবার সম্প্রদায়ান্তর্গত ভাবককে গূঢ় তাৎপর্য বুঝাইতেও হইবে। তাই প্রয়োজন অভিসন্ধিমূলক সন্ধ্যাভাষা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন কুশলী সুরঙ্গিকার মত সেই সন্ধিছেদের কৌশল। গুহ্য সাধনের সে সন্ধি ছেদ

করিতে পারে 'গুরুসম্প্রদায়' অর্থাৎ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ। সে উপদেশের উপাদান সময়সঙ্কেতদ্যোতক সন্ধ্যাভাষা।

সন্ধ্যাভাষা কি অশ্লীল ?

সময়সঙ্কেতের দিক হইতে সন্ধ্যাভাষার প্রাকৃতি বিচার করিতে গিয়া কেহ কেহ (Mercia Eliade) ইহাকে 'Obscene language' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য, গুহ্যসাধনার ভাষাসঙ্কেতও গুহ্য। আচার্য অদ্বয়বজ্র সরহপাদের দোহা-টীকায় এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। যোগিনীদের আচার-আচরণ কুৎসিত, রুচিবিগর্হিত ও অশ্লীল। তাঁহারা ঘরপতিকে ভক্ষণ করে, পরপতিকে গ্রহণ করে, বারাঙ্গনার মত ছলাকলাপূর্ণ রতিবিলাসে মত্ত হয় : 'তস্মাদ্ বিসদৃশং সর্বশাস্ত্রেষু লোকব্যবহারে বা যোগিনী-নামাচারঃ'। কিন্তু যোগিনীর সমাজ-বিগর্হিত আচারই কি সহজসাধকদের লক্ষ্য ? তাহা নহে। অদ্বয়বজ্র বলেন, 'যোগিন্যা চ ন মারিতং ন ভক্ষিতং। অপি সহজময়ঃ সহজাত্মকং সহজে নিলীনং কৃতমিতি ভাবম্।'

তাহা ছাড়া, হেবজ্রতন্ত্রে বা চর্যাগীতিতে যে-সকল শব্দ সন্ধ্যা শব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই বাহিরের দিক হইতে অশ্লীল নহে। হেবজ্রতন্ত্রের মলয়জ, পদ্মভাজন, কুন্দুরু, কর্পূর, কস্তুরী, বোল, কক্কোল ও চতুঃসম প্রভৃতি শব্দ এবং চর্যাগানের হরিণী, গজেন্দ্র, নদী, নৌকা প্রভৃতি শব্দ অশ্লীল তো নহেই, বরং উচ্চারণ-সৌকর্যে, অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে এবং লালিত্যে সেগুলি রুচির ও রুচিকর। এমন কি, তাহাদের অভিধেয় অর্থগুলিও মনোহর। মলয়জ = চন্দন, পদ্মভাজন = কমলপাত্র ; কে না জানে কর্পূর-কস্তুরী গন্ধদ্রব্য ? কুন্দরুও সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, বোল-কাক্কোলও অভিধেয় অর্থে 'গন্ধদ্রব্যবিশেষ' এবং চতুঃসম – 'মিলিতচন্দনাগুরুকস্তুরীকুঙ্কুমরূপম্' (হেমচন্দ্র, দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম)।

প্রকৃতপক্ষে যিনি যাহাই বলুন, চর্যাধর বা সিদ্ধাচার্যদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির সঙ্গে ছিল আশ্চর্যসুন্দর কবিদৃষ্টি। যাঁহারা নিজে 'সহজানন্দরসপূর্ণ' বা জ্ঞানানন্দসুন্দর,' তাঁহারা গীত রচনা করিতে গিয়া প্রজ্ঞা, আনন্দ ও সুন্দরেরই যুক্তবেণী রচনা করিয়াছেন। সহজসাধকেরা ছিলেন জীবনপ্রেমিক ও সৌন্দর্যরসিক। মর্তজীবনের পঞ্চবর্ণ বিহারে তাঁহারা এক অনাসক্ত আসক্তির পরিচয় দিয়াছেন, মহারাগ আস্বাদনে তাঁহারা পার্থিব রাগকে অস্বীকার করেন নাই। এ যেন 'ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা'র অনুসন্ধান

বা 'রূপের পদ্মে অরূপ মধুপান।' সিদ্ধ সাধকদের ভাষাভঙ্গীও কাব্যত্বের প্রতিকূল নহে। সন্ধ্যাশব্দের নির্বাচনে ও বিন্যাসে তাঁহারা কাব্যশোভাকর অনুকূল পরিবেশই রচনা করিয়াছেন। চর্যাধরেরা নিজে যোগিকালঙ্কারে (নিরংশুচর্যা) ভূষিত হইয়াছেন, সোনার নৈরামণিকে ময়ূরপিচ্ছে ও গুঞ্জামালায় সজ্জিত করিয়াছেন। এই অলঙ্কারপ্রিয়তা কাব্যের মণ্ডলকলারও সহায়ক হইয়াছে, তাই সাধনসঙ্গীতে আসিয়াছে বিবিধ কাব্যালঙ্কার—শ্লেষ, ব্যাজ, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি। এই অলঙ্কার সজ্জাব প্রধান উপকরণ অর্থশ্লিষ্ট সন্ধ্যাশব্দ। সন্ধ্যাভাষাব প্রকৃতি বিচারে শব্দেব এই শক্তি ও বৃত্তি কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে।

সন্ধ্যাশব্দের নিরুক্তি

সন্ধ্যাশব্দেব সৌন্দর্য বিচার করিবার পূর্বে ইহার নিহিতার্থগুলি কিভাবে স্থিব কবা হইয়াছে, তাহা বিচাব করা কর্তব্য। সন্ধ্যাশব্দেব নিহিতাথ আভিপ্রায়িক হইলেও স্বকপোলকল্পিত নহে। পূবপ্রচলিত ধাবা অনুসরণ করিয়াই শব্দগুলিব গূঢাথ বিচার করা হইয়াছে। এ বিষযে বৈদিক শব্দেব নির্বচনকাব নিরুক্তবাদীদের সহিত সহজ আচার্যদের দৃষ্টিভঙ্গীব মিল রহিয়াছে। বেদের অনেক শব্দকে কেহ কেহ নিরর্থক বলিয়াছেন। কিন্তু নিরুক্তকারেরা বলেন, কোন বেদমন্ত্রই নিরর্থক নহে। অন্ধ ব্যক্তি যে স্থাণু (খুঁটি) দেখিতে পায় না, তাহা স্থাণুর দোষ নহে, পুরুষের অন্ধত্বই তাহার কারণ (নিরুক্ত ১ ৩. ৫)। যাস্কমুনির মতে প্রত্যেকটি বেদমন্ত্র অর্থবহ। তবে শব্দগুলি অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অর্থের পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থ প্রকাশ করে। মানুষের পরোক্ষপ্রিয়তার ফলেই ভাষা প্রত্যক্ষ ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেক্ষেত্রে শব্দের অন্তর্লীন ক্রিয়া বিচার করিয়া বা অন্য কোন ক্রিয়াব অর্থ বা স্বর-ব্যঞ্জনের সমানতা ধরিয়া শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিরূপণ করিতে হয়। তাহা হইলেই সঙ্গত অর্থটি পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবচনের নির্বচনে বা অর্থনিরূপণে তন্ত্রকার বা ভাষ্যকারবৃন্দ এই প্রাচীন নৈরুক্ত পদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। নিরূঢ় ক্রিয়ার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা সন্ধ্যাবচনের ব্যুৎপত্তি ও গূঢ়ার্থ বিচার করিয়াছেন। এখানে চর্যাগানে ব্যবহৃত এবং মুনিদত্ত কর্তৃক উল্লিখিত সন্ধ্যাশব্দগুলির ব্যুৎপত্তিসহ অর্থ দেখানো যাইতেছে:

(i) প্রথমত কতকগুলি সন্ধ্যাবচন পাওয়া যাইতেছে, যাহাদের অর্থ

প্রত্যক্ষ ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হইলেও আভিধানিক অর্থ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যথা—

ডুলি (২)—সন্ধ্যার্থ 'মহাসুখকমল'। এখানে লয়ার্থক ধাতু 'লী' কে অবলম্বন করিয়া ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, 'দ্বয়াকারং যস্মিন্ লীনং গতং'। নূতনত্ব আসিয়াছে 'ডু' কে 'দ্বয়'-এর সমার্থক ধরায়। ডু বা দ্বয় বা দ্বৈতবোধ যেখানে লয়প্রাপ্ত, তাহাই 'ডুলি'। প্রচলিত অর্থে ডুলী বা ডুরীর অর্থ 'মাদী কচ্ছপ'। কমঠের সর্বসঙ্কোচন বৃত্তিই এখানে লক্ষ্যার্থে আরোপিত। মহাসুখও সমস্ত দ্বৈতবোধের অতীত।

বহুড়ী (২)—পরিশুদ্ধাবধূতী; তৎসম 'বধূটী' শব্দ হইতে তদ্ভব 'বহুডী' শব্দ নিষ্পন্ন; কিন্তু চর্যাটীকায় আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া 'অবধূতী' শব্দ হইতে আদ্যস্বর লোপে বধূতী বা বধূটী শব্দটি নিষ্পন্ন দেখানো হইয়াছে। অনাদি ভববিকল্প ধৌত করেন যিনি, তিনি পরিশুদ্ধাবধূতী। এইদিক হইতে অবধূতী-ই বহুডী। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক।

হরিণী (৬)—জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা; 'হরতি খণ্ডয়তি হরিণী'—যে হরণ করে বা খণ্ডন করে সেই হরিণী। অভিধানেও 'হৃ' ধাতু হইতেই হরিণ শব্দ নিষ্পন্ন। কিন্তু জ্ঞানমুদ্রার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি?—জ্ঞানমুদ্রা 'বিষপান ভব গ্রহান্ হরতি'। চর্যার হরিণীও অনাদি অবিদ্যাদোষে মোহগ্রস্ত মৃত্যুভীত হরিণার মোহভাব হরণ করেন। তাই লক্ষ্যার্থে 'হরিণী' জ্ঞানমুদ্রা।

হরিণা (৬)—সংবৃত্তি বোধিচিত্ত; হরিণা হরণ করে বা গ্রহণ করে অবিদ্যা-দোষ, ধারণ করে 'মাংস'। প্রকৃতিদোষে সে চঞ্চল। সংবৃত্তি চিত্তও স্পন্দনশীল, তাহার গতি সংসারের দিকে। অতএব লক্ষ্যার্থে 'হরিণা' সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।

মুসা (২১)—চিত্তপবন; 'মুষ্ণাতীতি মূষকঃ'—এখানে হরণার্থক 'মুষ্' ধাতু হইতেই শব্দটি নিষ্পন্ন। মূষিক মিষ্টদ্রব্য আহার করে, ঘরে গর্ত খনন করে, চঞ্চল ভাবে গমনাগমন করে। এই মূষিকবৃত্তিই চঞ্চল চোর সংবৃত্তি চিত্তপবনের বৃত্তি। তাই নিহিতার্থে 'মুসা' চিত্তপবন।

(ii) কতকগুলি সন্ধ্যা শব্দের গূঢার্থ স্পষ্টতঃ লক্ষণা শব্দশক্তিবলে সিদ্ধ:

বারুণী (৩)—সংবৃত্তি বোধিচিত্ত; টীকামতে 'বারুণীতি সুখপ্রমোদত্বাৎ বোধিচিত্তং'। বারুণী বা মদ প্রমোদকর, সংবৃত্তি বোধিচিত্তও বিষয় সুখেপ্রমাদগ্রস্ত।

গই (নদী) (৫)—ললনা-রসনাদি আভাষত্রয়; নদী জলবহা, নাড়ীগুলিও

বোধিচিত্তবহা। নদী মাঝখানে গহন, গভীর, কিনারায় পঙ্কিল—তেমনই মধ্যনাড়ী অতল, পার্শ্বনাড়ী প্রকৃতিদোষদুষ্ট। কাজেই 'ললনারসনাপ্তাভাবত্রয়ং পারাবার গম্ভীরত্বেন নদী সন্ধ্যয়া বোদ্ধব্যং' (টীকা)।

গজেন্দ্র (৯, ১৬)—চিত্ত; মদমত্ত গজেন্দ্র স্তম্ভ ভাঙ্গে, শৃঙ্খল ছিন্ন করে, মদ বর্ষণ করে, গর্জন করে ও কমলবনে ক্রীড়া করে। জ্ঞানপানপ্রমত্ত চিত্তও সংসারপাশ ছিন্ন করে এবং মহাসুখকমল-সরোবরে প্রবেশ করিয়া নিবৃত্ত হয়।

ডোম্বী (১০)—পরিশুদ্ধাবধূতী; টীকাকার বলেন, 'অস্পৃশযোগত্বাৎ ডোম্বী'। অস্পৃশ্য বলিয়া ডোমনী নগরের উপান্তে বাস করে, ব্রাহ্মণ তাহাকে স্পর্শ করে না। পরিশুদ্ধাবধূতিকার আগারও রূপাদি বিষয় সমূহের বহির্ভাগে, তাহা সংবৃত্তি চিত্তের অস্পৃশ্য। অতএব গুণ-লক্ষণায় ডোম্বী পরিশুদ্ধা অবধূতী।

নাঈ (১৪)—শুক্রনাড়িকায় প্রবাহিত বোধিচিত্ত; নৌ বা নৌকা নদী-সন্তরণ বা পারে গমনের উপায়, উহা নদীর বাহন; তেমনই পারগামীর আশ্রয় বোধিচিত্ত, উহা অবধূতিকা মার্গে সন্তরণ করে। নৌকা অর্ণবতরণে তরণী, বোধিচিত্ত 'ভবার্ণব-তরণে নৌকা'।

গঙ্গা-যমুনা (১৪)—চন্দ্রাভাস সূর্যাভাস গ্রাহ্য-গ্রাহক; অবধূতিকা নাড়ীর পার্শ্বস্থ বামগা নাড়ী চন্দ্র গ্রাহ্য। দক্ষিণা নাড়ী সূর্য গ্রাহক। নিরুক্ত মতে গঙ্গা বিশিষ্টভাবে গমনশীলা, কিন্তু যমুনা অন্য নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া গমনশীলা; একটি স্বতন্ত্রা, অপরটি অন্যনির্ভর। সরহপাদের দোহাটীকাতেও বলা হইয়াছে, 'যমুনা সর্বযানতদাশ্রয়া,' 'গঙ্গা তৎপরিগমনশীলা'। কাজেই লক্ষণায় যমুনা গ্রাহক, গঙ্গা গ্রাহ্য। চন্দ্রসূর্য ও গঙ্গাযমুনার সঙ্গে দেহস্থ নাড়ীর তুলনার পদ্ধতিটি সুপ্রাচীন।

শূন্যতাধ্বনি (১৭)—প্রভাস্বর অনাহত ধ্বনি; শূন্যের প্রতীক আকাশ, আকাশের গুণ শব্দ, সে শব্দ অশ্রুত; অনাহত ধ্বনিও অশ্রুত নাদ।

(iii) কতকগুলি সন্ধ্যাশব্দের স্পষ্ট ব্যুৎপত্তি চর্যাটীকায় নাই, অর্থ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। বিচার করিলে দেখা যাইবে সে অর্থগুলিও রূঢ়িলক্ষণায় সিদ্ধ। যথা—

করুণা (৮)—বোধিচিত্ত; মহাযান মতে করুণা ও পুদ্গলশূন্যতা একার্থক; হেবজ্র তন্ত্রমতে 'শূন্যতা করুণাভিন্নং বোধিচিত্তমিতি স্মৃতম্'। অতএব বোধিচিত্তের সঙ্গে করুণার যোগ শাস্ত্রসঙ্গত।

বড়িক (১২)—ষষ্ট্যুত্তর শত প্রকৃতি অর্থাৎ ১৬০ প্রকার দোষযুক্ত প্রকৃতি।

বেষ্টনার্থক 'বট্' ধাতু হইতে বড়িক শব্দের উৎপত্তি, উহা দাবার ছকে অনেকটা স্থান বেষ্টন করিয়া থাকে। প্রকৃতিদোষও বহুব্যাপক।

পুলিন্দা (১৪)—শব্দটির ব্যুৎপত্তি স্পষ্ট নহে, অর্থ নপুংসক। চন্দ্রসূর্য প্রসঙ্গেই পুলিন্দার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মধ্য নাড়ী অবধূতী।...নপুংসকের প্রজনন ক্ষমতা নাই—স্বরূপতঃ পরিশুদ্ধা অবধূতী নৈরাত্মাও বন্ধ্যা। তুঃ 'গবিআ বাঁঝে' (৩৩ নং চর্যা)।

হরিহর ব্রহ্মা (৪৭)—যথাক্রমে মূত্র, শুক্র ও বিট্। বিবিধ প্রকারে স্থিত বলিয়া বি-স্থা= বিষ্ঠা বা বিট্। ব্রহ্মাও বিবিধ রূপের স্রষ্টা। তাই ব্রহ্মা বিট্-নাড়ী। হরি বা নারায়ণের শয়ন-শয্যা-জল, তাই দ্রবাকার মূত্রের প্রতীক। আর হর যে বজ্র বা শুক্রধারী, শৈবতন্ত্রে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত। হেবজ্র-তন্ত্রমতে পঞ্চস্কন্ধের দেবতাদের মত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও তত্ত্ব : 'ব্রহ্মা নিবৃত্তিতো বুদ্ধঃ বিষ্ণাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে। শিবঃ সদা সুকল্যাণাৎ সর্বঃ সর্বাত্মনি স্থিতঃ ॥'

নাভিতে চণ্ডালী প্রজ্বলিত হইলে এই তত্ত্বগুলি দগ্ধ হয়—ইহাই ৪৭ সংখ্যক গানের বক্তব্য।

চর্যাগীতির অলঙ্কার

সন্ধ্যাবচনের গূঢ়ার্থ বিচারে দেখা যাইতেছে, অর্থপ্রকাশের দিক হইতে ইহা শ্লিষ্ট বা দ্ব্যর্থক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। একটি মাত্র শব্দ দ্বারা যেখানে দুইটি অর্থের ইঙ্গিত দেওয়া হয়, তাহাই শ্লিষ্ট শব্দ। শব্দের সৌন্দর্যবিচারে এইখানেই আসে শব্দশক্তির প্রসঙ্গ। বৈয়াকরণদের মতে শব্দের শক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার—অভিধা ও লক্ষণা। যে শক্তি বলে একটি শব্দ প্রত্যক্ষ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই শব্দের অভিধা শক্তি। শব্দের এই শক্তি বাচ্যার্থকে সুস্পষ্ট প্রকাশ করে এবং শব্দের সৌন্দর্যবিধায়ক নানারূপ অলঙ্কারও সৃষ্টি করিয়া থাকে। সন্ধ্যা-শব্দের বাহ্যার্থ বা অক্ষরার্থ এই অভিধাশক্তিরই প্রকাশ। কিন্তু অভিধেয় অর্থদ্বারা যেখানে শব্দার্থ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়, সেখানে যে শক্তিবলে শব্দটি মুখ্যার্থের সংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ প্রকাশ করে, তাহা শব্দের লক্ষণাশক্তি। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, সন্ধ্যাশব্দের নিহিতার্থ প্রায়শঃ লক্ষণায় সিদ্ধ। লক্ষ্যার্থের পরিধি বহুব্যাপক। রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণা বহু প্রকারের হইতে পারে। আচার্য বিশ্বনাথ 'অশীতি প্রকারা লক্ষণা'র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (সাহিত্যদর্পণ : ২/২৩)। অভিধেয় অর্থের সহিত সামীপ্য, সারূপ্য,

সমবায়, বৈপরীত্য ও ক্রিয়াযোগের সম্পর্কে পাঁচপ্রকার লক্ষ্যার্থ পঞ্চীকৃত হইয়া বহুপ্রকার হইতে পারে। অভিনবগুপ্ত বলেন, 'অনয়া লক্ষণয়া পঞ্চবিধয়া বিশ্বমেব ব্যাপ্তম্' (লোচনটীকা ১/১৮)।

শব্দের এই লক্ষণাবৃত্তি অনেকগুলি বাচ্যালঙ্কারের মূল ভিত্তি। প্রজ্ঞাপ্রবীণ কবি সৌন্দর্যসৃষ্টির গূঢ় অভিপ্রায়ে এই লক্ষ্যার্থকে বীজরূপে গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কাব্যশোভাকর অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। চর্যাগানেও দ্ব্যর্থবোধক সন্ধ্যাশব্দগুলি এই কারণেই কবিতার সৌন্দর্য-বিধায়ক অলঙ্কারের উপচার হইয়া উঠিয়াছে।

'নির্মলগিরা' টীকায় আচার্য মুনিদত্ত অনেকস্থলে 'ব্যাজ' ও 'উৎপ্রেক্ষা' অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা ভিন্নধর্মী অলঙ্কার হইলেও, ১ নংচর্যাটীকায় ব্যাজ যেন উৎপ্রেক্ষারই সগোত্র হইয়া উঠিয়াছে—উভয়ই যেন সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের পর্যায়ভুক্ত। আবার দুইটি যে এক নহে, টীকাকার সে সম্পর্কেও সচেতন (দ্রঃ ৮নং চর্যাটীকা)।

'ব্যাজ' শব্দের অভিধেয় অর্থ ছল। স্বরূপ আচ্ছাদন বা অভিপ্রায় গোপন করাই উহার স্বরূপ লক্ষণ। অলঙ্কার শাস্ত্রে অবশ্য 'ব্যাজ' নামে কোন অলঙ্কার নাই। আছে ব্যাজোক্তি, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলঙ্কার। 'ব্যাজ' সেই সমস্ত অলঙ্কারের অনুগ্রাহক। ব্যাজের সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে শ্লেষ অলঙ্কারের। এই শ্লেষ শব্দশ্লেষ ও অর্থশ্লেষ—দুই ভাগে বিভক্ত। শব্দশ্লেষ শব্দালঙ্কারের পর্যায়ভুক্ত। অর্থশ্লেষ অর্থালঙ্কারের বিষয়। এই অর্থশ্লেষই প্রকৃতপক্ষে 'ব্যাজ'। এই অর্থশ্লেষ সম্পর্কেই ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—একই শব্দদ্বারা শব্দশক্তি-বলে দুইটি বস্তু প্রকাশিত হইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়—'বস্তুদ্বয়ে চ শব্দশক্ত্যা প্রকাশমানে স শ্লেষঃ' (ধ্বন্যালোক ২।২২)। আচার্য বিশ্বনাথ বলেন, এক বৃন্তে দুইটি ফলের ন্যায়, একই শব্দের বোঁটায় দুইটি অর্থের সমাবেশই শ্লেষ—'শব্দাভেদার্থদয়ো-রেকবৃন্তফলন্যায়েন শ্লেষঃ' (সাহিত্যদর্পণ ১০।৬৬৪ কারিকা)। ব্যাজে বাচ্যার্থটি প্রকাশ পায় শব্দের অভিধাশক্তিবলে, অপর অর্থটি প্রকাশ পায় লক্ষণাশক্তি বলে। সন্ধ্যা ভাষার অর্থ-প্রকটনে এইখানেই ব্যাজের সার্থকতা। অভিধেয় অর্থটির আবরণে ব্যাজ লক্ষ্যার্থের ইঙ্গিত বহন করে। এইদিক হইতে চর্যাটীকায় ব্যবহৃত 'ধ্যান' শব্দটির সঙ্গে 'ব্যাজ' এর সাদৃশ্য আছে। যেমন 'করুণাপিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল' ১২ নং গানের টীকায় টীকাকার বলিয়াছেন,

'দ্যূতক্রীড়া ধ্যানেন প্রকথয়ন্তি'। এখানে 'ধ্যান'-এর পরিবর্তে অনায়াসে 'ব্যাজ' ব্যবহার করা চলে।

আমরা অর্থশ্লেষকে ব্যাজ বলিয়াছি। শ্লেষের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাহা যেমন স্বতন্ত্রভাবে শ্লিষ্টাত্মক সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারে, তেমনই আবার অন্য অলঙ্কারের অঙ্গীভূত হইয়া তাহাকে চারুত্ব দান করিতে পারে। উপমা-রূপক প্রভৃতি সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারে অনেক স্থলে শ্লেষ গুণীভূত হইয়া উপমা-রূপককেই প্রাধান্য দেয়—ফলে শ্লেষোপমা, রূপকশ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ভব হয়। চর্যাগানেও ব্যাজ এইরূপে রূপকের সহকারিতা করিয়াছে। ১ নং গানের 'কাআতরু' ও ৩৮ সংখ্যক গানের 'কাঅণাবড়ি' প্রকৃতপক্ষে ব্যাজাশ্রিত রূপক।

গূঢ়ার্থের দ্যোতনায় ব্যাজ অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে 'গঙ্গাজউনা মাঝেরে বহই নাঈ' (১৪) গানটিতে। এখানে 'নৌকাপ্রবাহ'-ব্যাজে বা ছলে শুক্রনাড়িকার অন্তর্গত বোধিচিত্তকে মহাসুখপুরের উদ্দেশ্যে বাহিয়া লইয়া যাওয়ার সঙ্কেত। সঙ্কেতটিই অভিপ্রেত। কিন্তু তাহা গোপন করা হইয়াছে নৌকা বাওয়ার অপদেশে ('নৌকা-প্রবাহ ব্যাজেন'):

গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকা বহিয়া চলে। সেখানে বুড়ী মতঙ্গকন্যা পারাপার করে। (পারার্থী বলে), ওলো ডোমের মেয়ে, বেলা পড়িয়া আসিল, তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া চল। গুরুর কৃপায় আনন্দলোকে যাইব। পাঁচ দাড় পড়িতেছে, কাছিটি নৌকার পিঠে বাঁধা। সেঁউতি দিয়া জল সেঁচিয়া ফেল, যাহাতে ছিদ্রপথে জল না ঢোকে। চন্দ্র-সূর্যের চাকা আর পুলিন্দা (পাল) এই তিনই বিনষ্টির হেতু। ডাইনে বাঁয়ে না তাকাইয়া মাঝ সোতায় নৌকা চালাও। ডোমের মেয়ে কাড-বুড়ী নেয় না, অবহেলায় পার করে। যে এই নৌকায় উঠিয়া বাহিতে জানে না, সে কূলেকূলে ডুবিয়া যায়।

এখানে সমগ্র নৌবাহন ক্রিয়াটিই ব্যাজ। গঙ্গা, যমুনা, নৌ এইগুলি সন্ধ্যা শব্দ, গূঢ়ার্থে অন্য ভাবের প্রকাশক।

উৎপ্রেক্ষা: (চর্যাটীকায় সন্ধ্যা শব্দের প্রসঙ্গে কয়েকবার উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—'নাবীতি উৎপ্রেক্ষালঙ্কারপরং বোদ্ধব্যং' (৮)) 'কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ চিত্তগজেন্দ্র সন্ধ্যাভাষয়া তমেবার্থং উৎপ্রেক্ষয়ন্ত আহুঃ' (৯); 'অনাদি ভববাসনা পল্লবাশ্রয়ত্বাৎ ...স্বচিত্তং তরুত্বেন উৎপ্রেক্ষিতং' (৪৫)।

(উৎপ্রেক্ষা শব্দটির সাধারণ অর্থ অনবধান বা অন্যমনস্কতা—অর্থাৎ প্রকৃত

বিষয়টিকে না ভাবিয়া অন্য বিষয়ের ভাবনা।) আচার্য দণ্ডী এই অর্থেই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, চেতন বা অচেতন বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিকে অন্য প্রকারে ভাবনা করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয় (কাব্যাদর্শ ২।২১৮)। ইহা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ব্যাপক নির্বচন। উৎপ্রেক্ষা সাদৃশ্যমূল অলঙ্কার। উহা উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতির সগোত্র। কিন্তু সূক্ষ্ম পার্থক্যও অল্প নহে। উপমেয় ও উপমানের প্রতিযোগিতা লইয়াই সাদৃশ্যধর্মী অলঙ্কার গড়িয়া উঠে। উৎপ্রেক্ষায় সাদৃশ্যবশতঃ উপমেয়কে অধঃকরণ না করিয়া উপমানপক্ষে একটি সংশয়াত্মক অভেদ কল্পনা ('সম্ভাবনা') করা হয় ('ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনঃ'—সাহিত্যদর্পণ ১০.৭০৭)। এই কল্পনায় থাকে অবাস্তব চমৎকারিত্ব, যাহাতে বিস্ময়ে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইতে হয়। (উৎপ্রেক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাহাই—উৎ=ঊর্ধ্ব, প্রেক্ষা=দৃষ্টি।) অবশ্য উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার হইতে উৎপ্রেক্ষার পার্থক্য উপমেয়-উপমানের ভেদাভেদ কল্পনার পার্থক্যে। উপমায় উপমেয় ও উপমান সমানধর্মা, তুলনায় উপমেয়ের প্রাধান্য। রূপকে উপমেয়ে উপমানের আরোপ হেতু উভয়ে তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভিন্নাত্ম; কিন্তু একাত্ম হইলেও রূপক উপমান-প্রধান। অতিশয়োক্তি সর্বথা উপমানসর্বস্ব। (উৎপ্রেক্ষা রূপক ও অতিশয়োক্তির মধ্যবর্তী। উৎপ্রেক্ষায় উপমান উপমেয়কে অতিশয়োক্তির মত 'নীগীর্ণ' (গ্রাস) করে না, আবার রূপকের মত উপমেয়ের সহিত অভেদাত্মও হয় না। বরং উপমেয় হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক থাকিয়া প্রবল সাদৃশ্যহেতু একটি অবাস্তব সংশয় বা সম্ভাব্য তাদাত্ম্য কল্পনা করে।) দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া বলা চলে, উপমায় দ্বৈতবাদ, অতিশয়োক্তিতে কেবলাদ্বৈতবাদ, রূপকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং উৎপ্রেক্ষায় ভেদাভেদবাদ। (কিঞ্চিৎ ভেদ এবং সংশয়াত্মক অভেদ কল্পনাই ('সম্ভাবনা') উৎপ্রেক্ষার মূলীভূত বিষয়।) টীকাকারও উৎপ্রেক্ষার এই দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন। 'কাআ তরুবর' পদটির ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, 'কায়তরুবরত্বেন গৃহীতঃ'। পরক্ষণেই প্রশ্ন করিতেছেন, কায় চেতন বস্তু, তরু অচেতন, 'নমু অচেতনত্বাৎ কথং কায়-তরুবরঃ'? তৎপরেই আবার তিনিই উত্তর দিতেছেন, 'নৈষ দোষঃ'। কারণ, শাস্ত্রকারেরাও 'উৎপ্রেক্ষালঙ্কারপরৈঃ কিঞ্চিদ্‌ ভেদাধিষ্ঠানং হি সাদৃশ্যমুদীরিতং' - উৎপেক্ষাঅলঙ্কারে কিঞ্চিৎ ভেদ সত্ত্বেও সাদৃশ্যের কথা বলিয়া থাকেন।

এই অর্থেই চর্যা গানে আসিয়াছে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। (৯ সংখ্যক গানে 'চিত্তগজেন্দ্রের উৎপ্রেক্ষা। এখানে পদকর্তা স্বয়ং চিত্তগজেন্দ্রের স্থান অধিকার করায় গজেন্দ্রের উৎপ্রেক্ষা কোন স্থলে বাধিত হইয়াছে, কোন স্থলে উপমান উপমেয় চিত্তের ধর্মে অধিবাসিত হওয়ায় তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'মণতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা' ৪৫) গানটিতে 'স্বচিত্তং তরুত্বেন উৎপ্রেক্ষিতং'। কিন্তু এ গানটিতেও 'মণতরু' উৎপ্রেক্ষার পরিবর্তে রূপক-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি মনের অঙ্গ পঞ্চইন্দ্রিয়, আশা, যথাক্রমে তরুর অঙ্গ শাখা, পত্র ও ফলের রূপণায় সাঙ্গরূপকের আকার ধারণ করিয়াছে। চর্যার উৎপ্রেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপকাশ্রিত।

উৎপ্রেক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য বিশেষরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে 'সোণে ভরিতী করুণা নাবী' (৮) গীতটিতে। এখানে 'করুণা' সন্ধ্যাশব্দটি 'নাবী' (নৌকা) রূপে উৎপ্রেক্ষিত। 'করুণা' উপমেয়; 'নাবী' উপমান। উভয়ের তাদাত্ম্য থাকিলেও করুণা ও নৌকা অভিন্ন হইয়া যায় নাই, বরং একাত্মতা সম্পর্কেই উপমান নৌকা বাস্তব নৌকা হইতে পৃথক হইয়া অসম্ভব কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়াছে।) বিশ্লেষণ মুখে দেখা যায়—

> নৌকা সোনায় ভরা। রূপা রাখিবার স্থান নাই। এই নৌকা গগন-সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বাহিতে হইবে। খুঁটি উপড়াইয়া কাছি খোলা হইল। পথে চলিতে চারিদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কেড়ুয়াল ছাড়া নৌকা বাওয়া যায় না। বাম-দক্ষিণ চাপিয়া মধ্য সোতায় নৌকা চালনা করিতেই পথে মহাসুখের সঙ্গ পাওয়া গেল।

এখানে উপমেয় 'করুণা'কে নিশ্চিত গ্রাস না করিয়াও উপমান নৌকার সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত। 'করুণা'র সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্যহেতু নৌকাবিষয়ে অসম্ভব কল্পনার দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। (বাস্তব নৌকা সোনায় ভরা থাকে না, এ নৌকা সোনায় ভরা, বাস্তব নৌকা গগনের উদ্দেশ্যেও ছোটে না, এ নৌকা গগন সমুদ্রের দিকে পাড়ি দেয়। উপরন্তু ঠিক মত বাহিতে পারিলে এই নৌকা জন্মান্তর নিরোধক মহাসুখের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেয়।

এইখানেই উৎপ্রেক্ষার চমৎকারিত্ব ও সার্থকতা। আর এই চমৎকারিত্ব সৃষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছে সন্ধ্যা শব্দের গূঢ়ার্থ দ্যোতনার শক্তি।)

শুধু ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা নহে, চর্যাগীতিতে সন্ধ্যাশব্দের লক্ষণাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া রূপক, অতিশয়োক্তি ও বিরোধ অলঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে—

(i) **রূপক ঃ** চর্যাগানে সন্ধ্যা শব্দের গুণবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া রূপক অলঙ্কার গঠিত হইয়াছে। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, রূপকাশ্রয়েই অনেক ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা সিদ্ধ হইয়াছে। 'করুণা নাবী' (৮), 'মুসা পবণা' (২১)—এগুলি প্রকৃত পক্ষে রূপক। বিশ্বনাথ বলেন, বিষয়কে (উপমেয়কে) অধঃকরণ না করিয়া ('অনিগীর্ণ') যেখানে বিষয়ী (উপমান) দ্বারা আরোপ প্রথায় বিষয়-বিষয়ীর তাদাত্ম্য প্রতীতি হয়, তাহা সারোপা লক্ষণা। এই সারোপা লক্ষণা রূপক অলঙ্কারের বীজ ('ইয়মেব রূপকালঙ্কারস্য বীজম্'—সাহিত্যদর্পণ, ১০. ২৮)। চর্যাগীতিতে সাঙ্গরূপক, পরম্পরিত রূপক এবং রূপকের আধিকারিক প্রয়োগের বিবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুয়াল' (৩৮)—সাঙ্গরূপকের ও 'সুণবাহ তথতা পহারী', (৩৬) পরম্পরিত রূপকের দৃষ্টান্ত। চর্যায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হইয়াছে রূপকের আধিকারিক প্রয়োগে। এইদিক হইতে—'তিনিএঁ পাটে লাগেলিরে অণহা' (১৬) গানটিতে 'চীঅ-গঅন্দা'—চিত্ত গজেন্দ্রের রূপকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গজেন্দ্রের গুণবৃত্তি মদমত্ততা এবং তাহার ফলে স্তম্ভমর্দন, শৃঙ্খলভঙ্গ, এবং নির্বাণ-সরোবরে প্রবেশপূর্বক 'মহারস' পানের রূপক সমগ্র গানে চিত্তপ্রমোদকর সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়াছে। এইদিক হইতে কৃষ্ণাচার্য-পাদের 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ' গানটিও (৯) উল্লেখযোগ্য। এখানে 'চিত্তগজেন্দ্র' সন্ধ্যাভাষা। কাহ্নুই এখানে চিত্ত-গজেন্দ্রের রূপকে রূপিত। গজেন্দ্রের ধর্ম 'আসবমত্ততা' এখানে কৃষ্ণাচার্যের চিত্তে আরোপিত। এইভাবে সন্ধ্যাশব্দের সারোপা লক্ষণা-বৃত্তি গানগুলির অঙ্গে সত্যই অপূর্ব সৌন্দর্য সঞ্চার করিয়াছে।

(ii) **অতিশয়োক্তি ঃ** চর্যাগীতির অপর অলঙ্কার রূপকাতিশয়োক্তি। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে উপমান উপমেয়কে গ্রাস করিয়া ফেলে। এখানে উপমানই উপস্থিত থাকে, উপমেয় অনুপস্থিত। উপমান যে লক্ষণাশক্তি বলে এই ব্যাপারটি ঘটায়, তাহাকে বলা হয় 'সাধ্যবসানা লক্ষণা'। সাধ্যবসানা=স অধ্যবসানা। বিষয়কে নিগীর্ণ (অধঃকরণ বা গ্রাস) করিয়া বিষয়ী দ্বারা (উপমান দ্বারা) যে অভেদ প্রতীতি—তাহাকে বলে অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায় যেখানে সিদ্ধ, তাহা সাধ্যবসানা। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের বীজ এই ধরনের লক্ষণা। চর্যাগীতির—'কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস' (৬) গানটিতে 'হরিণা' ও 'হরিণী' সন্ধ্যাশব্দ দুইটি দিয়া সিদ্ধ অধ্যবসায়ের পথে চমৎকার অলঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে। চর্যাটির বহিরঙ্গ অর্থ এইরূপ—

কি লইয়া, কি ছাড়িয়া, কেমন করিয়া আছ ? চারিদিকে বেড়া হাক-ডাক। নিজের মাংসে হরিণা নিজের শত্রু। ভুসুকু ব্যাধ হরিণাকে ছাড়ে না। হরিণা তৃণ ভক্ষণ করে না, জল পান করে না। হরিণীর নিলয় কোথায়, তাহাও জানে না। (এমন সময়) হরিণী (নিজেই আসিয়া) বলিল, হরিণা শোন, এ বন ছাড়িয়া পলায়ন কর। (এই কথা শুনিয়া) হরিণা ত্রস্ত-ব্যস্তে এমনভাবে ছুটিল যে, তাহার খুর দেখা যায় না।

এখানে হরিণা ও হরিণী উপমান, উপমেয় যথাক্রমে সংবৃত্তি বোধিচিত্ত ও জ্ঞানমুদ্রা ; উহারা সম্পূর্ণ গ্রস্ত। কিন্তু হরিণার মোহ, দেহমাংসের প্রতি মায়া, ব্যাধের আক্রমণজনিত ভীতি, অজ্ঞানতা এবং হরিণীর আবির্ভাবে ভ্রান্তির নিরসন প্রভৃতি লক্ষ্যার্থ দ্বারা উপমেয় সংবৃত্তি চিত্তের সঙ্গে অভেদপ্রতীতি অতি স্পষ্ট। সন্ধ্যাশব্দের লক্ষণাবৃত্তিই এই কাব্যশোভাকর সৌন্দর্যের হেতু।

(iii) **বিরোধ** ঃ সন্ধ্যাশব্দের অর্থশ্লেষ দ্বারা চর্যাগানে অপর যে অলঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা বিরোধ বা বিরোধাভাস। সন্ধ্যাভাষায় রচিত ২ এবং ৩৩ সংখ্যক গীতিতে বিরোধ বা বিরোধাভাস অলঙ্কারের বাহুল্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ সুকুমার সেন ২ সংখ্যক চর্যাকে বলিয়াছেন, অসম্ভব ঘটনামূলক 'প্রহেলিকা দ্বারা রচিত' নিষ্প্রপঞ্চচর্যা এবং ৩৩ সংখ্যক চর্যাকে বলিয়াছেন, 'বিশুদ্ধ প্রহেলিকা চর্যা'। প্রহেলিকায় অসম্ভব সংঘটনা থাকিলেও উহার প্রস্তুতাঙ্গে থাকে একটি প্রশ্ন। ধর্মদাসের বিদগ্ধমুখমণ্ডন গ্রন্থেও প্রহেলিকার এই 'প্রশ্নের' উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমেও প্রহেলিকাকে বলা হইয়াছে 'দুর্বিজ্ঞানার্থঃ প্রশ্ন'। প্রশ্ন প্রহেলিকার প্রধান অঙ্গ। প্রস্তুত প্রশ্নের অপ্রস্তুত উত্তরটি বুদ্ধি দ্বারা নিরূপণ করিতে হয়। ২ বা ৩৩ সংখ্যক চর্যায় কোন প্রশ্ন নাই, আছে অসম্ভব বিরুদ্ধ উক্তির বিন্যাস। উহাকে প্রহেলিকা না বলিয়া, বিরোধ বা বিরোধাভাস বলাই যুক্তিসঙ্গত।

জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়ার পরস্পর বিরোধী সমাবেশ দ্বারা যেখানে আপাত-বিরোধের ঈষৎ ভাসন ঘটে, তাহাই বিরোধ বা বিরোধাভাস অলঙ্কার। আচার্য দণ্ডীর মতে বিরোধসাধনের উদ্দেশ্যে যেখানে বিরুদ্ধ পদার্থের সংসর্গ হয়, তাহা বিরোধ (কাব্যাদর্শ ২/৩২০)। বিরোধটি আপাত, শ্লিষ্টার্থ বিচারে বিরোধের সমাধান হয়। আচার্য সুধীরকুমার বলেন, 'ইহা এক প্রকার ছল আঘাত, অকস্মাৎ বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া ঘনীভূত রূপের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' (কাব্যশ্রী)।

চর্যার এই অংশগুলি বিরোধাভাসের সুন্দর উদাহরণ :

(ক) 'দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই' (২)

—দুরা (কচ্ছপ) দোহন করিয়া, দোহনজাত দুগ্ধ পাত্রে ধরে না।—এখানে দ্রব্যের সহিত জাতির বিরোধ। দুলির দুগ্ধই হয় না। কিন্তু 'দুলি' এখানে 'মহাসুখকমল'; উৎপত্তিক্রমে সেই কমল হইতে প্রাতিভাসিক বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়। বালযোগিরা সে বোধিচিত্তকে ধারণ করিতে পারে না। এই তাৎপর্যার্থে বিরোধের সমাধান।

(খ) দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভায়।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ (২)

—দিনের বেলায় বধুটি নিজের দেহছায়া (কাড়) দেখিয়া ভয় পায়, রাত্রিতে সে কামরূপ যায়। দিনের বেলার ভীরু বধূ রাত্রিতে দুঃসাহসিকা। এখানে গুণ ও ক্রিয়ার বিরোধ। কিন্তু এই বধূ সামান্য বধূ নহেন। ইনি পরিশুদ্ধাবধূতিকা। ইনি একদিকে সংবৃত্তি সত্য উৎপন্ন করিয়া কায়কালপুরুষের ভয়ে ভীতা হন, আবার প্রজ্ঞাজ্ঞানে সেই বিকল্পকে ধ্বংস করিয়া নির্বিকল্প মহাসুখস্থানে গমন করেন। অবধূতিকার এই মহিমা স্মরণে বিরোধের অবসান।

৩৩ সংখ্যক গানের 'বেংগ সংসার বড্‌ঢিল জাঅ', 'বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে,' 'জো সো চৌর সৌ দুষাধী', 'নিতি নিতি ষিআলা ষিহেঁ ষম জুঝঅ'—উক্তিগুলিও বিরোধাভাসের আপাত বিস্ময় এবং শ্লিষ্টার্থে বিস্ময়ের সমাধানে চিত্ত-চমৎকারী।) তাই বলিতেছিলাম, সন্ধ্যাশব্দগুলি অশ্লীল নহে, ইহাদের ভিতর এমন একটি শক্তি আছে, যাহাকে বীজরূপে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানানন্দসুন্দর সিদ্ধ সাধকগণ সহৃদয়ের আহ্লাদকর কাব্যালঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন।

[শব্দালঙ্কার যমক-অনুপ্রাসের আলোচনা 'চর্যাগীতির ছন্দ' অংশে দ্রষ্টব্য]

চর্যার গীত-লক্ষণ

বৌদ্ধ সাধকদের 'চর্যাচয়' গানের আকারে লিখিত। টীকাকার মুনিদত্ত এগুলিকে 'গীতি'ই বলিয়াছেন। চর্যাকারেরাও এগুলিকে বলিয়াছেন গান,—

১. অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএ গাইউ—২

২. কাহ্নে গাইউ কামচণ্ডালী—১৮

৩. ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝই—৩৩

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর সঙ্গীত শাস্ত্রে 'চর্যা' একটি বিশিষ্ট ধরনের গীতরূপে

স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' মতে—চর্যাগান পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত, পাদান্তে অনুপ্রাস-যুক্ত, অধ্যাত্মবাচক পদে নিবদ্ধ এবং দ্বিতীয়াদি তাল সমন্বিত। পূর্ণ (ছন্দপূর্ত) ও অপূর্ণ ভেদে চর্যা দুই প্রকার। তাহা ছাড়া, সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবা ভেদেও ইহার দুইভাগ।[১] আমাদের আলোচ্য চর্যাগুলিও এই লক্ষণে লক্ষণান্বিত।

আবিষ্কারক শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, গানগুলি 'কীর্তনেরই পদ...সেকালেও সঙ্কীর্তন ছিল'—মনে হয়, তিনি 'কীর্তন' 'সঙ্কীর্ত্তন', শব্দগুলি ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তীকালের সঙ্গীতজ্ঞগণের অনেকে এগুলিকে ঠিক কীর্তনাঙ্গের গান বলিয়া মনে করেন না। তবে সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ চর্যা গানগুলিকে 'শাস্ত্রীয় অভিজাত সঙ্গীত-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত' বলিয়া মনে করেন (পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস)।

সঙ্গীতশাস্ত্র মতে সঙ্গীতের দুইটি প্রধান অঙ্গ—ধাতু ও মাতু—'ধাতুমাতু সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার' (ভক্তি রত্নাকর)। 'ধাতু' গীতের রাগাদি অবয়ব এবং মাতু' তাল-মানাদি বিষয়। বস্তুতঃ রাগ ও তাল লইয়াই গান। চর্যাকারেরা রাগ-রাগাঙ্গ-কোবিদ্, তালজ্ঞ এবং প্রবন্ধগাননিষ্ণাত। প্রত্যেকটি চর্যার প্রারম্ভে, কোন্ রাগে গানটি গাহিতে হইবে, তাহার উল্লেখ আছে। এই রাগ মালব-ভৈরবাদি ছয় পুংরাগ নহে, তাহা ছত্রিশ (বা ত্রিশ) রাগিণীর অন্তর্গত স্ত্রী-রাগিণী। রাগিণীগুলির নামে কিছুটা বানান-বিভ্রাট থাকিলেও নামগুলি শাস্ত্রীয়। বিভিন্ন চর্যাগানে 'রাগ' নামে এই রাগিণীগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়:—পটমঞ্জরী (১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬), গবড়া (২, ৩), গউড়া (১৮), অরু (৪), গুর্জরী বা গুঞ্জরী (৫, ২২, ৪৭), দেবক্রী (৮), দেশাখ (১০, ৩২), ভৈরবী (১২, ১৬, ১৯, ৩৮), কামোদ (১৩, ২৭, ৩৭, ৪২), রামক্রী (১৫, ৫০), বরাড়ী (২১, ২৩, ৩৪, বলাড্ডি—২৮), ধানসী (১৪), মল্লারী (৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯), মালসী (৩০), শবরী (৪৬) বা শীবরি (২৬), বঙ্গাল

পদ্ধড়ী প্রভৃতি চ্ছন্দাঃ পাদান্ত প্রাসশোভিতাঃ।
অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্ দ্বিতীয়াদি তালতঃ॥
সা দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত্যা পূর্ণা পূর্ণাত্বপূর্তিতঃ।
সমধ্রুবা চ বিষমধ্রুবে ত্যেবা পুনর্দ্বিধা॥
(স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'পদাবলী কীর্ত্তনের ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত)

(৪৩)। দুইটি গানে পাওয়া যায় মিশ্র রাগের উল্লেখ—মালসী-গউড়া (৪০) ও কহ্নু-গুঞ্জরী (৪১)।

তিব্বতী অনুবাদ হইতে লুপ্ত গানগুলির যে রাগ-নাম পাওয়া যায়, তাহাতে কিছু প্রমাদ আছে : নামগুলি এই—ইন্দ্রতাল (২৪); গীতি (২৫), পটহ (৪৮) 'গীতি' বলিতে গানকেই বোঝায়; 'ইন্দ্রতাল' সম্ভবতঃ কোন তালের নাম এবং 'পটহ' বাদ্যযন্ত্রের নাম। মনে হয়, গানগুলি বিশিষ্ট রাগে, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বিভিন্ন তালে গান করা হইত, সঙ্গে চলিত নৃত্য। বিভিন্ন চর্যায় ঘণ (=ঘন কাংস্য বা কাষ্ঠ বাদ্য বিশেষ ১৬), ডমরু (১০), পড়হ-মাদলা (=পটহ ১৯), বীণা (১৭) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। তালের গুরুত্ব যে ছিল, তাহার প্রমাণ 'ঘন' জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। তালের নিয়ামক মাত্রাসমষ্টি ও ছন্দ। চর্যাগানে অধিকাংশ চরণেই মাত্রাধিক্য বা মাত্রাল্পতা দেখা যায়। তালদ্বারা দ্রুত উচ্চারণে বা টানে মাত্রাসংখ্যা ঠিক করা হইত। শুধু তাহাই নহে, অনেক গানে দেখা যায়, দুই বা ততোধিক ভিন্ন ছন্দের সমাবেশ। এই ছন্দবদল গীতে তাল ফেরতার কাজ করিত। মাত্রার ন্যূনতা অলঙ্কার-সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত স্বরের গমকে। অনেক গানে 'রে' সম্বোধন-বাচক অব্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে উহা একদিকে তাল-স্থান নির্দেশ করিয়া দিত, অন্যদিকে গীতকে করিয়া তুলিত গীতালঙ্কার সমৃদ্ধ। মাত্রা-নির্দেশে চর্যালিপি যেন অনেকস্থলে স্বরলিপির প্রতীক। বাংলা উচ্চারণে ই-ঈ, উ-উ—এর উচ্চারণ এক প্রকার। চর্যার অনেকগুলি ভুল বানান হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রার নিরূপক, যেমন—চঞ্চল চীএ[২] (১) মারমি ডোম্বী[২] (১০), ভান্তী[২] পুচ্ছতু (৪১), লুই ভণই (১) প্রভৃতি। চর্যাকার যেন ইচ্ছা করিয়াই হ্রস্ব স্থলে দীর্ঘ লিখিয়া মাত্রা স্থির করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র মতে গীত অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। যে গান শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর আলাপ, তাহা অনিবদ্ধ—'অনিবদ্ধ রাগালাপরূপী নিরূপয়' (ভক্তি রত্নাকর) কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগালাপে অনিবদ্ধ গানের মূর্ছনা সৃষ্টি হয়। যে-সকল গান অর্থযুক্ত পদসংযোগে অবয়বযুক্ত হয়, তাহা নিবদ্ধ সঙ্গীত। ভক্তিরত্নাকর-কার বলেন, 'ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হইলে নিবদ্ধাখ্য হয়'। ধাতু বা সঙ্গীতাবয়বকে তিন, চার বা পাঁচটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রধান ভাগ তিনটি : উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ। গীতের প্রথম পদকে বলা হয়, 'উদ্‌গ্রাহ', মধ্যভাগকে বলা হয় 'ধ্রুব' ('ধ্রুবস্বাচ্চ ধ্রুবো মধ্য') এবং শেষভাগকে বলা হয় 'আভোগ'। আভোগ অংশে থাকে

কবির নাম বা ভনিতা—'আভোগে কবি নাম স্যাৎ।' কেহ কেহ আবার উদ্গ্রাহ ও ধ্রুবের মধ্যবর্তী 'মেলাপক' নামে একটি ভাগ এবং ধ্রুব ও আভোগের মধ্যবর্তী 'অন্তরা' নামে আর একটি ভাগকে স্বীকার করেন। চর্যা নিবন্ধাখ্য সঙ্গীত হইলেও উহাতে 'মেলাপক' অংশ নাই। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন, চর্যা ত্রিধাতুক প্রবন্ধ জাতীয় গান: 'উদ্গ্রাহক ধ্রুব ও আভোগ—এই তিন ধাতুর ব্যবহারে সমগ্র গান বা গীতির প্রকাশ হোত বলে চর্যাপদকে (চর্যা প্রবন্ধ গানকে) ত্রিধাতুক বলা হোত' (পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস)।

চর্যাগীতির রূপ বা গঠনপদ্ধতি বিচার করিলে কিন্তু দেখা যায়, অধিকাংশ গান পঞ্চপদী—অর্থাৎ পাঁচটি পদে বা দশটি চরণে সমাপ্ত। দুই চরণের একটি শ্লোককে বলা হয় 'পদ'। কেবল কয়েকটি চর্যায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ১০, ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক চর্যা সপ্তপদী বা চোদ্দ চরণের গান; ২১ ও ২২ সংখ্যক চর্যা ষট্‌পদী (১২ চরণ); ৪৩ সংখ্যক গানে চারিটি মাত্র পদ অর্থাৎ আটটি চরণ; ২৩ সংখ্যক গান অসম্পূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক বন্ধুবর ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বলেন, 'চর্যার মূল রচনা সমস্তই দশ চরণের।' তিনি অধিক চরণ বিশিষ্ট চর্যার অধিক চরণগুলি পরবর্তীকালের গায়কের বা ব্যাখ্যাকারের যোজনা বলিয়া মনে করেন ('বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি')। মন্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

গীতাবয়বের বিশিষ্ট অবয়ব 'ধ্রুবপদ'। গীতে যে পদটি বারবার আবৃত্ত হয়, তাহাই ধ্রুবপদ। চর্যাগীতিতে এই ধ্রুবপদের সন্নিবেশে বিশেষত্ব দেখা যায়। সঙ্গীতশাস্ত্র মতে গীতি 'সমধ্রুবা' ও বিষমধ্রুবা' ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে। যে সকল গানে দ্বিতীয় পদটিই মাত্র ধ্রুবপদরূপে গণ্য, তাহাকে বলা হয় 'বিষমধ্রুবা', আর যে সকল গানে সকল পদকে ধ্রুবপদ রূপে গণ্য করা হয়, তাহা 'সমধ্রুবা'।[১] সাধারণতঃ বিষমধ্রুবা গানেরই প্রচলন বেশী দেখা যায়। উহাতে প্রত্যেকটি পদ গান করার পরে ধ্রুবপদটি পুনরাবৃত্ত হয়। যেমন ডাকার্ণব তন্ত্রে (ত্রয়োবিংশপটল) সন্নিবিষ্ট বিষমধ্রুবা জাতীয় এই বজ্রগীতিটি—

পরমান্দি জগু মহাসুহ ভাই।
বিহরহু জুইণি চক্কু সহাই॥
অরি রিরি মোহপগু লোঅ ন জাই।
সহজ সুন্দরি লই মহাসুহ ঠাই॥

১. 'সমধ্রুবায় গানে সমগ্র পদের আবৃত্তি করা হোত। আর কেবল ধ্রুবাংশটি আবৃত্তি করে গাওয়া হলে তাকে বলা হোত অসম বা বিষমধ্রুবা' (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ)

তিহুঅণ সয়লহ বুদ্ধ সহাই।
করুণা জুবই রসহু সহাই ॥
আরাজ তুমি পরমাথু ন ভাবহু।
তে তুমি সহি বুদ্ধ তু ন বাচহু ॥
অরি ॥ ০ ॥

অস্ত বহুজিঅ ভিন্নলু জানহু।
লোঅহু সব্ ভট্ট উত্তরণু পুরহু ॥
অরি ॥ ০ ।

এখানে 'অরি রিরি'-বাচক পদটিই ধ্রুবপদ এবং উহাই পুনরাবৃত্ত।

কিন্তু চর্যাগীতির সবগুলিই 'সমধ্রুবা' জাতীয় গান। উহার প্রত্যেকটি পদকে ধ্রুবপদ রূপে গণ্য করা হইয়াছে। পুথিতে প্রত্যেকটি পদের পরে ॥ ধ্রু ॥ চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। যদিও টীকাকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পদটিকেই ধ্রুবপদ রূপে গণ্য করিয়াছেন এবং ধ্রুব পদটিকে সংখ্যায় চিহ্নিত না করিয়া, কোথায়ও বা কোন নির্দেশ না দিয়া প্রথম পদের সঙ্গেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তবু, ২৮ ও ৪৩ সংখ্যক গানের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, 'পদস্যোত্তরপদেন ধ্রুবপদং বোদ্ধব্যং' (যে-কোন পদের পরের পদটিকে ধ্রুবপদ বুঝিতে হইবে)। প্রাপ্ত চর্যা পুথিতে প্রত্যেকটি পদই ধ্রুবপদরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে এই ধরনের সমধ্রুবা জাতীয় গান বড় দেখা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। যদিও চর্যাগানে প্রত্যেকটি পদই ধ্রু-রূপে চিহ্নিত, তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়াছে গানের দ্বিতীয় পদে, যে পদটিকে টীকাকার ধ্রুবপদ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। যে ছন্দে সমগ্র গানটি রচিত, ধ্রুবপদে সে ছন্দ রক্ষিত হয় নাই। যেমন ১৬ সংখ্যক গান, উহা ২৪ মাত্রার দোহা, কিন্তু ধ্রুবপদ ১৬ মাত্রায় পাদাকুলক—

মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসে ঘোলই ॥

কোথায়ও বা এই দ্বিতীয় পদটি হইয়াছে ভঙ্গপদী, যেমন—

অকট হু ভব গঅণা।
বঙ্গে জাআ নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণানা ॥—৩৯.

গীতাবয়বের শেষাংশ 'আভোগ'। এই অংশেই কবির নাম বা ভনিতা থাকে। অধিকাংশ চর্যাগীতে শেষাংশেই ভনিতা আছে (চর্যা. ২, ৩, ৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৭, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭)। কিন্তু কতকগুলি চর্যাগানে দেখা যায়, কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে শুধু ধ্রুবপদে (৯, ১০, ১৪, ১৯, ৩৬, ৪৫, ৪৯)। কয়েকটি গানে আবার ভনিতা দেওয়া হইয়াছে দুইবার—ধ্রুবপদে ও শেষ পদে (১, ৫, ৬, ১১, ১২, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৪২)। আবার কয়েকটি গানে কবিনাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এলোমেলো ভাবে, দুই-এর অধিকবার ; শবরপাদের দুইটি গান (২৮, ৫০) ইহার এক উদাহরণ। অপর উদাহরণ কাহ্নপাদের ৭ ও ১৩ সংখ্যক গান ; ৭ সংখ্যক গানে প্রতিটি পদে কোন না কোন রূপে 'কাহ্ন' প্রসঙ্গ অসিয়াছে। দারিকপাদের ৩৪ সংখ্যক গানটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ; উহাতে পাঁচটি পদের ভিতর 'দারিক' আছেন চারিটি পদে। ভুসুকুপাদের ২৩ সংখ্যক গান অসম্পূর্ণ ; প্রাপ্ত তিনটি পদের ভিতর প্রথম দুই পদে ভুসুকু আছেন। কম্বলাম্বরপাদের গানে (৮) 'কামলি' রহিয়াছেন ধ্রুবপদে ও তৃতীয় পদে। ১৭ সংখ্যক গানে প্রত্যক্ষভাবে 'বীণাপাদ' কবির নাম নাই—শুধু ধ্রুবপদে 'বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা' বাক্যটি আছে। উহাতে প্রচ্ছন্নভাবে হয়তো কবির নাম আছে ; টীকাকারও তাই বলেন, 'বীণাপাদাঃ বীণা শব্দদ্বারেণ প্রতিপাদয়ন্তি'। ভনিতার প্রয়োগে চর্যাগানে শাস্ত্রবিধির আনুগত্যও আছে, লঙ্ঘনও আছে।

চর্যাগীতির রাগ-নাম ও গঠন-শৈলীতে কিছু কিছু শাস্ত্রীয় লক্ষণ থাকিলেও, নিয়মভঙ্গ বা স্বাধীনতাও ছিল। তৎকালে শাস্ত্রনির্দিষ্ট অভিজাত গীতের পাশাপাশি যে গ্রাম-গীতিও প্রচলিত ছিল, গোবর্ধন আচার্যের আর্যা সপ্তশতী গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়। সে গীতি ছিল অপূর্ব মাধুর্য পূর্ণ। অপভ্রংশ ভাষায় একদিকে ছিল দ্বিপদীখণ্ড, চর্চরী জাতীয় মার্গ সঙ্গীত, অপরদিকে ছিল গ্রাম-গীতি। বিশেষতঃ ভাব-প্রধান গান ছিল প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষারই বিশিষ্ট সম্পদ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ধ্রুবাধ্যায়ের গীত-দৃষ্টান্তগুলি প্রাকৃত ভাষার, সংস্কৃত নাটকের গান প্রাকৃত ভাষার, বিক্রমোর্বশী নাটকের গানের ভাষা অপভ্রংশ। গোবর্ধন আচার্য বলেন, অপভ্রংশ ভাষার গীত অতি মধুর (আর্যা ২১৫)। অপভ্রংশ ভাষা প্রাকৃত জনের মুখের ভাষা। তাহাতে লোক-গীতির প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। চর্যার সমস্ত অয়োজন লোকজগতকে কেন্দ্র করিয়া।

কাজেই চর্যাগীতেও যে লোক-সংগীতের প্রভাব পড়ে নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। চর্যাগানে ভনিতা সন্নিবেশে, ধ্রুবপদের বিন্যাসে এবং একই গানে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগে বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। ইহা লোক-সঙ্গীতের স্বাধীনতার কথাই মনে করাইয়া দেয়। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞগণ বলেন, লোকগীতি স্বতঃস্ফূর্ত—শাস্ত্রীয় বিধির আনুগত্য তাহাতে তেমন থাকে না। "শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যেমন হৃদয় ও বুদ্ধির একত্র সমন্বয়, বুদ্ধি ও অনুশীলনের দ্বারা তাহাতে যেমন বৈচিত্র্য সাধন করা হয়, লোকসঙ্গীত তেমনই নিছক হৃদয়াবেগের ব্যাপার।" (সঙ্গীত পরিচিতি : শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়)।

চর্যা গানগুলিও হৃদয়াবেগের সৃষ্টি। উহা ভাব-প্রধান। নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে, লৌকিক উৎসবাদির সঙ্গে উহাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। চর্যার নিসর্গ-পট বঙ্গপ্রকৃতি, বর্ষায় যেখানে নদী গহন-গম্ভীর, বসন্তে মুকুলিত 'নানা তরুবর', পরিপক্ক 'কঙ্গুচিনা', সামাজিক উৎসবে যেখানে বিবাহে উত্থিত হয় 'জঅ জঅ' (উলুজোকার) শব্দ, মিলনে গাওয়া হয় 'সঙ্গায়ন মঙ্গল' (মিলনের গান)। কাজেই চর্যাগীতিতে নৈসর্গিক প্রকৃতির সঙ্গে যে স্বাধীন হৃদয়ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত মিলন ঘটিবে, ইহাই স্বভাবসঙ্গত। চর্যাগানে লোকগীতির প্রভাব আছে।

চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি

বুদ্ধদেব স্বয়ং নৃত্য-গীতের বিরোধী ছিলেন। সে নৃত্যগীত লৌকিক আমোদ-প্রমোদ—কবিগান, পাণিস্বর, রঙ্গাভিনয় প্রভৃতি। কিন্তু বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে নৃত্য-গীতের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাঞ্জুর গ্রন্থতালিকা হইতে নানাপ্রকার গীতির নাম পাওয়া যায় : চর্যাগীতি, বজ্রগীতি, ডাকিনী বজ্রগুহ্য গীতি, কাপেরি গীতি প্রভৃতি। কাহ্নপাদের একটি গানে পাওয়া যায় 'কামচণ্ডালী' নাম—'কাহ্নে গাইউ কামচণ্ডালী'—১৮। মনে হয়, বিষয়বস্তু ও পরিবেশভেদে গীতির প্রকারভেদ ছিল। কাহ্ন-কথিত 'কামচণ্ডালী' প্রকৃতপক্ষে 'কর্মস্থ সাধনোপায় চণ্ডালী' অর্থাৎ কর্মমুদ্রাসহ চণ্ডালী প্রজ্জ্বলন বিষয়ক চর্যা।

গীতির প্রধানতঃ ছিল দুইটি ভাগ : চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি। কিন্তু এই দুই প্রকার গীতের সূক্ষ্ম ভেদরেখাটি যে কি, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর।

১৭ সংখ্যক চর্যায় নৃত্য-গীতের একটি চিত্র পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, বজ্রধর নৃত্য করিতেছেন এবং তাঁহার যোগিনী গান করিতেছেন.—

> নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
> বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥

টীকায় এই নৃত্যকে বলা হইয়াছে 'বজ্রপদ নৃত্যং' এবং গীতকে বলা হইয়াছে 'বজ্রগীতিকা' [বীণাপাদা বজ্রধর পদেন নৃত্যং ('বজ্রপদনৃত্যং') কুর্বন্তি তেষাং দেবী যোগিনী নৈরাত্মাদিকা বজ্রগীতিকয়া সঙ্গায়নমঙ্গলং কুর্বন্তি)। এই নৃত্য-গীত যে সংসারদুঃখ উপশমের কারণ. 'বিসমা' শব্দ দ্বারা তাহাও আভাসিত হইয়াছে— 'বুদ্ধ নাটকং বিশিষ্টাধিমাত্রং সত্ত্বানাং শমং নির্বাণং ভবতি'—টীকা।

বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে কিছু গীতের সমাবেশ দেখা যায়। এই তন্ত্রগুলি ভগবান্ বজ্রধর ও বোধিলাভেচ্ছু কোন শিষ্য বা নৈরাত্মা যোগিনীদের কথোপকথনছলে লিখিত। তন্ত্রবাক্য ভগবান্ বুদ্ধেরই বাক্য। 'এবং ময়া শ্রুতং'—এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য সহ উহা বজ্রী বুদ্ধের বাণীরূপেই সঙ্কলিত। এই সকল তন্ত্রে স্তব-স্তুতিরূপে কিছু গীতের সমাবেশ দেখা যায়। যেমন. শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্রের বোধিচিত্ত পটলে (দ্বিতীয় পটল) মৈত্রেয় প্রমুখ মহাবোধিসত্ত্বগণের এই স্তুতি। স্তবটি সংস্কৃতে—

অহো বুদ্ধ অহো ধর্ম অহো সঙ্ঘস্য দেশনা।
শুদ্ধ তত্ত্বার্থ শুদ্ধার্থ বোধিচিত্ত নমোঽস্তুতে।

ধর্ম নৈরাত্মাসম্ভূত বুদ্ধবোধি প্রপূরকঃ।
নির্বিকল্প নিরালম্ব বোধিচিত্ত নমোঽস্তুতে।'

সমন্তভদ্র সত্ত্বার্থং বোধিচিত্ত প্রবর্তক।
বোধিচর্য মহাবজ্র বোধিচিত্ত নমোঽস্তুতে ॥

চিত্তং তাথাগতং শুদ্ধং কায়বাক্‌চিত্ত বজ্রধৃক্।
বুদ্ধবোধি প্রদাতা চ বোধিচিত্ত নমোঽস্তুতে ॥

অপভ্রংশ ভাষায় গ্রথিত গানগুলি আরও তাৎপর্যবোধক। তান্ত্রিক ক্রিয়া বা চর্যার নির্দেশরূপে কিংবা মণ্ডল-উদ্বোধনের প্রেরণারূপে এই সকল গান গীত হইত। *প্রায়ই দেখা যায়, চরমতত্ত্বের কথা বলিতে বলিতে স্বয়ং বজ্রধর, কিংবা গূঢ়তত্ত্বের সংবাদ শুনিতে শুনিতে যোগিনীগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। তখন এই গীত গাহিয়া মূর্চ্ছিতের মূর্চ্ছাভঙ্গ করা হইত। যেমন হেবজ্রতন্ত্রের দ্বিতীয়কল্প চতুর্থ পটলের এই গান :

ক্ষিতিজল পবন হুতাশন তুহ্মে ভাইনী দেবী।
সুনহ পবঞ্চমি ততুম্ আহ্ম জো ণ জানই কোবি ॥

[বজ্রী যোগিনীদেহের তত্ত্ব-স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলে যোগিনীগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; তখন বজ্রী এই গান গাহিয়া তাঁহাদের স্তব করিলেন—হে ভাবিনী দেবী, তোমরাই যে প্রপঞ্চ সৃষ্টিতে ক্ষিতিজল-পবন হুতাশন, এ তত্ত্ব কেহই জানে না]

তন্ত্রে এই সকল গীতিকে বলা হইয়াছে 'বজ্রগীতি। যেমন,

কোল্লইরে ঠিঅ বোলা মুম্মুণিরে কক্কোলা।
ঘণ কিবিড় হো বাজই করুণেকি অইসন রোলা ॥

হেবজ্র তন্ত্রে এই গীতটির প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, বজ্রগীত দ্বারা স্থির স্মৃতিযোগ রক্ষিত হয় ; ইহা দ্বারা প্রবাহ-অভ্যাস সিদ্ধ হয় ; ইহাই গণরক্ষা ও আত্মরক্ষার উপায় ; ইহা দ্বারা লোক বশীভূত হয় এবং মন্ত্রজাপে সিদ্ধি লাভ করা যায়।[১] ডাকার্ণবতন্ত্রে বলা হইয়াছে, এই বাক্যগুণ শ্রবণে সত্ত্বার মুক্তি ভাবনা হয়— 'শ্রুত্বা বাক্যগুণা হ্যেবং ভাব্যতে সত্ত্ব মোচনং' (প্রথমপটল), এই মহাগীতি শ্রবণে যোগিচক্র প্রবুদ্ধ হয়—'ইদং শ্রুত্বা মহাগীতং প্রবুদ্ধং যোগিচক্রকং' (তৃতীয় পটল), এই গীতিকাধ্বনি দ্বারা মণ্ডল-চক্র নিষ্পন্ন হয়—'নিষ্পন্নং মণ্ডলং চক্রং গীতিকাধ্বনিভিঃ সদা' (পঞ্চদশ পটল)।

এই সকল সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া আচার্য ডঃ সুকুমার সেন চর্যাগীতি ও বজ্রগীতির এইরূপ পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন, 'চর্যাগীতি উৎসবে ও অবসর বিনোদনে গাওয়া হইত—বজ্রগীতি গাওয়া হইত গুহ্য যোগকর্মে ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, 'মণ্ডলচক্রে' আনুষ্ঠানিক স্তবগান রূপে। যোগিনীচক্র অনুষ্ঠানে বজ্রগীতি গাহিয়া বজ্রসত্ত্ব হেরুককে জাগানো হইত। বজ্রগীতিও গান, তবে তাহাতে চর্যাগীতির মত ভণিতা নাই। অর্থাৎ এ রচনা যেন কোন ব্যক্তি-বিশেষের নয়। মন্ত্রের মত অপৌরুষেয়। ভাষা বাঙ্গালা নয়, তবে কাছাকাছি অবহট্ঠ।'' (চর্যাগীতি পদাবলীর ভূমিকা)

চর্যাগীতি 'অবসর বিনোদনে' গাওয়া হইত বলিয়া মনে হয় না। এগুলি 'অবকাশ রঞ্জিনী' নহে, ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ আচার্যগণ সত্যদ্বয়ের ভ্রান্তিতে নিমগ্ন অশরণজনের জন্য চর্যাগান রচনা করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেকটি চর্যায় এ ইঙ্গিত রহিয়াছে। আচার্য মুনিদত্তও শিষ্যাববোধের নিমিত্ত এই গীতগুলি

১. গণরক্ষা তু অনেনৈবাত্মরক্ষা তথৈব চ।
অনেনৈব বশং লোকে মন্ত্রজাপ অনেন তু ॥ (হে বজ্র ২।৪।১১)

সঙ্কলন করিয়া টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকায় তিনি বার বার বলিয়াছেন, এগুলি 'পরার্থায়', 'পরমার্থায়', 'লোকার্থায়' প্রতিপাদিত। সহজলিপ্সু আদি কর্মিকদের এগুলি ছিল পাঠ্য। বজ্রগীতিরও একই লক্ষ্য। তবে বজ্রগীতির লক্ষ্য আধ্যাত্মিক মণ্ডলচক্র—চর্যাগীতির উদ্দিষ্ট এলোকের শিষ্যমণ্ডলী। বজ্রগীতির উদ্গাতা স্বয়ং বজ্রধর বা নৈরাত্মা যোগিনী বা সুখাবতী ব্যূহের মহা বোধিসত্ত্বগণ—চর্যাগীতির রচয়িতা লোকসিদ্ধ আচার্য। বজ্রগীতির ভাষা শুধু অপভ্রংশ নহে, সংস্কৃতও—চর্যার ভাষা বাংলা।

বজ্রগীতি ও চর্যাগীতির ভিতর কিছু পার্থক্য থাকিলেও পরবর্তী ভাষ্যকারগণ কিন্তু এ পার্থক্য মানেন নাই: চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি তাঁহাদের দৃষ্টিতে এক হইয়া গিয়াছে। তিব্বতী অনুবাদের সংস্কৃত ছায়ায় দেখা যায়, মুনিদত্ত তাঁহার টীকা সমাপ্ত করিয়া বলিতেছেন, 'চর্যাগীতিকোষঃ—সিদ্ধবজ্রগীতি তত্ত্বাবভাসিত কল্যাণমিত্রাণাং কৃতে আচার্য মুনিদত্তেন বিবৃতাঃ সিদ্ধবজ্রগীতয়ঃ সটীকাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ' (চর্যাগীতিকোষ: বিশ্বভারতী)। সেকোদ্দেশ টীকায় নাড়পা নিরোধ-বজ্রগত চিত্তে নিমিত্তোদ্গ্রহের দৃষ্টান্তস্বরূপ সরহ, ভুসুকু, শান্তিপাদাদির ভনিতায় যে উক্তি আহরণ করিয়াছেন, সেগুলিকে বজ্রগীতিই বলিয়াছেন ('বজ্রগীতিতঃ প্রচক্ষতে')। এই পদ আলোচ্য চর্যাগীতিরও পদ। যথা—

১. উই দূরে গঅণ মজ্জে অদ্ভুআ। পেকখুরে ভুসুকু সুণ্ণ সরুআ।।

২. আকট করুণা ডমরুলি বাজঅ। আজদেভ্র নিরালে রাজঅ।।

[এই দুইটি উদ্ধৃতির সহিত ২০ ও ৩১ সংখ্যক চর্যার মিল লক্ষণীয়]

চর্যাগীতি ও বজ্রগীতির প্রধান পার্থক্য উপায় ও উপেয় বিষয়ে। তত্ত্বাববোধের উপায়মূলক গানগুলি চর্যাগীতি, সহজতত্ত্বের উপলব্ধিমূলক গীতি বজ্রগীতি। বজ্রতত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে চর্যাধরই বজ্রধর। ১৭ সংখ্যক গানের বীণাপাদ যখন 'বাজিল', তাহার যোগিনী যখন 'দেবী', তখন তাহাদের গীত বজ্রগীত। সহজানন্দমুদিত সিদ্ধ সাধকদের তত্ত্বাবধায়ক গীতিই বজ্রগীতি: সেই তত্ত্বলাভের ক্রিয়া-চর্যামূলক গান চর্যাগীতি।

চর্যাগীতির ছন্দ

চর্যাগীতির ছন্দ মাত্রাছন্দ।[১] ইহা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ব্যবহৃত মাত্রাছন্দের পূর্বরূপ। কিন্তু সংস্কৃতে যে মাত্রাকৃতা জাতি ছন্দ ('জাতির্মাত্রা

১. The metres of the carya poems are Matra vrtta (O.B.D.L.)

কৃত।') বা প্রাকৃতে যে মাত্রাবৃত্ত-এর প্রচলন আছে, চর্যার মাত্রাছন্দের প্রকৃতি সেগুলি হইতে পৃথক। প্রাচীন জাতি বা মাত্রাবৃত্তের অক্ষরের উচ্চারণ-রীতি, মাত্রানিরূপণের পদ্ধতি এবং চরণমধ্যে 'গণ' অনুসারে অক্ষরবিন্যাসের নিয়ম চর্যার ছন্দে নাই। প্রাচীন নিয়মে অক্ষরের মাত্রা দৃষ্টিগ্রাহ্য. অর্থাৎ চোখে দেখিয়াই অক্ষরটি হ্রস্ব (একমাত্রিক), না দীর্ঘ (দ্বিমাত্রিক), তাহা বোঝা যায়। সেখানে হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষর (অ, ই, উ, চ, তু, হি,) এক মাত্রা এবং দীর্ঘ স্বরান্ত (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, যা, হে, নৌ), ব্যঞ্জনান্ত (সৎ, বাক্, কিম্), সানুস্বর (অং, কং) ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বঅক্ষর (বু২দ্ধ, ধ২র্ম) দুই মাত্রা; চরণান্তিক হ্রস্ব অক্ষর বিকল্পে দুই মাত্রা।[১] এই নিয়মে চর্যার ছন্দ বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে, উহাতে প্রায় প্রতি পাদে (পর্বে) বা চরণে মাত্রাধিক্য বা মাত্রাল্পতা দোষ ঘটিতেছে। যেমন, ১৩ সংখ্যক গানের এই চরণটি—

তারন্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।

গানটি ষোল মাত্রার ছন্দে রচিত। অথচ প্রাচীন মতে এই চরণে আছে ২১টি মাত্রা। মাত্রা সঙ্কোচ না করিলে ছন্দপতন হইবে। এখানে দীর্ঘ অক্ষর শুধু সঙ্কুচিত হয় নাই, দুই-তিন মাত্রা পর্যন্ত এক হইয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে ৩ সংখ্যক গানের ঊনমাত্রিক এই চরণটি—

এক ঘড়ুলী সরুই নাল।

নিয়মমত এখানে আছে ১৩ মাত্রা, কোন কোন অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ না করিলে ছন্দ হতবৃত্ত হইবে। চর্যার কবিরা নিশ্চয়ই 'ছন্নছাড়া' ছিলেন না, তাঁহাদেরও ছন্দ জ্ঞান ছিল। সে ছন্দের বিচার-পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

প্রথমতঃ চর্যার ছন্দ 'শুদ্ধ মাত্রাবৃত্ত' নহে। উহা 'গেয় মাত্রাছন্দ'। গানে সুরের টানে মাত্রার হেরফের ঘটে। চর্যায় বহু ক্ষেত্রে সুরের টানে মাত্রার ন্যূনতা বা আধিক্য পূরণ করা হইয়াছে।[২] গেয় ছন্দে একটি চরণে বা পাদে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার বেশী বা কম মাত্রা থাকিতে পারে। সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞগণ বলেন, গীতে কবিগণ ইচ্ছা করিয়াই চরণে মাত্রাসংখ্যা কম বা বেশী

---

১. দীহো সংজুত্তপরো বিন্দুজুত্ত পড়িও অ চরণংতে।

স গুরু বংক দুমত্তো অণ্ণো লহু হোই সুদ্ধ এককলো॥ প্রা, পৈ, ১।২,

২. The verses were chanted and the chant music or tune accomodated all question of quantity in individual syllables (O. D. B. L).

রাখেন। গায়ক সুরের টানে মাত্রা যথাক্রমে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া মাত্রার পাদ পূরণ করিয়া লন। তাহাতে সুরে 'গীতালঙ্কার' (গমক, গিটকিরি) যোজিত হয় এবং গীত অলঙ্কার সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ বাঙালীর উচ্চারণ-গত বিশিষ্টতা। উচ্চারণেও অক্ষরমাত্রার তারতম্য ঘটে। চর্যায় বাংলা উচ্চারণের স্থিতি-স্থাপকতা কার্যকরী হইয়াছে।

অবশ্য শুদ্ধ ছন্দের ন্যায় গেয় ছন্দেরও প্রধান উপকরণ—মাত্রা, যতি, যতি-খণ্ডিত নির্দিষ্ট মাত্রিক পাদ, চরণান্তিক মিল এবং স্তবক-বন্ধন। চর্যা ছন্দেরও উপাদান—মাত্রা, যতি, পাদ, মিল ও স্তবক।

প্রথমেই আসে মাত্রার প্রসঙ্গ। প্রাচীন নিয়মে অক্ষর-মাত্রা দৃষ্টিগ্রাহ্য বলিয়া ছবির মত স্থির। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার বিচার দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর-মাত্রা লইয়া। কিন্তু অপভ্রংশ স্তরে আসিয়া দেখা যাইতেছে উচ্চারণের দিক হইতে নূতন একটি নিয়ম, যেখানে দীর্ঘ বর্ণ লঘু জিহ্বায় পাঠ করিলে লঘু হইয়া যায় এবং দ্রুত পঠনে দুই তিন বর্ণ পর্যন্ত এক বর্ণের সামিল হয়।[২] প্রথম নিয়মটি অপভ্রংশ ভাষার উচ্চারণ-শিথিলতার স্মারক, দ্বিতীয় নিয়মটি (দ্রুত পঠনে দুই-তিন বর্ণ এক হইয়া যায়)—অক্ষরে প্রচণ্ড দমক বা সঙ্গীতে দ্রুতলয়ে উচ্চারণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাকৃত পৈঙ্গলকার কৌতুক করিয়া বলেন, তরুণীর কটাক্ষে যেমন চিত্ত-ধৈর্য বিচলিত হয়, তেমনই গুরু অক্ষরের লঘু অপবাদ ঘটে।

চর্যাগীতির ছন্দ-বিচারে অক্ষরমাত্রার এই নমনীয়তা বিশেষভাবে গণনীয়। বাঙালীর উচ্চারণে প্রায়শঃ 'গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত', কখনও লঘুর যশ 'অধিক অধিক বাড়ে'। এখানে অক্ষর-মাত্রা শ্রুতিগ্রাহ্য—একটি অক্ষরে কয় মাত্রা হইবে, তাহা কানে শুনিয়া স্থির করিতে হয়। বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণে সকল অক্ষরই হ্রস্ব, শুধু পদান্তের হলন্ত অক্ষর এবং একাক্ষরী হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর বিশিষ্ট উচ্চারণে দুই মাত্রা। যেমন, চর্যাগীতের এই উচ্চারণগুলি—সদ্ =স-অদ্ (সদ্ গুরু), বাক্=বা-আক্ ; নৌ=নউ, চৌ=চউ<(চতু)। চর্যা গানে পদান্তের হলন্ত অক্ষর নাই, অ-কারান্ত শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট অ-কারান্ত, হলন্ত নহে, যথা—ডাল, কাল, নাল, তাল, (ডাল্, কাল্, নাল্, তাল্ নহে)।

২. জই দীহো বিঅ বণ্ণো লহু জীহা পঢই হোই সো বি লহু।
বণ্ণো বি তুরিঅ পঢ়িও দো তিণ্ণি বি এক্ক জাণেহু ॥ প্রা. পৈ. ১।৮

পদান্তিক এই অক্ষরগুলি ক্ষেত্রবিশেষে হ্রস্ব বা দীর্ঘ। কিন্তু মাত্রাছন্দের ব্যাপারে এই স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির ব্যতিক্রম ঘটে। মাত্রাবৃত্তে বাংলা উচ্চারণ দ্বিধাগ্রস্ত। বাংলা মাত্রাবৃত্ত অনেকাংশে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ উচ্চারণের মুখাপেক্ষী। একদিকে নিয়মতান্ত্রিক উচ্চারণের বন্ধন, অপরদিকে নিজস্ব উচ্চারণ-রীতির প্রভাব। ফলে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতিকে বিকৃত করিয়া প্রাচীন ঢঙে দীর্ঘ স্বরান্ত ও পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দুইমাত্রা উচ্চারণ করা হয়। আবার নিজস্ব উচ্চারণ-রীতির প্রভাবে প্রাচীন দীর্ঘ অক্ষর হ্রস্ব হইয়া যায়। উপরন্তু আছে সঙ্গীতের প্রভাব।

মাত্রা বিচারের দিক হইতে চর্যাগীতিতে সর্বাপেক্ষা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরের (আ, এ, ও, ঔ প্রভৃতি) উচ্চারণে। এই সকল ধ্বনি প্রাচীন নিয়মে কোথায়ও প্রসারিত বা দীর্ঘ (যেমন, কাআ, বেঢিল ডাক), আবার বঙ্গীয় উচ্চারণের প্রভাবে কোথায় সঙ্কুচিত বা হ্রস্ব যেমন, কমলকুলিশ
১ ২ ১ ১ ২
ঘাণ্টে (৪), চোরে নিল। কোথায় প্রসারিত কোথায় সঙ্কুচিত হইবে, তাহার ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নাই। অপভ্রংশ ছন্দশাস্ত্রে এইটুকু বলা হইয়াছে যে, আল্‌তো ভাবে পাঠ করিলে অক্ষর লঘু হয় এবং দ্রুতপঠনে দুইতিন বর্ণ এক হইয়া যায়। কিন্তু কোথায় লঘু, কোথায় দ্রুত উচ্চারণ হইবে, তাহার কোন নির্দেশ নাই।

উচ্চারণের এই স্থিতিস্থাপকতা বিচার করিয়া গীতিকারেরা অনেক স্থলে নিজেরাই স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, চর্যাকার বা লিপিকর-ধৃত ভুল বানানই অধিকাংশস্থলে মাত্রা-মিলের সহায়তা করিয়াছে। এগুলি ঠিক লিপিকর-প্রমাদ নহে, গীতের স্বরলিপি। যেমন—

চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ—চর্যা, ৩

এখানে 'চীঅণ', 'বারুণি' শুদ্ধ বানানে হওয়া উচিত 'চিঅণ' ও 'বারুণী'; কিন্তু ভুল বানানেই-৪-মাত্রা মিল ঠিক থাকে। তেমনই—'হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী (৬) খুন্টি উপাড়ী (৮) মারমি ডোম্বী (১০) ভান্তী পুচ্ছ তু (৪১)। ৪৪ সংখ্যক গানের একটি চরণ—'অণ চাহন্তে আণ বিনঠা'; মনে হইতে পারে চর্যাকার একই শব্দের অন্য>আণ, অণ—দুইটি রূপ একই চরণে ব্যবহার করিলেন কেন?—ছন্দের দিক হইতে অণচা-হন্তে-আণবি-নঠা এই পাঠই চতুষ্কল গণের ভাগ অনুসারে মাত্রামিলের সহায়ক। প্রথম গানের 'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ' চরণে শাস্ত্রী মহাশয় ও ডঃ সেন 'লুই ভণই' পাঠ লইয়াছেন, কিন্তু টীকা মতে উহা 'লূই'।

এমন কি প্রতিলিপিতেও উহা 'লূই'; লূই পাঠ ধরিলেই ছন্দের মাত্রা ঠিক থাকে। চর্যার প্রতিলিপির পাঠ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখাই বিধেয়। ভুল বানান বহুস্থলে গীতের স্বরলিপির প্রতীক।

তবে চর্যা-লিপিতে যে ভ্রম-প্রমাদ নাই, তাহা নহে। অনেক স্থলে বাঙলার উচ্চারণ-রীতি অনুসারে ই-উ-এবং ঈ-উ-কারের স্থান বিনিময় হইয়াছে। শুদ্ধ বানান ধরিলে মাত্রা-সংখ্যা ঠিক থাকে। যেমন,

ডুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই—চর্যা. ২

এখানে 'পিটা স্থলে টীকাঅনুযায়ী 'পীটা' ('পীঠক') বানান রাখিলে চতুষ্কলগণের ৪ মাত্রা ঠিক থাকে।

চর্যার মাত্রাবিচারে এইগুলি স্মর্তব্য :—(১) সংযুক্ত বর্ণের পূবঅক্ষর সাধারণতঃ দীর্ঘ; (২) ব্যঞ্জনান্ত শব্দ (সদ্, বাক্, কিম্) দীর্ঘ। (৩) দ্বিমাত্রিকতার প্রতি ঝোঁক বাংলা উচ্চারণের একটি বৈশিষ্ট্য। চর্যার বিষমমাত্রিক শব্দ প্রায়ই বিষম মাত্রিক শব্দের যোগে যুগ্ম মাত্রিক। (৪) চর্যার চরণের ক্ষুদ্র গুচ্ছগুলিও সাধারণতঃ চতুষ্কলগণের চতুর্মাত্রিক চালে রচিত। কোন অক্ষরের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ, তথা মাত্রা স্থির করিবার সময় এই চার মাত্রার চালের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছের 'এড়িএউ' (১) 'মেলিমেল (৩৮) প্রভৃতি অংশে 'এ' হ্রস্ব (১ মাত্রা), 'বাহ লো' (১৪), 'রাউতু ভণই কট' অংশে 'লো' ও 'রা' হ্রস্ব বা ১ মাত্রা। (৫) চর্যায় পদান্তের হলন্ত অক্ষর নাই। অ-কারান্ত শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট অ-কারান্ত, হলন্ত নহে, অর্থাৎ—ডাল, কাল, তাল (ডাল্ কাল্ তাল্ নহে)। চরণান্তের এই হ্রস্ব অক্ষর বহু স্থলে দীর্ঘ, যেমন, পঞ্চবি ডাল (১) কোঞ্চা তাল (৪)। এমন কি, চতুষ্কলগণের শেষ অক্ষরটিও প্রায়শঃ দীর্ঘ, যেমন রূপা থোই (৮) বুদ্ধনাটক বিসমা হোই (১৭); অনেকস্থলে হ্রস্ব এই অক্ষরগুলি দীর্ঘ বানানেই দেখানো হইয়াছে, যথা হোহী, জাহী (৫), এ বণ চ্ছাড়ী (৬), গাভী (২১) প্রভৃতি।

ছন্দের দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় 'যতি'। ধ্বনিপ্রবাহের গতির ভিতর জিহ্বা-যন্ত্রের সাময়িক বিরতি-স্থানেই এই যতি পড়ে। দীর্ঘতর যতি পড়ে চরণান্তে, কিন্তু চরণমধ্যেও কতকগুলি ধ্বনির পরে যতি পড়ে। চরণ মধ্যস্থ যতির প্রভাবে ধ্বনিগুচ্ছ দলে দলে বিভক্ত হয়। কিন্তু এই যতি গতির পূর্ণ বিরতি নহে বলিয়া, গতি ও যতির পুনঃ পুনঃ আবর্তনে ধ্বনি-প্রবাহ খাণ্ডত

হইয়া ছন্দ-স্পন্দন সৃষ্টি করে। পরিমিত কালান্তরে যতির আবর্তন হইতে যতি-খণ্ডিত দলগুলি সংখ্যাসাম্যে চরণমধ্যে একটি অপূর্ব সৌন্দর্য-সুষমাও সঞ্চা করিয়া দেয়।

পদমধ্যস্থ এই যতিগুলি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইতে পারে ক্ষুদ্রতর যতি একক হিসাবে ধ্বনিগুচ্ছের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য স্থির করিয়া দেয়। কি প্রায়শঃ ক্ষুদ্রতর যতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে বলিয়া উহা চরণমধ্যস্থ দীর্ঘতর যতি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে এবং প্রত্যঙ্গরূপে দীঘ যতিকে পূর্ণতা দান করে। অপভ্রং ছন্দেই পদমধ্যস্থ এই যতির মহত্ত্ব দেখা যায়।

গেয় ছন্দে চরণমধ্যস্থ এই যতি-স্থান তাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয় পাঠ্য-ছন্দের সঙ্গে তাহার একটা পার্থক্য থাকে। পাঠ্য ছন্দে যতির পূর্ণত দেয় কথার মাত্রা, গেয় ছন্দে অনেক সময় কথা কম বা বেশী থাকে বলিয় সেখানে যতির পূর্ণতা বোঝা যায় সুরের সঙ্কচনে বা প্রসারণে। গানে যতি কাজ করে তাল। চর্যাগীতিও গান ; এইজন্য ইহার যতিও তাল-যতি।

চরণমধ্যস্থ এই দীর্ঘতর যতি-ভাগ দ্বারা একটি চরণ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই ভাগগুলিকে প্রাচীনমতে বলা হয় পাদ, নব্য মতে পর্ব এই পাদগুলির সংখ্যাদ্বারা চরণের এক একটি বিশিষ্ট নক্সা গড়িয়া উঠে যে চরণে যতি-খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহ দুই ভাগে বিভক্ত, তাহা দ্বিপদী চরণ যেখানে ধ্বনিপ্রবাহ তিন ভাগে বিভক্ত, তাহা ত্রিপদী চরণ। প্রতি চরে এই পদসংখ্যা সমান থাকিলে কবিতার দ্বিপদী, ত্রিপদ প্রভৃতি রূপগুলি ফুটিয় উঠে। চর্যাগানে চরণের দ্বিপদী রূপটিই প্রধান। কেবল কয়েকটি গানে ত্রিপদীর রূপ দেখা যায়।

চর্যাগীতির অধিকাংশ চরণ চার মাত্রার চালে রচিত, অর্থাৎ প্রতি চার মাত্রার পরেই একটি ক্ষুদ্র যতি পড়ে। যেন মনে হয়, অপভ্রংশের চতুষ্কলগণ (চতুর্মাত্রিক ক্ষুদ্র ভাগ) অনুসারেই চরণগুলি রচিত। কিন্তু তাই বলিয় চর্যাগানের ষোলমাত্রার চরণগুলি কিন্তু চৌপদী নহে; দ্বিপদী। কাজেই অনেকক্ষেত্রে চতুর্মাত্রিক ক্ষুদ্র গুচ্ছে অংশগুলিকে ভাগ করা গেলেও, চরণ মধ্যস্থ দীর্ঘতর যতি পড়ে ৮ মাত্রার পরে। ৮ মাত্রাকে ৪+৪=৮—এই ভাগেও ভাগ করা যায়। যথা—১. কাআ—তরুবর পঞ্চ বি—ডাল।

চঞ্চল—চীএ পইঠো—কাল॥ চর্যা, ১,

২. করুণা—পিহাড়ি খেলহুঁ—নয়বল।
সদ্‌গুরু—বোহেঁ জিতেল—ভব বল॥ চর্যা. ১২.

কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এই ক্ষুদ্র যতি পরবর্তী গুচ্ছের কোন শব্দের ভগ্নাংশকে লইয়া পূর্ণ হয়। কাজেই মনে হয়, ৮ মাত্রাতেই পাদের পূর্ণতা। যেমন,

১. সঅলস—মাহিঅ কাহিক—রিঅই।
সুখ দুঃ—খেতে নিচিত ম—রি অই॥ চর্যা. ১.

২. ভুসুকু ভ—ণই কট রাউতু ভ—ণই কট
সঅলা—অইস স—হাব। চর্যা. ৪১.

অনেকস্থলে চার মাত্রার এই ক্ষুদ্র ভাগ লিখিয়া দেখানো সম্ভবই নহে। কারণ দুইটি মাত্রা একটি অক্ষরের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া থাকে যে, ক্ষুদ্র যতিকে তুচ্ছ করিয়া পূরা আট মাত্রায় পাঠ করিলেই সেখানে সঙ্গতি থাকে। যথা,

১ ২২ ১ ১১ ১
১. দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন—থাহা। চর্যা. ৫.
১১ ১ ২ ১ ১১
২. উদক চান্দ জিম সাচ ন—মিচ্ছা॥ চর্যা. ২৯.

চর্যাগীতির এই চতুর্মাত্রিক বা অষ্টমাত্রিক চাল বাংলা-উচ্চারণের দ্বিমাত্রিকতার প্রতি ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাঙালীর জিহ্বার বিরাম যুগ্ম মাত্রায়। যেখানে বিষম মাত্রিক শব্দ থাকে, সে ক্ষেত্রে দুইটি বিষমমাত্রিক শব্দ পাশাপাশি বসিয়া যুগ্ম মাত্রা পূর্ণ করিয়া দেয়। চার মাত্রার ক্ষেত্রে হয় ৩+১ বা ১+৩, যেমন, ধরণ ন (২), ঘুমই ণ (৩৬), ন ছিজই (৪৬); ছয় মাত্রার ক্ষেত্রে হয় ৩+৩, যেমন, জামমরণ (২২), ভুসুকু ভণই (৪১); আট মাত্রার ক্ষেত্রে হয় ৩+৫ বা ৫+৩, যেমন, দশমি দুআরত (৩), কমলিনী কমল (২৭)।

চর্যা-ছন্দের আর এক বৈশিষ্ট্য চরণান্তিক মিল। সংস্কৃত বা প্রাকৃত কবিতায় চরণান্তিক মিলের অভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিলের বৈচিত্র্য দেখা যায় অপভ্রংশ কবিতায়, বিশেষতঃ অপভ্রংশ গানে। বাংলা কবিতারও বিশেষত্ব চরণান্তিক মিল। চর্যাগীতিও মিলের মাধুর্যে কর্ণানন্দ।

মিলের উপযোগিতা নানা দিক হইতে বিচার্য। ইহা একটি চরণের বিরতি সূচনা করে, ভাবের পূর্ণতা সম্পাদন করে এবং ধ্বনিবৈষম্যের স্থলে ধ্বনিগত একটি মিলনের পটভূমি রচনা করে। কবি কালিদাস রায় বলেন,

'দীর্ঘ ছন্দের পথে মিলগুলি যেন মিলনের পান্থ নিবাস'। চরণান্তিক ধ্বনি-সাম্য কবিতার অলঙ্কারও বটে ; কোথায়ও উহা অনুপ্রাস, কোথায়ও বা যমক। সৌন্দর্য ও মাধুর্য—দুইই মিলের অন্তর্গত। প্রবন্ধজাতীয় সঙ্গীতে মিলের উপযোগিতা আরও বেশী। সুরের সুষমা মধুর হইয়া উঠে কথার মিলে।

স্বরসাম্যই চরণান্তিক মিলের প্রধান আশ্রয়। বিশেষতঃ সঙ্গীতে স্বরালাপেরই প্রাধান্য। এইজন্য চর্যাগীতিতে দেখা যায়, কবি ব্যঞ্জন ধ্বনিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু অন্ত্য স্বরের মিল রক্ষা করিয়াছেন। যথা বী/ই (১৭), রি/ই (২০), হেঁ/লেঁ (৩৪), হি/ই (৩৮, ৪২), গি/ণী (৪৭), না/আ (১৩)।

আর একপ্রকার মিল দেখা যায়—চরণের শেষাক্ষরে ব্যঞ্জন সমেত একটি স্বরধ্বনির মিল। যেমন, হোহী/জাহী (৫), রুন্ধেলা/ভইলা (৭), উবেসেঁ/কইসেঁ (৮), মাত্তা/নিবিত্তা (৯), বীণা/রুণা (১৭), আঁসু/সেসু (২৬), মেলেঁ/লীলেঁ (২৭), আনন্দে/চান্দে (৩০)। এ মিল অতি সাধারণ মিল। কুশলী কবিদের নিকট এ ধরনের মিল তেমন সমাদৃত হয় না।

উপান্তের স্বরসহ ব্যঞ্জনসমেত অন্ত্যস্বরের মিলই কবির আদরণীয়। তাহা শ্রুতিসুখকরও বটে। চর্যাগানে এ ধরনের মিলও প্রচুর আছে। যথা, ডাল/কাল, মাণ/জাণ, আস/পাস, নাল/চাল, ভাল/ফাল, বাহী/থাহী, গামী/সামী, ধীরা/চীরা, নাবী/ঠাবী, সাঙ্গ/লাঙ্গ, মাঙ্গে/সাঙ্গে।

কোথায়ও বা মিল অন্ত্য তিন স্বর বা অধিক স্বর মিলাইয়া, শেষের সব্যঞ্জন মিল তো আছেই। যথা, সান্ধঅ/বান্ধঅ, গঢ়ই/তরই, (সস)রী বালী/(গুঞ্জ)রী মালী (২৮), ছাইলী/(পো)হাইলী, অবকাস/গলপাশ, কাঅর/সাঅর।

এই সকল মিল শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসের সামিল। যদিও সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে স্বরের বৈষম্যেও অনুপ্রাস হয়, বাংলায় কিন্তু স্বরের সাম্যেই অনুপ্রাসের সৌন্দর্য প্রকট হয়। কবিতায় বা গানে স্বরসাম্যই প্রধান বিচার্য। তাহার সঙ্গে যদি ব্যঞ্জন ধ্বনির মিল থাকে, তবে সোনায় সোহাগা। চর্যাগানে অনুপ্রাস জাতীয় মিল স্বরসাম্যেই হৃদয়গ্রাহী।

চর্যাগীতির অন্ত্যমিলে শ্রুত্যনুপ্রাসও ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় র ও ল-এর উচ্চারণ বিনিময় হইত। ওড়িয়া উচ্চারণের প্রভাবে 'ণ' 'ড়'-এর মত উচ্চারিত হইত। ফলে 'ণ', 'ড়' ও 'ল'কে শ্রুতিতে সম পর্যায়ের ধ্বনি বলিয়া মনে হইত। চর্যাগানে উচ্চারণসাম্য জনিত এই প্রকারের শ্রুত্যনুপ্রাস

য়েকটি পদে দেখা যায়। যথা, **কুমারী**/মেহেলী (১৩), নিবাণে/পণালে ৭), ডালী/ধারী (২৮), লোণ্হা/তোরা (৪১), খেড়া/ফুলিঙ্গা (৪১), কুঠার লে (৪৫) প্রভৃতি। এই ধরনের মিল প্রাচীন বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তাহা ছাড়া বাঙালীর নিজস্ব শ্রুত্যনুপ্রাসও (বাঙালীর কানের ধ্বনিসমতা) য়েকটি পদে চরণান্তিক মিল সৃষ্টি করিয়াছে। যথা শঙ্কা/কঙ্খা (ক-খ-এর নিগত মিল, ২২, ৩৭), অপা/কুণ্ডবা (প-ব এর মিল ৩৯), আছ/বাস ছ-স-এর মিল, ৩৭), অবকাশ/গলপাস (৩৭), কাষ/দিস (২৯) প্রভৃতি।[২]

অনুপ্রাস ব্যতীত চর্যাগীতির অন্ত্যমিলে কয়েকটি পদে আছে যমক। মানুসারে দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিরাবৃত্তিই যমক। যমকের ধ্বনি-াম্য অর্থবহ হইতে পারে, নাও পারে। তবে যমকে স্বরের সাম্য থাকে। াগানে যমকের এই মিলগুলি লক্ষণীয়—পসারা/নিসারা (৩), রিসঅ/(ব)-রসঅ (৯), নয়বল/ভববল (১২), নিঅমণে-বাণে/পরম নিবাণে (২৮)।

প্রতি চরণে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার ধ্বনিপ্রবাহ যতি-খণ্ডিত হইয়া এক একটি ন্দ-রূপ প্রকাশ করে। পূর্বে যতি সন্নিবেশের আলোচনা প্রসঙ্গে চরণের দ্বিপদী, পদী রূপগুলির কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ সম মাপের দুইটি চরণে একটি াক বা পদ পূর্ণ হয়। চর্যাগানে পদই স্তবক। এইরূপ কয়েকটি পদ বা স্তবক ইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা বা গান গড়িয়া উঠে। চর্যার অধিকাংশ গান পাঁচটি দ বা দশটি চরণের সমষ্টি। কেবল ১০, ২৮ ও ৫০ সংখ্যক চর্যায় ৭টি বা ১৪টি চরণ, ২১ ও ২২ সংখ্যক গানে ৬টি পদ বা ১২টি চরণ এবং ৪৩ খ্যক গানে চারিটি পদ বা আটটি চরণ (টীকাদৃষ্টে মনে হয়, এই গানে ধ্রুবপদটি প্ত)। ২৩ সংখ্যক গান অপূর্ণ।

অপভ্রংশে চরণের মাত্রাসংখ্যা অনুসারে নানা নামের ছন্দ প্রচলিত ছিল। ংলা মাত্রাছন্দে সেই সকল ছন্দের কোন-কোনটির আদল রক্ষিত হইলেও, ংলায় সে নামগুলি গ্রহণ করা হয় নাই—না চর্যাগানে, না পরবর্তীকালের ান কাব্যে। বরং মধ্যযুগীয় বাংলাকাব্যে কোন কোন কবি সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দের ম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই আদর্শে বাংলা ছন্দও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু

১. চর্যাগীতির অন্ত্যমিল অনেকক্ষেত্রে শুদ্ধপাঠ নিরূপণে সহায়তা করে। শ্রদ্ধেয় আচার্য সুকুমার সেন এ বিষয়ে কতকগুলি পাঠ-সংশোধনের ইঙ্গিত দিয়াছেন (দ্রষ্টব্য চর্যাগীতি পদাবলী)। ন্দ-মাত্রা বিচার করিয়া কতকগুলি লিপি-প্রমাদও সংশোধন করা যাইতে পারে।

অপভ্রংশে ব্যবহৃত ছন্দের কোন নাম পাওয়া যায় না। অথচ বিচার করি দেখিলে বাংলা মাত্রাছন্দ অপভ্রংশেরই কাছাকাছি। তবে অপভ্রংশ মাত্রাছ প্রতি চরণে ত্রিকল, চতুষ্কল, পঞ্চকল, ষট্‌কলগণ ও হ্রস্ব-দীর্ঘ অনুসারে যে মাত্র বিন্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, চর্যার মাত্রাছন্দে তাহার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ চর্যাগানে আছে চতুর্মাত্রিক চতুষ্কলগণের প্রয়োগ। এই চতুষ্কলগণ মধ্যে যেগুলিতে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের নিয়ম শিথিল, চর্যাগানে সেইসকল ছন্দে অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ছন্দের আদল অপভ্রংশ হইলেও উচ্চারণ-রীতি বাংলার। ফলে প্রায় প্রতি চরণে ঊনমাত্রিক বা অধিক মাত্রিক পাদের সমাবেশ

চর্যাগীতিতে ষোড়শমাত্রিক চরণের ছন্দই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ৪৬ পূর্ণাঙ্গ গানের ভিতর ৩৭টি গানের অধিকাংশ পদ এই ষোল মাত্রার চরণে রচিত অপভ্রংশে ষোলমাত্রার ছন্দ হিসাবে পজ্‌ঝড়ি (পদ্ধড়ি), অড়িল্লা ও পাদাকুলক ছন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চর্যাগীতির কোন-কোন পদে পজ্‌ঝড়ি-অড়িল্লার লক্ষণ থাকিলেও পাদাকুলকের লক্ষণযুক্ত ছন্দই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। পজ্‌ঝড়ি অড়িল্লার আবির্ভাব যেন পাদাকুলকের বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্যই। পাদাকুলকে এই প্রাধান্যের কারণ লঘু-গুরু অক্ষরের বিচার-শিথিলতা। বাংলা-উচ্চারণে অক্ষরমাত্রা শ্রুতি-নির্ভর বলিয়া স্থিতি-স্থাপক।

পাদাকুলক ঃ প্রাকৃতপৈঙ্গলমতে, যে ছন্দে প্রতি চরণে থাকে ষোলমা পদে পদে থাকে উত্তম মিল ('উত্তম রেহা') এবং যাহাতে লঘু-গুরু বি নিয়ম নাই, তাহাই পিঙ্গলনাগের প্রিয় ছন্দ পাদাকুলক।[১]

উপরের সংজ্ঞার্থ হইতে দেখা যাইতেছে, পাদাকুলকের চরণে যতির উল্লেখ করা হয় নাই। তবে পরবর্তীকালের ছান্দসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন উহাতে আট মাত্রার পরে যতি থাকে। পাদাকুলক ছন্দে গণ ব্যবস্থাও নাই তবে ১৬ মাত্রায় রচিত বলিয়া কেহ কেহ চতুষ্কল গণের ভাগ স্বীকার করেন এ বলেন, শেষের গণটি হয় দুই গুরু (গুরুদ্বয়াত্মক চতুষ্কল)। তবে পাদাকু এই সকল ব্যবস্থার বন্ধন সত্যই শিথিল। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে, গণব্যবস্থায় এ যতিস্থাপনে, এমন কি অন্ত্যমিল যোজনাতেও পাদাকুলক স্বাধীন। বন্ধন-

১. লহু গুরু এক্ক নিয়ম ণহি জেহা।
পঅ পঅ লেক্‌খউ উত্তম রেহা ॥
সুকই ফণিংদহ কংঠঅ বলঅং।
সোলহ মত্তা পাআকুলঅং ॥ (প্রাঃ পৈ ১।১২৯)

-ছন্দের বৈশিষ্ট্য। চর্যাগানেও দেখা যায়, চার মাত্রার ভাগ ও চতুষ্কলগণ
:নেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। যেমন,

১ ২ ২ ১ ১ ১
১. **দু আন্তে চিখিল** মাঝেঁ ন-থাহী—৫,
১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
২ **উদক চান্দ জিম** সাচ ন-মিচ্ছা—২৯,

[চতুষ্কলগণের বন্ধন পাদাকুলকে আবশ্যিক নহে, কারণ বহুস্থলেই ৩+৫
সকল সমাহিঅ), ৫+৩ ('কমলিনী কমল'), ২+৬ ('জেঁ অজরামর'),
+৩+২ (ধমন চমণ বেণি)-এর ভাগ দিয়া ৮ মাত্রার পূর্ণতা]

এমন কি অষ্টম মাত্রার পরে যতি-স্থানও অনেক ক্ষেত্রে দুর্লক্ষ্য, যেন গোটা
্ণ মিলাইয়া ১৬ মাত্রার পূর্ণতা। যেমন,

১. সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা—৩৬
২. বাণ্ড কুরণ্ড সন্তারে জাণী—৩৭

চরণান্তের গুরুদ্বয়গণও অনেক স্থলে বিপর্যস্ত। বহুস্থলে লঘু-লঘু-গুরু কিংবা
-লঘু-লঘু দিয়া চতুষ্কলগণের পূর্ণতা। যেমন,

১. কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিলা—১৯
২. ভাদে ভণই অভাগে লইআ—৩৫,

অন্ত্যমিলের দিকেও কবিগণ বহুক্ষেত্রে উদাসীন। যেমন,

১. হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারি।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই॥—২০ [রি/ই-এর মিল]
. ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই যিঞ্চহূঁ পাণী॥—৪৭ [গি/ণী-এর মিল]

বস্তুতঃ বন্ধন-মুক্তির পরিচয়েই পাদাকুলক বিশিষ্ট। তবু বলা চলে, ষোল
ার চরণ, হ্রস্ব-দীর্ঘের অতিদেশ, অষ্টম ও ষোড়শ মাত্রার পরে যতি,
ক মিল সহ দুই সমমাত্রিক চরণে একটি পদের পরিসমাপ্তি—এইগুলিই
াকুলকের বৈশিষ্ট্য। চর্যায় পাদাকুলকের এই দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। যেমন,

সোণে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥
বাহতু কামলি গঅণ উ বেসেঁ।
গেলী জাম বহুড়ই কইসে॥

খুন্টি উ পাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়িলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি (কঁ) কি বাহব (কে) পারঅ॥
বামদাহিণ চাপী মিলিমিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিলম হা সুখ সঙ্গা॥—চর্যা ৮

[ফাঁকদ্বারা চরণমধ্যস্থ দীর্ঘতর যতির স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। থোই জাম উনমাত্রিক; কেড়ুআল, বাম-দাহিণ অধিক মাত্রিক। কঁ, কে অতিরিক্ত সংযোজন]

কতকগুলি গানের চরণ ষোল মাত্রার হইলেও গণনায় ৮+৭=১৫ মাত্রা পাওয়া যায়। সে সকল ক্ষেত্রে চরণান্তের হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে কারণ পদান্তের হ্রস্ব বিকল্পে দীর্ঘ হইতে পারে। তাহা ছাড়া, উহা দ্বার পাদাকুলকের গুরুদ্বয় শেষ চতুষ্কলগণের ঠাটটিও বজায় থাকে। যেমন,

১. দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥—১

২, জে সচরাচর তিঅস ভ মন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি॥—২২

পজ্‌ঝড়ি: ষোড়শ মাত্রিক চরণের ভিতর পজ্‌ঝড়ি (পদ্ধড়িআ) ছন্দটি উল্লেখ্য। পজ্‌ঝড়িই স্পষ্টতঃ চতুষ্কলগণ যুক্ত ষোল মাত্রার ছন্দ। পৈঙ্গলকার বলেন, যে ছন্দের চরণে ষোলমাত্রা চারিভাগে চতুর্মাত্রিক বিভক্ত এবং চরণান্তিক গণটি 'জগণ' (লঘু-গুরু-লঘু) তাহাই পজ্‌ঝড়িআ। পাদাকুলক ছন্দ হইতে ইহার পার্থক্য দুই বিষয়ে—(১) পাদাকুলকে চতুষ্কল বিভাগ অস্পষ্ট, পজ্‌ঝড়িতে চতুর্মাত্রিকগণের ভাগ সুস্পষ্ট এবং (২) পাদাকু[লকের] শেষগণটি দ্বিগুরু, পজ্‌ঝড়ির চরণান্তগণ 'জগণ' অর্থাৎ লঘুপুটিত মধ্যগুরুগণ কিন্তু ছান্দসিকগণের মতে অনেক ক্ষেত্রেই পজ্‌ঝড়ি ছন্দে 'জগণে'র প্রয়ো[গ] থাকে না। সংস্কৃতে যে 'পজ্‌ঝটিকা' অপভ্রংশ পজ্‌ঝড়িআর সমরূপ, তাহাতে

১. চউমত্ত করহ গণ চারি ঠাঁই।
ঠবি অংত পওহর পাই পাই॥ প্রা পৈ. ১।১২৫ [পয়োধর মধ্যগুরুগণ]

'জগণে'র প্রয়োগ নিষিদ্ধ।[১] চর্যাগানেও এমন কোন ষোলমাত্রার চরণ পাওয়া যায় না, যাহার শেষে 'জগণ' আছে। মনে হয়, পজ্ঝড়ি ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব ৪+৪+৪+৪ চতুষ্কলগণের ব্যবস্থায় এবং প্রত্যেকটি চতুষ্কলগণের পরে স্পষ্ট তাল-যতি স্থাপনে। শেষ চতুষ্কলগণটি 'ভ'গণ (গুরু-লঘু-লঘু) অথবা 'স'গণ (লঘু-লঘু-গুরু) হইতে পারে। কিন্তু চরণান্তে দ্বি-লঘুর দাবী অড়িল্লা ছন্দে বেশী। কাজেই বলা যায়, চরণান্তে 'সগণ'সহ চতুষ্কল ষোড়শ মাত্রিক ছন্দই পজ্ঝড়ি বা পদ্ধডি। চর্যাগানে পজ্ঝড়ি ধরনের পদ (দুই চরণের শ্লোক) বহুস্থলে পাওয়া যায় :

১, আলিকালি-ঘণ্টা-নেউর-চরণে।
রবিশশী-কুণ্ডল-কিউআ-ভরণে ।।—১১

২, মাররে-জোইআ-মূসা-পবনা।
জেঁণ-তুটঅ-অবণা-গবণা ।।—২১

সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা বলেন, চর্যা পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত হইবে। চতুর্মাত্রিক তালের দিক হইতেই হয়তো তাহারা এই কথা বলিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক ছন্দই আমাদের আলোচ্য চর্যাগানের বিশিষ্ট ছন্দ। সেই ছন্দে যেন 'তাল ফেরত'ার কাজ করিয়াছে পজ্ঝড়িআ।

অড়িল্লা : ষোড়শ মাত্রিক চরণের অপর ছন্দ 'অড়িল্লা'। প্রাকৃতপৈঙ্গল মতে, অড়িল্লায় প্রত্যেক চরণে থাকে ষোল মাত্রা, চরণান্তে থাকে যমক ; এই ছন্দে 'জগণ' (পয়োধর) থাকে না এবং চরণান্তের দুই অক্ষর হয় লঘু (সুপ্রিয়)।[২] চতুষ্কলগণের ছন্দে চরণান্তে দুই লঘু থাকিতে পারে—'ভগণে' (গুরু-লঘু-লঘু), কিংবা চতুর্লঘুগণে (লঘু লঘু লঘু লঘু)। লঘুদ্বয় শেষ এবং যমক—এই দুইটিই অড়িল্লার বিশিষ্ট লক্ষণ। কোন সম্পূর্ণ চর্যা এই ছন্দে রচিত না হইলেও গীতমধ্যে বহুপদে অড়িল্লার সমাবেশ দেখা যায়। যথা,

১, এক সে-শুণ্ডিনী-দুই ঘরে-সান্ধঅ।
চীঅণ-বাকলঅ-বারুণী-বান্ধঅ ।।—৩

১. প্রতিপদ যমকিত ষোড়শ মাত্রা। নবম গুরুত্ব বিভূষিত গাত্রা ।।
পজ্ঝটিকা পুনরত্র বিবেকঃ। ক্বাপি ন মধ্য গুরুগণ একঃ ।। ছন্দোমঞ্জরী, পঞ্চম স্তবক।

২. সোলহ মত্তা পাউ অলিল্লহ।
বে বি জমক্কা ভেউ অড়িল্লহ ।।
হোণ পওো কিম্পি অড়িল্লহ।
অন্ত সুপিঅ ভণ ছন্দ অড়িল্লহ ।। প্রাঃ পৈ, ১।১২৭।

২, জোইনি-তঁই বিনু-খনহিন-জীবমি।
তো মুহ-চুম্বী-কমলরস-পীবমি ॥—৪

৩, জিমজিম-করিণা-করিণিরেঁ-রিসঅ।
তিমতিম-তথতা-মঅগল-বরিসঅ ॥—৯

৪, করুণা-পিহাড়ি-খেলহুঁ-নয় বল।
সদ্‌গুরু-বোহেঁ-জিতেল-ভব বল ॥—১২

চর্যার দশটি গানে (১৪, ১৫, ৩৬, ২৩, ২৮, ৩৪, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫০) প্রতি চরণে ১৬ এর অধিক মাত্রাযুক্ত ছন্দের নমুনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৪৩ সংখ্যক গানে, শুদ্ধ মাত্রাছন্দের মাত্রাগণনা অনুসারে পাওয়া যায় প্রতি চরণে ২২ মাত্রার (১০ : ১২) একটি ছন্দ। এই গানটি চারিটি পদে (আট চরণে) বিভক্ত, প্রতিটি সমচরণ 'রে' সম্বোধন পদ দ্বারা খণ্ডিত, সপ্তম চরণটি ২৮ মাত্রার (৮+৮+১২)—

সহজ মহাতরু ফ্‌রিঅ এ তেলোএ।
খসমসভাবে রে বাণতকা কোএ ॥
জিম জলে পণিআ টলিআ ভেডন জাঅ।
তিম মণরঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ ॥
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।
আই অনুঅণা রে জাম মরণ ভব নাহি।
ভুসুক ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
জাই ণ আবয়ি রে ণ তং হি ভাবা ভাব ॥

[সপ্তম চরণটি বাদ দিলে এরূপ খাঁটি সমমাত্রিক চরণের ছন্দ সমগ্র চর্যাগীতিতে নাই বলিলেও চলে]

দোহা : ইহার পরেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দোহাজাতীয় ছন্দ। কিন্তু দোহার রূপ ও প্রকৃতি চর্যাগানে বিপর্যস্ত। অপভ্রংশ ছন্দশাস্ত্রমতে দোহা ১৩+১১ মাত্রায় বিভক্ত ২৪ মাত্রিক চরণের ছন্দ। ইহার গণ ব্যবস্থা যথাক্রমে ৬+৪+৩ =১৩ এবং ৬+৪+১=১১।* প্রতি যতি-খণ্ডিত পাদে দোহা বিসমমাত্রিক।

*. তেরহ মত্তা পঢ়ম পঅ পুণু এআরহ দেহ।
পুণু তেরহ এআরহ দোহ লক্‌খণ এহ ॥ প্রা. পৈ. ১।৭৮.

ছন্দোমঞ্জরীতেও দোহা বা দোহড়িকার একইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে :—
মাত্রা ত্রয়োদশকং যদি পূর্বং লঘুক বিরামি।
পশ্চাদেকাদশস্তু দোহড়িকা দ্বিগুণেন ॥ (অপভ্রংশ ভাষায়াং প্রচারঃ)—পঞ্চম স্তবক.

এইখানেই বাংলা উচ্চারণ-রীতির সঙ্গে বিরোধ। বাংলা উচ্চারণের ঝোঁক যুগ্ম মাত্রার দিকে। এইজন্য খাঁটি দোহা বাংলা কাব্যে স্থান পায় নাই। চর্যা গানেও ইহাকে যথাসম্ভব দোহার গণব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া, যুগ্ম চতুর্মাত্রিক রূপ দিয়া, ৪+৪+৪+২=১৪ এবং ৪+৪+৪=১২—এইরূপ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। শেষের মাত্রাটি বিষমমাত্রিক (৩ বা ১) হইলেও পাঠ করিবার সময় উহা যেন যুগ্ম মাত্রারই রূপ ধারণ করে ; ফলে চরণটিকে ১৪ : ১২=২৬ মাত্রার চরণ বলিয়া মনে হয়। ১৬ সংখ্যক চর্যার ধ্রুব পদটি বাদে বাকী চারিটি পদ এই ঠাটেই রচিত। প্রায় প্রতিটি চরণ 'রে' দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যতিস্থান নির্দেশ করিয়াছে :

তিনিএঁ—পাটেঁ—লাগেলি—রে	অণহক—সণঘণ—গাজই।
তা শুনি—মার ভ—য়ঙ্কর—রে	(সঅ) মণ্ডল—সএল—ভাজই ॥
পাপ পু—ণ্য বেণি—তিড়ি অ সি—কল	মোরিঅ—খম্ভা—ঠাণা।
গঅণ—টাকলি—লাগি—রে	চিন্তা—পইঠো ণি—বাণা ॥
মহারস—পানে—মাতেল—রে	তিহুঅন—সএল উ—এখী।
পঞ্চবি—ষয়ের—নায়ক—রে	বিপখ—কোবী ন—দেখী ॥
খররবি—কিরণসং—তাপে—রে	গঅণা—ঙ্গণ গই—পইঠা।
ভণন্তি—মহিডাঁ—মই এথু—বু	ডন্তে—কিম্পি ন—দিঠা

চতুষ্কলগণ বিভাগেও কোন-কোন স্থলে উনমাত্রিকতা বা অধিকমাত্রিকতা আছে। উচ্চারণে বা গানের টানে সেগুলিকে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করা যায়। এমন কি, এগুলিকে ১২ : ১২=২৪ মাত্রার ভাগেও পাঠ করা সম্ভব। এই ধরনের ২৪ বা ২৬ মাত্রিক চরণের পদ চর্যায় অন্যান্য গানেও ছড়াইয়া আছে।

ইহার পরে পাওয়া যায় ২৮ মাত্রার ছন্দ। অপভ্রংশে ২৮ মাত্রার ছন্দ হিসাবে 'কর্পূর', 'কুঙ্কুম', 'উল্লালা' প্রভৃতি ছন্দের নাম পাওয়া যায়। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে 'উল্লালা' নামটিই গৃহীত হইয়াছে। সূরী হেমচন্দ্র বলেন, মগধের ভট্ট কবি কর্পূরাদি ছন্দকে 'উল্লালা' বলিয়া থাকেন। হয়তো পূর্বী অপভ্রংশে এই ছন্দটির সমাদর ছিল।

উল্লালা : প্রাকৃতপৈঙ্গলের মতে উল্লালা দ্বিপদী (দুই চরণের) ছন্দ। প্রতি চরণে ২৮ মাত্রা। উহাতে গণব্যবস্থাও আছে। প্রথমে তিনটি চতুষ্কল গণ, তৎপরে ত্রিকল একটি গণ (৪×৩+৩=১৫) ; পরের পাদে যথাক্রমে ষট্‌কল,

চতুষ্কল ও ত্রিকল একটি করিয়া গণ (৬+৪+৩=১৩)—একুনে ২৮ মাত্রা। যতি পড়ে ১৫ ও ১৩ মাত্রার পরে।*,

উল্লালাও পাদে পাদে বিষমমাত্রিক। কাজেই বাংলায় উহা সাতটি চতুর্মাত্রিক গণে সমমাত্রায় উপস্থাপিত হয়। ফলে যতিখণ্ডিত হইয়া উহার রূপ হয় ১৬ : ১২ বা ৮+৮ : ৮+৪। চর্যাগানে এই রূপটিই দেখা যায়। যেমন,

১. কিন্তো তন্তে কিন্তো মন্তে কিন্তোরে ঝাণ বখানে।
অপইঠান মহাসুহ লীণে দুলখ পরম নিবাণে ॥
দুঃখে সুখে একু করি আ ভুঞ্জই ইন্দী জানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী ॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরে বাধা।
লূই পাঅ পসাএঁ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লাধা ॥—৩৪,

ধ্রুবপদের প্রথম চরণে এবং চতুর্থ পদের শেষ চরণে মাত্রাল্পতা থাকিলেও ৪১ সংখ্যক গানটি এই ২৮ মাত্রার ভঙ্গীতেই রচিত।

মরু মরীচি গন্ধ (ব) নইরী দাপণ পতিবিম্বু জইসা।
বাতা বত্তে সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥...
রাউতু ভণই কট ভুসুক ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জইতো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু পাঅ ॥

চর্যায় মিশ্র ছন্দ

ছন্দশাস্ত্রে মিশ্র ছন্দের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। একই কবিতার বিভিন্ন চরণে বিভিন্ন মাপের চরণ বিন্যাস করিয়া মিশ্র ছন্দ বা 'বিষমবৃত্ত' গঠন করা হয়। বৈদিক সাহিত্যে ছিল 'প্রগাথ' ছন্দ। 'উদ্গতা' নামক ছন্দটিও এই প্রকারের। অপভ্রংশেও এই ধরনের মিশ্র ছন্দের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের স্তবকবন্ধ একত্র করিয়া একটি ছন্দ গড়িয়া উঠে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে 'কুণ্ডলিয়া' নামক মিশ্র ছন্দের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ছন্দে থাকে দোহা (১৩ : ১১), রোলা (১১ : ১৩) এবং উল্লালা (১৫ : ১৩) ছন্দের স্তবক বন্ধ। চর্যাগানেও মিশ্র ছন্দের রূপ দেখা যায় দুই প্রকারে :—

তিণ্ণি তুরঙ্গম তিঅল তহ ছহ চউ তিঅ তহুঁ অন্ত।
এম উল্লালা উট্টবহু বিহু দল ছপ্পণ মত্ত ॥ প্রা : পৈ, ১।১২৮

(১) একই পদে 'বিষম' বৃত্তের মত দুই চরণে দুই প্রকার ছন্দ-চরণের সমাবেশ। (২) একই গানে বিভিন্ন পদে বিভিন্ন ছন্দের স্তবক-বন্ধের মিশ্রণ।

(১) ষোড়শ মাত্রিক ছন্দে দেখা যায়, পাদাকুলকের চরণের সঙ্গে 'রসিকা' বা 'দোহা'র চরণের মিশ্রণ। 'রসিকা' (৪+৪+৩) ১১ মাত্রার ছন্দ। আবার দীর্ঘতর মাত্রার ছন্দে দেখা যায় উল্লালা ও দোহার মিশ্রণ। যথা—

(ক) পাদাকুলক+রসিকা ঃ

চালিঅ ষষহর মাগে অবধুই।
রঅণহু ষহজে কহেই॥ —২৭

(খ) পাদাকুলক+দোহা ঃ

তুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী॥—১০

(গ) উল্লালা+দোহা ঃ —চর্যা. ১৪.

বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা। ১৬ ঃ ১২
সদ্‌গুরু পাঅ পসাএঁ জাইব পুনু জিন উরা॥ ১২ ঃ ১২

(ঘ) ৫০ সংখ্যক গানে পাওয়া যায় উল্লালা ও পাদাকুলকের মিশ্রণ।

(২) চর্যায় একই গানে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের স্তবক-বন্ধের মিশ্রণও লক্ষণীয়। পাদাকুলক ছন্দ-বন্ধে পদ্ধড়ি ও অড়িল্লার মিশ্রণ অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন,—

(ক) কাহ্নু বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনী বণ পইসি নিবিতা॥ } পাদাকুলক
জিমজিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥ } অড়িল্লা—চর্যা. ৯.

(খ) গন্ধ পরসরস জইসো তইসো।
নিন্দ বিহুনেঁ সুইনা জইসো॥ } পদ্ধড়ি
চিঅ কণ্ডহার সুনত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥ } পাদাকুলক—১৩.

(গ) ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলকের স্তবক-বন্ধনে ১১ মাত্রার রসিকা ছন্দের স্তবক বৈচিত্র্য আনিয়াছে ৪৪ সংখ্যক গানে—

স্থনে স্থন মিলিআ জবেঁ। } রসিকা
সঅল ধাম উইআ তবেঁ ॥

আচ্ছ হুঁ চউ খণ সং বোহী। } পাদাকুলক—৪৪
মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী ॥

(ঘ) ১৬ সংখ্যক গান রচিত হইয়াছে দোহার ঠাটে। সাহসা তাহার ধ্রুবপদে আসিয়া মিলিয়াছে ১৬ মাত্রার পাদাকুলক—

মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥

মত্ত চিত্তগজেন্দ্রের ধাবমান গতিই যেন এখানে আভাসিত হইয়াছে দ্রুতলয়ে। এগুলি ছাড়াও বহুক্ষেত্রে ভঙ্গপদী চরণ যোজনাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

(ক) গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি জইআ লীলে পার করেই ॥—১৪.

(খ) অকট হূঁভব গঅণা।
বঙ্গে জাআ নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণানা ॥—৩৯.

চর্যাগীতির এই মিশ্র ও বহুবিভঙ্গ রূপ লক্ষ্য করিয়া ছন্দ-রসিক শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় সৎসাহস দেখাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "ছন্দোজগতে চর্যা পদেরও কিছু দাম আছে। ইহাই যথার্থ মুক্তবন্ধ কবিতার অর্থাৎ 'মুক্তকে'র প্রবর্তন করিয়াছে। মুক্তক সৃষ্টির গৌরব রবীন্দ্রনাথের নয়, চর্যা কবিরই প্রাপ্য।" (ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দো বিবর্তন : ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭১)। এই প্রসঙ্গে তিনি ২৮ সংখ্যক চর্যাগীতির প্রতিটি পদের গঠন-রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ দেখিলে মনে হইবে, বলাকার মুক্ত-বন্ধ ছন্দের পূর্ব রূপটি যেন বহুকাল পূর্বেই মিলিতেছে চর্যাগানে।

বস্তুতঃ চর্যা-ছন্দের বৈচিত্র্য অসাধারণ। মাত্রা-ছন্দের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও ইহা যেন স্বাধীনভাবে রূপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। অবিমিশ্র কোন নির্দিষ্ট ছন্দের অনুবর্তন ইহাতে অল্প। অবিমিশ্র ছন্দে নিবদ্ধ গানগুলিতেও বহুপদে নিয়মভঙ্গ হইয়াছে ; নিয়মভঙ্গ হইয়াছে উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্যে—মাত্রার দীর্ঘীকরণে বা লঘূকরণে ; নিয়মভঙ্গ হইয়াছে ভঙ্গপদী চরণ রচনায় ; নিয়মভঙ্গ করা হইয়াছে 'বিশেষ প্যাটার্ণের স্তবক-বন্ধন অস্বীকার' করিয়া। এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নহে, চর্যাছন্দের বৈচিত্র্যের সূচক। ছন্দে সম্মিতি অপেক্ষা বৈচিত্র্য সৃষ্টির

প্রতিই চর্যাগীতিকারদের অধিক আগ্রহ। এই বৈচিত্র্য বহুস্থলে প্রকাশ পাইয়াছে ভাবের সঙ্গে ছন্দের মেলবন্ধনে। চর্যার ছন্দের গতি কোথায়ও সিংহ-বিক্রমবৎ উদ্ধত, কোথায়ও গজগতিবৎ মন্থর, কোথায়ও সর্পগতি সম দ্রুতচঞ্চল। ভাবের সঙ্গে এই গতির নিগূঢ় সম্পর্ক। ১৬ সংখ্যক গানে প্রমত্ত গজের শৃঙ্খল-মোচন যেন সিংহবিক্রমের মতই ছন্দে আভাসিত: 'তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহকসন ঘণ গাজই': ধ্বনির গাম্ভীর্য, বৃত্ত্যনুপ্রাসের আবর্তন ও ছন্দের উদ্ধত গতি যেন ভাবের সঙ্গে একান্ত সুসঙ্গত। তেমনই ১০ সংখ্যক গানে ডোম্বী-নৃত্যের অংশে চতুর্মাত্রিক ধ্বনি-গুচ্ছের দ্রুতগতিই যেন নৃত্য-চপল হইয়া উঠিয়াছে,

—একসো পদুমা চৌসঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥

তেমনই 'সাসুঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল' অংশের অক্ষর-সঙ্কুচন যেন বন্ধন-সঙ্কোচের দ্যোতক। এমনই করিয়া প্রকৃতির বসন্ত-বিকাশ (২৮), দুঃখের বেদনা (২০), নৈরাশ্যের ক্ষোভ (৪৯), মিলনের আনন্দ (৫০), বিবাহের জয়-যাত্রা (১৯) ছন্দের বিভিন্ন তালে ও বোলে ভাবানুগ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

চর্যাগীতির ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত', পয়ার নহে। অনেকে মনে করেন,অপভ্রংশ পাদাকুলক ছন্দ হইতে পয়ার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলা মাত্রা ছন্দকে তৎসম শব্দের আদলে বলা যায় তৎসম ছন্দ, পয়ার তদ্ভব ছন্দ। মাত্রাছন্দের উচ্চারণ-রীতি অনেকটা সংস্কৃত-প্রাকৃত উচ্চারণের অনুরূপ, কিন্তু পয়ারের উচ্চারণ-রীতি বাংলা। কাজেই মাত্রাছন্দকে পয়ার বলা চলে না। পয়ার গড়িয়া উঠিয়াছে অক্ষর-বৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণে বঙ্গালরীতিতে—যেখানে অক্ষরবর্ণ ও মাত্রা সমার্থক। উচ্চারণ-ভঙ্গী দিক্ পরিবর্তন করিয়াছে; প্রাচীন অক্ষর-মাত্রার স্থির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রায় প্রতি অক্ষর এক মাত্রিক হইয়া উঠিতেছে; 'গণ'-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং শব্দের আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত প্রযুক্ত হওয়ায় গুরু গৌরববর্জিত হইয়া যাইতেছে। বাংলা উচ্চারণের এই ভঙ্গীই পয়ারের ভঙ্গী ও লক্ষণ। ফলে যদিও চর্যার ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত'—তবু বহু পংক্তিতে 'পয়ার'-এর লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

(ক) ১. কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী—৪
২. সহজ মলিনীবণ পইসি নিবিতা—৯
৩. নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ—১০

৪. কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠঅ চারে—১১
৫, অমিঅ ভখঅ মূসা করঅ অহারা—২১
৬, ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ—২১
৭, বতিস যোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ—২৭
৮, বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুঝিঅ আনন্দে—৩০
৯, ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলেঁ বুঝই—৩৩
১০, স্বপণে মই দেখিল তিহুঅণ সুণ—৩৬
১১, ভণই তাড়ক এথু নাহি অবকাশ—৩৭
১২, কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী—৪৭

[খাঁটি বাংলা উচ্চারণে এগুলি ৮+৬=১৪ মাত্রার পয়ার ; যতি আট ও ছয়ের পরে।]

(খ) ৮+১০=১৮ মাত্রার মহাপয়ার

১, তহি বুড়িলী মাতঙ্গি জোইআ লীলে পার করেই—১৪
২, জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু পাঅ—৪১
৩, তিম মণ রঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ—৪৩

(গ) লঘু ত্রিপদী—৬+৬+৮,

১, সুনা পান্তর উহ ন দিসই
ভান্তি ন বাসসি জাংতে।—১৪
২, সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী
পেক্ষ রাতি পোহাইলী—২৮

(ঘ) দীর্ঘ ত্রিপদী—৮+৮+১০

১, রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট
সঅলা অইস সহাব।—৪১

চর্যাগীতির কাব্যমূল্য

অনেক কাব্যরসিক ধর্মসাহিত্য ও অধ্যাত্ম সঙ্গীতকে কাব্যের আসরে স্থান দিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ধর্মসাহিত্যের স্বাদ, গন্ধ ও প্রকৃতি কাব্য-কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। কাব্যের আশ্রয় জগৎ ও জীবন, ইহলোকের সুখ-বেদনা-নৈরাশ্য—ধর্মসাহিত্যের আশ্রয় পরলোক, ভগবৎ-তত্ত্ব ; উহার মূলকথা জীবন-বিবিক্ততা ও বৈরাগ্য। শ্রদ্ধেয় আচার্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেন, "কাব্যসৃষ্টি তত্ত্বরসের চমকসৃষ্টি নহে…ইহা ঋষির আত্মদর্শন নহে, অথবা মিষ্টিক

সাধকের তত্ত্বরস চেতনায় চমকও নহে...তাহার সহিত আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র সম্পর্ক নাই।" (জীবনজিজ্ঞাসা : কবিতা ও বৈরাগ্য)। আবার কেহ বলেন, কাব্যের লক্ষ্য মূলতঃ আনন্দ পরিবেশন, ধর্মসাহিত্যের লক্ষ্য নীতি-উপদেশ ও জ্ঞানের প্রচার—একটির আস্বাদক সহৃদয় সামাজিক চিত্ত, অপরটির আস্বাদক তত্ত্বজিজ্ঞাসু। বৈষ্ণব কবির উপমা দিয়া বলা যায়,—ধর্মসাহিত্য 'জ্ঞান-নিম্ব ফল', তাহার আস্বাদক 'অরসজ্ঞ কাক' এবং কাব্য-কবিতা 'প্রেমাম্র-মুকুল', তাহার আস্বাদক 'রসজ্ঞ কোকিল'।

আমাদের দেশে কিন্তু ঠিক এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কাব্য-বিচার করা হয় নাই। বিষয় যাহাই হউক, কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনায় ও রসের উত্তরণে। কাব্য-বিচারের দুইটি দিক—একটি কাব্যের ভাব-রস, অপরটি প্রকাশভঙ্গীর চারুত্ব। কাব্যের প্রকাশ-রীতি লইয়া এদেশে—অলঙ্কার, গুণ, রীতি ও বক্রোক্তিবাদ প্রভৃতি 'প্রস্থান' গড়িয়া উঠিয়াছে। কাব্যের ভাববস্তু বিচারে গড়িয়া উঠিয়াছে দুইটি প্রস্থান—রস ও ধ্বনি। কাব্যের ভাব কয়েকটি স্থায়ী ভাব (রতি-উৎসাহ-ক্রোধ-বিস্ময়-শোকাদি): এই ভাবগুলির রস-ব্যঞ্জনাতেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ। এই জন্য এদেশে 'শান্তরস', যাহার স্থায়ী ভাব শম, নির্বেদ ও প্রপত্তি—তাহাও রস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এদেশের শান্তরসাত্মক অমর মহাকাব্য মহাভারত—তাহার মূল প্রতিপাদ্য 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'—এই নীতি বাক্য। ধর্ম-সাহিত্য বেদ-উপনিষদের দ্রষ্টা ঋষিদের আমরা বলি, 'কবি'।

চর্যাগীতি অধ্যাত্ম-সঙ্গীত হইলেও বহিরঙ্গের রসাবেদনে ও সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনায় এগুলিকে কাব্যের কোঠা হইতে বাদ দেওয়া যায় না। দুঃখ-তৃষ্ণার চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে 'শান্ত সন্তপিত' হওয়া—অর্থাৎ শান্ত ('সমা'—১৭) ও নিবৃত্ত ('নিবিতা'—৯) হওয়া চর্যা-সাধকদের লক্ষ্য। শান্তরসই এই গানগুলির প্রধান রস। কিন্তু এই শান্তরসের সঙ্গে রহিয়াছে করুণ, হাস্য, অভিলাষ শৃঙ্গার (৪) ও সম্ভোগ শৃঙ্গারের (১৯, ২৮, ৫০) উজ্জ্বল চিত্র। যেমন,

যোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥ (৪)

অথবা, হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুণ নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥ (২৮)

চর্যার কয়েকটি গান করুণ রসেও উচ্ছল। ২০ সংখ্যক গানে একটি দুঃখিনী নারীর মর্মবেদনা হাহাকারে ও দীর্ঘশ্বাসে বড় করুণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার স্বামী উদাসীন, সন্তানও 'বায়ুড়া'। গভীর ক্ষোভে শ্লেষ যেন শোকের ব্যঞ্জনায় আস্বাদ্য—'নব জৌবন মোর ভইলেসি পূরা'। তেমনই করুণ ৪৯ সংখ্যক গানের হৃতসর্বস্ব, পত্নীহারা পুরুষের এই ক্ষোভ—'জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।'

চর্যাগীতির অদ্ভুত ও হাস্যরসের পদগুলিও উপভোগ্য। 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাঅ। রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥' (২), 'বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে,' 'জো সো চৌর সোই দুষাধী', 'নিতিনিতি ষিআলা ষিহে ষম যুঝঅ' (৩৩) প্রভৃতি বিপরীতভাষণ বিস্ময়-বোধের সঙ্গে হাস্যকেও উচ্ছল করিয়া তোলে। চর্যাগানে অদ্ভুত ও হাস্যরস যেন অনেকগুলি পদে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে; 'অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ' (৩১), 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়' (৩৩) প্রভৃতি চরণ সঙ্কররসের চর্বণায় সার্থক। হাস্যের দীপ্তিতে, বিস্ময়ের চমক সৃষ্টিতে, করুণরসের উদ্বোধনে এবং শৃঙ্গারের দ্যোতনায় চর্যাগীতি বহিরঙ্গে রসমধুর।

চর্যাগানের রূপ-কর্মেও কবিকৃতির স্বাক্ষর বিদ্যমান। সিদ্ধ আচার্যগণ তত্ত্বই পরিবেশন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এই পরিবেশনায় সন্ধ্যা ভাষার আড়ালে তাঁহারা শব্দের যে লক্ষণা শক্তিকে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই কবিতার সৌন্দর্য-বিধায়ক অলঙ্কারের উপচার হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানানন্দ-সুন্দর সাধকগণ সৌন্দর্যের দাবীকে উপেক্ষা করেন নাই। ফলে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধ ও বিপরীত ভাষণে গানগুলি অলঙ্কার-সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থ-শ্লেষে চর্যাগীতি উপভোগ্য (দ্রষ্টব্য 'চর্যাগীতির অলঙ্কার')।

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার-সৃষ্টিতে কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে উপমান বস্তুর আহরণে। চর্যাগানে কোন-কোন ক্ষেত্রে উপমাগুলি প্রথাসিদ্ধ ও গতানুগতিক। যেমন, সংবৃত্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৪১ সংখ্যক গানের রজ্জুসর্প, গন্ধর্ব-নগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব, মরু-মরীচিকা, বন্ধ্যাপুত্রের উপমানগুলি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আক্ষিপ্ত বস্তুর সংগ্রহে সাধকগণ শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন: চঞ্চল চিত্তের রূপণায় হরিণ ও মূসার কল্পনা, অবধূতীর বর্ণনায় ডোম্বী বা কমলিনীর কল্পনা, সহজপুরের প্রতীক হিসাবে পদ্মবন ও জ্যোৎস্না বাড়ীর কল্পনা এবং চিত্ত-চালনায় নৌ-বাহনের রূপকগুলি অভিনব ও উপভোগ্য।

চর্যার গীতি-রূপ ও ছন্দ বৈচিত্র্যও ইহার অলঙ্করণের আর এক দিক। রাগ

ও ছন্দের যোজনায় সাধকদের প্রমুক্ত মন ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছন্দ-তত্ত্বজ্ঞ ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, 'মুক্তক সৃষ্টির গৌরব রবীন্দ্রনাথের নয়, চর্যাকবিরই প্রাপ্য।' (দ্রষ্টব্য—'চর্যাগীতির ছন্দ')।

বস্তুতঃ (গ্রাম্য ভাষার সঙ্কলনে, কাব্য শোভাকর অলঙ্কার যোজনায় এবং ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদনে চর্যাকারগণ যে প্রমুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, সৌন্দর্য-চর্বণার দিক হইতে তাহা উপেক্ষণীয় নহে।)

'এহো বাহ্য'। আধুনিক কালের বিচারে কাব্য-কবিতার প্রধান বিচার্য মানব জীবন। জীবন-রসে পূর্ণ রচনাই কাব্য। এদেশের ধর্মসাহিত্যে জীবনকে কখনও অস্বীকার করা হয় নাই। রস অলৌকিক হইলেও রসের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ লৌকিক জীবনের ভাব ও ক্রিয়া। কাব্য ও ধর্ম সাহিত্যের প্রধান পার্থক্য—জীবনসম্পর্কে দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে। কোন কোন দেশে ধর্মকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়া জীবনসম্পর্কে একটি একপেশে ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে ধর্ম ও জীবন অপৃথক্। ইহজীবনের কাম্য অর্থ ও কাম; এদেশে অর্থ ও কাম ধর্ম ও মোক্ষের বন্ধনীতে আবদ্ধ, যেন অর্থ ও কামের বৃন্তে প্রস্ফুটিত ধর্ম-মোক্ষের পুষ্প। এখানে বৈরাগ্যের গৈরিক রঞ্জিত হয়, মহাপ্রেমের রক্তরাগে। সর্বত্যাগী ঈশ্বর শিব আমাদের জীবনের আদর্শ, ধর্মেরও আদর্শ: যে শিব ভোগীর ভোগী, আবার যোগীর যোগী। এদেশের প্রাণের ধর্ম প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যকে অস্বীকার করিয়া নহে, ইন্দ্রিয়ের প্রবল সংঘাতের মধ্যেই বীতভোগ শুদ্ধ ধ্রুব শান্তিকে প্রত্যক্ষ করে। তাই এখানে ধর্মের সঙ্গে জীবন ও জীবনের সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোত। এখানে ভোগ-উজ্জ্বল হিরণ্ময় পাত্রে আবৃত পরম সত্যের শুভ্র মুখ। কবিরা কবিত্ব করিয়া বলেন, 'ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা।'

গৌড়বঙ্গের প্রথম ভাষা-কাব্য চর্যাগীতির কাব্যমূল্য বিচারে এই কথাটি সর্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে, (তত্ত্বপ্রধান হইলেও চর্যার তত্ত্ব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সহজশূন্যতা পূর্ণতায় ভরা ('চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না'—৪২)। সহজতত্ত্ব সহজ প্রাণের নন্দন তত্ত্ব। সহজসাধনের চর্যা—'স্বচ্ছন্দ চর্যা'—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের জগতে 'পঞ্চবর্ণ বিহার'।) সাধনবলে যাঁহারা স্ব-পর ভেদ ভুলিয়া অদ্বৈত বোধশুদ্ধ কায়া-তরুতে করুণার পুষ্প বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলেন,) তাঁহারা 'জগদর্থকরুণাভারস্তিমিতহৃদয়'; (জগতের প্রতি তাঁহারা 'করুণারসবিদ্ধ')

জীবনের প্রতি এই মহাকরুণার আন্দোলন চর্যাগানগুলিকে কাব্যের মত আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের আনন্দ-তত্ত্ব যদি কাব্যের বিষয় হয়, তবে চর্যাগীতি অবশ্যই কবিতা; জীবনের প্রেম, আনন্দ-বেদনা, আশা-নৈরাশ্যের সংবেদন যদি কাব্য হয়, তবে চর্যাগীতি সত্যই কবিতা; জীবন-নিষ্ঠা ও জীবন-রস-রসিকতার প্রকাশ যদি কাব্য হয়, তবে চর্যাগীতি অবশ্যই কাব্যধর্মী।

আধ্যাত্মিক রচনা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—স্তুতি, প্রার্থনা, নীতি-উপদেশ, সাধন-প্রক্রিয়ার নির্দেশ ও তত্ত্বানুভবের প্রকাশ। চর্যাগানে স্তুতি-প্রার্থনার অংশ নাই বলিলেও চলে। সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ কিছু আছে, যেমন, মহাসুখ পরিমাণ কর (১), শূন্য পক্ষকে আলিঙ্গন কর (১) কায়াতরুর মূল ছিন্ন কর (৪৫) প্রভৃতি। এগুলির কাব্যসৌন্দর্য তেমন নাই। তবে কোথায়ও বা শ্লিষ্ট শব্দের প্রয়োগে এবং অলঙ্কারের যোগে সাধনমূলক উপদেশের কোন কোন অংশ কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, যথা—

সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দ সুজ্জ বেণি পখা ফাল॥—৪

শাশুড়ীকে ঘরে তালাচাবি দিয়া, চন্দ্র-সূর্যের দুই পক্ষ খণ্ডন কর। কিংবা, 'মাররে জোইআ মুসা পবণা' (২১)—ওরে যোগি, চঞ্চল মূষিককে নিহত কর। এই উপদেশগুলির বিশেষ মূল্য সাধক-চিত্তের আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায় এবং জ্ঞানের গভীরতায়। দৃঢ় প্রত্যয়ের নিরাভরণ প্রকাশ, অনেকক্ষেত্রে একটি কাব্য-শোভাকর বাক্য অপেক্ষা অধিক ব্যঞ্জনা-গভীর। যেমন, চর্যাগানের এই অনুশাসনগুলি—'ণ ভুলহ রাজপথ কণ্টারা' (১৫), 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ' (৩২), 'অনুভব সহজ মা বোলু রে জোই' (৩৭) প্রভৃতি।

চর্যাগীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তত্ত্ব হইলেও এই তত্ত্ব শুষ্ক, নীরস জ্ঞান-তত্ত্ব নহে। কারণ তত্ত্ব এখানে 'মহাসুখ' বা 'সহজানন্দ': এ সুখ পার্থিব মিলনের বিপুল আনন্দ হইতে পৃথক নহে। এই সুখরূপ তত্ত্বকে লাভ করিবার উপায় 'মহারাগ': এ রাগ জাগতিক কামনারই (স্ত্রী-পুং-যোগের) একটি রূপ—অতি প্রচণ্ড, অথচ মহনীয়—বাস্তব অথচ যোগকৌশলে রহস্যগূঢ়। উপেয় ও উপায়—উভয়ই জীবন-মন্থনোদ্ভূত রসে নিষিক্ত এবং জীবনের উষ্ণ উত্তাপে প্রাণ-চঞ্চল। যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে, তেমনই চর্যাগীতিতে রসই তত্ত্ব, তত্ত্বই রস।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, চর্যাগীতির এই 'সুখ' ও 'রাগ' ঠিক জাগতিক রাগ-সুখ

াহে; পরমার্থতঃ এগুলি ইন্দ্রিয়জ রাগ-সুখের অতীত একটি অলক্ষ্য, লক্ষণহীন, অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় রাগ-সুখ। কারণ, চর্যাকারেরা বলেন, এই তত্ত্বের মননে ইন্দ্রিয় বৃত্তি মূর্ছিত হইয়া যায়—'জাসু মুণন্তে তুট্টই ইন্দিআল' (চর্যা. ৩০)। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রাগ-সুখ হইতে পৃথক হইলেও এগুলি অসত্য নহে। যে গুলিকে আমরা ধরিতে-ছুঁইতে পারি, তাহাই যে শুধু সত্য ও কাব্যের বিষয়, তাহা নহে। কাব্যের বিষয় চিরকালই স্থুল ধরা-ছোঁয়ার অতীত। কবির কল্পনায় ও অনুভবে এমন একটি অসাধারণ যাদুস্পর্শ থাকে, যাহা ধূলি-মলিন বস্তুকে, অন্য বস্তু এবং অধিকতর সত্য বস্তুরূপে প্রতিভাত করায়। বিশেষতঃ সাধকের স্বসংবেদ্য তত্ত্ব একটু অসাধারণ। তাহা এলোকে অলোকের স্পর্শে সমুজ্জ্বল। অথচ তাহা মিথ্যা নহে, অতিশয় সত্য।

এই সত্যের প্রকাশ লইয়া এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য-শাখার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা মিষ্টিক সাহিত্য শাখা। আধ্যাত্মিক রচনা-শাখায় চর্যাগানগুলি মিষ্টিক ভাবনায় রহস্য-মধুর। তাহা সন্ধ্যার গোধূলির মত একটি অভূতপূর্ব আবেদন সৃষ্টি করে, যেন আবছা অন্ধকারে দিকচক্রবালে শুক্রজ্যোতি উষার প্রথম আবির্ভাব। আধ্যাত্মিক রচনাবলীতে মিষ্টিক রচনা বিশেষভাবে কাব্যধর্মী। সৌন্দর্য ও বিস্ময়ের সম্মিলনে তাহা শুধু অসামান্য নহে, হৃদয়গ্রাহী। চর্যাগীতি ও মিষ্টিক কবিতা। মিষ্টিকের অন্তর্গূঢ় রহস্যময় অনির্বচনীয় তত্ত্ব, সেই তত্ত্বকে লাভ করিবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ও অনির্দেশ্য লোকের দিকে সাধকের যাত্রা, মিষ্টিকের আভাস-রহস্য ও রূপকতা এবং পরম কাম্যধনের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিবিড় আনন্দ-তন্ময়তা—সবই চর্যাগানের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গের গীতিকবিতার প্রথম প্রকাশ মিষ্টিক অনুভবে। সহজ সিদ্ধাচার্যদের গান—তাহার আদি বাক্-প্রতিমা। উহা উচ্চাঙ্গের কাব্যধর্মে সমুজ্জ্বল।[১]

চর্যাগীতির এই মিষ্টিক ভাবের সহিত নিবিড়ভাবে শ্লিষ্ট উহাদের রূপকধর্ম বা প্রতীকতা। E. Underhill বলেন, "All kinds of symbolic language come naturally to the articulate mystic, who is often a literary artist as well." (Mysticism)

এই রূপক-প্রতীকতার প্রকাশে সাধক কবিগণ বস্তুজগতের সঙ্গে যে নিবিড় পরিচয় উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহার কাব্যমূল্যকে অতি বড় কঠোর সমালোচকও

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য—'চর্যাগীতির মিস্টিসিজম্'

অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আচার্য মোহিতলাল বলেন, "সাধক-সঙ্গীতের মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা কাব্যধর্মী সেগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের একটি না একটি সুমধুর বেদনা—উদাসীনতার মধ্যেও এই জীবনের প্রতি একটি না একটি মমত্বের ব্যঞ্জনা গৌণ ভাবে ফুটিয়া উঠে। উহাই উহার কাব্যরস।" (জীবন-জিজ্ঞাসা: কবিতা ও বৈরাগ্য)। এইদিক হইতে চর্যাগীতির বহিরঙ্গ রূপ-চিত্রগুলি নিশ্চয়ই কবিত্বের নিদর্শন। এই জীবন-চিত্রগুলি লোকজগতের অভিজ্ঞতায়, সূক্ষ্ম বস্তুজ্ঞানে, লোকচরিত্রের চিত্রণ-দক্ষতায় ও জীবন-রস-রসিকতায় ভাস্বর। তত্ত্বদর্শী সাধকেরা এখানে জীবন-প্রেমিক কবি।

এই বস্তুজ্ঞান ও জীবন চিত্রের প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। চর্যায় কবির দৃষ্টি সুদূর, অপ্রত্যক্ষ কোন মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ছুটে নাই; অভিজাত কোন জীবনের প্রসঙ্গও সাধক কবিগণ উত্থাপন করেন নাই। তাঁহাদের সমগ্র দৃষ্টি রঞ্জন-রশ্মির মত সংহত হইয়াছে সাধারণ জীবনের মর্ম-কেন্দ্রে। সেখানে শ্বশুরের নিদ্রার সুযোগে বধূ কাম-অভিসারে যাত্রা করে (২), শুঁড়িনী মদ চোলাই করিয়া চৌষট্‌ঠি ঘড়ায় পসরা দেয় (৩), প্রেমিকার মুখচুম্বন করিয়া প্রেমিক কমলরস পানের আনন্দ অনুভব করে (৪); সেখানে শবর-শবরীর প্রেমোন্মত্ত জীবনের সংবাদ (২৮,৫০), ডোমরমণীর স্বচ্ছন্দ-জীবন-চর্যা (১০), মাতঙ্গ-কন্যার নদী-পারাপারের চিত্র (১৪) এবং অভাবক্লিষ্ট জীবন চলমান ও জীবন্ত হইয়া উঠে। কেমন করিয়া লাউয়া-বীণা তৈরী হয়, অঙ্গুলিচাপে বত্রিশ-তন্ত্রী বীণা ঐকতান সৃষ্টি করে—(১৭), কেমন করিয়া সাঁকো প্রস্তুত করা হয় (৫), নৌকা বাওয়া হয় (৮), শিকার ধরা হয় (৯), ধুনুরীরা তুলা ধুনে—(২৬)—এই সকল অতি পরিচিত, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, চিত্রে চর্যাগান পূর্ণ। এই দিক হইতে চর্যাগীতি অতি সাধারণ জীবন-চিত্রের চিত্র-শালা।

চর্যাগীতিকারদের এই জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে হাজার বছর পরের নব্য রোমান্টিক যুগের প্রখ্যাত গীতিকবি Wordsworth-এর দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। Wordsworth হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া সাধারণ লোকের জীবন ও চরিত্রগুলিই অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সাধারণ লোক-ভাষাই ছিল তাঁহার ভাব-প্রকাশের ভাষা।[1] Coleridge প্রমুখ কবি Wordsworth-এর

1. The principal object, then, proposed in these poems was to choose incidents and situation from common life and to relate or describe them, throughout, as-far-as practicable in a selection of language really used by men......Poetry and Poetic diction : W. Wordsworth.

এই কাব্যাদর্শের প্রতিবাদ করিলেও, কবিতা রচনার ক্ষেত্রে Wordsworth-এর মতবাদ উপেক্ষিত হয় নাই। Wordsworth বলেন, সাধারণ লোকজীবন ('Humble and Rustic life') সকলের পরিচিত এবং রক্তমাংসে সজীব; অতএব সহজ প্রাণের স্ফূর্তিতে জীবন্ত এই জীবন সকলের হৃদয়গ্রাহী এবং উহাদের ভাষাও সহজ প্রাণের সহজ ভাষা—স্বতঃস্ফূর্ত, আবেগোচ্ছল ও অকৃত্রিম। অতএব এই দীন দরিদ্রের জীবন ও তাহাদের ভাষা দ্বারাই হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের জীবননিষ্ঠ সহজিয়া সাধক কবিরাও নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন গ্রাম্য প্রাণচঞ্চল সাধারণ জীবন এবং তাঁহাদের প্রকাশের ভাষাও যথাসম্ভব গ্রাম্য ও দেশী ভাষা। অতএব কবিকর্ম হিসাবে এই কৃতিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চর্যাসাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে প্রমুক্ত প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয়বহ।

এই প্রসঙ্গে চর্যাগানগুলি যে গীতিকবিতা বা lyric poetry, তাহাও বিচার্য। আধুনিক কালের লিরিক কবিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও, চর্যাগীতি স্বানুভবেরই সুরেলা প্রকাশ। এইদিক হইতে এগুলি গীতিকবিতার সগোত্র। তবে চর্যাগানে ব্যক্তি-চেতনা অপেক্ষা গোষ্ঠী-চেতনা প্রাধান্য পাইয়াছে - ইহা স্বীকার্য। কিন্তু গোষ্ঠী-চেতনার অন্তরালে সাধক-কবিদের স্ব-সংবেদন অনেকস্থলেই ব্যক্তিগত আশা, নৈরাশ্য, ক্ষোভ, দুঃখ ও আনন্দের প্রকাশে হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। গুণ্ডরীপাদের যোগিনী-বিলাস, কম্বলাম্বরপাদের নৌবাহন, কাহ্নপাদের ডোম্বী-প্রেম, ভুসুকুপাদের সহজানন্দের অনুভব, এমন কি লুইপাদের তত্ত্ব উপদেশগুলিও যেন ব্যক্তিমনের স্পর্শে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। বিষয় এক, প্রকাশের ভঙ্গী পৃথক—লিরিক স্বানুভাবের এই গুণ বহু গানে লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু আছে ছন্দ ও সুরের যাদুস্পর্শ। শ্রদ্ধেয় তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'লিরিকের একটা মস্ত গুণ এই যে, সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে তা মনে মনে গুনগুনিয়ে বা আউড়িয়ে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে মর্ত্যলোকেই এক স্বর্গলোক রচনা করে দুদণ্ড পার্থিব ব্যাপারের হাত এড়ানো যায়। কিন্তু চর্যাগানগুলি নিয়ে ঠিক তা করার জো নেই। কারণ, চর্যাচর্য এগুলো ছন্দে উচ্চারণ করা যেমনি শক্ত, টীকাভাষ্য করে বুঝিয়ে না দিলে এর মানে বের করাও তেমনি দুরূহ। কিন্তু এ সত্ত্বেও একটু ধৈর্য্য ধরে চর্যাগান নিয়ে চর্চা করলে তার মধ্যে লিরিকের স্বাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়।" (বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা: বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)।

চর্যাগানগুলির আর এক আকর্ষণ ছোট ছোট কাহিনী বা গল্পের প্রসঙ্গ। 'সাংখ্য প্রবচনসূত্রে'র চতুর্থ অধ্যায়ে যেমন, শাস্ত্রার্থ বুঝাইতে গিয়া শাস্ত্রকার বিবিধ আখ্যায়িকার সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা যেমন গৃহস্তম্ভে লিখিত সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র কারুকার্যের মত ('সূণালিখন') ভাস্বর, চর্যাগীতির গল্পসম্পদও তেমনই তত্ত্বগর্ভ রচনায় আর এক শিল্প-কর্মের নিদর্শন। এই গল্পগুলি কোথায়ও স্বল্পরেখায় ইঙ্গিতগর্ভ, যেমন, 'সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ' (২), টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী' (৩৩) প্রভৃতি। কোথাও এই গল্প জন্তু-কাহিনী. যেমন ভুসুকুপাদের 'হরিণা' (৬) বা 'হরিণী' (২১) ; কোথায়ও এই গল্প জীবন্ত মানব-কাহিনী—যথা, বিরুআপাদের শুণ্ডিনী চর্যা (৩), কাহ্নপাদের ডোম্বী-চর্যা (১০, ১৮, ১৯), কুক্কুরীপাদের 'খমণ ভতারী'র কাহিনী (২০), ভুসুকুপাদের পদ্মাখালে বজরা নৌকা বাওয়ার কাহিনী (৪৯) এবং শবরীপাদের শবর-শবরীব মিলন কাহিনী। সংহত কবিতার অঙ্গে এই কাহিনী-বিন্যাস তত্ত্বগভীর গান গুলিকে ছোটগল্পের আস্বাদে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

চর্যাগীতি সাধক-সঙ্গীত হইলেও জীবন-ধর্মের প্রকাশে প্রাণময় ; উহা শুধু তত্ত্বের চমক নহে, জীবন-মন্থনোদ্ভুত রস। তত্ত্ব-রসিকসিদ্ধাচার্য জীবন-রসিক শিল্পী।

চর্যাগীতির ঐতিহাসিক মূল্য

(প্রাচীন বঙ্গের জন, সমাজ; রাষ্ট্র, গৃহ ও ধর্ম)

প্রাচীন সাহিত্যের মূল্য শুধু কাব্য-সৌন্দর্যে নহে, ইহার আর এক বিচার প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যায়নে। চর্যাগীতি গৌড়বঙ্গের আদি 'ভাষা'-কাব্য। উহাতে শতাধিক হাজার বছর পূর্বেকার বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ ছড়ানো রহিয়াছে। তৎকালীন বঙ্গীয় তাম্রপট্ট লিপিতে ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বঙ্গ-ইতিহাসের যে উপকরণ পাওয়া যায়, চর্যাগানের ঐতিহাসিক ও সমাজ-চিত্রের সঙ্গে তাহার মিল রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মনে, রাখিতে হইবে চর্যাগীতির স্থানিক পট বৃহৎবঙ্গের পট চর্যার ভাষাও ইহা সমর্থন করে। চর্যার ভাষা নিঃসন্দেহে অপভ্রংশ-বৃন্তে সদ্য স্ফুটনোন্মুখ প্রত্ন বাংলা, তবে উহার অবয়বে প্রাচীন হিন্দী ও প্রাচীন মৈথিলী এবং ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার কিছু চিহ্ন আছে। চর্যার ভাষাকে শুধু রাঢ় অঞ্চলের ভাষা বলাও সঙ্গত নহে। কারণ অনেকগুলি শব্দের উচ্চারণে ও

গ্রাম্যশব্দের সঙ্কলনে চর্যার ভাষায় 'বঙ্গাল বাণী'র ছাপ সুস্পষ্ট। ট-এর 'ড' উচ্চারণ (চর্যায় পাটি>পাডি, কোটি>কোডি) পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণেরই বৈশিষ্ট্য, ঈর্ষ্যা বহন করা অর্থে 'রিস' নামধাতুর প্রয়োগ (চর্যা ৯.) পাওয়া যাইতেছে পূর্ববঙ্গ গীতিকাতে ('রাজার সাত পুত্র 'রিসাইয়া' সাব—তিলকবসন্ত পালা). কাহ্নপাদের গানে সঙ্কল্প-বিকল্প জাল অর্থে 'আলাজালা' (চর্যা ৪০) শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় আলাওলের কাব্যে ('বচিন্ত বহুল গ্রন্থ নানা আলাঝালা'), তাহা ছাড়া 'দুলি' (১), 'চিখিল' (৫), দুখোল (১৪) প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দ পূর্ববঙ্গেরই গ্রাম্য শব্দ। প্রকৃত নাব্য অঞ্চল বলিতে পূর্ববঙ্গকেই বোঝায়: বঙ্গ 'নৌসাধনোদ্যত —ইহা রঘুবংশের স্বীকারোক্তি। আর চর্যাগান যেন রসস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে পূর্ববঙ্গের এই নদীমাতৃক ভূমির রসে।

চর্যায় প্রাচীন বঙ্গের প্রাগার্য কয়েকটি নরগোষ্ঠীর পরিচয় অতি উজ্জ্বল। আর্য অভ্যাগমের পূর্বে এ দেশ ছিল আদি জন-গোষ্ঠীর অধিকারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও আরণ্যকে 'বঙ্গ' নামে একটি গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ আছে। আরণ্যকে উহাকে 'বয়াংসি' অর্থাৎ পক্ষি-জাতীয় বলা হইয়াছে। মনে হয়, বঙ্গীয়েরা ছিলেন পক্ষীর মত উড়ন্ত অর্থাৎ যাযাবর। পরে জাতিবাচক 'বঙ্গ' হইতে দেশবাচক বঙ্গ এবং জাতি বাচক 'বঙ্গাল' নাম প্রচলিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণে 'বঙ্গ' অপরাধীর নির্বাসন-স্থানরূপে গণ্য। পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন-কারী বৈশ্বামিত্রগণ এইখানেই নির্বাসিত হইয়াছিলেন। সৃষ্টি সম্পর্কে কূট প্রশ্নের উত্থাপন-কারী ও গোধর্ম প্রচারক ঋষি দীর্ঘতমাকেও নির্বাসন দেওয়া হইয়াছিল বঙ্গে। আর্যদের দৃষ্টিতে বঙ্গ ছিল নিন্দনীয় উহা 'দস্যুভূয়িষ্ঠ' দেশ চর্যাগানে বঙ্গালের এই দস্যুসুলভ দুর্ধর্ষ প্রকৃতির পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এখানে 'বঙ্গাল' নির্দয় ও দেশলুণ্ঠনকারী ('আদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ'—৪৯)। তাহারা শুধু দেশ লুণ্ঠন করিতেন না, লুণ্ঠিতের জাতিনাশ করিয়া 'বঙ্গালী' করিয়া ছাড়িতেন। দ্বাদশ শতকের একটি অনুশাসন হইতেও জানা যায় 'বঙ্গালবল' সোমপুর বিহারে (বর্তমান পাহাড়পুর) আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম বলেন, 'বাঙালী গোয়ার ভয় নাহিক তিলেক' (রায়মঙ্গল)।

কিন্তু বঙ্গালের দুর্ধর্ষ প্রকৃতির অন্তরালে চর্যায় আর একটি লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। গূঢ়ার্থে 'বঙ্গাল' অদ্বয়বোধের প্রতীক। 'বঙ্গালী' হওয়া মানে দ্বৈত বোধ হইতে মুক্ত হওয়া। বঙ্গে জায়া গ্রহণ করারও একই তাৎপর্য। সরহ-

পাদের 'বঙ্গে জাআ নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণানা' (৩৯)—বাক্যের অর্থ আপন-পর ভেদজ্ঞান বিনষ্ট করা বা অবিদ্যা দোষ হইতে মুক্ত হওয়া। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'বাঙ্গালী' সহজমতের একটি পথ, উহাতে 'কেবল অদ্বৈত, দ্বৈতের ভাঁজও থাকে না।' মনে হয়, 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাল' যত দুর্ধর্ষই হউক, তাঁহারা জাতি-বর্ণ ভেদ মানিতেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিতে স্বপর-বিভাগও ছিল না, অধ্যাত্ম-জগতে তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রাচীন জাতীয় ইতিহাসের দিক হইতে 'বঙ্গে'র এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

চর্যায় আদি জন-গোষ্ঠী রূপে শবর-শবরীর উল্লেখ পাওয়া যায় দুইটি গানে (২৮, ৫০)। পণ্ডিত-গবেষকগণ মনে করেন, শবর আর্যপূর্ব আদি অস্ট্রাল জন-গোষ্ঠীর একটি সুপ্রাচীন জন (Tribe)।[১] চর্যায় চিত্রিত শবর-শবরীও আর্য-সমাজ-বহির্ভূত আদি জনের প্রতীক। তাঁহাদের বাস উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে, বিহার পার্বত্য অরণ্য ভূমিতে ('উঁচা উঁচা পাবত তাহি বসই সবরী বালী'—২৮); ৫০ সংখ্যক গানেও উচ্চভূমিতেই শবরীর বাস। পুষ্প-আভরণে শবরীর অঙ্গসজ্জা, ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, গলায় গুঞ্জামালা, কর্ণে বজ্রকুণ্ডল। শবরের বাড়ীর পাশে 'কঙ্গুচিনা' (কাউন-চিনা) পাকে, কাপাস ফোটে। এগুলি অষ্ট্রিক জাতির কৃষি-নৈপুণ্যের পরিচয়বহ। শবর শরসন্ধান করে, ব্যাধবৃত্তিও ছিল ইঁহাদের জাতিবৃত্তি। অন্ন-বস্ত্রের অভাব যখন না থাকে, তখন ইঁহারা জীবন-সম্ভোগে মত্ত। (চর্যায় শবর-শবরীর রুচি-সঙ্গত ভোগোন্মত্ত জীবনের চিত্র অতি উজ্জ্বল। অবস্থা যে ইহাদের মন্দ, তাহা মনে হয় না। কাহারও কাহারও তিন-চারখানা বাড়ীও থাকিত। ৫০ সংখ্যক গানে শবরের 'তইলা বাড়ী'র পাশে 'জোন্‌হা বাড়ী'। ২৮ সংখ্যক গানে দেখা যায়, শবর বিহারের জন্য তিন ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র) নির্মিত খাট পাতে, বিহারকালে তাম্বুল-কর্পূর খায়। শবর-রমণীদের স্বাধীনতাও ছিল: সাজিয়াগুজিয়া তাঁহারা একলা বনবিহারে বহির্গত হইত ('একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী'—২৮)। সম্ভবতঃ অবাধ মিলনেও বাধা ছিল-না।) নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে ছিল জীবনের যোগ। সম্ভোগের

১. The Proto Australoids of India, after they became modified into the primitive Austric-speaking people, came in touch with the Aryans after these have invaded India in times posterior to 1500 B. C. and the Aryans came to know them as Nisadas as Sabaras and as Pulindas etc. (Kirata-Jana Kriti : Dr. S. K. Chatterjee).

জন্ত জ্যোৎস্না বাড়ীর কল্পনা সুরুচির পরিচায়ক। (মৃত্যুর পরে শব দাহ করা হইত। হিন্দুর মতই বাঁশের চৌপায়াতে শব বহন করা হইত এবং দশদিকে কাক-বলি দেওয়া হইত। সম্ভবতঃ হিন্দু-সংকারে 'কাকবলি' দেওয়ার প্রথা এই সমাজেরই দান।)

শবর-শবরীর লৌকিক জীবনচিত্র ছাড়াও তাঁহাদের আর একটি ভূমিকা বৌদ্ধতন্ত্রে, তথা চর্যাগানে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সাহিত্যে রামায়ণে শবরী ধর্মপ্রাণা নারী, তন্ত্রে শবরী দেবী। বৌদ্ধতন্ত্রে শবর স্বয়ং বজ্রধর, শবরী স্বয়ং নৈরাত্মা। চর্যাটীকা মতেও সবর —'সকারপরো হ স এব পবিধরঃ' এবং শবরী —'তস্যা গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা হঁকারভা' অর্থাৎ নৈরামণি। দেহের শীর্ষকমলে সহজ-কায়ে তাঁহাদের মিলন-মহাসুখ। চর্যাগীতিতে শবর-শবরীর এই ভূমিকা একটি সমাজে তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

আদি অস্ট্রালের আর এক গোষ্ঠী নিষাদ। চর্যায় পাই 'ভুসুকু অহেরী'র প্রসঙ্গ (৬)। শিকার-বৃত্তি ইঁহাদের জাতিবৃত্তি। দুইটি চর্যায় (৬, ২৩) হরিণ শিকারের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

(চণ্ডাল ও ডোম ('ডোম্ব') বহুকাল যাবত হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে স্থান লাভ করিয়া আছে। যে সমস্ত অনার্য আদিবাসী হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, হিন্দু সমাজের অধম শূদ্র শ্রেণীভুক্ত ডোম-চণ্ডাল তাহাদেরই প্রতীক।) সমাজে ডোম-চাঁড়াল এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আদৌ উভয়ের জাতি-বৃত্তি এক ছিল না। Caste in India গ্রন্থে সমাজতত্ত্ববিদ্ J. H. Hutton ও ডোম ও চণ্ডালের পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। মনে হয়, এই বিবরণে কিছু গোলমাল আছে। (আর্যসমাজে বহুকাল যাবত চণ্ডালের বৃত্তি শ্মশানে শব দাহ করা।) হিন্দু স্মৃতিতে (মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়) চণ্ডালের এই প্রকার বৃত্তির কথাই বলা হইয়াছে ('শবঞ্চৈব নির্হরয়েৎ')। (লৌকিক জীবন-বৃত্তের দিক হইতে চর্যাগীতিতেও চণ্ডালের বা চণ্ডালীর এই বৃত্তিই উল্লেখিত।) ৪৯ সংখ্যক গানে দেখা যায়, ভুসুকুপাদের গৃহিণীকে 'চণ্ডালেঁ লেলী'। সম্ভবতঃ বঙ্গালের লুণ্ঠনে নিহত হইয়াছিলেন ভুসুকু-গৃহিণী, কাজেই দগ্ধ করার জন্ত তাহাকে গ্রহণ করিল চণ্ডাল। ৫০ সংখ্যক গানেও শবরের মৃত্যু হইলে, চণ্ডালীকে দিয়া শব দাহ করা হইয়াছে। (৪৭ সংখ্যক গানে দেখা যায়, ভীষণ

অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য : 'চণ্ডালী' এখানে বহ্নির প্রতীক—সেই বহ্নিতে দগ্ধ হইতেছে ডোম্বীর ঘর, দগ্ধ হইতেছে হরি-হর-ব্রহ্মা (ডঃ সেনের মতে এগুলি দেব-প্রতিমার প্রতীক), দগ্ধ হইতেছে শাসন-পাট্টা। দগ্ধ করাই চণ্ডাল বা চণ্ডালীর অতি ভীষণ রৌদ্র কর্ম। সম্ভবতঃ আদৌ ইঁহারা ছিলেন রুদ্র কর্মরত অতি প্রবল এক অনার্য গোষ্ঠী। চণ্ডালের দাহ-কর্ম কিন্তু চর্যাগানে গূঢ়ার্থে প্রচণ্ড প্রজ্ঞা বা জ্ঞানাগ্নির প্রতীক। সহজ-সাধনায় বজ্র-পদ্ম যোগের উহা একটি স্তরবিশেষ। ইহা কিন্তু বঙ্গ-ইতিহাসের অন্য একটি ইঙ্গিত বহন করে : চণ্ডাল রুদ্র, রৌদ্র কর্মই তাঁহার কর্ম। কিন্তু সে চণ্ডাল ব্রাত্য রুদ্রের মতই অজ্ঞানের বিনাশক।

চর্যাগীতিতে উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত হইয়াছে ডোম্বী বা ডোম জাতির জীবন-চিত্র। হিন্দু-সমাজবিধির ভিত্তিতেই বাহিরের দিক হইতে ডোম-রমণীর ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিধিমতে—নগরের বাহিরে ডোম-নারীর বাস। সমাজে তাঁহারা অস্পৃশ্য। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ছোঁয় না, তিনিও ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করেন না। ডোম-নারী বংশ-তন্ত্রী নির্মিত চাঙ্গারি বিক্রয় করেন (১০)। ১৪ সংখ্যক গানের ডোম্বী মতঙ্গ-কন্যা ('মাতঙ্গী') ; তিনি গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নৌকায় মানুষ পারাপার করেন, ভাঙ্গা নৌকার জল তুখোলে সিঞ্চন করেন, পারাপারের কড়ি-বুড়া আদায়ে তাঁহার কেমন কড়াকড়ি নাই—যোগীকে তিনি বিনামাশুলে পার করিয়া দেন ? নৌবাহনে তিনি কুশলী। সমাজ-জীবনে ডোম নারীরা বোধ হয়, নটবৃত্তি গ্রহণ করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতেন। একটি গানে দেখা যায় ডোমনার নৃত্য-পরায়ণা, রূপ—

এক সো পদুমা চৌষডী পাখুড়ী।
তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥—১০.

ডোম্বীর এই নৃত্যচঞ্চলা রূপ অনেককে আকর্ষণ করিত। চারিত্রিক দৃঢ়তা হয়তো তাঁহাদের তেমন ছিল না : ডোম্বী কুলীনেরও সেবা করিতেন, কাপালিককেও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। ডোম-রমণীর সঙ্গলাভের জন্য বিশেষ-ভাবে আগ্রহী হইতেন কাপালী যোগী। কেহ কেহ ইঁহাদের জন্য সর্বত্যাগী হইতেন। ১৯ সংখ্যক গানে পাওয়া যায় ডোম্বী-বিবাহের চিত্র। এই বিবাহ-চিত্র সাধারণ বিবাহ-চিত্র হইতে ভিন্ন নহে। বিবাহে বর দোলায় (করণ্ডক) চড়িয়া যাত্রা করেন, বাদ্য বাজে পটহ-মাদল-দুন্দুভী, উলুজোকারে জয় জয় শব্দ উত্থিত হয়। বিবাহে বর যৌতুকও লাভ করেন। সহজ-উন্মত্ত যাঁহারা, তাঁহারা ডোম্বীকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হন।

এইখানেই চর্যাগীতিতে ডোমশ্রেণীর বিশিষ্ট ভূমিকা। সহজ-সাধনায় ডোম্বী অবধূতিকার প্রতীক। তিনিই কর্মমুদ্রা, সময়মুদ্রা ও জ্ঞানমুদ্রা—মহামুদ্রা-সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা। যোগী এই ডোম্বীর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কাপালী-বেশ ধারণ করেন। তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সহজ-মহাসুখে বিভোর হন। সাধক বলেন, 'বিতুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠে ন মেলঈ' (১৮)। শুধু তাহাই নহে, ডোম্বীর সঙ্গে যে যে যোগী রত, সেই সহজ-উন্মত্ত যোগী মুহূর্তের জন্যও ডোম্বীকে আলিঙ্গন মুক্ত করেন না—

ডোম্বী-এর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ-ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো ॥—১৯.

হিন্দু সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেখানো হইলেও, মনে হয়, 'চণ্ডাল' ও 'ডোম' আদৌ ছিল আদি জনগোষ্ঠীর প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী একটি গোষ্ঠী। সমাজতত্ত্ববিদ্ J.H. Hutton-ও বলেন, 'Dom....possibily representing an aboriginal tribe of some influence and power.' (Caste in India). অধ্যাত্ম জীবনে তাঁহাদের দান ছিল এবং সমাজে প্রতিষ্ঠাও ছিল। পরবর্তী বাংলা ধর্ম মঙ্গলকাব্যও দেখা যায়, ডোম বীর, নীতিপরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ।

চর্যাগীতিতে চিত্রিত আধ্যাত্মিক প্রভাবসম্পন্ন এই সকল জনগোষ্ঠীর বর্ণনা বঙ্গের বিস্মৃত ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে। যখন এদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, ব্রাহ্মণ্য সমাজবিধি বর্ণভেদ এ দেশের আদি জনগোষ্ঠীকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন করে নাই, তখন সমাজে নেতৃত্ব করিতেন ইঁহারাই। ইঁহাদেরই শক্তি, সাহস, সৌন্দর্য-বোধ, প্রাণের স্ফূর্তি, নিসর্গ-প্রীতি, রুচি ও অধ্যাত্ম ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিল 'বঙ্গ' নামক ভূভাগ। অতীতের সেই বঙ্গাল, শবর, নিষাদ, চণ্ডাল, ডোমের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে চর্যাগীতিতে চিত্রিত অপাংক্তেয় জনগোষ্ঠী।

চর্যাগানে আমরা যে সমাজ-গড়নের পরিচয় পাই, তাহা হিন্দু সমাজেরই গড়ন। সে সমাজের উচ্চ কোটিতে বটু ব্রাহ্মণ, নিম্ন কোটিতে ডোম-চণ্ডাল—মধ্যে উত্তম বা অধম শূদ্র। তবু এখানে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নানা প্রসঙ্গে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তখনও সমাজে নানাপ্রকার বৃত্তিধারী লোক ছিল। ডোম-চণ্ডালের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ছিল শৌণ্ডিক (শুঁড়ী), ধুনুরী, তন্তুবায়, সূত্রধর ও বণিক। শুড়ী-বৌ মদ

চোলাই করিত।) বিভিন্ন মাদক দ্রব্য একটি ঘটে ঢালা হইত—তাহার পর চিকণ বাকলে সেই মদ ছাকা হইত—

এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীকণ-বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ ॥—২

মদ তৈরী করার উদ্দেশ্য ছিল দেহকে তাজা চাঙ্গা ('জে অজরামর হোই দিঢ কান্ধে') করিয়া তোলা। চৌষট্টি ঘড়ায় পসরা সাজানো হইত; বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহকগণ নিজেরাই সেখানে উপস্থিত হইত। বিক্রয়-স্থানেই গ্রাহকগণ মদ্যপান করিয়া চুপচাপ না থাকিয়া হট্টগোল করিত—'পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা।' এটি শৌণ্ডিকালয়ের সাধারণ দৃশ্য।

(শান্তিপাদের একটি গানে (২৬) পাওয়া যায় তুলা-ধুনার প্রসঙ্গ। তুলা ধুনিয়া আঁশ করা হইত।) সেই আঁশ ধুনিয়া আরও সূক্ষ্ম করা হইত। তুলার পূর্বরূপ আর থাকিত না। তাহার পরে তাহা ওয়াড়ে ভরিয়া সেলাই করা হইত। এমনভাবে সেলাই হইত যে, ওয়াড়ের দুই পাশ একেবারে মিলিয়া যাইত—চুলমাত্র রেখাসন্ধিও দেখা যাইত না—

'বহল বাট দুই আর ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥'—২৬

(সূত্রধরের প্রসঙ্গ সোজাসুজি না আসিলেও, ৫ সংখ্যকগানে সাঁকো তৈরীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।) প্রথমে বৃক্ষ ছেদন করিয়া পটি (ছাউনি) প্রস্তুত করা হইত। কড়ির সঙ্গে সেই পটি জোড়া দেওয়া হইত এবং টাঙ্গি (কুঠার) দিয়া কাড়ি ('কোড়িঅ') দৃঢ় করা হইত।

(নৌকার ব্যাপক প্রসঙ্গ দেখিয়া মনে হয়, নৌ-বাণিজ্যের প্রসার ছিল। নৌকা শুধু পারাপার করিত না, সোনার ভরা লইয়া নদীপথে যাত্রা করিত (৮)। বজরা নৌকার পাটি (বাজণাব পাড়ি-৫০)—'চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরে'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এরূপ শক্ত (বজ্র) নৌবহর দূর জলপথের উপযোগী। বেদে আমরা আর্য-বিরোধী 'পণি' জাতির কথা পাই, তাহাদের একদল বঙ্গের এই নাব্য অঞ্চলেই বাস করিতেন। যাস্ক মতে 'পণি' মানে বণিক। (চর্যার বণিকের নৌ-বাণিজ্য সেই প্রাচীন গৌরবের স্মারক।)

চর্যাগীতি কর্মবহুল সাধারণ জীবনের বিচিত্র চিত্রশালা। চর্যাগানে বৃহত্তর রাষ্ট্রজীবনের কথা নাই। দুই একটি গানে 'রাজপথ কণ্টারা' প্রসঙ্গে—রাজপথ

যে কনক ধারায় মণ্ডিত, তাহার আভাস পাওয়া যায়। টীকায় বলা হইয়াছে, রাজারা সেই পথে সোজা প্রমোদউত্থানে প্রবেশ করিতেন। দাবা খেলার প্রসঙ্গে (১২)—হস্তী-নৌকা-পদাতি লইয়া রাজায়-রাজায় যুদ্ধের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রণাদাতা। তাঁহার মন্ত্রণায় বিপক্ষের বলকে নিঃশেষে পরাজিত করিয়া রাজাকে বন্দী করা হইত। কোন রাজা লৌকিক রাজ্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রাজত্বকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন (৩৪)। ৪৮ সংখ্যক গানটি লুপ্ত। ডঃ প্রবোধ বাগচী-প্রদত্ত তিব্বতী অনুবাদের সংস্কৃত ছায়া হইতে ওই গানে পুরী-জয়ের একটি চিত্র পাওয়া যায়। রণরঙ্গে সৈন্যগণের প্রবেশ, শঙ্খ-তূর্য ধ্বনি, দুর্গজয় ও পুরলুণ্ঠনের ইঙ্গিত উহাতে আছে। নগরে রাত্রির প্রহরী দৌঃসাধি নগররক্ষকের কাজ করিতেন—কিন্তু অনেক সময় প্রহরীই হইতেন চোর—'জো যো চৌর সৌ দুষাধী' (৩৩)। নদীপথে যাতায়াত নির্বিঘ্ন ছিল না ঃ দুর্ধর্ষ বঙ্গাল দস্যুতা করিত। তবু বাণিজ্য উপলক্ষ্যে নৌ-যাত্রা স্থগিত থাকিত না (৮)। দেশে ধনবান্ লোক ছিল, তাঁহারা ছিলেন পঞ্চ পাটনের মালিক, কাহারও বা সঞ্চয় চতুষ্কোটি মুদ্রার ভাণ্ডার ('চৌকোডী ভণ্ডার')—সোনা-রূপার সঞ্চয় তো ছিলই। কিন্তু সময়ে দস্যুরা এরূপ ধনীকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া ফেলিত (৪৯)। দস্যু-তস্করের উপদ্রব সেকালেও ছিল।

কিন্তু চর্যাগীতিতে হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে সাধারণ গৃহজীবনের ছবি। গানের সংহত চরণে অঙ্কিত হইয়াছে আমাদেরই চারিপাশে বিকীর্ণ গার্হস্থ্য জীবন। সে জীবন সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায় করুণ-মধুর। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, বধূ লইয়া বাঙালীর যৌথ পরিবার। কখনও সে পরিবারে শ্যালিকাও স্থান লাভ করিত। কাপাস বস্ত্র পরিয়া, মোটা ভাত খাইয়া জীবন মোটামুটি সুখে কাটিত। গৃহস্থ বাড়ীতে গাভীও থাকিত। পাত্র ভরিয়া তিন-সন্ধ্যা দুগ্ধ দোহন করা হইত ('পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে'—৩৩)। গোহালে গাভী-বলদের ভিতর দুষ্ট বলদও থাকিত। গৃহীরা দুষ্ট বলদ অপেক্ষা শূন্য গোয়াল প্রশস্ত মনে করিতেন, 'বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ্য বলংদে'—৩৯।

বাঙালীর গৃহজীবনের দারিদ্র্য-দুঃখ আভাসিত হইয়াছে ৩৩ সংখ্যক গানে। 'হাড়ীত ভাত নাহি'—এ দুঃখ মর্মান্তিক। অথচ অভাবের সংসারে অতিথি-অভ্যাগতেরও অপ্রতুলতা ছিল না। অচল সংসারে নিত্য সন্তান-সন্ততির আবির্ভাবে সংসারে লোক-সংখ্যা বাড়িয়াই চলিত—'বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ।'

সংসারের এই অভাবের তাড়না বিশেষ করিয়া সহ্য করিতে হইত নারীকে। নারীর মর্ম-বেদনায় চর্যাগীতি স্থানে স্থানে অশ্রু-সজল।) ২০ সংখ্যক গানে পাই খ্যাম্‌না বা ঢ্যামনা-ভাতারীর দুঃখ। বাঙালীর সংসারে স্বামী উদাসীন হইলে নারীর দুঃখ-বেদনার অন্ত থাকিত না। নারী চায় গৃহমুখী স্বামী, ঘরমুখী সন্তান। কিন্তু যাহা সে চায়, তাহা পায় না—'জা এথু চাহাম সো এথু নাহি'। সাধারণতঃ স্বামী হয় বেকার উদাসীন, সন্তানও হয় 'বায়ুড়া' (বাউল)। নারী তখন গভীর দুঃখেই বলে, 'হাঁউ নিরাসী খমণ-ভতারি'; শ্লেষ কঠিন হইয়া উঠে কণ্ঠে—'নব জৌবন মোর ভইলেসি পূরা'।

নারী-চরিত্র যে সর্বত্রই সাধ্বীর চরিত্র হইত, তাহা নহে। অনেকে বাহিরের উঠানকেই ঘর মনে করিত; দিনের বেলায় যে বধূ নিজের দেহছায়া দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠে, সেও রাত্রিতে শ্বশুর নিদ্রাভিভূত হইলে জাগিয়া থাকিত, কখনও তাহার কর্ণভূষা চুরি যাইত, কখনও সে স্বচ্ছন্দ বিহারে যাত্রা করিত—

দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥—২

পুরুষ-চরিত্রও সুস্থির ছিল না। শাশুড়ীকে ঘরে তালাচাবি দিয়া রুদ্ধ করিয়া নর-নারীর মিলন ঘটিত। পরকীয়া নারীর অধরামৃত পুরুষ-ভুজঙ্গের পক্ষে 'কমলরস' (চর্যা. ৪)। আর একটি ঘটনাও গৃহ-জীবনে ঘটিত, তাহা পুরুষের কাপালীব্রত গ্রহণ। শাশুড়ী, ননদ, সালী ও মায়ের মায়াবন্ধন কাটাইয়া কোন পুরুষ হয়তো কাবালী হইয়া যাইতেন—

মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে সালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥—১১

এত দুঃখ সত্ত্বেও বঙ্গভূমি ছিল রঙ্গভূমি। বীরবল প্রমথ চৌধুরী বলেন, হাস্য প্রকৃতপক্ষে 'মনের আলো', এ যেন দুঃখের উপরে 'বীরের হাসি'। সত্যকারের হাস্যরসিকের কাছে শত দুঃখেও এ আলো অনির্বাণ থাকে। চর্যার 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাঅ। রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ ॥' (২), কিংবা 'বলদ বিআএল গবিআ বাঝে' প্রভৃতি উক্তি কূটভাষণে কৌতুকোজ্জ্বল। হাস্যের অপর সার্থকতা 'সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি'তে। চর্যায় এই ধরনের প্রাণের বক্রোক্তি হাস্যরসে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে গৃহবধূর পুংশ্চলী বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া—'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ' (২) কিংবা

পাহারাদারের চৌর্য বৃত্তি লইয়া—'জো সো চৌর সৌ দুষাধী' (৩৩); গভীর দুঃখেও মনের ক্ষোভ শ্লেষে শুষ্ক হাসির রূপ ধারণ করে, যেমন স্ফীতা 'খমণ ভতারী'র এই উক্তি; আমার নব যৌবন সার্থক—'ণব জৌবন মোর ভইলেসি পূরা' কিংবা লুণ্ঠিত সর্বহারা পত্নীবিয়োজিত ভুসুকুপাদের এই শ্লেষ—'ণিঅ পরিহারে মহানেহে থাকিউ' (৪৯)। মানুষের শব দাহ করা হইলে বঞ্চিত হয় শিয়াল-শকুন, তাহা লইয়াও হাসির কথা—'শবরো ডাহ কএলা কান্দএ সগুণ-শিআলী' (৫০)।

হরিণ শিকার করা (৬, ২৩), দাবাখেলা (৯) প্রভৃতি ছিল ক্রীড়া-কৌতুকের অঙ্গ। পটহ-মাদল-দুন্দুভী বাদ্যে ও জয়-জোকারে বিবাহ-উৎসব আনন্দমুখর হইয়া উঠিত (১৯)। লাউয়া বা তুম্বী বীণার বত্রিশ তন্ত্রী কম্পিত করিয়া কখনও উঠিত সারি গানের রোল। অধ্যাত্মবাচক শান্ত রসাত্মক নাচগান জীবনে শান্তি বহন করিয়া আনিত—'বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই' (১৭)। ডোমরমণীর নৃত্যকুশলতাও দর্শকের মনোরঞ্জন করিত। পদ্মদলে ডোম্বীর নৃত্য সত্যই চিত্তাকর্ষক (১০)। তামসিক আনন্দেরও অপ্রতুলতা ছিল না। মদ্যপায়ীর মত্ত কোলাহলে শৌণ্ডিকালয় মুখর হইয়া উঠিত। নেতিবাচক উক্তিতে ইতিবাচক সঙ্কেতটি উপভোগ্য—'পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা' (৩)।

তৎকাল-প্রচলিত ধর্মজীবনেরও আলেখ্য রহিয়াছে চর্যাগানে। চর্যায় সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রাধান্য। সহজিয়া বৌদ্ধদের দৃষ্টির আলোকে পাওয়া যায় অন্য ধর্মের প্রসঙ্গ। বেদাচার, পৌরাণিক ধর্ম ও তন্ত্র তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আগম-বেদ-পুরাণ বৌদ্ধ সহজিয়া মতে 'মনোগোচর' শাস্ত্র।

তান্ত্রিক কাপালিক ধর্ম সেকালে ছিল একটি বিশিষ্ট ধর্ম। এই ধর্ম যত নিন্দিতই হউক, অন্যান্য ধর্মের উপর তাহার প্রভাব ছিল। কাপালিকরা ছিলেন যোগপন্থ। তাঁহাদের বেশ-ভূষা, আচার-আচরণও ছিল বিশিষ্ট। চরণে ঘণ্টা নূপুর, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হাড়ের মালা ও মৌক্তিক হার, দেহে ভস্মভূষণ, হস্তে ডমরু (১০, ১১)—ইহাই ছিল কাপালিকদের পরিচিত বেশ। হীনজাতীয়া রমণীর সঙ্গ তাঁহারা করিতেন। সহজ সাধকেরাও কাপালিকদের বেশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এই বেশ-ভূষার তাৎপর্য পৃথক এবং গূঢ়ার্থে আধ্যাত্মিক। ডমরু অনাহত ধ্বনির প্রতীক, ঘণ্টা-নূপুর আলোকাভাস ও আলোক জ্ঞানের প্রতীক, কর্ণকুণ্ডল চন্দ্রসূর্য কালজ্ঞানের রূপক, ভস্ম রাগদ্বেষ

মোহাদি জয়ের প্রতীক, অস্থি-আভরণ নিরংশু চর্যার প্রতীক। সহজিয়া মতে 'কাপালিক' শব্দের অর্থই হইল, যিনি ক-সুখকে পালন করেন অর্থাৎ ঐহিক সুখকে গ্রহণ করিয়াও জয় করেন। ইহাদের ডোম্বী-সম্ভোগও একপ্রকার যোগক্রিয়া। সহজিয়া বৌদ্ধগণ কাপালিক হইলেও কামজয়ী যোগী। তাঁহারা 'নিঘিণ' ঘৃণাহীন ; মায়াকে ধ্বংস করিয়াই তাঁহারা কাবালী ('মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী'—১১)। এইখানেই অন্য কাপালিকধর্ম হইতে সহজিয়া কাপালিকদের স্বাতন্ত্র্য। সহজিয়াদের সমস্ত তত্ত্ব দেহের অভ্যন্তরে।)

(সেকালে আর এক ধরনের যোগীসম্প্রদায় ছিল—যাঁহারা ছিলেন রস-রসায়ণ সিদ্ধ। যোগীর চরম লক্ষ্য দেহকে জরা-মরণ জয়ী করিয়া তোলা। অজর-অমর হইবার জন্য এই রসসিদ্ধ যোগিগণ নানাপ্রকার ঔষধি ব্যবহার করিতেন—পারদাদি দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতেন।) কিন্তু সহজ সাধকগণ এই প্রক্রিয়াকে নিন্দার চোখেই দেখিয়াছেন, বলিয়াছেন,

জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা।
সো করউ রস-রসানেরে কংখা ॥—২২

চর্যাগীতিতে নাথপন্থ যোগীদের প্রসঙ্গও আছে। তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারতে নাথপন্থ যোগীদের প্রতিপত্তি ছিল। তত্ত্বের দিক হইতে নাথ সিদ্ধাইদের তত্ত্বের সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদের মিল ছিল। পার্থক্য ছিল সাধন-প্রক্রিয়ায়। নাথ যোগিগণ হঠযোগের পথে আসন, বন্ধ, করণ, কপাট (সমাধি) আশ্রয় করিয়া চন্দ্র-সূর্য অর্থাৎ কালজ্ঞানকে রোধ করিতে চেষ্টা করিতেন। সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা এবং কঠিন আসন-প্রাণায়াম ছিল তাঁহাদের সাধনের করণ। কিন্তু সহজ সাধকেরা ছিলেন, এই সুকঠিন দেহ প্রত্যাখানের বিরোধী। তাঁহারা মনে করিতেন, কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে দেহ পীড়িত হয়, চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। অতএব শূন্যতারূপ সহজ মহাসুখ অর্জনের পথে এগুলি যোগবিঘ্ন।—লুই পাদ বলেন,—

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধকরণ কপাটের আস।
সুসুপাখ ভিতি লেহু রে পাস ॥—১

আবিষ্কৃত পুথিতে ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ গান ও একটি অপূর্ণাঙ্গ গান আছে। প্রত্যেকটি গানেই রচয়িতার নাম আছে—কোথায়ও ভনিতা রূপে, কোথায়ও বা গানের প্রারম্ভে কবি-নাম-নির্দেশিকা রূপে। ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক গান লুপ্ত ; টীকা হইতে ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক গানের রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। তিব্বতী অনুবাদ হইতে জানা যায়, ২৪ সংখ্যক গানের রচয়িতা কাহ্নপাদ। মোট ২৩ জন কবি। রচিত গীতের সংখ্যাসহ কবিদের নাম—

লুই—১, ২৯ ; কুক্কুরীপা—২, ২০, ৪৮ (লুপ্ত) ; বিরুআ—৩ ; গুণ্ডরী—৪, চাটিল—৫ ; ভুসুকু—৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯ ; কাহ্ন—৭, ৯, ১০ ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪ (লুপ্ত), ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ ; কামলি—৮ ; ডোম্বীপাদ—১৪ ; শান্তি—১৫, ২৬ ; মহিণ্ডা—১৬ ; বীণাপাদ—১৭ ; শবরপাদ—২৮, ৫০ ; আজদেব—৩১ ; ঢেণ্ঢণপা—৩৩ ; দারিক—৩৪ ; ভাদে —৩৫ ; তাড়ক—৩৭ ; সরহ—২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ ; কঙ্কণ—৪৪ ; তন্ত্রী—২৫ (লুপ্ত) ; জয়নন্দি—৪৬ ; ধাম—৪৭।

এই কবিদের ভিতর সকলেই সিদ্ধ আচার্য। তিব্বতী ইতিহাসে চৌরাশী সিদ্ধার নাম সুপ্রসিদ্ধ। A. Gruenwedel যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে 'চাটিল', 'তাড়ক' ও 'ঢেণ্ঢনপাদ' ব্যতীত সকলের নামই পাওয়া যায়।* মিথিলার জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর তাঁহার 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে যে ৭৬ জন

---

* চৌরাশী সিদ্ধা ১. লূহিপা (মৎস্যান্ত্রাদ) ২. লীলাপা ৩. বিরূপা ৪. ডোম্বি-হেরুক ৫. শবর (শবরী) ৬, সরহ (রাহুলভদ্র) ৭. কঙ্কালি ৮. মীন (বজ্রপাদ) ৯. গোরক্ষ ১০, চৌরঙ্গী ১১. বীণা ১২. শান্তি (রত্নাকর শান্তি) ১৩. তান্তি ১৪. চর্মরি ১৫. খড়্গ ১৬. নাগার্জুন ১৭. কৃষ্ণচারী (কাহ্নপাদ) ১৮, কাণের (আর্যদেব) ১৯. থগণ ২০. নাড়পা ২১. সালিপা ২২. তিলোপা ২৩ চত্র ২৪. ভদ্র (ভাদে) ২৫. দ্বিখণ্ডী ২৬. অযোগী ২৭. কড়পাদ ২৮. ধোবী ২৯. কঙ্কণ ৩০. কম্বল (কামরি) ৩১. ঢেঙ্কি ৩২ ভদে (ভাণ্ডারী) ৩৩. তন্ত্রী ৩৪. কুক্কুরী ৩৫. কুজী ৩৬. ধর্ম (ধাম) ৩৭. মহী ৩৮. অচিন্ত্য ৩৯. বভহী ৪০, নলিন ৪১. ভুসুকু (শান্তিদেব) ৪২. ইন্দ্রভূতি ৪৩. মেঘপাদ ৪৪. কুঠালি ৪৫. কর্মার ৪৬. জালন্ধরী ৪৭. রাহুল ৪৮. ঘর্বরি ৪৯. ধোকরী ৫০. মেদিনি ৫১. পঙ্কজ ৫২. ঘণ্টা. ৫৩. যোগী ৫৪. চেলুক ৫৫. গুণ্ডরী ৫৬. লুঞ্চক ৫৭. নির্গুণ ৫৮. কল্যানন্দ (জয়নন্দি) ৫৯. চর্পটি ৬০. চম্পক, ৬১. বিষাণ ৬২. ভলি ৬৩. কমরী ৬৪. চর্পটি ৬৫. মণিভদ্র ৬৬. মেখলা ৬৭. মঙ্গলা ৬৮. কলকল ৬৯. কন্তুরী ৭০. ধহুলি ৭১. উধলি ৭২. কপালী ৭৩. কিল ৭৪. পুষ্কর ৭৫. সর্বভক্ষ ৭৬. নাগবোধি ৭৭. দারিক ৭৮. পুত্তুল ৭৯. পনহ ৮০. কোকিলা ৮১. অনঙ্গ ৮২. লক্ষ্মীঙ্করা ৮৩. সামুদ্র ৮৪ ভলিপা (ব্যাড়ি)।

সিদ্ধাচার্যের নাম করিয়াছেন, তাহাতে—ভন্তিপা, দারিপা, বিরূপা, কাহ্ন ভাদে, কামরী (কামলি), সবর, সান্তি, ও চাটল-এর নাম পাওয়া যায় পণ্ডিতপ্রবর রাহুলজী তাঁহার 'দোহাকোশ' গ্রন্থের ভূমিকায় বিনয়শ্রী-কৃত যে সিদ্ধ নামানুস্মরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাড়ক ও ঢেণ্ঢণপাদ ব্যতীত চর্যা-সাধকদের সকলের নামই মিলে ; সেখানে চাটিল-এর পরিবর্তে 'চাটপা' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

চর্যার সাধক কবিরা সকলেই ছিলেন একদা জীবন্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের পরিচয়-প্রসঙ্গ অতি অল্পই জ্ঞাত। জনশ্রুতি-মূলক কিছু পরিচয় দিয়াছেন তিব্বতী পণ্ডিত লামা তারানাথ। তারানাথের গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন Prof. Gruenwedel, নাম দেন 'Edel tein mine' (Mine of precious stones বা মহার্ঘ রত্নাকর)। গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করেন Dr. Bhupendranath Datta—তিনি গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—'Mystic Tales of Lama Taranatha' (কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত)। এই গ্রন্থ, তাঞ্জুর তালিকা এবং অন্যান্য উপকরণ হইতে সিদ্ধ আচার্যদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, চর্যাকারদের ভিতর কেহই ৮-১২ শতাব্দীর পরবর্তী নহেন।

লুইপাদ ঃ চর্যাগীতিতে প্রথমেই সঙ্কলিত হইয়াছে লুইপাদের গান। টীকাকার মুনিদত্ত তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'আদি সিদ্ধাচার্য'। তিব্বতী তালিকাতেও তাঁহার নাম প্রথম। কিন্তু তারানাথের বিবৃতি মতে লুইপাদ চতুর্থ সিদ্ধাচার্য। আদিসিদ্ধা রাহুলভদ্র সরহ, তাহার শিষ্য সিদ্ধ নাগার্জুন, তৎশিষ্য শবরীপাদ বা দ্বিতীয় সরহ, তৎশিষ্য লুইপা। রাহুলজী মনে করেন, যেহেতু লুইপা ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তি, তাই তালিকায় প্রথমেই স্থান পাইয়াছে তাঁহার নাম। তারানাথের মতে লুইপা ছিলেন উড্ডীয়ান-রাজ উদয়নের করণিক। তিনি মহাসিদ্ধ শবরীপাদের নিকট তন্ত্রাভিষেক লাভ করেন এবং নির্বিঘ্নে ধ্যান করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে আসেন। সেখানে তিনি বার বৎসর মৎস্যের অন্ত্র (Fish-entrails) ভক্ষণ করিয়া বজ্রবারাহীর ধ্যান করিতে থাকেন এবং 'মৎস্যান্ত্রাদ' নামে পরিচিত হন। তাঞ্জুর তালিকামতে লুইপাদ বাঙ্গালী ও মৎস্যান্ত্রাদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরও সিদ্ধান্ত—লুইপাদ বাঙ্গালী। রাহুলজী বলেন, লুইপা ছিলেন রাজা ধর্মপালের কায়স্থ (সচিব ও লেখক)।[১]

১. 'লুইপা রাজা ধর্মপালকে কায়স্থ (সচিব যা লেখক) থে'—ভূমিকা দোহাকোশ

তাহা হইলে লুইপাদের জীবৎকাল দাঁড়ায় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদ। লুইপার শিষ্য উড়িষ্যার রাজা দারিক ও তৎমন্ত্রী ঢেঁকি। দারিকপাদও তাঁহার গানে (৩৪) লুইপাদ-প্রসাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

যদিও তাঞ্জুর তালিকায় লুইপাদকে মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তবু অনেকেই লুই-মৎস্যেন্দ্র-মীননাথকে অভিন্ন মনে করেন। মীননাথের জীবনের সঙ্গে লুইপাদের কিছু মিলও আছে। অদ্বয়বজ্রকৃত সরহের দোহাকোষ পঞ্জিকায় লুইপাদকে বলা হইয়াছে 'কৈবর্ত'; তিনি তত্ত্ব-স্বরূপ ভুলিয়া কামোন্মত্ত হওয়ায় যম-কিঙ্করাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন।[১] মীননাথের জীবন বৃত্তের সহিত এই ঘটনা মিলিয়া যায়। কিন্তু সংশয়-প্রশ্ন জাগে, লুইয়ের উপাধি 'পাদ', আর মীনের উপাধি 'নাথ'। সম্প্রদায় ভিন্ন। টীকাকার মুনিদত্তও মীননাথের দর্শনকে বলিয়াছেন 'পরদর্শন' (চর্যাটীকা ২১) অতীতের ইতিহাস কুয়াশাচ্ছন্ন। নাথধর্মের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্যহেতু হয়তো দুই সম্প্রদায়ের আচার্যদ্বয় পরবর্তী শ্রুতিতে এক হইয়া গিয়াছিলেন।

লুইপাদ বৌদ্ধ আচার্য। তাঞ্জুর তালিকায় তাঁহার নামে যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের সবগুলিই বৌদ্ধ-দর্শন সংক্রান্ত। দোহাকোষ ও টীকা বাদে তিনি 'শ্রীভগবদভিসময়', 'অভিসময়বিভঙ্গ', 'বুদ্ধোদয়' ও 'বজ্রসত্ত্বসাধন' রচনা করেন। 'বজ্রসত্ত্বসাধন' তন্ত্রের পুঁথি, 'ভগবদভিসময়' ও 'অভিসময় বিভঙ্গ' গ্রন্থ দুইখানি সম্ভবতঃ এক নূতন সাধনধারার ইঙ্গিতবহ এবং সহজ সময়-চর্যাবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থদ্বয় এত বিখ্যাত ছিল যে, কালক্রমে বহু আচার্য বিভিন্ন বৌদ্ধ কেন্দ্রে এই গ্রন্থ দুইটির উপর বৃত্তি, টীকা, ক্রম, মঞ্জরী ও পঞ্জিকা রচনা করিয়াছেন ('চর্যার কালবিচার' অংশ দ্রষ্টব্য)। লুইপাদের রচনাবলী হইতে স্পষ্ট ধারণা হয়, বজ্রযানী আচার্যগণই তন্ত্রজলধি হইতে সহজ সাধনার ধারাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লুইপাদের নামাঙ্কিত দুইটি চর্যা (১, ২৯) চর্যাগীতিতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম গানের সংহত অবয়বে তিনি মিতাক্ষরে সহজধর্মের সাধ্য (মহাসুখ) ও সাধনতত্ত্বের (মহারাগনয়) সার-সঙ্কেত করিয়াছেন। গানটি সিদ্ধ আচার্যের সাধনলব্ধ অনুভবের অনুশাসন। তিনি নিজে গুরুর কৃপায় 'শান্তসন্তর্পিত-

১. 'লুই কৈবর্ত্তাদীনাং বিসংবাদ এব কামিক পুরুষাণামজ্ঞানাৎ যমকিঙ্করাদিনা মারিতা ভবন্তি।' -বৌদ্ধগান ও দোহা।

স্তিমিত হৃদয়' ; সত্যদ্বয়ের মোহভ্রান্তিতে মগ্ন অশরণ দীনজনের জন্য তিনি করুণায় আপ্লুত। তাহাদের উদ্ধার কামনায় তিনি গীতরচনা করিয়াছেন। বোধিপ্রস্থান চিত্তের প্রত্যয়ে তিনি স্থির, গানেও সেই স্থির প্রত্যয়ের বজ্রনির্দেশ —'মহাসুহ পরিমাণ', 'সুনুপাখ ভিতি লেহুরে পাস'। ২৯ সংখ্যক গানটি৫ তত্ত্বাবভাসে উজ্জ্বল। উক্ত গানের টীকায় আচার্য মুনিদত্ত লুইপাদকে বলিয়াছে৷ 'জ্ঞানানন্দ সুন্দর'। বিশেষণটি সার্থক। সহজজ্ঞানের মূল তত্ত্বই গানটিতে প্রকাশিত। সহজ মহাসুখ যে শূন্যরূপ বিজ্ঞান, তাহা বর্ণ-চিহ্নরূপ বিবর্জি৷ হইলেও যে এক সর্বব্যাপী তত্ত্ব—এই সমন্বয়ের সুরটি লুইপাদের গানে সুস্পষ্ট।

কবিদৃষ্টি অপেক্ষা সাধক দৃষ্টিই লুইপাদের প্রখর। গানে বাচনভঙ্গীর ঋজুত তত্ত্ববিজ্ঞাপনে সার্থক। তাহা পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত নহে, অলঙ্কারে ভারেও ভারাক্রান্ত নহে। একটি রূপক ('কাআতরুবর'—১) ও একটি দৃষ্টা ('উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা'—২৯) যেন স্পর্শগ্রহণের মত বক্তব্যকে ঈষ স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ছন্দও সাধারণ পাদাকুলক, রাগ উভয়ক্ষেত্রে 'পটমঞ্জরী'। প্রত্যেকটি গানে ভনিতা ব্যবহৃত হইয়াছে দুইবার—ধ্রুবপদে শেষপদে। লুইয়ের গানে -র,-এর (ষষ্ঠী) এবং এ, তেঁ (অধিকরণ) বিভ চিহ্নগুলি বাংলার নিজস্ব বিভক্তিচিহ্নের স্মারক।

শবরীপাদ : লুইপাদের গুরু মহাসিদ্ধ শবরী। ইনি রসসিদ্ধ নাগার্জু শিষ্য। তারানাথের বিবরণে শবরী আদৌ ছিলেন বঙ্গের এক নটাচা নাগার্জুন তাঁহাকে শ্রীপর্বতে যাইবার নির্দেশ দেন। সেখানে তিনি শ সুলভ জীবন যাপন করেন এবং 'শবরীশ্বর' বা 'সিদ্ধ শবরী' নামে পরিচিত হ তন্ত্রমতে 'শবর' বা 'সবর' অর্থ বজ্রধর ('সকারপরো হকারঃ স এব পবিধ চর্যাটীকা ২৮)। ইনি কনিষ্ঠ সরোহ ('younger saroha'—Dr. B. Datta) নামেও পরিচিত।

তাঞ্জুর তালিকামতে, সিদ্ধ শবরীপাদ 'বজ্রযোগিনী-সাধন' সংক্রান্ত কত গ্রন্থ রচনা করেন। ষড়ঙ্গ যোগের উপরেও তাঁহার রচনা আছে। 'আচার্য' ও 'মহাচার্য' বিশেষণেও বিশেষিত।

শবরপাদের নামে দুইটি চর্যাগীতি (২৮, ৫০) পাওয়া যাইতেছে। সুকুমার সেন মনে করেন, যে ভাবে 'শবর' পদটি চর্যায় আছে, তাহাকে ভ বলিয়া মনে করা অনুচিত। গীতশীর্ষে ও টীকায় কিন্তু গান দুইটি শবরপ

রচনা* বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। 'মহাকরুণারসবিদ্ধ' সিদ্ধাচার্য শবরপাদ পরমার্থ সাক্ষাৎকরণের নিমিত্ত 'জনার্থায়' বা 'লোকার্থায়' তাঁহার অনুভব ব্যক্ত করিয়াছেন। রূপক গ্রহণ করিয়াছেন শবর-শবরীর মিলনরূপক। এই রূপকের আবরণে তিনি সহজ-সাধনের 'প্রবাহ-অভ্যাস', 'ক্রীড়ারূপ', 'বজ্রগুরু-মাহাত্ম্য' ও চিত্তের 'যথাভূত স্বরূপ'—সবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

শবরীপাদের দুইটি গানই লৌকিক শবর-শবরী জীবনের সজীব জীবনালেখ্য। দুইটি গানেই কৃষি-নির্ভর পার্বত্য জীবনের স্ত্রী-স্বাধীনতা, ভুজঙ্গ নায়কের পরকীয়া আসক্তি, পুষ্পপ্রিয়া আরণ্য নারীর কুসুম-সজ্জা এবং সম্ভোগশৃঙ্গারের আনন্দ-উল্লাস অভিব্যক্ত। সম্ভোগ-শৃঙ্গারের চিত্রে কামশাস্ত্রের অভিজ্ঞান সুস্পষ্ট। কামের উপকরণ তাম্বুল-কর্পূর ও সুন্দরী নারী তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে শৃঙ্গারের উদ্দীপন বিভাবরূপে সুন্দর প্রকৃতি-চিত্র। ২৮ সংখ্যক গানে 'নানা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলি ডালী' পংক্তিতে পাওয়া যায় সুন্দর বসন্ত-চিত্র, আর ৫০ সংখ্যক গানে আসিয়াছে শুভ্র সদ্যস্ফুট কাপাস পুষ্পের বর্ণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া জ্যোৎস্না-স্নাত 'জোহ্না বাড়ি'র বর্ণনা। সাধকের শিল্প-দৃষ্টি এখানে অবারিত। পঞ্চবর্ণ বিহারে অপরাঙ্মুখ, মহাসুখ-বিভোর সহজিয়া কবির সত্তাই যেন এখানে প্রকাশমুখর। বস্তুজ্ঞান, সমাজ-সচেতনতা ও সৌন্দর্য-দৃষ্টি সবই প্রকৃতি-প্রভাস্বর সাধকের স্বভাবসিদ্ধ। শবর (বজ্র)-সাধনের সঙ্কেত দ্যোতনায় কবি দেশজ শাবরী ভাষাকে উপেক্ষা করেন নাই। মোর (ময়ূর), গুঞ্জরী (...), গুহাড়া, গুলী, ঘাট, তাবোলা (তাম্বুল ২৮), এবং বাড্হি (বাড়ী), কুঠারী (কুঠারী), দুন্দোলী, কপাসু (কার্পাস), কঙ্গুচিনা (৫০)—প্রভৃতি দেশজ শব্দচয়নেও সাধক-কবি সতর্ক। শবরীপাদের গানের রাগ 'বলাড্ডি' (২৮) ও 'রামক্রী' (৫০)। ছন্দে, ছন্দ-স্তবকে এবং চরণবিন্যাসেও শবরীপাদের গানে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। প্রমুক্ত মনের ছন্দ বন্ধনহীন, তাঁহার গতি স্বচ্ছন্দ। চর্যাগানগুলি প্রায়শ: পঞ্চপদী (দশচরণের কবিতা), কিন্তু শবরীপাদের দুটি গানই সপ্তপদী। মিশ্র ছন্দের প্রয়োগেও উহা বিচিত্র।

ভুসুকুপাদ : ভুসুকুপাদ একজন শক্তিমান চর্যাকার। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিতর্ক অল্প নহে। চর্যাগীতির রচনা-কাল বিচারে এবং মহাযান মধ্যমক মতের সঙ্গে সহজ-তান্ত্রিক শাখার সম্পর্ক বিচারে ভুসুকু-পাদের জীবন-বৃত্ত প্রভূত আলোক-সম্পাত করে। শূন্যবাদের শেষস্তর, সহজিয়া

তান্ত্রিকতার সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত। শেষ পর্যন্ত মহাযানের সকল মতই সহজ-সাগরে মিলিত হইয়া হেবজ্রতন্ত্রের 'সহজং জগৎ সর্বং' মহাবাক্যটিকেই যেন সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। পদকর্তা ভুসুকুর জীবন এই সত্যের স্মারক।

শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ভুসুকু চর্যাকর্তাদের মধ্যে বেশ অর্বাচীন। পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য এবং সন্ধ্যা সঙ্কেতের আড়ম্বর চর্যাগীতির অনুশীলনে দীর্ঘ গতানুগতিকতারই দ্যোতক।" তিনি আরও বলেন, "ভুসুকুর জীবৎকালের নিম্নতম সীমা ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরে নকলকরা ভুসুকুর 'চতুরাভরণ' গ্রন্থের পুথি পাওয়া গিয়াছে।"

কোন গ্রন্থের প্রাচীন অনুলিপির তারিখ ধরিয়া যে গ্রন্থকারের কালনির্ণয় করা সম্ভব নহে, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ (প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীই বলা চলে) ভুসুকুর জীবৎকালের নিম্নতম সীমা হইলে কমপক্ষে দ্বাদশ শতকে সঙ্কলিত চর্যাগীতিকোষে ভুসুকুর স্থান হয় কিরূপে? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং Dr. Snellgrove প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করিতেছেন সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে যত মহাযান-বজ্রযানের ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেগুলি তাঞ্জুর তালিকায় স্থান লাভ করিয়াছে। মুনিদত্ত-কৃত 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' এইরূপ একটি গ্রন্থ। ভুসুকুর চর্যা তাহাতে স্থান পাইয়াছে। তাহা হইলে ভুসুকু কি দ্বাদশ শতকের পরেও আরও প্রায় দুইশত বৎসর জীবিত ছিলেন? আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, অতিশ দীপঙ্কর (৯৮০-১০৫০) একটি 'চর্যাগীতি-বৃত্তি' রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাগীতির সঙ্কলন তখনও প্রচলিত ছিল। আমাদের বিবেচনায় কোন চর্যাকারই একাদশ শতকের পরবর্তী নহেন। চর্যাকার ভুসুকু বেশ প্রাচীন কবি।

তাহা ছাড়া, রচনায় তান্ত্রিক যোগ-প্রসঙ্গ, পারিভাষিক শব্দ ও সন্ধ্যা সঙ্কেতের বাহুল্য থাকিলেই, তাহাকে 'অর্বাচীন' বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অনুচিত। সন্ধ্যা-সঙ্কেতের বাহুল্য কি 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক,' 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' ও অসঙ্গের 'যোগাচার ভূমি'তে নাই? এগুলি কি অপ্রাচীন? বৌদ্ধ সহজযান তন্ত্রযানেরই একটি শাখা—উহা 'অনুত্তর যোগতন্ত্র'। অতএব সহজিয়া রচনায় তান্ত্রিক পরিভাষা থাকাই স্বাভাবিক। আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদের গানের 'মহাসুখ' 'সুনুপাখপাস' (মহারাগনয়), 'ধমণ চমণ-পাণ্ডী' প্রভৃতি গূঢ় সঙ্কেতবহ। তিনি তন্ত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছেন, সহজগীতিও রচনা করিয়াছেন।

আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধ গান ও দোহার মুখবন্ধে 'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থের রচয়িতা শান্তিদেবের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শান্তিদেব, রাউতু ও ভুসুকু একই ব্যক্তি। চর্যাগানে ভুসুকুরও বিশিষ্ট ভনিতা—'রাউতু ভণই কট' (৪১, ৪৩)। ভুসুকু ও শান্তি যে একই ব্যক্তি—নারোপাকৃত সেকোদ্দেশটীকায় উদ্ধৃত একটি পদও তাহার সাক্ষ্য—

'উইঅ উরে ভুসুকু তারা।
শান্তি ভণই পোহান্ত পহারা ॥

৪৬ সংখ্যক চর্যাটীকায় ভুসুকুপাদের নামে উদ্ধৃত একটি শ্লোকও—ভুসুকু ও শান্তিদেবের একত্ব প্রতিপাদন করে। টীকাকার মুনিদত্ত 'তথাচ ভুসুকুপাদাঃ' বলিয়া—'(ন) ক্লেশাবিষয়েম্বেত্যাদি' যে শ্লোকের সূচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা শান্তিদেবকৃত 'বোধিচর্যাবতারে'র চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪৭ সংখ্যক শ্লোক।[১]

বোধিচর্যাবতার-রচয়িতা শান্তিদেব সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, (Poussin, বিধুশেখর শাস্ত্রী)। শান্তিদেব ব্যতীত অন্য কেহ ভুসুকু নামে পরিচিত, এমন তথ্য কোথায়ও পাওয়া যায় নাই। তবু কেহ কেহ ভুসুকু ও শান্তিদেবের ব্যক্তিত্বকে পৃথক মনে করিয়া স্বকল্পিত প্রশ্ন তুলিয়াছেন, চর্যাকার ভুসুকু এত প্রাচীন কি না? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "শান্তিদেব ও ভুসুকু যে একই ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। . গানের ভুসুকু ও শান্তিদেব এক কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ। কারণ, গানগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাযানের।" ডঃ সেনও ঠিক অনুরূপ প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, "শান্তিদেব অনেক আগেকার লোক। তিনি মঞ্জুশ্রীর উপাসক। আর ভুসুকু ছিলেন সহজানন্দের সাধক।" এই-সংশয় উক্তিগুলির ভিতরেই মহাযানের (মাধ্যমিক শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের) তন্ত্রযান, তথা সহজযানে রূপান্তরের ইতিহাস নিহিত। শান্তিদেব যখন বর্তমান

---

১. সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই

ন ক্লেশা বিষয়েষু নেন্দ্রিয়গণে নাপ্যন্তরালে স্থিতাঃ।
নাতোঽন্যত্র কুত স্থিতাঃ পুনরিমে মথ্নন্তি কৃৎস্নং জগৎ ॥
মায়ৈবেয়মতো বিমুঞ্চ হৃদয় ত্রাসং ভজস্বোদ্যমং।
প্রজ্ঞার্থং কিমকাণ্ড এব নরকেষ্বাত্মানমববাধসে।

—"ক্লেশসকল বিষয়ে, ইন্দ্রিয়ে, অন্তরালে বা অন্য কুত্রাপি অবস্থিত নাই; তথাপি ইহা সমস্ত জগৎকে মথিত করিতেছে। ইহারা মায়ামাত্র; অতএব হে হৃদয়, ত্রাস ত্যাগ করিয়া উদ্যম কর। বৃথা কেন নিজেকে নরকে নিপাতিত করিতেছ।"—কাপিলমঠাচার্যকৃত অনুবাদ।

ছিলেন, তখন বিজ্ঞানবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। মাধ্যমিক মত তখন স্পষ্টতঃ অস্তিবাদের দিকে ঝুঁকিয়াছে। আর এই নব মহাযানে তখন শাখা-পল্লবে বিটপিত হইয়াছে তন্ত্রযান। শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন, 'শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয়ের ভূমিকায় বেণ্ডেল সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন, এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের কথা আছে।' সত্যই তাহাতে তান্ত্রিকতার কথা আছে। শিক্ষাসমুচ্চয়ে বোধিচিত্তকে বলা হইয়াছে 'বুদ্ধাঙ্কুর', উহা 'শূন্যতা করুণাগর্ভ'; সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে, চিত্ত-শোধন দ্বারা বিষয়কে বিশুদ্ধ করিয়া বিষয়ভোগ করিলে তাহা 'পথ্যের' মত কাজ করে। শূন্যতা-করুণার যোগেই বিষয়-বিশুদ্ধি হয়:

ভোগশুদ্ধিং চ জানীয়াৎ সম্যগাজীব শোধনাৎ।
শূন্যতা-করুণাগর্ভং চেষ্টিতাৎ পুণ্য শোধনম্ ॥—শিক্ষাসমুচ্চয়

এগুলি তন্ত্রেরই কথা এবং সহজসাধনারও মূল কথা। বোধিচর্যাবতারের প্রজ্ঞা-পরিচ্ছেদে এবং অন্যত্র সহজমত ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। সেখানে মহাসুখের স্থানকে বলা হইয়াছে 'সুখাবতী' (১০।৪)—এই সুখাবতীর সুখামোদকে তিনি সকলের জন্য কামনা করিয়াছেন। সেখানে চিত্তকে বলা হইয়াছে 'জগদানন্দবীজ' (১।২৬); চিত্ত প্রসঙ্গে 'গুহ্য', 'রত্ন' এবং কায় সম্পর্কে 'নৌ' ('কায়ে নৌবুদ্ধিমাধায় কায়ং কুরু সত্ত্বার্থ সিদ্ধয়ে'—৫।৭০) প্রভৃতি সঙ্কেতগর্ভ শব্দও প্রয়োগ করা হইয়াছে। স্বচ্ছন্দচর্যার প্রসঙ্গ আসিয়াছে দুইটি শ্লোকে (৮।২৮, ৮৮)। তাহা ছাড়া, ধর্মকায়, নাথ, বজ্রী, মার্গ, ক্ষণসম্পৎ (একক্ষণ সম্বোধি), ছন্দ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দও প্রচুর রহিয়াছে। কাজেই 'মহাযানার্থ-কোবিদ্' শান্তিদেব যে তন্ত্রমতে তথা সহজমতে বিবর্তিত হইতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমেয় এবং হইয়াছিলেনও তাহাই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এসিয়াটিক সোসাইটির ৯৯৯০ নম্বর তালপাতার পুঁথি হইতে শান্তিদেবের যে জীবন-চিত্র উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেও শান্তিদেবের এই রূপান্তর সমর্থিত হয়। শান্তিদেব ছিলেন রাজার ছেলে। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার প্রাক্কালে তাঁহার মাতা তাহাকে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুবজ্রের নিকট উপদেশ লইতে বলেন। শান্তিদেব ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। পথে মঞ্জুবজ্রের এক শিষ্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং বার বৎসর মঞ্জুবজ্রের নিকট থাকিয়া তিনি মঞ্জু-শ্রী-মন্ত্রে সিদ্ধ হইলেন। তৎপরে তিনি রাউত ('Horse man')—বেশে যাত্রা করিলেন মগধের উদ্দেশ্যে। মগধরাজের নিকট

'অচল সেন' নামে নিজের পরিচয় দিলেন। মগধরাজ অশ্বারোহী, তরবারিধারী অচলকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। তরবারিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অদ্ভুত সিদ্ধি প্রকাশ পাইল। তখন তিনি রাজকার্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুবেশে নালান্দায় আসিলেন। এইখানেই তিনি শিক্ষাসমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার রচনা করেন। ভোজনকালে, সুপ্ত অবস্থায় এবং কুটি গমনে (বিশ্রাম কালে)—প্রভাস্বর বা সমাধি সমাপন্ন থাকিতেন বলিয়া তিনি 'ভুসুকু' নামে খ্যাতি লাভ করিলেন।[১] এই নামেই তিনি 'সহজগীতি' রচনা করিয়াছেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে, যিনি শান্তিদেব, তিনিই অচলসেন, তিনিই রাউত, তিনিই ভুসুকু। যিনি মধ্যমক শূন্যবাদের প্রবক্তা তিনিই তান্ত্রিক মঞ্জুশ্রীসিদ্ধ, তিনিই আবার সহজসমাধিসম্পন্ন ভুসুকু। শান্তিদেব যে তন্ত্রাচার্য মঞ্জুঘোষের শিষ্য ছিলেন, বোধিচর্যাবতারের প্রণাম-শ্লোকটিই তাহার প্রমাণ—'মঞ্জুঘোষং নমস্যামি যৎপ্রসাদান্মতিঃ শুভে' (১০।৫৮)। তাঞ্জুর তালিকায় মঞ্জুবজ্র ও অচল উভয় নামেই 'মহামুদ্রাভিগীতি' গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা দ্বারাও গুরুশিষ্যের যোগ সুপ্রকট এবং উভয়েই যে মহামুদ্রা সাধনের সঙ্গে যুক্ত, তাহাও স্পষ্ট। শান্তিদেব ও মঞ্জুবজ্রের নামে তন্ত্র গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখা যায়। অতএব 'মহাযানার্থ-কোবিদ' শান্তিদেবই যে 'সহজানন্দ রসপূর্ণ' ভুসুকু, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শান্তিদেব মহাযানী, ভুসুকু সহজপন্থী—এ যুক্তি দ্বারাও উভয়ের ভিন্নতা প্রমাণ করা যায় না, কারণ অবরকালে অনেক মহাযানী বজ্রযান তথা সহজমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভুসুকুর গানে যেমন মধ্যমক শূন্যবাদের ভাব প্রবল, তেমনই অতি স্পষ্ট তাঁহার রাউত-বৃত্তি। হরিণ-শিকার (৬, ২৩) এবং জলদস্যুদের সহিত সংঘাত-ঘটনায় ভুসুকুর রাউত বা যোদ্ধ ভাব অতি স্পষ্ট। অর্থাৎ মহাযানার্থ কোবিদ শান্তিদেব এবং রাউত অচল সেন আসিয়া মিলিত হইয়াছেন সহজানন্দমুদিত ভুসুকুর গানে। বোধিচর্যাবতার প্রণেতা আচার্য শান্তিদেব বলেন, 'সর্বত্যাগশ্চ নির্বাণম্' (বোধি ২, ৩।১১), তিনি বলেন 'শূন্যতা দুঃখ শমনী' (বোধি, ৯।৫৬) : ভুসুকুর গানেও সেই স্বীকারোক্তি—'নিঅ পরিহারে মহানেহে থাকিউ' (চর্যা, ৪৯)। শান্তিদেব বলেন,

১, 'ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোঽপি কুটিং গতোঽপি তদেবেতি ভুসুকু সমাধি সমাপন্নত্বাৎ ভুসুকু নাম খ্যাতিং সঞ্জেঽপি। —ভুঞ্জান, সুপ্ত, কুটিগত শব্দগুলির আদ্য বর্ণ লইয়া 'ভুসুকু'। ঐ অবস্থায় সমাধির নাম ভুসুকু-সমাধি। এই সমাধি ছিল বলিয়া শান্তিদেবকে বলা হইত ভুসুকু। শান্তিদেব ব্যতীত ভুসুকু নামে আর কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না।

জগৎ তত্ত্বতঃ 'নাস্তি', মোহহেতু জগতের পরিকল্পনা ('মোহাত্তৎকায়বুদ্ধিঃ')— ভুসুকুও বলেন, 'আইএ অণ্অণা এ জগরে ভান্তিএঁ সো পড়িহাই' (চর্যা. ৪১)। সংবৃত্তির দৃষ্টান্তগুলিও উভয়ক্ষেত্রে প্রায় একরূপ—বোধিচর্যায় 'বন্ধ্যা দুহিতৃলীলা' 'স্বপ্ন মায়োপম', 'প্রতিবিম্ব'—আর চর্যগানে পাই—'দাপণ-পতিবিম্বু, 'বান্ধিসুআ' প্রভৃতি। শান্তিদেব গুরুত্ব দিয়াছেন চিত্ত ও চিত্তশমনের উপর। তিনি বলেন, 'ধর্মসর্বস্বং চিত্তং গুহ্যং'—তাহা একদিকে ভয়ানক, সর্বদুঃখের আকর—আবার অপরদিকে চিত্তরত্নই 'জগদানন্দবীজ', 'জগদ্দুঃখৌষধ' (বোধি. ১।২৬)। ভুসুকুর গানেও (৬, ২১) এই ভাব। যে হারণ-চিত্ত মৃত্যুমারের অধীন, তাহাই আবার প্রজ্ঞাভিষঙ্গে শূন্যপথের যাত্রী , যে চিত্ত-মূষা অমৃতের ভক্ষক, তাহাই আবার 'চরঅ অমণ ধাম'। শান্তিদেব বলেন অসংযত, অবদ্ধ, চঞ্চল, ক্রোধচিত্ত ও পাপচিত্তই সর্বক্লেশের আকর—(দ্রষ্টব্য, বোধিচর্যা ৫।৬)। এই চিত্ত নিহত হইলেই সর্বশত্রু বিজিত হয় -'মারিতে ক্রোধচিত্তে তু মারিতাঃ সর্বশত্রবঃ' (বোধি. ৪।১২)। ভুসুকুর গানেও এই সুর ; তিনি বলেন, 'চঞ্চল মূষক-চিত্ত গত খনন করে, দুর্গতির কারণ হয়—অতএব 'মাররে জোইআ মূসা পবনা' (২১)। ক্লেশাবৃত চিত্তের প্রতি শান্তিদেবের বাক্য'—

> ক্লেশবাগুরিকাঘ্রাতঃ প্রবিষ্টো জন্মবাগুরাঃ।
> কিমদ্যাপি ন জানাসি মৃত্যোর্বদনমাগতঃ।। বোধি. ৭।৪.

—ক্লেশ জালিকের দ্বারা গৃহীত হইয়া জন্মজালে আবদ্ধ হইয়া তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি মৃত্যুমুখে আগত? ঠিক এই সুরেই হরিণ-চিত্তকে সম্বোধন করিয়া ভুসুকু বলেন, 'কাহেরে ঘিণি মেলি আচ্ছহু কীস। বেঢ়িল ডাক পড়অ চৌদীস।।' চর্যা. ৬

শুধু তাহাই নহে, চিত্তরক্ষা পূর্বক পঞ্চবর্ণবিহার করা যায়,—সহজ সাধকদের এই যে 'স্বচ্ছন্দ চর্যা,' শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতারের দুইটি শ্লোকে (৮।১৮, ৮-) তাহার উল্লেখ দেখা যায়। ৩২ চর্যার টীকাতেও ইহাদের একটি শান্তিদেবের নামেই উদ্ধৃত হইয়াছে।১ উপরন্তু শান্তিদেবের রচনায় সাধকদৃষ্টির সহিত শিল্প-দৃষ্টির যে সমন্বয় লক্ষিত হয়, ভুসুকুর গানেও সেই পরিচয় নিহিত। কাজেই শান্তিদেব ও রাউত ভুসুকুকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

শান্তিদেব বা ভুসুকু সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর ভিতর বর্তমান ছিলেন।

১. স্বচ্ছন্দ চার্যনিলয়ঃ প্রতিবদ্ধো ন কস্যচিৎ।
যৎসন্তোষ সুখং ভুঙ্ক্তে তদিন্দ্রস্যাপি দুর্লভং।। (বোধি ৮।৮?)

তারানাথ বোধিচর্যাবতারাদি গ্রন্থের লেখককে সৌরাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়াছেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহাকে 'ভারতের পূর্বাঞ্চলের লোক' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমাদের চর্যাকার ভুসুকুপাদ যে 'বঙ্গালী' হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ তাঁহার গানেই আছে—'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।' বন্ধুবর ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভুসুকুর 'বঙ্গালী' দাবী সমর্থন করিয়াছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড)।

চর্যাগীতিতে ভুসুকুর ভনিতায় মোট ৮টি চর্যা (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯) পাওয়া যায়। এই গানগুলি হইতে জানা যায় ভুসুকু ছিলেন পঞ্চপাটন, চৌকোটি ভাণ্ডার ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। তিনি 'রাউত'—মৃগয়াবৃত্তি ও যুদ্ধবিদ্যাতেও তিনি কুশলী ছিলেন। একবার পদ্মাখালে বজ্রা নৌকায় ভ্রমণকালে তিনি 'বঙ্গাল' কর্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয় এবং তাঁহার স্ত্রীও এই সংঘর্ষে নিহত হন। তিনি নিজেও বঙ্গাল হইয়া যান। এই ঘটনাই তাঁহাকে সহজ মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত হইবার দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ভুসুকু নিজেকে 'জোই' (যোগী) বলিয়াছেন (৩০)। ভুসুকু যোগী সিদ্ধসাধক, জ্ঞানী ও দার্শনিক। সত্যই তিনি 'ভুসুকু'—অর্থাৎ সব অবস্থাতেই সমাধি-সমাপন্ন। টীকাকার তাঁহাকে 'প্রজ্ঞাপারমিতামৃতস্নপিত', 'সহজ-মদমুদিত', 'সহজানন্দরসপূর্ণ', 'করুণান্দোলিত চিত্ত' প্রভৃতি বিশেষণে, বিশেষিত করিয়াছেন। এই বিশেষণগুলি সার্থক। ভুসুকু শূন্যবাদের সমর্থক। তিনি বলেন, সর্বশূন্যতাই মহাসুখ। সর্বশূন্য চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত তত্ত্বই পরম তত্ত্ব। তাঁহার মতে, জগৎ 'আইএ-অনুঅণা' (আদৌ অনুৎপন্ন)। দৃশ্যমান জগৎ ভ্রান্তি মাত্র। চিত্তের উপর তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। চিত্ত একদিকে মৃত্যুমার বেষ্টিত, অপর দিকে মহাসুখ। 'অমন' মনই সহজ ও প্রভাস্বর। চঞ্চলচিত্ত বিনষ্ট হইলেই ভাবাভাবের দ্বন্দ্ব দূরী ভূত হয়, দেখা যায় সহজের স্বরূপ। সহজস্বরের অকৃত্রিম আলোক দেখিয়া তিনি উল্লসিত—

উইআ গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ॥—৩০

এই সহজানন্দ মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত হইবার যে উপায়—মেল (অর্থাৎ বজ্রপদ্ম যোগ), বোধিচিত্তোৎপাদ ও অবধূতী মার্গে সেই চিত্তের চালনায় যে কমলরসের প্রবাহ—সবই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—২৭.

ভুসুকু শুধু সিদ্ধ সাধক নহেন, তিনি সুন্দরের সাধক, তিনি শিল্পী। উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি ও দৃষ্টান্ত যোজনায় তিনি রূপদক্ষ। ৪১ সংখ্যক গানে সংবৃত্তির দৃষ্টান্ত চয়নে তিনি রজ্জুসর্প (রাজসাপ), মরুমরীচিকা, দর্পণ-প্রতিবিম্ব, গন্ধর্বনগরী, বাতাবর্তে ঘনীভূত ঘনোপল ('অপে পাথর') ও বন্ধ্যাসুতের যে উপমান সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি প্রথাবদ্ধ উপমান হইলেও, উহাদ্বারা—তাঁহার বহুশ্রুতত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বস্তুজ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ। চঞ্চল চিত্তের রূপকাতিশয়োক্তি রচনায় তিনি যে হরিণা (৬) ও মুসা (২১)-এর উপমান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শুধু মৌলিক নহে, রুচির কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। ভুসুকুর হরিণ-চর্যা (৬) ও পদ্মাখালে নৌ-যাত্রার চর্যা ছোটগল্পের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। শিল্পী-সুলভ কৃতির অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন (৪৯) সংখ্যক গানে। তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তৎকালীন গৌড়বঙ্গের একটি জীবন্ত চিত্রঃ সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হইয়াছে বঙ্গালের দুর্ধর্ষতা, চণ্ডালের হৃদয়হীনতা ও হৃতসর্বস্ব একটি ব্যক্তির মানস চিত্র। 'নিসি অন্ধারী মুসার চারা' (২১), 'অধরাতিরভর কমল বিকসউ' (২৭) প্রভৃতি উক্তিগুলিও কবিত্বের পরিচয়বহ। ভুসুকুর গানে বঙ্গীয় বাগ্‌বিধি লক্ষণীয়; 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী', 'জীঅন্তে মঅলে নাহি বিশেসো' (৪৯) প্রভৃতি উক্তি বঙ্গীয় বাগর্থের স্মারক। গানে ছন্দের বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য।

শান্তিপাদ: শান্তিপাদ প্রাচীন সিদ্ধাচার্য। ডঃ সুকুমার সেনও শান্তিপাদকে প্রাচীন চর্যাকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঞ্জুর তালিকা মতে রত্নাকর শান্তিই শান্তিপাদ। তারানাথের বিবরণ অনুসারে রত্নাকর শান্তি শবরীপাদের সমসাময়িক। তাহা হইলে শান্তিপাদের সময় দাঁড়ায় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ।

তিব্বতী তালিকায় রত্নাকরশান্তি 'আচার্য', 'আচার্যপাদ', মহাপণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। রত্নাকর শান্তির নামে তাঞ্জুর তালিকায় অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। যে দুইটি তন্ত্র—হেবজ্র ও গুহ্যসমাজতন্ত্র সহজসাধনার ভিত্তি, রত্নাকরশান্তি সেই দুইটি তন্ত্রের উপরই টীকা রচনা করেন—'মুক্তাবলী নাম্নি হেবজ্র পঞ্জিকা' এবং 'কুসুমাঞ্জলি নাম গুহ্যসমাজ নিবন্ধ'। এগুলি ছাড়াও তিনি বজ্রতারা, মহামায়াসাধন প্রকাশ করেন। তাঁহার অপর বিশিষ্ট গ্রন্থ 'সুখদুঃখদ্বয় পরিত্যাগ দৃষ্টি'। 'সহজরতিসংযোগ' ও 'সহজ যোগক্রম'—গ্রন্থ দুইটি সহজযানের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগের স্বাক্ষর বহন করে।

শান্তিপাদের নামে দুইটি চর্যাগান (১৫, ২৬) পাওয়া যায়। উভয় গানেই 'সঅ সংবেঅণ' এর প্রসঙ্গে আছে। দুইটি গানেই 'জ্ঞানানন্দ প্রমোদভর' সিদ্ধ আচার্যের জ্ঞানদৃষ্টির পরিচয় মিলে। ২৬ সংখ্যক গানে মাধ্যমিক শূন্যবাদের প্রভাব অতি স্পষ্ট। শান্তিদেব বোধিচর্যাবতারে যে ভাবে বিজ্ঞানবাদের মত খণ্ডন করিয়া শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শান্তিপাদও তুলা-ধুননের রূপকে ঠিক সেই ভাবেই ষড়ংশ সাধনে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া শূন্যবাদের স্বসংবেদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শূন্য-সংবেদন শূন্য, তাহাতে 'অস্তি' বলিয়া কিছু নাই-- তাহা অলক্ষ্য ('অলক্‌খ'), তাহার লক্ষণও নাই (লক্‌খণ ণ-জাই'—১৫)— শান্তিপাদের গানে সহজের এই তত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তাই বলিয়া শান্তিদেব ও শান্তিপাদ কখনই এক ব্যক্তি নহেন। চর্যার শান্তিপাদ রত্নাকর শান্তি—সহজযোগের উপর যিনি পুথি রচনা করিয়াছেন। শান্তিপাদের গানে সিদ্ধাচার্যের জ্ঞান দৃষ্টির সঙ্গে কবিদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বস্তুদৃষ্টিরও পরিচয় মিলে। সহজ শূন্যতত্ত্ব প্রতিপাদনে তুলা-ধুননের রূপকটি (২৬) সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের পরিচয় দেয়। ১৫ সংখ্যক গানে সীমাহীন শূন্য প্রান্তরের ('সুণা পান্তর') বর্ণনাটিও সুন্দর। ২৮ মাত্রার দীর্ঘায়ত ছন্দ শূন্য যাত্রাপথ বর্ণনার উপযোগী হইয়াছে। অনাবর্ত হইবার একমাত্র পথ 'উজুবাট' বা অবধূতী মার্গ —এই বিশ্বাসে সাধক অনড়। তিনি বলেন, এ রাজপথ কনকধারা মণ্ডিত সোজা পথ। 'কনকধারা' অর্থে 'কণ্টারা' শব্দটির প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য আছে।

সরহপাদ ঃ পণ্ডিত তারানাথের সাক্ষ্য মতে সরহ সিদ্ধাচার্যগণের আদি। তিনি জাত্যা ব্রাহ্মণ এবং বেদাদি বিদ্যায় পারঙ্গম। জন্মস্থান উড়িষ্যা (Odivisa)। তিনি নালান্দায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। নালান্দায় তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন ধর্মকীর্তি হরিভদ্র। রাহুলজী বলেন, হরিভদ্র রাজা ধর্মপালের (৭৭০ --৮১৫ খ্রীঃ) সমসাময়িক। সরহপাদের জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দী। সম্ভবতঃ ৭৮০খ্রীঃ তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি আচার্য স্থবিরকালের নিকট অভিষিক্ত হন। দাক্ষিণাত্যে তিনি এক শরকারের (arrow-smith) কন্যাকে মুদ্রারূপে গ্রহণ করেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হয় শরহ বা সরহ। সরহের অপর নাম রাহুলভদ্র, সরোরুহ বা সরোজ বজ্র। রাহুলজী মনে করেন, তাঁহার ভিক্ষু নাম রাহুলভদ্র। বজ্রযানের সঙ্গে সম্পর্ক বুঝাইতে সরোরুহবজ্র বা সরোজ বজ্র ব্যবহার করা হয়। তিনি আরও বলেন, সরহ 'পূর্বদিশা'র অন্তর্গত 'রাজ্ঞী' নামক

স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, উহা বর্তমানে ভাগলপুরের অন্তর্গত। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, সরহ বরেন্দ্রভূমির লোক। তাঁহার একটি চর্যার বহিরঙ্গ অর্থ হইতে জানা যায়, তিনি বঙ্গে জায়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ('বঙ্গে জাআ নিলেসি' চর্যা, ৩৯)। সরহের গানের প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌বিধি বিচার করিলেও মনে হয়, সরহ গৌড়বঙ্গের অধিবাসী। তিনি বসসিদ্ধ নাগার্জুনকে সহজমতে অভিষিক্ত করেন। সরহের গানে 'রস-রসায়ণ' সিদ্ধির প্রতি কটাক্ষ আছে (২২)।

তাঞ্জুর তালিকায় সরহকে বলা হইয়াছে—'আচার্য', 'মহাচার্য', 'সিদ্ধ-মহাচার্য', 'মহাব্রাহ্মণ', 'যোগী', 'মহাযোগী', 'যোগীশ্বর' এবং 'মহাশবর'। 'শবর' শব্দটি বজ্রযানে বজ্রধরের প্রতীক। সরহের নামে সংস্কৃত, অপভ্রংশ এবং প্রত্নবাংলা তিন ভাষাতেই রচনার নিদর্শন মিলে। অপভ্রংশভাষায় তিনি রচনা করেন অনেকগুলি দোহা ও দোহাজাতীয় গীত। এগুলির ভিতর 'দোহাকোষ-গীতি', 'ক-খ দোহা' (ক-কারাদি বর্ণকে আদ্যক্ষর করিয়া বর্ণার্থমূলক দোহা), 'মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি', 'কায়-বাক্-চিত্তঅমনসিকার', 'ডাকিনীগুহ্যগীতি' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরহের দোহা নানাবিধ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়া তিনি সহজমতের সারবত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। সহজতত্ত্ব ও সহজসাধন বুঝিবার পক্ষে সরহের দোহার মূল্য অপরিসীম। সংস্কৃতেও তিনি কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। 'বুদ্ধকপালসাধন', 'হেবজ্রতন্ত্রপঞ্জিকাপদ্মিনী নাম' প্রভৃতি গ্রন্থ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চর্যাটীকাতেও সরহের সংস্কৃত রচনার অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। সহজসাধনে গুরুর ভূমিকা বিষয়ে তাহার 'যা সা সংসারচক্রং বিরচয়তি' (টীকা ১) শ্লোক, কিংবা সহজ সাধনায় বিষয়-ভোগের গুরুত্ব বিষয়ে তাহার মন্তব্য১—সরহের সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। সরহের আর একটি শ্লোক মিলিতেছে, কাহ্নপাদের দোহাকোষের মেখলা টীকায়।২ চর্যাটীকায় সরহ-কৃত বহু সংস্কৃত শ্লোকের প্রথমাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—যথা,—'এতা এব হি' (১৭), 'চিত্তেশ্বরহরম' (২৭), 'চিত্ত চিত্ত পরিহর' (৩০), নমোতস্মৈ

১ তন্মুত্তব চিত্ত...বকো বিষয়ানে যদি ন নিরা রুদ্ধে।
গগনব্যাপী ফলদ, কল্পতরুর্ফল লভ্যতে। উদ্ধৃতি টীকা।

২. তে ধাত্তবঃ ক্ষীণতরা বভূবুবায়ঃ কু...ত্রো যত্র এব এব।
সা কামিনী কামুককল্পলতা অত্যাপি কিং কারণেঃ সুহৃত্বে। মেখলাটীকা, ২৩

যন্তুদয়েন' (৩০), 'মহামায়া দেবী' (৪৬), 'যস্ত প্রসাদ কিরণৈঃ' (২১), 'স শ্রীমান্' (২৫)। এই শ্লোকগুলি এত সুপ্রচলিত ছিল যে, টীকাকার সম্পূর্ণ শ্লোকের উদ্ধৃতি দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

চর্যাগীতিতে সরহের ৪টি গান (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯) সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গান সিদ্ধাচার্যের ভাব-স্বরূপ পরিজ্ঞানের পরিচয়বহ। সবধর্মাধিগতচিত্তে জন্ম-মৃত্যু, ভাব-অভাব, নাদ-বিন্দু, রবি-শশীর বিকল্প থাকে না, সে চিত্ত স্বভাব-মুক্ত ('চিঅরাঅ সহাবে মুকল'—৩২), তাহা যেন জ্যান্তে মরা ('জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো' ২২)—এই প্রত্যয়ে সরহপাদ অটল। সহজ-সাধনের সোজা পথ সম্পর্কেও সিদ্ধ আচার্যের প্রত্যয় স্থির। তাই মার্গানুশংসায় তিনি মুখর —'উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক'—৩২। গুরুচরণ প্রসাদের উপরেও দৃঢ় বিশ্বাস—'সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল'—৩৮। টীকাকার সরহপাদকে বলিয়াছেন 'মৈত্রীময়'। লোকার্থে তাঁহার চিত্ত করুণার্দ্র। ৩৯ সংখ্যক গানে অবিদ্যাভ্রান্ত চিত্তের স্বরূপ বর্ণনায় তাঁহার মৈত্রীময় হৃদয় যেন গর্জন করিয়া উঠিয়াছে—'অমিঅ অচ্ছন্তে বিস গিলেসিরে চিঅ পরবস অপা'। সরহ নিজেদের বলিয়াছেন, অচিন্ত্য যোগী ('অচিন্ত জোই'—২২)।

কবি স্বভাব অপেক্ষা আচার্যসুলভ স্বভাবই সরহের গানে প্রকাশিত। একটি গানে (৩৮) তিনি নৌবাহনের রূপক গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গে প্রচলিত বিশিষ্টার্থক বাক্য প্রয়োগে সরহের বাক্‌পটুতার পরিচয় মিলে, উহা লোকজ্ঞানের পরিচয়ও বহন করে। 'হাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ', 'অপণে অপা বুঝতু নিঅমণ' (৩২), 'অমিঅ অচ্ছন্তে বিস গিলেসিরে', 'বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দে' (৩৯)— প্রভৃতি উক্তি বঙ্গীয় বাগর্থকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। ৩৯ সংখ্যক গানে দীর্ঘ মাপের মাত্রাছন্দে ভঙ্গপদী চরণের প্রয়োগ ছন্দ-বৈচিত্র্য সূচনা করিয়াছে। মিল যোজনাতেও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় (শঙ্কা/কংখা—২২, বলন্দে/স্বচ্ছন্দে—৩৯)।

দারিকপাদ: লুইপাদ দারিকপাদকে অভিষিক্ত করেন। দারিকের গানে, 'লুইপাঅ পসাএ'র স্বীকৃতি আছে। তারানাথের মতে দারিকপাদ ছিলেন উড়িষ্যার ('Odisiva') রাজা। তিনি সংস্কৃতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঞ্জুর তালিকায় দারিকের নামে 'শ্রীকালচক্রতন্ত্ররাজে'র 'সেকপ্রক্রিয়া-বৃত্তি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তিনি 'শ্রীচক্র সম্বর সাধন' সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তালিকায় তিনি আচার্য, সিদ্ধাচার্য ও মহাসিদ্ধ অভিধায় অভিহিত।

দারিকের একটি চর্যাগান (৩৪) পাওয়া যায়। এই গানে তিনি তন্ত্র-মন্ত্র-ধ্যান-ব্যাখ্যানের অসারতা ঘোষণা করিয়াছেন। ধর্মের গভীর রহস্য তাঁহার অধিগত। তিনি বলেন, মহাসুখে লীন হওয়াই পরম নির্বাণ। স্বচ্ছন্দ চর্যার মর্মকথাও তাঁহার গানে স্থান পাইয়াছে। দারিক বলেন, অপর রাজা মোহে বদ্ধ, আসল রাজা তিনিই, যিনি মহাসুখে অবস্থিত। লুইপাদও বলিয়াছিলেন, 'Vajrasatva is a greater king' (Mystic tales of Lama Taranatha-Dr. Datta)—দারিকপাদ গুরু লুইপাদের এই বাণীরই যেন প্রতিধ্বনি করিয়াছেন দোহাছন্দে তাহার গানে—

'রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরে বাধা।
লুই পাঅপসাএঁ দারিক দ্বাদশ ভুবনে লাধা॥'—৩৪.

বিরুআপাদঃ বিরুআপাদ বা বিরূপাপাদের গুরু ছিল না। তিনি বজ্রযোগিনীর সাধক ছিলেন। তারানাথের গ্রন্থে তাঁহার মদ্যপানাসক্তি ও শুণ্ডিনীর সঙ্গে সংযোগের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বিরূপাপাদের চর্যায় (চর্যা. ৩) এই শুণ্ডিনীর মদ চোলাইয়ের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাঞ্জুর তালিকায় বিরূপের 'আচার্য', 'মহাচার্য', 'মহাযোগী' 'যোগীশ্বর, প্রভৃতি বিশেষণ দেখা যায়। তাঁহার নামে 'গীতিকা', 'কর্ম-চণ্ডালিকা দোহাকোষ গীতি'—প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।

সিদ্ধ সাধকরূপে বিরূপ এত বিখ্যাত ছিলেন যে, পরবর্তীকালে অনেকেই এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তারানাথ বলেন, রামপালের সময়ে 'সিরো' নামক একজন যোগী নিজেকে বিরূপ বলিয়া পরিচয় দেন। রামপালের পট্টহস্তী 'বানবাদল' এই বিরূপের চরণামৃত পান করিয়া যুদ্ধে গমন করিয়া ম্লেচ্ছ সৈন্যকে পরাভূত করে। কথিত আছে, জল, অগ্নি, বিষ—কিছুই তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিত না। এগুলি প্রকৃতপক্ষে মহাযোগী আদি বিরূপেরই গুণ। বিরূপপাদের চর্যায় কিভাবে বোধিচিত্তকে বজ্রদৃঢ় করিয়া অজরামর দৃঢ়স্কন্ধ লাভ করা যায়, তাহার সঙ্কেত রহিয়াছে বারুণীবন্ধনের রূপকে—৩,

এই বারুণী-বন্ধনের ব্যাপারে কবির বস্তু-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বিরূপের গানের ঘড়িয়ে, ঘড়ুলী, সরু, নাল শব্দগুলি লোক-জগত হইতে সমাহৃত।

কাহ্নুপাদ বা কৃষ্ণপাদঃ চর্যাগীতিতে সঙ্কলিত ৫০টি গানের ভিতর ১৩টি গানই কাহ্নুপাদের রচনা। ২৪ সংখ্যক চর্যাটি মূল পুথিতে লুপ্ত, কাজেই

মোট ১২টি গান (চর্যা. ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫) কাহ্নভনিতায় পাওয়া যাইতেছে। চর্যাগীতিতে সংখ্যার দিক হইতে কাহ্নের রচনাই সর্বাধিক। তিব্বতী ইতিহাসে, তাঞ্জুর তালিকায়, চর্যাগীতিতে এবং বাংলা সিদ্ধাচার্য গীতিকায় কাহ্নপাদ একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি সিদ্ধ সাধক, মহাপণ্ডিত এবং মণ্ডলাচার্যদের ভিতর মহাচার্য। কাহ্নপাদ নিঃসংশয়ে কীর্তিমান্, কিন্তু তাঁহার একক ব্যক্তিত্ব ও জীবৎকাল তর্কাতীত নহে। তাঞ্জুর তালিকায় কৃষ্ণ, কাহ্নপাদ, কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণবজ্রের নামে যে গ্রন্থতালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে একাধিক কৃষ্ণ থাকিতে পারেন, সেরূপ সঙ্কেত পাওয়া যায়। একজন কৃষ্ণপাদ 'কৃষ্ণযমারিতন্ত্ররাজপ্রেক্ষণপথপ্রদীপনাম টীকা' সংশোধন করেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় এবং ভারতবাসী, তাঁহাকে 'বড় কৃষ্ণ' বলা হইয়াছে।

ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "চর্যাগীতিতে যে গানগুলি আছে, তাহা হইতে অন্ততঃ দুইজন কাহ্নের অনুমান করিতে পারি।" তিনি মনে করেন, ১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪২ সংখ্যক চর্যা জালন্ধরী পাদের শিষ্য তান্ত্রিক যোগী কাহ্নের রচনা এবং ৭, ৯, ১২, ১৩, ৪০, ৪৫ চর্যা অপর কাহ্নের রচনা।

চর্যাগীতিতে গীতশীর্ষে রচয়িতার যে নামগুলি পাওয়া যায়, তাহাতে কাহ্নপাদ (৭, ৯, ৪০, ৪২, ৪৫), কৃষ্ণপাদ (১২, ১৩, ১৯), কৃষ্ণাচার্যপাদ (১১, ৩৬), কৃষ্ণবজ্র পাদ (১৮) প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ১০ সংখ্যক চর্যার শীর্ষে কবির নাম নাই। টীকাকার 'কৃষ্ণাচার্যপাদ' (৭, ৯, ১২, ১৮, ৪২), 'কৃষ্ণাচার্য' (১১, ৩৬, ৪০, ৪৫), কৃষ্ণাচার্য চরণ (১৩, ১৯) এবং কৃষ্ণপাদ (১০) প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে এবং গীতোক্ত ভনিতা হইতে একাধিক কৃষ্ণের কল্পনা করা যায় না। কতকগুলি গানে 'জ্ঞান উপদেশের প্রবলতা', কতকগুলি গানে 'ডোম্বী-বিবাহের' সন্ধা-সঙ্কেত—এই যুক্তিদ্বারাও দুই কাহ্নের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। চর্যাগানে একই সাধকের দুই শ্রেণীর গান পাওয়া যায়—এক শ্রেণীতে পড়ে সহজ মহাসুখ তত্ত্ব এবং স্বসংবেদনের কথা, অপর শ্রেণীতে পড়ে সেই সহজ মহাসুখ লাভের উপায়ের কথা। সহজ-সাধনের এই উপায় রহস্যময় তান্ত্রিক যোগ। তাহা গূঢ়, জটিল ও সন্ধ্যাসঙ্কেতে পূর্ণ। গীতকার কাহ্নপাদও কতকগুলি গানে টীকামতে 'সহজানন্দসুন্দর' (৩৬), 'সহজানন্দ মুদিত' (৪০), 'জ্ঞানামৃত পরিতুষ্ট' (৪২) এবং 'পরমানন্দমুদিত'

(৪৫)—আবার অনেকগুলি গানে 'জগদর্থকরুণাভারস্তিমিতহৃদয়'—জনার্থে 'চর্যাধরে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ। কাহ্নপাদ কৃত ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯ সংখ্যক চর্যা—সাধনমূলক চর্যা বলিয়াই সন্ধ্যা-ভাষিত ও যোগ-সঙ্কেতে পূর্ণ। 'মহাসুখসাঙ্গা'র উদ্দেশ্যেই 'ডোম্বী-বিবাহ' ও 'কপাল-চর্যা'। ডঃ সেনের শ্রেণীভাগ অনুসারেও দেখা যাইবে—দুই শ্রেণীর ভিতর ভাবগত ও ভাষাগত মিল প্রচুর। 'সুণ বাহ তথতা পহারী' (৩৬), আর 'সুন তরুবর গঅণ কুঠার' (৪৫)—এই দুই উক্তিতে পার্থক্য কোথায়? ৭ সংখ্যক গানের অদ্বয় অনুভব কি ৩৬ বা ৪২ সংখ্যক গানের অনুভব হইতে ভিন্ন? এমন কি 'অবণাগবণ' শব্দটি পর্যন্ত ৭ ও ৩৬ সংখ্যক চর্যায় সমভাবে ব্যবহৃত। চর্যাগীতির কৃষ্ণ বা কাহ্নপাদ এক ও অভিন্ন। যিনি 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা' গুনিয়া দাবার চাল চালেন (১২), তিনিই 'চৌষঠ্‌ঠী' দল পদ্মে ডোম্বীর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন (১০); যিনি 'সহজ-উন্মত্ত' (১৯), তাঁহারই চিত্তগজেন্দ্র 'সহজনলিনীবণ'-এর যাত্রী (৯)।

কাহ্নপাদের পরিচয় পুরাণশ্রুতিতে আচ্ছন্ন। তাঞ্জুর তালিকায় কখনও বলা হইয়াছে তিনি ভারতবাসী, কখনও বলা হইয়াছে তিনি উড়িষ্যা হইতে আগত। তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাস বলে, কৃষ্ণাচারী কর্ণ-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জনশ্রুতি ইহাও বলে, তাঁহার জন্মস্থান পদ্মনগর বা বিদ্যানগর বা বিজয়নগর। এই স্থানগুলি কোথায়, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। বাংলা সিদ্ধাচার্য-গীতিকা হইতে তাঁহার একটি কীর্তি-কেন্দ্র যে বঙ্গ মেহারকুল, তাহা জানা যায়: গুরুকে উদ্ধার করিবার জন্য—'কান্‌ফা চলিয়া গেল মেহারকুল দেশ।' কাহ্নপাদের গানে বাংলা শব্দসম্ভারের প্রাচুর্যও লক্ষণীয়।

কাহ্নপাদের জীবন অতি বিচিত্র। প্রথমে তিনি ছিলেন সিদ্ধাচার্য বিরূপ বা বিরুআর শিষ্য। নাম কাল-(Black) বিরূপ। ভবিষ্যদ্‌বাণী হয়, তিনি চারিটি মহাপাপ করিবেন। ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়। পাপক্ষালণের নিমিত্ত তিনি জালন্ধরী পাদের শরণ গ্রহণ করেন এবং জালন্ধরীর নির্দেশে বজ্রবারাহীর উপাসনা করিয়া পাপমুক্ত হন। বিরূপের সঙ্গে যে কৃষ্ণপাদের যোগ ছিল, চর্যাগানে তাহার ইঙ্গিত আছে। তাঞ্জুর তালিকায় আচার্য বিরূপের নামে 'কর্মাচণ্ডালিকা দোহাকোষগীতি' নামে একটি গ্রন্থ দেখা যায়। একটি চর্যায় কাহ্নং বলিয়াছেন, 'কাহ্নে গাইউ কামচণ্ডলী' (কামচণ্ডালী='কর্মচণ্ডালিকাসাধনস্বোপায় চণ্ডালী'—টীকা ১৮)। ওই চর্যায় ডোম্বীর উদ্দেশ্যে 'বিরুআ' শব্দটিও আছে

তবু জালন্ধরী পাদের সঙ্গেই কাহ্নের যোগ বেশী। বাংলা সিদ্ধাচার্য্য গীতিকায়—জালন্ধরী পাদ হাড়িপা নামে পরিচিত : আর এই 'হাড়িফাকে সেবে নিত্য কানফা যোগাই।' চর্যাগানে কাহ্নপাদ জালন্ধরীপাদকেই সাক্ষ্য মানিয়াছেন, 'শাখি করিব জালন্ধরী পাএ' (৩৬)। শুধু তাহাই নহে, তিব্বতী ইতিহাসে আছে, জালন্ধরীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য কৃষ্ণ অঙ্গে হাড়ের মালা ও হস্তে ডমরু ধারণ করিবেন। চর্যাগানে কাপালী যোগী কাহ্নও 'হাড়েরি মালী' ধারণ করিয়াছেন (১০), এবং 'অনহাডমরু' বাজাইয়া দেহনগরে বিহার করিয়াছেন (১১)।

(চর্যাগীতির কাহ্নপাদ একাধারে চর্যাধর, সিদ্ধ সাধক ও কবি।) সপ্রপঞ্চ চর্যার আদর্শ—যৌগিক ভোগ বা পঞ্চবর্ণ বিহারের কৌশল তিনি জনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন।(নিরংশু চর্যা বা কপাল-চর্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি 'যোগিকালঙ্কার' মণ্ডিত কাপালিক যোগীর জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন (চর্যা ১১)।) 'জ্ঞানামৃতপরিতুষ্ট', 'সহজানন্দসুন্দর' সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ 'বাক্‌পথাতীত' সহজানন্দের চরম অনুভবকেও অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। 'চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না' বাক্যটি (৪২) সহজতত্ত্বের নির্যাস। এ তত্ত্ব যে স্বসংবেদ্য ও অনির্বাচ্য, তাহা মিতাক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে এই পদে—

ভণই কাহ্ন জিণ-রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥—৪০

কাহ্নপাদের গীতে কবিত্ব আছে, নাটকীয়তা আছে, আছে ছোট গল্পের দীপ্তি ও লোকচরিত্রের সমালোচনা।

গৌড়বঙ্গের সমাজ-চিত্র উদ্ঘাটনের দিক হইতে কাহ্নপাদের কয়েকটি গান অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান। সমাজে ডোম্বীর স্থান, তাহাদের জাতিগত বৃত্তি ও স্বভাব এবং বিবাহচিত্র—বঙ্গ ইতিহাসের একটি দিকে আলোকসম্পাত করিয়াছে। তাঁহার কবি-দৃষ্টিও শিল্পীর মত স্বচ্ছ ও সুন্দর। সহজ-সাধনে অবধূতী-মার্গে প্রবেশের দুরূহ তত্ত্ব ডোম্বীর রূপকে এমনভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, যাহাতে লৌকিক শৃঙ্গারের পূর্বরাগ ও মিলন-সম্ভোগের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। (কাহ্নপাদের গানে ছন্দ-বৈচিত্র্য নাই—সবই ১৬ মাত্রার ছন্দ। রাগ-রাগিণীর বৈচিত্র্য আছে—দেশাখ, গউড়া, ভৈরবা, কামোদ প্রভৃতি। গানে ভনিতার প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। ডোম্বী, মত্ত গজেন্দ্র ও দাবা খেলার রূপকগুলি উপভোগ্য। ৪২ সংখ্যক গানের দৃষ্টান্ত বাক্যগুলিও অলঙ্কার যোজনায় সাধক-কবির কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর।)

ডোম্বীপাদ : তারানাথের মতে ডোম্বী-হেরুক ছিলেন বিরূপ-শিষ্য কাল বিরূপ বা কাহ্নপাদের শিষ্য। তাঞ্জুর তালিকায় আচার্য ডোম্বী বা আচার্য ডোম্বীপাদ এবং আচার্য বা মহাচার্য সিদ্ধ ডোম্বী-হেরুক উভয় নামেই একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। তারানাথের মতে উভয়ে অভিন্ন। তিব্বতী তালিকায় সিদ্ধ ডোম্বীহেরুককে সন্ন্যাসী ও মগধের রাজা বলা হইয়াছে। তারানাথ বলেন, ডোম্বীহেরুক ছিলেন ত্রিপুরার রাজকুমার। তিনি এক মুদ্রিকা লইয়া সাধনা করিতেন, ফলে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। কিন্তু রাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ডোম্বী হেরুক আশ্চর্য সিদ্ধাই দেখাইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করেন। তখন লোকে তাঁহার সিদ্ধির কথা বুঝিতে পারে। ডোম্বী-হেরুকের শিষ্য বর্গ ডোম্বী-ধারার[১] সাধক। তারানাথের মতে ডোম্বী রাঢ়ের রাজাকেও অভিষিক্ত করেন, ফলে রাঢ় অঞ্চল হইতে তীর্থিক ধর্ম লোপ পায়। ১০ সংখ্যক চর্যাটীকার পরে এইরূপ একটি উক্তি আছে—লাড়ী ডোম্বীপাদের স্থগেত্যাদি চর্যার ব্যাখ্যা নাই।[২] সুকুমার সেন মনে করেন, ইনি রাঢ়ের (লাঢ়ী) ডোম্বী হইতে পারেন। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের মতে ডোম্বী-হেরুক অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে বর্তমান ছিলেন।

ডোম্বীপাদের একটি চর্যা (১৪), চর্যাগীতিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে কোন ভনিতা নাই: কিন্তু ডোম্বীই যে কবিতাটির নায়ক, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নৌবাহনের রূপকে অবধূতিকা-মার্গে সাধকের প্রবাহাভ্যাসের একটি সুন্দর চিত্র এই চর্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। সাধকের মুদ্রা 'বুড়িলী মাতঙ্গী' (='সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী')। চর্যাটিতে সূক্ষ্ম বস্তুজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই চর্যায় উছারা, কেড়ুআল, কাচ্ছি, পুলিংদা, দুখোল, কবড়ী, বোড়ী প্রভৃতি শব্দও লোকশ্রুতি হইতে সমাহৃত।

ভাদে, মহিল ও ধামপাদ : কাহ্নপাদের ছয়জন শিষ্য, তন্মধ্যে ভাদে (ভদ্রপাদ), মহিল (মহিণ্ডা) ও ধর্ম বা ধামপাদ বিখ্যাত। ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া গীতিকা চর্যাগীতিকোষে উদ্ধৃত হইয়াছে। তারানাথের মতে ভদ্রপাদ 'গুহ্য' নামেও পরিচিত ছিলেন। বাংলা গোপীচন্দ্রের গানে 'বাইল ভাদাই' নামে কৃষ্ণাচার্যের যে শিষ্যের নাম পাওয়া যায়, ইনি ভদ্রপাদ হইতে পারেন। কানফা গোপীচন্দ্রকে উদ্ধার করিবার জন্ম সোনার

১. আধ্যাত্মিক অর্থে 'ডোম্বী' বলিতে বুঝায় 'বায়ুরূপা' অবধূতিকা (দ্রষ্টব্য চর্যাটীকা—১৯)
২. 'লাড়ীডোম্বীপাদানাং স্থগেত্যাদি চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।'

গোপীচন্দ্রমূর্তিকে ক্রুদ্ধ হাড়িপার সম্মুখে স্থাপন করিবার উপদেশ দেন। হাড়িপার ক্রোধে এই স্বর্ণমূর্তি ভস্ম হইয়া যায়। গুরু জালন্ধরী এই কথা জানিতে পারিয়া কানুপাকে শাপ দেন। ময়নামতীর অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ হাড়িপা বলেন, কানুপাকে শাপমুক্ত করিবে 'বাইল ভাদাই'। সিদ্ধাচার্যদের অনেকেই শিষ্যকর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন। হয়তো কানুপার বিপদেও উদ্ধার করিয়া থাকিবেন ভাদাই বা ভদ্রপাদ। তাঞ্জুর তালিকায় ভাদেপাদকে বলা হইয়াছে ভাণ্ডারিন্ (আচার্য); তাঁহার নামে 'সহজানন্দদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি' গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। ৩৫ সংখ্যক চর্যাটি ভাদেপাদের। গুরুর উপদেশে কিরূপে তিনি সহজচিত্ত লাভ করিয়াছিলেন, গানটিতে তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। টীকাকার ভদ্রপাদকে বলিয়াছেন 'জ্ঞানানন্দপ্রমোদ' যুক্ত সিদ্ধাচার্য। গানেও সর্বধর্ম অনুপলম্ভরূপ চরম জ্ঞানের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। গানে 'বাজুল' (বজ্রকুল) শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, ভদ্রপাদ ছিলেন বজ্রকুলের সাধক।

১৬ সংখ্যক চর্যাগানের রচয়িতা মহিণ্ডা। ভনিতায় 'মহিণ্ডা' নামই আছে। চর্যাশীর্ষে নাম 'মহীধরপাদ'। তারানাথের মতে 'মহিল'। তাঞ্জুর তালিকায় নাম পাওয়া যায় 'মহিপাদ'। সেখানে তিনি আচার্য কৃষ্ণের বংশধর (শিষ্য) বলিয়াই উল্লেখিত হইয়াছেন। তাঁহার রচনা 'বায়ুতত্ত্ব দোহাগীতিকা'। চর্যায় মত্ত গজেন্দ্রের ('মাতেল চিঅ গএন্দা') রূপকে তিনি অনাহত ধ্বনি শ্রবণে চিত্তের প্রজ্ঞালোকের দিকে যাত্রা ও মহারসপানের সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। মহীধরপাদের গানটি ধ্বনি গাম্ভীর্যে, ২৬ মাত্রার দীর্ঘায়ত ছন্দের গজগতিতে ও রূপক-কল্পনার সৌন্দর্যে সত্যই উপভোগ্য। টীকাকার বলিয়াছেন 'জ্ঞানপান-প্রমত্তো হি সিদ্ধাচার্য মহীধর'। এই জ্ঞান-দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত শিল্পদৃষ্টি। এই গানটির সঙ্গে কাহ্নপাদ-রচিত ৯ সংখ্যক চর্যার ভাব ও চিত্র-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহাতে কাহ্নপাদের সঙ্গে মহীধরের নিকট সম্পর্কই সূচিত হয়।

ধম্ম বা ধামও তারানাথের মতে কাহ্নপাদের শিষ্য। কাহ্নপাদ যখন গুরুকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শিষ্যবর্গ সহ গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে আসেন, তখন রাজা তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি ভোজের আয়োজন করেন। কাহ্নপাদ বলেন, শিষ্য ধম্ম ও ধূমকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেই সকলে পরিতৃপ্ত হইবে। রাজার সংগৃহীত সমস্ত ভোজ্য ধর্ম ও ধূম নিঃশেষ করেন। তখন সকলে উঁহাদের সিদ্ধি বুঝিতে পারেন। তাঞ্জুর তালিকাতেও আচার্য ধর্মপাদকে কৃষ্ণের

বংশধর বলা হইয়াছে। তাঁহার নামে 'সুগত দৃষ্টি গীতিকা', 'মহাযান নিস্পন্নক্রম' ও 'হুঙ্কার চিত্তবিন্দু ভাবনাক্রম' প্রভৃতি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ধামপাদের চর্যাতেও (৪৭) নিস্পন্নক্রম সাধনের কথাই বিবৃত হইয়াছে। প্রজ্ঞোপায় সমতাযোগে চণ্ডালী প্রজ্জ্বলিত হয়, দগ্ধ হয় অপরিশুদ্ধা নাড়ী; তখন নাড়ীর অধিদেবতা ও চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে মহাসুখচক্রে। হেবজ্রতন্ত্রের 'চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ' শ্লোকটির ভাষা-অনুবাদ ধামপাদের এই গান। ইহা প্রকারান্তরে কাহ্নপাদোক্ত 'কামচণ্ডালী' সাধন।

কম্বলাম্বর পাদ ঃ তাঞ্জুর তালিকায় আচার্য বা মহাচার্য কম্বলের নাম পাওয়া যায়; সেই সঙ্গে পাওয়া যায় প্রজ্ঞারক্ষিতের গুরু মহাসিদ্ধ কম্বলাম্বর-পাদের নাম। তাঁহার গ্রন্থ 'অভিসময়নামপঞ্জিকা'। তারানাথের বিবরণ অনুসারে, দারিকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয়। সেই সূত্রে দারিক-গুরু লুইপাদের গ্রন্থের 'পঞ্জিকা' রচনা করা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তারানাথের মতে কম্বল ছিলেন বজ্রঘণ্টের শিষ্য। ডোম্বী-হেরুক, জালন্ধরী প্রভৃতি আচার্যের সঙ্গেও কম্বলাম্বরপাদের যোগ ছিল। কাহারও মতে ইনি ছিলেন উড়িষ্যাবাসী রাজকুমার। শ্মশানে সাধনা করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ হন। মন্ত্রবতী শ্মশান-ডাকিনী তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু ডাকিনী শ্মশানে একটি কম্বল ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না। ইহাতেই তিনি 'কম্বল' নামে প্রসিদ্ধ হন। কম্বলাম্বরপাদের কিছু সংস্কৃত রচনাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে সরহ-দোহার অদ্বয়বজ্রকৃত টীকায়। সেখানে তিনি শাস্ত্র-শব্দাক্ষরের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* ৮ সংখ্যক চর্যা 'সোণে ভরিতী করুণা নাবী' গানখানি কম্বলাম্বরপাদের রচনা। গানে সাধক নিজেকে 'কামলি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। নৌবাহনের রূপকে 'পরমকরুণামুদিতহৃদয়' কম্বলাম্বর-পাদ মহাসুখচক্রের উদ্দেশ্যে বোধিচিত্তের যাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন। গানটি সাধনতত্ত্বের রূপক। নৌবাহনের একটি বাস্তব চিত্র এই গানে পাওয়া যায়। 'খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি', 'কেড়ুআল' প্রভৃতি শব্দ নৌকা বাওয়ার অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। সন্ধ্যাসঙ্কেতে ও উৎপ্রেক্ষায় কামলির চর্যাটি উপভোগ্য।

* কম্বলাচার্যেণোক্তম্ ঃ

বর্ণাপবাদানি বাক্যানি লিঙ্গানি বচনানি চ।

ক্রিয়াকারকসম্বন্ধা বিতথম্বাদ বাচকাঃ ।। দ্রষ্টব্য বৌদ্ধ গান ও দোহা

বীণাপাদ: ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "টীকাকারের অনুসরণে একটি চর্যা (১৭) অকারণে বীণাপাদের রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভনিতা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি এমন কোন নাম চর্যাটিতে নাই।" চর্যাগানে অনেকক্ষেত্রে লেখক রূপকের আবরণে আত্মগোপন করিয়াছেন, কোথায়ও বা সরাসরি কোন ভনিতা না দিয়া নিজেই গীতি-কবিতার নায়ক সাজিয়াছেন। কাহ্নপাদের ১০ সংখ্যক চর্যায় ও শবরপাদের ২৮ ও ৫০ সংখ্যক চর্যায় এই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। কাজেই বীণাপাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাঞ্জুর তালিকায় বিরূপার বংশধর রূপে বীণাপাদের উল্লেখ আছে। গুহ্যাভিষেক, মহাভিষেক ও বজ্রডাকিনী নিষ্পন্নক্রমের উপর তাঁহার গ্রন্থও আছে। বীণাপাদের চর্যাটিও নিষ্পন্নক্রমের সাধন-সংক্রান্ত চর্যা। সেকমণ্ডলে আলি-কালির দ্বার রুদ্ধ হইয়া চিত্ত অবধূতী মার্গে প্রবিষ্ট হইলে, কি ভাবে হেরুক-বীণায় শূন্যতা ধ্বনি উঠে, কি ভাবে যোগিনী অভিসঙ্গে যোগী বজ্রনৃত্যে ও বজ্রগীতে তন্ময় হন—তাহার একটি বাস্তব চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বীণাপাদের গানে। সাধক সত্তাই এখানে বীণা-যন্ত্র স্বরূপ। বীণার রূপণায় নীরস দেহতত্ত্ব প্রসঙ্গ সরস হইয়া উঠিয়াছে। গানটি শুধু তত্ত্ব নহে, নানা তথ্যে সমৃদ্ধ ও বস্তুদৃষ্টির পরিচয়বহ। তারানাথ বলেন, বীণাপাদ অশ্বপাদের শিষ্য। ডোম্বী-হেরুকের সঙ্গেও তাহার সংযোগ ছিল। তাহা হইলে বীণাপাদের কাল দাঁড়ায় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদ।

কুক্কুরীপাদ: তাঞ্জুর তালিকায় আচার্য কুক্কুরীপাদ কুকুরাজ বা কুক্কুররাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার নামে অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'গুহ্যার্থধর ব্যূহ' নামে তিনি বজ্রসত্ত্ব, বৈরোচন, বজ্রহেরুক, পদ্মনর্ত্তেশ্বর প্রভৃতির সাধন-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গুহ্যার্থ উদ্যোতনে কুক্কুরিপাদ পারঙ্গম। তাঁহার দুইটি চর্যাই (২, ২০) গূঢ়ভাষিত সন্ধ্যাসঙ্কেতে পূর্ণ, যেন দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। আর একটি চর্যা (৪৮) লুপ্ত। তিব্বতী অনুবাদের সংস্কৃত ছায়া হইতে তাহার যে ভাববস্তু আহরণ করা যায়, তাহা যুদ্ধের রূপকে রূপিত। টীকাকার মুনিদত্তের ভাষ্য অনুসারে কুক্কুরীপাদ 'স্বানন্দ আসবপান-প্রমোদমনা' (২) এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতার্থামৃতপানপরিতুষ্ট' (২০)। তাঁহার দুইটি গানই তত্ত্ব-সমৃদ্ধ—একটিতে আছে সাধনতত্ত্বের গূঢ় নির্দেশ (২), আর একটিতে নৈরাত্মা যোগিনীর স্বরূপ। উভয়ত্রই আসিয়াছে গৃহবধূর রূপণা।

কুক্কুরীপাদের গানে গৃহবধূর দুশ্চরিত্রতা (২) এবং শ্যামনা ভাতারী নারীর মর্মবেদনা (২০) উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। একটিতে পাই ছোটগল্পের আভাস, আর একটিতে গীতিকবিতার স্ব-সংবেদন। গৌড়বঙ্গের সামাজিক অবস্থার প্রতিলিপি হিসাবে দুইটি গানই মূল্যবান্। সাধক-দৃষ্টির সঙ্গে রসদৃষ্টি মিলিত হইলে কবিতা কিরূপ রসমধুর হয়, কুক্কুরীপাদের গান তাহার সাক্ষ্য। কুক্কুরীপাদের গানে দুলি, বিয়াতী, বহুড়ী, কাড় (দেহছায়া) ভতার, বায়ড়া প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

আর্যদেব : তাঞ্জুর তালিকায় আর্যদেবকে 'আচার্য', 'মহাচার্য' বলা হইয়াছে। তাহার নামে অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। আর্যদেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। চতুষ্পীঠ যোগতন্ত্র সাধন সম্পর্কে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। 'চিত্তাবরণবিশোধন নামপ্রকরণ' ('চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ') সংস্কৃত গ্রন্থখানিও সহজ-সাধনার চিত্তশোধন বিষয়ক মূল্যবান্ গ্রন্থ। ভাষায় তিনি রচনা করেন 'কাণেরি গীতিকা'। প্রভুভাই প্যাটেল মনে করেন, আর্যদেব রাহুলভদ্রের শিষ্য সিদ্ধ নাগার্জুন এবং উড়িষ্যারাজ ইন্দ্রভূতি পাদের সমসাময়িক। তিনি আরও বলেন, 'Aryadeva was somewhat earlier than the beginning of the eighth century,'[১]

আর্যদেবের (আজদেব) একটি চর্যা (৩১) চর্যাগীতিকায় আছে। নৈরাত্মধর্ম আমুখীকরণে চিত্তের অন্তরালাগম ('নিরাল') অনুভবের কথাই তিনি উক্ত চর্যায় ব্যক্ত করিয়াছেন। নিঃস্বভাবীকৃত চিত্তে বিকল্পাবলী কিভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, সে সম্পর্কে দৃষ্টান্তবাক্যটি সুন্দর—

চান্দেরে চন্দকান্তি জিম পডিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসঅ॥

কঙ্কণ : তাঞ্জুর তালিকামতে কঙ্কণ সিদ্ধ সাধক। তিনি আচার্য কম্বলের বংশধর। তাঁহার রচনা 'চর্যাদোহাকোষগীতিকা'। সম্ভবতঃ গীতিকা বাদে তিনি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ৪৪ সংখ্যক চর্যাটি কৌঙ্কণ বা কঙ্কণ-পাদের রচনা। টীকাকার তাঁহাকে বলিয়াছেন, পরম করুণাসব পানে প্রমুদিত 'কঙ্কণ সিদ্ধাচার্য'। চর্যাটিতে মধ্যমা নিরোধে যুগনদ্ধ ফলোদয়ের অবস্থাটি বর্ণনা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র মাপের মাত্রা ছন্দ (১১ মাত্রার রসিকা) কঙ্কণই ব্যবহার

১. Citta Visuddhi Prakarana : Introduction (Visva Bharati)

করিয়াছেন। ষোড়শ মাত্রিক স্তবক-বন্ধনের সঙ্গে ১১ মাত্রার চরণ ছন্দে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছে,—সুনে সুন মিলিআ জবেঁ ॥
সঅল ধাম উইআ তবেঁ ॥

চাটিল: চাটিল নাম তারানাথের বিবরণে নাই, তাঞ্জুর তালিকাতেও নাই। বর্ণরত্নাকরে সিদ্ধা-বর্ণনায় 'চাটল' নাম আছে, বিনয়শ্রীকৃত সিদ্ধনামাঙ্ক-স্মরণে আছে 'চাটলা' নাম। ৫ সংখ্যক চর্যাগানটি চাটিলপাদের রচনা। গানে তিনি নিজেকে 'অনুত্তর সামী' বলিয়াছেন। ডঃ সেন মনে করেন, গানটি চাটিলের কোন শিষ্যের রচনা। "কেননা, যত উচ্চস্তরের সাধক হোন না কেন, কোন চর্যাকর্তাই নিজেকে 'অনুত্তর স্বামী' গুরু বলিয়া জাহির করিবেন না।" সাধক-সঙ্গীত সম্পর্কে এ উক্তি প্রযোজ্য নহে। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস কি স্বরচিত কবিতায় নিজের গুণ জাহির করেন নাই? সিদ্ধাচার্যগণ বহুস্থলে নিজগৌরব উচ্চনাদে ঘোষণা করিয়াছেন। লুইপাদ, গুণ্ডরীপাদ, কুক্কুরীপাদ—সকলের গানেই 'আত্মপ্রশংসা' আছে। চাটিলের গানে নদীমাতৃক বঙ্গের নদীর গহন-গম্ভীর রূপ বস্তুদৃষ্টির পরিচয়বহ। সাঁকো-নির্মাণের বর্ণনাটিও বাস্তব। চিখিল, থাহী ফাড়িঅ, পটি, টাঙ্গী প্রভৃতি দেশজ শব্দের সঙ্কলনে গানটি মূল্যবান।

গুণ্ডরীপাদ: Grunwedel যে সিদ্ধাচার্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে গুণ্ডরী নাম আছে, বিনয়শ্রীর সিদ্ধবন্দনাতেও আছে। তাঞ্জুর তালিকায় এই নামের কোন লেখক নাই। ৪ সংখ্যক চর্যাটি গুণ্ডরীপাদের রচনা—ভণিতা 'গুড়রী'। হেরুক-চর্যায় পারঙ্গম সাধক এইগানে কুন্দুরু যোগের একটি সঙ্কেত করিয়াছেন। গানটিতে নর-নারীর প্রেম ও মিলনের স্থূল বর্ণনা আছে। 'যোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি। তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥' —পদটি বাস্তব শৃঙ্গারের সাভিলাষ উক্তি। গূঢ়ার্থে উহা যোগঘটিত কমল-কুলিশ বা প্রজ্ঞোপায়যোগ। নৈরাত্মা যোগিনীই সাধকের প্রিয়তমা। গানটির শেষে আছে আত্মপ্রশংসা,—ভণই গুড়রী অহ্মে কুন্দুরে ধীরা।
নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা ॥—৪

গানটিতে কমলকুলিশ, মণিকুল, ওডিআণ, চন্দ্র-সূর্য, কুন্দুর প্রভৃতি শব্দ সঙ্কেতপূর্ণ।

তাড়কপাদ: তাড়ক নামটি একটি চর্যা (৩৭) ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঞ্জুর তালিকায় মহাপণ্ডিত তারশ্রী ও উপাধ্যায় তার-পাদের নাম পাওয়া যায়। তাড়ক ইহাদের কেহ হইতে পারেন। টীকাকার তাড়ককে সিদ্ধাচার্য বলিয়াছেন—'সিদ্ধাচার্যো হি তাড়ক'। গানটিতে সহজজ্ঞানের

অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সহজে মহামুদ্রা সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষাও লুপ্ত হইয়া যায়, উহা 'চৌকোড়ি বিমুকা' (চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত) এবং 'বাক্ পথাতীত'। তাড়কের গানে বস্তুদৃষ্টির পরিচয় আছে। নৌ-পারাপারে পারানীর কড়ি অনুসন্ধানের দৃষ্টান্তটি উপভোগ্য—'বাগুকুরুগু সন্তারে জাণী।'

জয়নন্দী ঃ জয়নন্দী নামটি তারানাথের ইতিহাসে নাই। সিদ্ধাচার্য তালিকায় 'জয়নন্দ' নামটি পাওয়া যায়। ৪৬ সংখ্যক চর্যাটি তাঁহার রচনা। টীকাকার তাঁহাকে পরম করুণা অর্জনের নিমিত্ত 'অভিজ্ঞা লাভী' বলিয়াছেন। তিনি কি সিদ্ধ নহেন ? গানটিতে পরমার্থ চিত্তের অদাহ্য, অপ্লাব্য, অচ্ছেদ্য রূপের বর্ণনা আছে, আর আছে পরমার্থতত্ত্বের লক্ষণ। জয়নন্দীর গান অলঙ্কার-বর্জিত, সোজাসুজি তত্ত্ববাহী।

ঢেণ্ঢণপাদ ঃ ঢেণ্ঢণপাদের নাম তিব্বতী ইতিহাসে নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন, ভোট উচ্চারণে যিনি ধেতন, তিনিই ঢেণ্ঢণ। ৩৩ সংখ্যক চর্যাটি তাঁহার রচনা। টীকাকার তাঁহাকে 'পরমানন্দমুদিত সিদ্ধাচার্য' বলিয়াছেন। চর্যাটি আগাগোড়া সন্ধ্যাভাষায় লেখা। চর্যাটিতে সন্ধ্যা-সঙ্কেতে সংসারচিত্ত ও সহজ চিত্তের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পদে পদে পরস্পরবিরোধী উক্তি ও বিরোধ অলঙ্কারের সমাবেশে ('বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে', 'জো সো চৌর সৌ দুষাধী', নিতি নিতি ষিআলা ষিহে সম জুঝঅ) চর্যাটি দুরূহ হইলেও উপভোগ্য। চর্যাকারের সরস আনন্দ-দৃষ্টিও উপভোগের বস্তু। গানটিতে গৌড়বঙ্গের গরীব সংসারের চিত্র পাওয়া যায়। সাধকের সূক্ষ্ম বস্তুদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তিও প্রশংসনীয়। কবীরের একটি কবিতায় হুবহু এই চর্যার প্রতিধ্বনি মিলে। সহদেব চক্রবর্তী ও লক্ষ্মণের অনিল পুরাণে এবং গোর্খ বিজয় কাব্যেও ঢেণ্ঢণপাদের কতিপয় উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

তন্ত্রীপাদ ঃ তন্ত্রীপাদের চর্যা (২৫) লুপ্ত। টীকা হইতে গানের শেষাংশের কিছু আভাস পাওয়া যায়। তিব্বতী অনুবাদ হইতে গানটি যে তন্তু বয়ন-বিষয়ক, তাহা বোঝা যায়। 'তন্ত্রী' নামটি জাতি-বৃত্তির স্মারক। নৈরাত্মা যোগিনীর অভিষঙ্গে জাতিধর্ম লুপ্ত হইয়া যায়—হীন-বৃত্তিধারী তন্ত্রী হন বজ্রধর। গানটির শেষাংশে এই যোগিনী-অনুশংসাই বর্ণিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য টীকা)। সিদ্ধাচার্য তালিকায় 'তান্তি' নাম আছে, বর্ণরত্নাকরে নাম 'তন্তিপা'।

সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জী

[স=সম্পাদনা, Tr.=অনুবাদ]

অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ : স. শাস্ত্রী হরপ্রসাদ (G. O. S. XL.)

অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী : বেজবরুয়া দেবেন্দ্রনাথ

আর্যা সপ্তশতী : স. চক্রবর্তী জাহ্নবীকুমার

কাব্যাদর্শ (দণ্ডী) : স ব্যানার্জী অনুকুলচন্দ্র (কঃ বিঃ)

কাব্যশ্রী : দাশগুপ্ত সুধীর কুমার

গৌড়ীয় ব্যাকরণ : রায় রাজা রামমোহন

গৌড়ের ইতিহাস (১ম) চক্রবর্তী রজনীকান্ত

চর্যাগীতি (ক. বিশ্ববিদ্যালয়) : মুখোপাধ্যায় তারাপদ

চর্যাগীতিকোষ (বিশ্বভারতী) : স. বাগচী প্রবোধচন্দ্র ও শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রী

চর্যাগীতি পদাবলী : সেন সুকুমার

চর্যাপদ : বসু মণীন্দ্রমোহন

চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ (বিশ্বভারতী) স. প্রভুভাই প্যাটেল

চিণ্ময় বঙ্গ : সেন শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন

জীবন জিজ্ঞাসা : মজুমদার মোহিতলাল

ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দো বিবর্তন : ভট্টাচার্য তারাপদ

ছন্দোমঞ্জরী (গঙ্গাদাস সূরী) : স. ভট্টাচার্য রামধন (Saus. Series XIV)

জ্ঞানসাগর (আলী রাজা) : স. সাহিত্য বিশারদ আব্দুল করিম (সা প)

তাঞ্জুর তালিকা (পরি. বৌদ্ধগান ও দোহা) : শাস্ত্রী হরপ্রসাদ

দেশী নামমালা (হেমচন্দ্র) : স. ব্যানার্জী মুরলিধর (কঃ বিঃ)

দোহাকোশ (সরহপাদ) : স. মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন

ধর্মপূজাবিধান (রামাই পণ্ডিত) স বন্দ্যোপাধ্যায় ননীগোপাল (সা. পঃ)

ধ্বন্যালোক ও লোচন (আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত) : স. সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র ও কালীপদ ভট্টাচার্য

নিরুক্ত (যাস্ক) ১ম—৪র্থ : স. ঠাকুর অমরেশ্বর (কঃ বিঃ)

নাট্য শাস্ত্র (ভরত) : স. ঘোষ মনোমোহন (এশিয়াটিক সোসাইটি)

পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

পবনবিজয় স্বরোদয় : বসুমতী সংস্করণ

পাতঞ্জল যোগদর্শন : শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ (কঃ বিঃ)

প্রাকৃত কল্পতরু (রামশর্মা) স. ঘোষ মনোমোহন (এশিয়াটিক সোঃ)
প্রাকৃত পৈঙ্গল (১ম, ২য়) : ব্যাস ভোলাশঙ্কর (প্রাঃ গ্রন্থ পরি. বারাণসী)
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার : চক্রবর্তী জাহ্নবীকুমার
বর্ণরত্নাকর (জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর) : স চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার ও বাবুয়া মিশ্র (এ. সো.)
বাগর্থ : ভট্টাচার্য বিজনবিহারী
বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি : দাস ক্ষুদিরাম
বাংলা দেশের ইতিহাস (১ম, ২য়) : মজুমদার রমেশচন্দ্র
বাংলার বাউল (লীলা বক্তৃতা, কঃ বিঃ) : সেন শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন
বাংলার বাউল ও বাউল গান : ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ
বাংলা ভাষা পরিচয় : ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস : ভট্টাচার্য আশুতোষ
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) : চট্টোপাধ্যায় তপনমোহন
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম; ২য়, ৩য়) : বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার
বাঙালীর ইতিহাস (১ম) : রায় নীহাররঞ্জন
বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ) : বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস
বাঙ্গালা ব্যাকরণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম. পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ) : সেন সুকুমার
বোধিচর্যাবতার (শান্তিদেব) : কপিল মঠ সংস্করণ
বোধিচর্যাবতার (শান্তিদেব) : জার্নাল বুদ্ধিস্ট্ টেক্স্ট্
বৌদ্ধ গান ও দোহা (চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, সরোজবজ্র ও কাহ্নপাদের দোহাকোষ, ডাকার্ণব) শাস্ত্রী হরপ্রসাদ
বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি : দাশগুপ্ত শশিভূষণ
ভক্তি রত্নাকর (নরহরি চক্রবর্তী) : গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় : দত্ত অক্ষয়কুমার
ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ : চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার
ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ : পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ
ভাষার ইতিবৃত্ত : সেন সুকুমার

হোযান বিংশিকা (নাগার্জুন) : স. ভট্টাচার্য বিধুশেখর (বিশ্বভারতী)
াদুনাথের ধর্ম পুরাণ (বিশ্বভারতী) : স. মণ্ডল পঞ্চানন
যোগাচারভূমি (অসঙ্গ) : স. ভট্টাচার্য বিধুশেখর (ক: বি:)
যোগ রত্নমালা (কাহ্নপাদ) : Snellgrove সম্পাদিত হেবজ্রতন্ত্রে মুদ্রিত
রামরচিত (সন্ধ্যাকর নন্দী) : স. বিদ্যাবিনোদ অযোধ্যানাথ
শব্দ তত্ত্ব : ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
শ্রীগুহ্য সমাজ তন্ত্র : স বাগচী শীতাংশুশেখর (মৈথিলী সং)
সঙ্গীত পরিচিতি : বন্দ্যোপাধ্যায় নীলরতন
সাধনমালা (G. O. S.) : ভট্টাচার্য বিনয়তোষ
সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী (দৌলতকাজী) : স. ঘোষাল সত্যেন্দ্রনাথ (বিশ্বভারতী)
সাহিত্য দর্পণ (বিশ্বনাথ) : স. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর
সাহিত্য পত্রিকা (১ম সংখ্যা) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেকোদ্দেশ টীকা (নারোপা) : স M. E. Carelli (G. O. S XC)
হঠযোগ প্রদীপিকা : বসুমতী সংস্করণ
হারামণি (কলিকাতা বিশ্বদ্যালয়) : মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস : রামচন্দ্র শুক্ল

Introduction to Mahayana Buddhism : W. M. Mc Govern
Asta Sahasrika Pragma Paramita : Tr. E. Conze
Buddhism : C. Humphreys
Caste in India : J. H. Hutton.
Development of Mahayana Buddhism : D. T Suzuki
Encyclopaedia of Religion and Ethics
(Essays on Mysticism) : R. M Jones, La Valle Poussin)
English Critical essays (19th Century) : Ed. E D. Jones.
Hevajra Tantra (Text) : D. L. Snellgrove
Hevajra Tantra (Criticel study) : : D. L Snellgrove
History of philosoply Eastern and
Western. Vol I : : Ed Radhakrishnan
Introdution to Tantric Buddhism : S B. Dasgupta
Islam in India and Pakistan : M. T. Titus
Journal and Text Buddhist Text Society : (1893—1896)

Kirata-Jana-Kriti : : S. K. Chatterjee
Materials for a critical Edition
of the Old Bengali Carya Gitis : P. C. Bagchi. (C.U.)
Muslim traditions in Bengali Literature : Syed Ali Asraf.
Mysticism ; Rudolph Otto.
Mysticism : Evelyn Underhill
Mystic Tales of Lama Taranath : Tr. Beupendranath Datta.
Obscure Religious cults : S, B. Dasgupta.
Origin and Development of Bengali
Language (O. D B. L. Vols. I. II) : S. K. Chatterjee
Persian Influence on Hindi (C. U) : Ambika Prasad Bajpeyi
Prabandha Chintamani (Merutunga) : Tr. C. Tawney (A. S. B)
Saddharma Pundarika : Tr. H. Kern.
Sufism : Its Saints & Shrines : John. A. Subhan,
Studies in Tantras Part I : P. C. Bagchi.
Studies in Ancient India : P. Maiti.
The Awakesning of Faith
(Sraddhotpad Sastra of Aswaghosh) : Tr. Suzuki.
The Cultural Heritage of India : Ed. Ramakrishna Vedanta Math
The Old Bengali Language and Text (C.U) : Tarapada Mukherjee
The teachings of the Mystics : W. T. Stace.

সমাপ্ত